আল্লামা কারী মুহাম্মদ তৈয়ব রহ. এর
বক্তৃতামালার অমর সংকলন

খুতুবাতে হাকীমুল ইসলাম



আল্লামা কারী মুহাম্মদ তৈয়ব রহ. এর
বক্তৃতামালার অমর সংকলন

খুতুবাতে হাকীমুল ইসলাম-২

অনুবাদ
মাওলানা আবু সাকী মাহবুব
মুহাদ্দিস, সম্পাদক ও সাহিত্যিক
খানেকাহ হাটহাজারী

বইঘর
[অভিজাত বইয়ের ঠিকানা]
৪৩ ইসলামী টাওয়ার, ১১/১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
দূরালাপনী : ০১৭১৭৫৫৪৭২৭, ০১৭১১৭১১৪০৯
e-mail: boighorbd@gmail.com; boighor2008@gmail.com
web: www.boighorbd.com



খুতুবাতে হাকীমুল ইসলাম-১
অনুবাদ মুহাম্মদ আবু সাঈদ মাহবুব

প্রকাশক
ম ই ম র -এর পক্ষে
এস এম আমিনুল ইসলাম

© সংরক্ষিত

৫ম মুদ্রণ
জুলাই ২০১৮

৪র্থ মুদ্রণ
জানুয়ারী ২০১৭

তৃতীয় মুদ্রণ
অক্টোবর ২০১৫

প্রথম প্রকাশ
জানুয়ারি ২০১১

প্রচ্ছদ
আরিফুর রহমান

কম্পোজ
ম ই ম র কম্পিউটার
বাংলাবাজার, ঢাকা- ১১০০
০১৭১১৭১১৪০৯

মুদ্রণ : মাসুদ আর্ট প্রেস
২৬/২, প্যারিদাস রোড, ঢাকা-১১০০

মূল্য : ৫০০ টাকা মাত্র

ISBN : 984-70168-0017-7

KHOTOBAT-E-HAKIMUL ISLAM : Translate by Abu Saki Mahbub
Published by : S M Aminul Islam, BoiChor : Islami Tower Ground floor
11/1 Banglabazar, Dhaka-1100 First Edition : January 2011, Fifth Edition : July
2018 © by the publisher

Price : 500 Taka only

অ র্প ণ

হযরত মাওলানা সৈয়দ মুহাম্মাদ শামছুল হক
প্রতিষ্ঠাতা মুহতামিম, মদীনাতুল উলুম কওমী মাদরাসা
পৈকখালী, ভাণ্ডারিয়া, পিরোজপুর।

হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রাজ্জাক
সহ-সুপার, হযরতপুর আহমদিয়া দাখিল মাদরাসা
সিরাজদিখান, মুন্সিগঞ্জ।

হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ শহীদুল্লাহ
মুহাদ্দিস, দারুল উলুম খাদেমুল ইসলাম
গওহরডাঙ্গা, গোপালগঞ্জ।

আমার উর্দু-ফার্সি ভাষা শিক্ষার ভিত্তি যাঁদের
হাতে রচিত হয়েছে।

টেলিগ্রাম চ্যানেল লিংক
https://t.me/islaMic_fdf

প্রকাশকের নিবেদন

ইদানীং ভিন্ন ভাষার মনীষীদের অনূদিত বক্তৃতা প্রকাশের প্রবল জোয়ার বইছে। বাংলা ভাষাভাষীরা এতে উপকৃতও হচ্ছেন যথেষ্ট। সেই তুলনায় উপমহাদেশের যুগশ্রেষ্ঠ আলেমেদীন বিশ্ববিখ্যাত ইসলামী বিদ্যাপীঠ দারুল উলুম দেওবন্দের অর্ধশতকেরও অধিক সময়ের মুহতামিম আল্লামা কারী মুহাম্মদ তৈয়ব রহ. অনেকটা উপেক্ষিতই রয়েছেন বলা চলে। অথচ উপমহাদেশের ক্ষণজন্মা এ মনীষীর বর্ণাঢ্য কর্মময় জীবনে হকের পয়গাম মানুষের দুয়ারে পৌঁছে দিতে রয়েছে লেখনি ও বক্তৃতামালার অসামান্য অবদান। সেসব আকর গ্রন্থগুলি আরবি উর্দুসহ নানা ভাষায় অনূদিত ও প্রকাশিত হয়ে মুসলমানদের আল্লাহমুখী জীবন গঠনে অবদান রেখে চললেও বাংলা ভাষায় তা যথেষ্ট পরিমাণে অনুপস্থিত। উল্লেখ্য, কারী মুহাম্মদ তৈয়ব রহ.-এর ব্যক্তিগত জ্ঞান, প্রজ্ঞা, স্মরণশক্তি ও মেধা এবং বংশীয় পরিচিতির সুবাদে তিনি শিক্ষাক্রম সমাপ্ত করেই দারুল উলুমে শিক্ষক হিসাবে নিযুক্তি লাভ করেন। তেমন যোগ্যতা ছিল বলেই মাত্র পঁচিশ বছর বয়সে তিনি দারুল উলুম দেওবন্দের মতো একটি বিশ্বখ্যাত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মুহতামিমের দায়িত্ব পেয়েছিলেন। সফল শিক্ষকতা এবং সুদক্ষ পরিচালনা ছাড়াও তিনি ওয়াজ নসীহত এবং বক্তৃতার ক্ষেত্রে অসামান্য যোগ্যতার অধিকারী ছিলেন। ছাত্রজীবন থেকেই তাঁর সুললিত বক্তৃতা ও আলোচনা শ্রোতাসাধারণকে মুগ্ধ করত। অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়েও তিনি একটানা কয়েক ঘণ্টা বক্তৃতা করতে পারতেন। শরীয়তের সূক্ষ্ম তত্ত্ব ও গভীর রহস্য আলোচনা এবং বিষয়বস্তুকে সংক্ষেপে বোধগম্য করিয়ে দিতে তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত শ্রেণীও তাঁর বিজ্ঞচিত আলোচনায় উপকার লাভ করতেন। আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়সহ ভারতের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর বক্তৃতার আয়োজন করা হতো। কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা আলীগড়

বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে মুদ্রিত করে প্রকাশও করা হয়। তাঁর সেসব মূল্যবান বয়ানগুলোই 'খুতুবাতে হাকীমুল ইসলাম' নামে দশ খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে, যা একাধারে ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের ভাণ্ডার এবং ইসলামী সাহিত্যের সুবিশাল আকর। তাঁর বক্তৃতা সম্পর্কে বলা যায়– নিখিল ভারতের এমন কোন প্রদেশ নেই, যেখানে তাঁর বক্তৃতার ধ্বনি পৌঁছায়নি।

আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, জ্ঞানতাপস আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন এই মনীষীর বিখ্যাত সেই বক্তৃতাগুলো এখনো বাংলা ভাষাভাষীদের সামনে অনুপস্থিত। আমরা সীমিত সাধ্য নিয়ে যাত্রা শুরু করলেও স্বপ্ন দেখার তাওফিক যিনি দিয়েছেন তাঁর ভাণ্ডারে তো কমতি নেই। সেই ভরসা আর দীন প্রসারের অদম্য বাসনাকে পুঁজি করে এই মনীষীর সেরা সংকলন হিসেবে বিবেচিত 'খুতুবাতে হাকীমুল ইসলাম' বাংলায় প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। পাশাপাশি তাঁর অন্যান্য গ্রন্থাদিও বাংলায় প্রকাশের ইচ্ছে আমাদের রয়েছে। প্রাজ্ঞ আলেম আবু সাকী মাহবুব অনূদিত প্রথম খণ্ডটি ব্যাপক পাঠকপ্রিয়তার পাশাপাশি পরবর্তী খণ্ডগুলোর জন্য আমরা পাঠকদের অনবরত তাকিদ পাচ্ছি। আশা করি পরবর্তী খণ্ডগুলোও স্বল্পতম সময়ের মধ্যে পাঠকদের হাতে তুলে দিতে সক্ষম হবো। আমাদের এ কাজ নিতান্ত ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে নয়– পাঠক মাত্রই তা বুঝবেন। তাই আমাদের অগ্রযাত্রায় আপনাদের সার্বিক পরামর্শ ও সহযোগিতা প্রত্যাশা করি। কষ্টসাধ্য এ কাজের বদলা মহান আল্লাহ তাআলা এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে দান করুন।

তারিখ : দুআর মুহ্তাজ

১ ডিসেম্বর ২০১০ ঈ. এস এম আমিনুল ইসলাম

হযরত হাকীমুল ইসলাম রহ.-এর উত্তরসূরি সুযোগ্য খলীফা খতীবুল আস্‌র হযরত মাওলানা সালেম কাসেমী সাহেব-এর

ভূমিকা

কুতুবুল ইরশাদ হাকীমুল ইসলাম হযরত মাওলানা কারী মুহাম্মাদ তৈয়ব রহ. মুহতামিম দারুল উলুম দেওবন্দ-এর ব্যক্তিত্ব ছিল সকল গুণের কেন্দ্রস্থল, সকল আধ্যাত্মিক নিসবতের কেন্দ্র এবং পূর্ণাঙ্গতার আধার। এক নজর তাঁকে দেখার পর ঈমানদারগণের এ অনুভূতি হত যে, আমরা সকল আকাবির ও সালেহীনের দর্শন লাভে ধন্য হয়েছি। তাঁর মাহফিলে অংশগ্রহণকারীদের এ ধারণা যথার্থই ছিল যে, সালফে সালিহীনের মাহফিলে অংশগ্রহণ করার সৌভাগ্য আমাদের লাভ হয়েছে।

উলামায়ে কেরাম ইলমী সন্দেহ-সংশয়পূর্ণ প্রশ্নাবলী পেশ করে হযরতের নিকট হতে তৃপ্তিদায়ক উত্তর লাভ করার পর এ স্বীকারোক্তি যথার্থ ছিল– আল্লাহ তাআলা কারী সাহেব রহ.-এর মাধ্যমে আকাবিরগণের ফায়েয-বরকত ও আত্মার শান্তি আমাদেরকে দান করে সৌভাগ্যশালী করেছেন। মাসাইল ও মুয়ামালাত সম্পর্কে পরামর্শকারীদের এ অনুভূতি ও উপলব্ধি অত্যন্ত সঠিক ও অপরিবর্তনীয় হত যে– المستشار مؤتمنٌ এবং المجالس بالأمانة হযরতের মজলিসের আলাপ-আলোচনা আমানততুল্য এবং পরামর্শদাতা হিসেবেও তিনি অত্যন্ত বিশ্বস্ত। তাঁর পরামর্শ গ্রহণ করে আমরা যেন উম্মতের সকল সালিহীন বান্দার পরামর্শের ফয়েয লাভ করেছি এবং আমাদের আত্মার প্রশান্তি লাভ হয়েছে।

ব্যক্তিগত বিষয়াবলি, সম্মিলিত বিষয়াবলি, সমিতি, সংগঠন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ইবাদতকেন্দ্র প্রভৃতিতে সৃষ্ট ঝগড়া-কলহ, বিরোধ ও মতানৈক্য দেখা দিলে সাধারণত উভয়পক্ষই হযরত রহ.-কে পরিপূর্ণ বিশ্বাসের সাথে সালিস নিযুক্ত করতেন এবং হযরত রহ. যে সিদ্ধান্ত ঘোষণা করতেন, সে সিদ্ধান্তে শরীয়ত, প্রচলিত আইন-কানুন এবং বিবেক-বুদ্ধির কষ্টিপাথরে ন্যায়-নীতি ও ইনসাফের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম দিকও পরিপূর্ণভাবে রক্ষিত হত। উভয়পক্ষ নিজ নিজ অবস্থান থেকে সব রকমের দ্বিধা-সংশয় হতে শুধু মুক্তই হতেন না; বরং জয়-পরাজয়ের অর্থহীন অনুভূতিও শেষ হয়ে যেত এবং ফয়সালাকারীর জন্য দুআ করতে থাকতেন।

দুআ প্রার্থীগণ হযরত হাকীমুল ইসলাম রহ.-এর কাছে নেক দুআর দরখাস্ত করার পর যখন সে মাকবুল দুআর প্রেক্ষিতে নিজ নিজ উদ্দেশ্য সফল হতে গায়েবী সাহায্য খোলাচোখে দেখেন, তখন তাদের অন্তরে এ বদ্ধমূল বিশ্বাস তৈরি হয়ে যেত যে, আমরা হাকীমুল ইসলামের দুআ লাভ করে প্রকৃতপক্ষে আকাবির আহলুল্লাহদের মকবুল দুআকে নিজ অবস্থার সঙ্গী করে নিয়েছি।

মুসলিম জাহানের এমন সম্মিলিত কাজ যাতে ধর্মীয় ও রাজনৈতিক মতপার্থক্য থাকা সত্ত্বেও একতাবদ্ধ হওয়ার মানসে এমন ব্যক্তিত্বের প্রয়োজন দেখা দিত যার ইলম, তাকওয়া, পবিত্রতা, মহৎ গুণাবলী, পরিপূর্ণতা, চিন্তাশীলতা, মহান স্বভাব, চরিত্র মাধুর্য, পক্ষপাতিত্বহীনতা, কপটতামূলক দলাদলি ও নিজ দলের প্রতি অনুচিত আকর্ষণ হতে বহু উর্ধে এবং সর্বোচ্চ মহান মর্যাদায় অধিষ্ঠিত– তখন দেশবরেণ্য ব্যক্তিগণের সালিস নির্বাচনের দৃষ্টি নিপতিত হত একমাত্র হযরত হাকীমুল ইসলামের মহান ব্যক্তিত্বের উপর।

ঠিক এভাবে শরীয়ত, নৈতিকতা, তাসাউফ, ফিকহ, ইলমে কালাম, তাফসীর, হাদীস এবং পারিবারিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক কিংবা রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক পর্যায়ের কোন সমস্যা দেখা দিলে এসবের সমাধানের জন্য সামগ্রিক ইলম ও জ্ঞানের অধিকারী ও সংস্কার সাধনকারী ব্যক্তি হিসেবে সকলে একবাক্যে হযরত হাকীমুল ইসলাম রহ.কেই ফয়সালাকারীরূপে মেনে নিতেন। বরকতময় সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার পর হযরত শুধু নিজেই সান্ত্বনা লাভ করতেন না যে আল্লাহর ইচ্ছায় উত্তমভাবে জিম্মাদারী আদায় করেছি; বরং সর্বস্তরের সাধারণ ও বিশেষ ব্যক্তিবর্গ, সুস্থ চিন্তার অধিকারী জনসাধারণের পক্ষ হতে তিনি অসংখ্য শুকরিয়া ও ধন্যবাদের পাত্র বলে বিবেচিত হতেন।

হযরতের তাকরীর ও খুৎবা দ্বারা জটিল বিষয়াবলীর সমাধান হয়ে যাওয়ার পর শান্তি, একতা, পারস্পরিক ভালবাসা, সততাপূর্ণ পরিবেশ এবং সামাজিক মান-মর্যাদার যে উন্নতি ও দৃঢ়তা সাধিত হয়, বিশ্বাসের যে পরিবেশ ফিরে আসে, এও হয়ে যায় সকলের জন্য এক অকল্পনীয় মহানেয়ামত।

এই প্রকৃত অবস্থার আলোকে নির্দ্বিধায় ও নির্বিঘ্নে বলা যেতে পারে, হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ.-এর চরিত্র গঠনমূলক ও নৈতিক উৎকর্ষ সাধনকারী হিদায়াতের ভাণ্ডার মাওয়ায়েজে হাসানার পর তারই অন্যতম খলীফা হাকীমুল ইসলাম হযরত মাওলনা কারী মুহাম্মদ তৈয়ব রহ.-এর এসব হিদায়াত ও

মারেফাতের ভাণ্ডারের অবস্থান। যাতে রয়েছে কিতাব ও সুন্নাহ, শরীয়ত ও তরিকত, ফিকাহ ও তাসাউফ, কালাম ও আকাঈদ, নিকাত ও লতায়েফ, ইসরার ও দাকায়েক, হিকমত ও মাওরিয়াত। তার সাথে সাথে রয়েছে পূর্ণ আত্মিক প্রশান্তি, বিশ্বাস, ভালবাসা, ভ্রাতৃতা, শান্তি ও সৌহার্দ্যের দুর্লভ বৈশিষ্ট্যে পরিপূর্ণ। জ্ঞানের এ অকূল সমুদ্রকে হাকীমুল ইসলাম একাডেমি প্রথমবারের মত ভারতের মাটিতে প্রকাশ করার সৌভাগ্য লাভ করেছে।

সম্মানিত পাঠকবৃন্দের নিকট নিবেদন, পাঠকাল এবং এর পূর্বাপর হযরত হাকীমুল ইসলাম রহ.কে ইসালে সাওয়াবে স্মরণ রাখবেন। আল্লাহ তাআলা যেন এই ইলমী ও দীনি মহান ফায়েযকে তাঁর জন্য সদকায়ে জারিয়া এবং এ থেকে উপকার লাভকারীদের জন্য সুন্নতের অনুসরণ ও আল্লাহর দরবারে মাকবুল হওয়ার উসিলা হিসেবে কবুল করে নেন। আমীন!

মুহাম্মাদ সালেম কাসেমী
পরিচালক, হাকীমুল ইসলাম একাডেমী, দেওবন্দ।

টেলিগ্রাম চ্যানেল লিংক
https://t.me/islaMic_fdf

কুতুবে ইরশাদ হযরত হাকীমুল ইসলাম রহ. সম্পর্কে তিনটি ঐতিহাসিক মন্তব্য

এক.

তাসাউফ ও সুলুকের ইতিহাসে যে স্বাতন্ত্র্য মহা সৌভাগ্য কুতুবে ইরশাদ হযরত হাকীমুল ইসলাম মাওলানা কারী মুহাম্মাদ তৈয়ব রহ.-কে আল্লাহ তাআলা দান করেছেন তা এই যে, তাঁর মুরশিদ শায়খুল আলম হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ. যখন মৃত্যুপীড়ায় আক্রান্ত, তখন তাঁকে দেখার জন্য হযরত কারী সাহেব তাঁর কাছে উপস্থিত হলে হযরত থানভী রহ. তাঁর হাতকে নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে চুমু খেলেন এবং স্বীয় বক্ষ মোবারকের উপর রেখে বললেন, এ হাত দ্বারা আমি আমার অন্তরে আশ্চর্যজনক এক প্রশান্তি ও তৃপ্তি অনুভব করছি। তারপর হযরত হাকীমুল ইসলাম রহ.-এর ইলমী, আমলী ও রূহানী ফয়েজ এবং স্বাস্থ্য, সুস্থতা ও জীবনে বরকতের জন্য মাকবুল দুআ করে বিদায় দিলেন।

দুই.

আরিফ বিল্লাহ হযরত মাওলানা সাইয়েদ আসগর হুসাইন মিয়া সাহেব রহ. হযরত হাকীমুল ইসলাম রহ. সম্পর্কে বলেন, মাওলানা মুহাম্মাদ তৈয়ব আমার স্নেহভাজন, স্বীয় বুযর্গগণের ইলমী বৈশিষ্ট্যাবলী এবং রূহানী নেসবতসমূহ আল্লাহ তাআলা তাঁর মধ্যে একত্র করে দিয়ে তাঁকে আপাদমস্তক ফয়েয ও বরকতময় করে তুলেছেন।

তিন.

খতীবে আযম, আমীরে শরীয়ত হযরত মাওলানা সৈয়দ আতাউল্লাহ শাহ বুখারী রহ. ভারত বিভাগের পূর্বে মুলতানের খায়রুল মাদারিস-এর বার্ষিক সভায় হযরত মাওলানা খায়র মুহাম্মাদ সাহেবের আন্তরিক দাওয়াতে গুরুত্বসহকারে অংশগ্রহণ করতেন। হযরত হাকীমুল ইসলাম রহ.-এর এ সভায় নিয়মিত অংশগ্রহণ এবং বিশেষ বিশেষ ধর্মীয় বিষয়াদির উপর অদ্বিতীয় ও নজিরবিহীন বয়ান এ জলসার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হয়ে গিয়েছিল। এ সম্পর্কে আমীরে শরীয়ত হযরত শাহ সাহেব রহ. হযরত হাকীমুল ইসলাম রহ. সম্পর্কে নিজের গভীর সম্পর্ক ও ভালবাসা এবং তাঁর ইলমের প্রতি সম্মান প্রদর্শনপূর্বক বলতেন, আমি এ জলসায় শুধু তাঁর ওয়াজ শোনার জন্য উপস্থিত হয়ে থাকি। তিনি আরো বলতেন, তাঁর এক তাকরিরে আমার সারা বছরের অসংখ্য তাকরিরের বিষয়াদি তৈরি হয়ে যায়।

رحمهم الله رحمة واسعة

হযরত হাকীমুল ইসলাম রহ.-এর খুতুবাত সম্পর্কে তাঁর খলিফাগণের মন্তব্য

এক.

হযরত হাকীমুল ইসলাম রহ.-এর খুতুবাত ও বক্তৃতার ফয়েযের প্রকাশ 'দারুল উলুম দেওবন্দ'। যিনি এ প্রতিষ্ঠানটিকে আন্তর্জাতিক দীনি কেন্দ্ররূপে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। হযরতের কামালাত ও গুণাবলীর প্রকাশ ঘটেছে ঐসব খলিফার দ্বারা যারা বিশ্ব জুড়ে কোটি কোটি ব্যক্তির নিকট হযরতের ফয়েয ও বরকত পৌঁছে দেয়ার মাধ্যম হিসেবে কাজ করেছেন। তাঁর পূর্ণতার প্রকাশ ঐ সকল খলিফা যাঁরা ধর্মনীতি, চরিত্র নীতি, ইবাদত, ইলম ও আমল অনুযায়ী হযরতের বক্তৃতা ও তারবিয়াত অনুসারে জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে একমাত্র দীনের জন্য ওয়াকফ করে দিয়েছেন।

–হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ সালেম কাসেমী, দেওবন্দ

দুই.

হযরত হাকীমুল ইসলাম রহ.-এর বক্তৃতার ইলমী আমলী ও তারবিয়াতী ফয়েজ ভৌগোলিক সীমারেখা অতিক্রম করে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়েছে। নিঃসন্দেহে এসবের কারণে হযরত হাকীমুল ইসলাম রহ.-কে দেওবন্দী জামায়াতের মধ্যে অদ্বিতীয় ও তুলনাহীন বলা অতিরঞ্জন হবে না এবং বাস্তবতা পরিপন্থীও হবে না।

–হযরত আল্লামা রফিক আহমাদ, মুজাফফরনগর

তিন.

এ বাস্তবতার মধ্যে কোন অতিরঞ্জনতার সম্ভাবনাই নেই যে, কুতুবে ইরশাদ হযরত হাকীমুল ইসলাম রহ.-এর একটিমাত্র বয়ান নাস্তিকতার নিকটবর্তী সীমায় অবস্থানকারী দ্বিধা-সংশয়ের মরিচা ধরা আত্মাগুলোর সকল সংশয়ের অবসান ঘটিয়ে ঈমানকে সুদৃঢ় করে দেয়। এ এক অসীম আমলে সালেহ।

–হযরত মাওলানা হাকিম মুহাম্মাদ ইসলাম, মিরাঠ

চার.

কুতুবে ইরশাদ হযরত হাকীমুল ইসলাম রহ.-এর ইলমী মাহাত্ম্য কোন পরিচয় দানের মুখাপেক্ষি নয়। তাঁর ওয়াজ ও বাণীগুলো রূহানী জিন্দেগীর স্থায়িত্ব ও উন্নতির জন্য মহান পুঁজির মর্যাদায় অধিষ্ঠিত; এবং তাঁর অবর্তমানে এগুলো তাঁর সাহচর্য ও সঙ্গলাভের স্থলাভিষিক্ত।

–হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ শরীফ, জালন্ধর, মুলতান

সূ চি প ত্র

বয়ান : ১

মাআরিফুল কুরআন / ২৩
কল্যাণের দু'টি ভিত্তি / ২৫
ভিত্তিদ্বয়ের কল্যাণসমূহ / ২৬
আল্লাহ তাআলার ইচ্ছা বান্দার ইচ্ছার অনুগামী / ২৭
আমলের কল্যাণময়তা ও শ্রেষ্ঠত্ব / ২৯
কুরআন মাজিদের হিফাযত / ২৯
কুরআন এবং তার ব্যাখ্যা / ৩১
কুরআনের উদ্দেশ্য এবং আভিধানিক অর্থ / ৩৪
রাসূলুল্লাহ (সা.)কে প্রেরণের উদ্দেশ্যাবলি / ৩৫
উত্তম আদর্শের আবশ্যকতা / ৩৭
কুরআনের সাথে কল্যাণের সম্মিলন / ৩৯
কালামুল্লাহর মাধ্যমে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক স্থাপন / ৪০
কুরআনের বাতেন হল জান্নাত / ৪১
তাওরাত এবং হাশরের মাঠ / ৪৩
কুরআনুল কারীম এবং হাশরের ময়দান / ৪৪
আহলে কুরআনের অবস্থা / ৪৬
পবিত্র কুরআনুল কারীমের বরকত / ৪৯
আনন্দ প্রকাশের ক্ষেত্র / ৫২
আনন্দের দ্বিতীয় ক্ষেত্র / ৫২
ওলীর নিদর্শন / ৫৪
আনন্দ অনুষ্ঠান / ৫৫

বয়ান : ২

রহমাতুল্লিল আলামীন / ৫৭
নেয়ামতের প্রকারসমূহ / ৫৯
নেয়ামতের মাধ্যমে নয়, মুসিবতের মাধ্যমে ভালবাসার পরীক্ষা / ৬১
সর্বোত্তম নেয়ামত এবং সৃষ্টিজগতের উদ্দেশ্য / ৬৬
মুহাম্মাদ সা.-এর আবদিয়াতকে কেন্দ্র করে বিশ্বজগৎ সৃষ্টি / ৬৮
সকল আম্বিয়া আ.-এর ধর্ম হল ইসলাম / ৭০

দীনের পূর্ণতা একটি স্বতন্ত্র নেয়ামত / ৭২
তাওহীদের পূর্ণতা / ৭৪
শিরকের উপকরণকেও শরীয়তে মুহাম্মাদী ধ্বংস করে দিয়েছে / ৭৫
গুনাহের উপকরণাদিও হারাম / ৮৪
ফরযের আনুষঙ্গিক বিষয়ে সাওয়াব ও প্রতিদান / ৮৭
আল্লাহর পক্ষ হতে উপহার / ৮৯
সর্ববৃহৎ নেয়ামতের মর্যাদা অনুধাবনকারীগণ / ৯১
সর্ববৃহৎ নেয়ামতের অধিকারসমূহ / ৯৬

বয়ান : ৩

বাইতুল্লাহিল কারিম / ১০১
আমাদের সকলের মূল হল বাইতুল্লাহ / ১০৫
বাইতুল্লাহকে ইবাদতের কেন্দ্র সাব্যস্ত করার হেকমত / ১০৬
বাইতুল্লাহর সীমা / ১০৭
বাইতুল্লাহর উপর আল্লাহর সত্তার নিকটতম তাজাল্লির প্রতিচ্ছবি / ১০৮
আমাদের মৌলিক উপাদান, রূহানিয়াত ও নূরানিয়াতের মূল বাইতুল্লাহ / ১১০
বাইতুল্লাহ জগতের মধ্যস্থিত হওয়ার হেকমত / ১১১
কেন্দ্রের স্থানান্তর / ১১২
বরকত ও হিদায়াতের ঘর / ১১৩
প্রকৃষ্ট নিদর্শন / ১১৪
দৈহিক প্রশান্তির সাথে আধ্যাত্মিক প্রশান্তি / ১১৫
পৃথিবীর মধ্যবর্তী স্থানে রাসূল সা.-এর জন্মগ্রহণের হেকমত / ১১৬
ইসলামী নীতিমালার বিশ্বজনীন স্বীকৃতি / ১১৮
সাহাবায়ে কেরাম ও অমুসলিম সম্প্রদায় / ১১৯
নবুওয়াতের প্রভাব বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়া / ১২০
আন্তর্জাতিক তাবলীগের কেন্দ্র বিশ্বের কেন্দ্রে হওয়া উচিত / ১২২
সিরিয়া হল রাজনীতির কেন্দ্র / ১২৫
মিসর হল সামরিক কেন্দ্র / ১২৬
ইসলামের স্থায়িত্ব তাবলীগের মধ্যেই নিহিত / ১২৭

বয়ান : ৪

ইবাদাত ও খেলাফত / ১২৯
মানুষের মধ্যে সকল সৃষ্টির নমুনা বিদ্যমান রয়েছে / ১৩২
মানুষের মধ্যে বিশ্বজগতের স্রষ্টার নিদর্শন / ১৩৬
সৃষ্টিজগতের নমুনা হওয়ার কারণে মানুষের করণীয় / ১৪১

আল্লাহর পূর্ণতার নমুনা হিসেবে মানুষের করণীয় / ১৪৫
ঈমানের পূর্ণতার জন্য ইবাদত ও খেলাফত উভয়ই আবশ্যক / ১৪৭
চারিত্রিক শক্তিতেই মানুষ উন্নত হতে পারে / ১৫৩
আল্লাহর কালিমাকে সমুন্নত রাখাই মুসলিম জীবনের উদ্দেশ্য / ১৫৫
ত্যাগের মাধ্যমে পৃথিবীতে মতাদর্শের বিস্তার ঘটে / ১৫৭

বয়ান : ৫

ইখলাস ফিদ্দীন / ১৬১
সুন্নত অনুযায়ী আমল করার দ্বারা স্বভাবগত কাজও ইবাদতে পরিণত হয় / ১৬৪
ইসলামের প্রতিটি কাজ দুইভাবে ক্রিয়াশীল / ১৬৫
নির্দেশ পালন করাই ইবাদত / ১৬৬
মানব সত্তায় কোন উৎকর্ষতা নেই / ১৬৮
ইসলামের সহজ পথ / ১৬৯
আমল একমাত্র আল্লাহর জন্য হওয়ার ব্যাপারে দু'টি জিনিস আবশ্যক / ১৭০
কেন আল্লাহর ইবাদত করা হবে / ১৭২
গাইরুল্লাহর মধ্যে কার সম্মান করা কর্তব্য / ১৭৫
আমল কবুলের জন্য প্রয়োজন ইখলাস ও নবীর আনুগত্য / ১৭৬
নবীগণের মধ্যে একমাত্র মুহাম্মাদ সা.-এর সীরাতই সংরক্ষিত / ১৭৭
তাওহীদের শক্তি এবং শিরকের অসহায়ত্ব / ১৭৮
মুসলমানগণ বিশ্ব সম্প্রদায়ের সংশোধনের জিম্মাদার / ১৭৯
বান্দাকে স্বীয় ইচ্ছা বিসর্জন দেয়া উচিত / ১৮০
তিলাওয়াতকৃত আয়াত প্রসঙ্গে আলোচনা / ১৮১
নামের এবং কাজের মুসলমান / ১৮১

বয়ান : ৬

সুহবাতে সালিহ / ১৮৩
ইলমের প্রাচুর্য সত্ত্বেও আমলহীনতার আধিক্য / ১৮৫
পরিবেশের প্রভাব / ১৮৮
বাইরের প্রভাব অন্তরের মধ্যে / ১৮৯
চরিত্র গঠনের ক্ষেত্রে পরিবেশের প্রভাব / ১৯২
কথা ও কাজে সামঞ্জস্যতার প্রভাব / ১৯৩
পরিবেশের প্রভাব রাষ্ট্রীয় আইনেরও উর্ধ্বে / ১৯৪
পরকালীন হিসাব-নিকাশের পার্থিব চিত্র / ১৯৭
সংশোধনের পদ্ধতি / ১৯৯
সংশোধনের দৃঢ় সংকল্প / ২০২

বয়ান : ৭

মুক্তির পথ / ২০৫
অভ্যন্তরীণ গুণের ভেতর মানুষের মুক্তি নিহিত / ২০৮
সত্তাগত উৎকর্ষতাই মানুষের প্রকৃত উৎকর্ষতা / ২০৯
অন্তর এক আশ্চর্য অপরূপ বস্তু / ২১২
হৃদয়ের দু'টি দরজা রয়েছে / ২১৪
জ্যোতির্ময়তা ও সফলতার মাধ্যম হল ইলম / ২১৫
মূর্খতা পরাজয়ের মাধ্যম / ২১৬
মানবীয় জ্ঞান ও প্রজ্ঞার শক্তি / ২২১
উম্মতে মুহাম্মাদীর নামে হযরত ইবরাহীম আ.-এর পয়গাম / ২২১
বিশ্বর সকল মানুষ স্থপতি / ২২৩
সর্বাধিক শ্রমসাধ্য হল ঈমানী ইলমের অন্বেষণ / ২২৬
শুধু ইলম উপকারী নয় / ২২৭
আন্তরিকতাহীন বড় আমলও গ্রহণযোগ্য নয় / ২২৯
ক্ষুদ্র আমলও ইখলাসের কারণে নাজাতের মাধ্যম হয় / ২৩২
অহংকার ইখলাসকে ধ্বংস করে / ২৩৭
একমাত্র আল্লাহর অনুগ্রহের উপর নাজাত নির্ভরশীল / ২৩৮
রূপক ইবাদত নিয়ে কিভাবে আমরা গর্ব করতে পারি / ২৪১
আল্লাহর কাছে ত্রুটি স্বীকার করাই শোকর / ২৪৩
আধ্যাত্মিক জীবনের চার উপাদান / ২৪৫
মূল বুনিয়াদী জিনিস হল সান্নিধ্য ও সাহচর্য / ২৪৬
সাহচর্য ও সান্নিধ্যের সুফল / ২৪৭
গুনাহ জমা হয়ে যাওয়া অত্যন্ত ক্ষতিকর / ২৪৯
মৃত্যুর নির্ধারিত সময় কারো জানা নেই / ২৫০
উপদেশ গ্রহণের ক্ষেত্র / ২৫২
পরকালীন জীবিকাও সংগ্রহ করা উচিত / ২৫৩
মুসলমানদেরকে চিন্তাশীল করে সৃষ্টি করা হয়েছে / ২৫৪
পরকাল চিন্তাকে শাণিত করা আবশ্যক / ২৫৫

বয়ান : ৮

মধ্যম পথ / ২৫৭
শানে নুযুল / ২৬১
খ্রিস্ট আকীদা-বিশ্বাসের অসারতা প্রমাণ / ২৬১
আয়াত দুই প্রকারের / ২৬২
আল্লাহর গুণাবলি সম্পর্কীয় মুতাশাবিহ-এর হুকুম / ২৬৩
নবী আ.গণের ব্যাপারে মুতাশাবিহ নস-এর হুকুম / ২৬৮

সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে মুতাশাবিহ শব্দের হুকুম / ২৬৮
আল্লাহর ওলীগণের কথাবার্তা সম্পর্কে আহলে হকের নীতি / ২৭০
হযরত নিজামী রহ.-এর একটি বিস্ময়কর ঘটনা / ২৭১
আল্লাহওয়ালাগণ দুই ধরনের / ২৭২
দীনের পথে অবিচলদের অবস্থা / ২৭৩
শুধু কুরআনের হরফই যথেষ্ট নয় / ২৭৫
শুধু বুদ্ধির মাধ্যম দীন বুঝতে চাওয়ার পরিণাম / ২৭৬
সঠিক দীন বোঝার জন্য ব্যক্তিরও প্রয়োজনীয়তা রয়েছে / ২৭৭
মানুষ দুই প্রকার / ২৭৯

বয়ান : ৯

জীবনের উদ্দেশ্য / ২৮৩
মানবীয় সফরের সূচনা ও সমাপ্তি / ২৮৬
আলমে বরযাখের অবস্থা / ২৮৯
জীবনের তাৎপর্য / ২৯৩
পানাহারই কি জীবনের উদ্দেশ্য / ২৯৪
রূহানী শক্তির বিস্ময়কর অবস্থা / ২৯৯
জীবনের উদ্দেশ্য কি সম্মান ও ক্ষমতা লাভ / ৩০৩
কুরআনের আলোকে জীবনের উদ্দেশ্য / ৩০৫
চিরস্থায়ী জীবনের চিরস্থায়ী উদ্দেশ্য / ৩০৬
পার্থিব জীবনের প্রাণ / ৩১০
একটি সন্দেহের অবসান / ৩১২
দ্বিতীয় সন্দেহের অবসান / ৩১৬
আল্লাহর ইবাদত কেন মানব জীবনের উদ্দেশ্য / ৩১৮
মানুষ শুধু আল্লাহর কাজের জন্য / ৩১৯
বিবেকের মানদণ্ডে আল্লাহর ইবাদতের আবশ্যকতা / ৩২০
ইবাদত ও আনুগত্যের ব্যাপকতা / ৩২২
ইসলাম পার্থিব কাজকর্ম থেকে বিরত রাখতে আসেনি / ৩২৪
আল্লাহ ও বান্দার মধ্যে চুক্তি / ৩২৬

বয়ান : ১০

মৃত্যু দর্শন / ৩২৯
বিশ্বের স্থায়িত্ব আধ্যাত্মিকতার স্থায়িত্বের দ্বারা সম্ভব / ৩৩২
প্রতিটি বস্তু তাসবীহ পাঠ করছে / ৩৩৩
নামায ব্যতীত আল্লাহর সাথে সম্পর্ক স্থাপন সম্ভব নয় / ৩৩৫
নামাযের মাধ্যমে আল্লাহর দীদারের যোগ্যতা লাভ / ৩৩৬

আল্লাহর রূহ প্রত্যেক জিনিসে বিদ্যমান / ৩৩৬
মুসলিম জাতির সকল পেরেশানীর সমাধান / ৩৩৭
ইসলামী রূহ বেরিয়ে যাওয়ার ফল / ৩৩৮
বিশ্বের রূহ আল্লাহ তাআলার যিকির / ৩৩৮
রূহের বাহ্যিক কেন্দ্র / ৩৩৯
মৃত্যু-দর্শন ও উলামায়ে রব্বানীর শান / ৩৪০
আল্লাহ ও ফেরেশতাদের মধ্যকার কথোপকথন / ৩৪১
মৃত্যু একটি পার্থিব উপহার / ৩৪২
মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষা করা ওলী হওয়ার লক্ষণ / ৩৪৩
একটি ছাত্রসুলভ সন্দেহ / ৩৪৪
মৃত্যু তরুণদের প্রতিভা বিকাশের মাধ্যম / ৩৪৫
মৃত্যু ইসলাহ ও তারবিয়াতের সংস্কার সাধনের মাধ্যম / ৩৪৬
যুগের চাহিদা অনুযায়ী সমসাময়িক আলেমগণ ইসলামকে উপস্থাপন করেছেন / ৩৪৬
কাফেরদের আকাঙ্ক্ষা / ৩৪৭
আল্লাহ বিমুখতার ভয়াবহ প্রভাব / ৩৪৮
মৃতের প্রতি হা-হুতাশ ব্যক্ত করা / ৩৫০
'ইন্না লিল্লাহ' আয়াতে সার্বিক সবরের শিক্ষা রয়েছে / ৩৫১
মুমিন ও কাফেরের মৃত্যুর তুলনা / ৩৫২
মুসলমান হিসেবে শরীয়তে বর্ণিত আদব গ্রহণ করুন / ৩৫৩

বয়ান : ১১

ইসলামে পরকাল ভাবনা / ৩৫৫
পরকাল সম্পর্কে ইসলাম ও অন্যান্য ধর্মের মতপার্থক্য / ৩৫৮
পার্থিব কাজের ব্যাপারে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি / ৩৬১
ঈমানী আমলের সুগন্ধি / ৩৬৩
আল্লাহর দরবারে সর্বপ্রথম উপস্থিতি / ৩৬৪
আল্লাহর ব্যাপক বিস্তৃত মাগফিরাত / ৩৬৪
তওবার পথ যেন ছেড়ে দেয়া না হয় / ৩৬৫
তাওবার শক্তি / ৩৬৭

বয়ান : ১২

জুমার দিনের ফযিলত / ৩৬৯
একটি হাদীস / ৩৭২
ময়দানে মাযিদ / ৩৭২
ময়দানে মাযিদে জান্নাতবাসির উপস্থিতি / ৩৭৪
ময়দানে মাযিদে আলেমগণের মুখাপেক্ষিতা / ৩৭৬

পৃথিবীতে ময়দানে মাযিদের দৃষ্টান্ত / ৩৭৮
সাধারণ খুৎবার চেয়ে জুমার খুৎবার আদব অধিক / ৩৭৯
আল্লাহ তাআলার নির্বাচন / ৩৮০
জান্নাতের মওসুম / ৩৮২
সাইয়েদুল আইয়াম / ৩৮৩
জুমার মধ্যে একত্রিকরণ ও পরিপূর্ণতার শান / ৩৮৫
বর্তমানে সব মানুষ জাহান্নামে রয়েছে– এ থেকে উত্তোরণের পদ্ধতি / ৩৮৭
জুমা হল পরীক্ষার দিন / ৩৮৮
উমর ফারুক রা.-এর সাথে হক ঘুরতে থাকে / ৩৮৯
সমগ্র উম্মতের মধ্যে নবুওয়াতের চেতনা বিদ্যমান / ৩৮৯
উম্মতে মুহাম্মাদীর উদাহরণ / ৩৯০
উলামায়ে উম্মতে মুহাম্মাদীর খেদমত / ৩৯১
বিশ্বের আলোকোজ্জ্বল সূর্যের আগমন / ৩৯২
একই জ্যোতির বিভিন্ন রূপ / ৩৯৪
এ উম্মত হতে হক ও সত্য কখনো বিছিন্ন হবে না / ৩৯৫
হযরত শায়খুল হিন্দ রহ.-এর সোনালী উপদেশ / ৩৯৬
সুধারণা পোষণ করার প্রয়োজনীয়তা / ৩৯৭
সকল জায়গা থেকে মানুষ ভালটুকু গ্রহণ করে / ৩৯৮
সমগ্র উম্মতের মধ্যে কিভাবে কল্যাণ প্রকাশ পেতে পারে / ৪০১
সমষ্টিগতভাবে উম্মতও মাসুম / ৪০২
সর্বদা যেন আল্লাহর ধ্যান থাকে / ৪০৩
ইসলামে দুনিয়া বর্জনের অর্থ / ৪০৪
জুমার শিক্ষা / ৪০৫

বয়ান : ১৩

সুন্নাতে খলীল / ৪০৭
তিনটি প্রাকৃতিক মূলনীতি / ৪১০
শরীয়তের মূলনীতিত্রয় / ৪১২
নফসের প্রিয় বস্তুর কুরবানী / ৪১৩
কুরবানীর রূহ এবং সংশয়ের অবসান / ৪১৫
কুরবানীর তাৎপর্য / ৪১৯
কুরবানী ও সদকার মধ্যে পার্থক্য / ৪২০
কুরবানী বিরোধীদের প্রতিউত্তর– এক / ৪২১
কুরবানী বিরোধীদের প্রতিউত্তর– দুই / ৪২২
কুরবানী সংক্রান্ত বিষয়াবলির প্রতি আলোকপাত / ৪২৫

বয়ান : ১৪

বিবাহের হাকিকত / ৪২৯
বাস্তব অবস্থাসমূহ / ৪৩২
জান্নাত ও জাহান্নামের সমন্বয়ে পৃথিবী গঠিত / ৪৩২
অদৃশ্য জগতে ভাল-মন্দের সিলসিলা / ৪৩৩
শয়তানের প্রেরণায় কৃত নেকীও সঠিক নয় / ৪৩৬
পৃথিবীতে কল্যাণ ও অকল্যাণের দু'টি ধারা / ৪৩৮
কল্যাণ ও অকল্যাণ– এ উভয় সিলসিলার কাজ / ৪৪০
মানবজাতিকে একত্রিত করণের সর্ববৃহৎ সিলসিলা / ৪৪১
নারীগণের মাধ্যমে গোত্রে গোত্রে ভালবাসা প্রতিষ্ঠিত হয় / ৪৪৩
বিবাহের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য / ৪৪৫
বিবাহ আল্লাহর কুদরতের নিদর্শন / ৪৪৬
পারিবারিক জীবনে সান্ত্বনা লাভের রহস্য / ৪৪৮
উত্তম স্ত্রী মানুষের সৌভাগ্যের লক্ষণ / ৪৫১
স্ত্রী নির্বাচনের মাপকাঠি / ৪৫২
স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার কলহ মহাফিৎনার পূর্বাভাষ / ৪৫৪
স্বামীর চরম আনুগত্য স্ত্রীর উপর ওয়াজিব / ৪৫৬
স্বল্প ব্যয়ের বিয়েতে বরকত দেয়া হয় বেশি / ৪৫৮
লেনদেনের মধ্যে বিবাহ সর্বাধিক সহজ বিষয় / ৪৬০
বিয়েতে নগণ্য দু'টি খরচ রয়েছে / ৪৬২
বিয়েতে অত্যধিক ব্যয়ের পরিণতি / ৪৬২
বিবাহের শুভফল কখন প্রকাশ পায় / ৪৬৩
বিবাহের আহকাম / ৪৬৫
স্বামীর অমর্যাদা করার পরিণাম / ৪৬৬
মহিলারা যেন পুরুষদেরকে পরিচালনা না করে / ৪৬৯
স্ত্রীর উপর স্বামী কিভাবে দয়াশীল হতে পারে / ৪৭২
স্ত্রীর অবাধ্যতার প্রতি শাসনের স্তরসমূহ / ৪৭৩
প্রয়োজনে তালাক প্রদানের পদ্ধতি / ৪৭৬
যারা আল্লাহ প্রদত্ত জোড়কে টিকিয়ে রাখেন তারাই নেককার / ৪৭৭
মোবারকবাদ / ৪৭৯

বয়ান : ১

মাআরিফুল কুরআন

কুরআনের জ্ঞান-বিজ্ঞান

পবিত্র কুরআন মাজিদের দু'টি দিক– একটি তার শব্দাবলি, অন্যটি হল তার অর্থ; যা নিহিত রয়েছে শব্দের অন্তরালে। এর পর এসব অর্থের গভিরে রয়েছে হাকাইক বা মূলতত্ত্ব। হাকাইকের ভেতরে রয়েছে মাআরিফ বা জ্ঞানভাণ্ডার, মাআরিফের অভ্যন্তরে রয়েছে বিভিন্ন কাইফিয়াত বা বিশেষ অবস্থা– যা আত্মার উপর প্রকাশ লাভ করে হৃদয়কে আচ্ছন্ন করে নেয়।

কুরআন মাজিদ অবতরণের একমাত্র উদ্দেশ্য তার শব্দ ও অর্থকে অনুধাবন ও হৃদয়ঙ্গম করাই নয়; বরং কুরআন অবতরণের মূখ্য উদ্দেশ্য হল এমনসব আত্মা ও প্রতিভার শুদ্ধি ও পবিত্রতা সাধন, যে আত্মাগুলো শব্দের ও অর্থের অভ্যন্তরে লুকায়িত মূলতত্ত্ব ও জ্ঞানভাণ্ডারকে উদ্ধার ও উপলব্ধি করার উপযুক্ত হয়ে যায় এবং কুরআনের এসব মায়ারিফ ও জ্ঞানভাণ্ডার ধারণের যোগ্য পাত্রে পরিণত হয়।

– হযরত হাকীমুল ইসলাম রহ.





اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُه وَنَسْتَعِيْنُه وَنَسْتَغْفِرُه وَنُؤْمِنُ بِه وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّاٰتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَّهْدِه اللّٰهُ فَلاَ مُضِلَّ لَه، وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلا هَادِىَ لَه، وَنَشْهَدُ أَنْ لاَّ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَه لاَ شَرِيْكَ لَه، وَنَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَمَوْلاَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُه وَرَسُوْلُه، أَرْسَلَهُ اللّٰهُ إِلٰى كَافَّــةً لِّلنَّاسِ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا وَّدَاعِيًا إِلَيْهِ بِإِذْنِه وَسِرَاجًا مُّنِــيْرًا.

أَمَّــابَعْدُ:

فَقَدْ قَالَ النَّبِىُّ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ القُرْاٰنَ وَعَلَّمَه ــ صَدَقَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

বুযুর্গানে মুহতারাম!

অদ্যকার এ মজলিশের সাথে সামঞ্জস্য রেখে আমি যে হাদীস খানা তিলাওয়াত করেছি তার অর্থ হল– তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম হলো ঐ ব্যক্তি যে নিজে কুরআন শিক্ষা করে এবং অপরকে শিক্ষা দেয়।

কল্যাণের দু'টি ভিত্তি

এ উম্মতের জন্য সর্বাগ্রে যে জিনিসকে আবশ্যক করা হয়েছে এবং যাকে পরিপূর্ণ কল্যাণের আধার সাব্যস্ত করা হয়েছে তা হল আল্লাহর কিতাব কুরআন মাজিদ।

যার সম্পর্কে হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে–

أَصْدَقُ الْحَدِيْثِ كِتَابُ اللهِ او خَيْرُ الْحَدِيْثِ كِتَابُ اللهِ.

সর্বোত্তম সত্য ও কল্যাণকর বাণী হল আল্লাহর কিতাব।

এমনিভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বরকতময় সত্তা সম্পর্কে বলা হয়েছে–

خَيْرُالْهَدْىِ هَدْىُ مُحَمَّدٍ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم

সর্বোত্তম চরিত্র হল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চরিত্র।

উম্মতের জন্য এ দুটি ভিত্তি সাব্যস্ত করা হয়েছে। একটি হল আল্লাহর কিতাব অপরটি আল্লাহর রাসূল। উম্মতে মুহাম্মাদীর জন্য আল্লাহ তায়ালা যে রাসূলকে দান করেছেন তিনি সর্বোত্তম মানুষই বেকল নন, সকল প্রকার সৃষ্টি হতেই তিনি উত্তমতর। অপরদিকে এ উম্মতের জন্য দানকৃত আল্লাহর কিতাব সর্বোত্তম আসমানী কিতাব ও সার্বিকভাবে পরিপূর্ণ ও পূর্ণাঙ্গ কিতাব। আর এ কিতাবের শিক্ষা গ্রহণ ও শিক্ষা প্রদানকে সর্বোত্তম কল্যাণময় কাজ সাব্যস্ত করা হয়েছে।

ভিত্তিদ্বয়ের কল্যাণসমূহ

এই কল্যাণময় ভিত্তি দু'টির কারণেই মুহাম্মাদ সা.-এর উম্মতগণ خَيْرُ أُمَّةٍ (সর্বোত্তম উম্মত) উপাধিতে ভূষিত হয়েছেন। ইরশাদ হয়েছে–

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ

তোমরাই হলে সর্বোত্তম উম্মত, মানবজাতির কল্যাণের জন্যেই তোমাদের উদ্ভব ঘটানো হয়েছে। [আলে ইমরান : ১১০]

কল্যাণময় বুনিয়াদের আলোকে তারবিয়াতপ্রাপ্ত উম্মতগণও তেমনি কল্যাণময় উম্মত। এ ব্যাপক কল্যাণ উম্মতের কয়েকটি স্তরকে বেষ্টন করে নিয়েছে। সেসব স্তরের উম্মতগণও পূর্ণাঙ্গ কল্যাণের ভিত্তি বলে সাব্যস্ত হয়েছেন। যেমন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন–

خَيْرُ الْقُرُوْنِ قَرْنِىْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُم ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ

সর্বোত্তম যুগ হল আমার যুগ, এর পর এর সাথে সংযুক্ত যুগ, অতঃপর তার সাথে সংযুক্ত যুগ।

যুগ হিসেবে সর্বোত্তম ফযিলতের অধিকারী হয়েছেন হযরত সাহাবায়ে কেরামের। কুরআন মাজিদে সামগ্রিকভাবে যে স্তরকে পবিত্র সাব্যস্ত করা হয়েছে তা হল সাহাবায়ের কেরামের স্তর। তাঁদের মধ্যে কোন শ্রেণীবিভেদ করা হয়নি, অংশবিশেষকে নির্দিষ্টও করা হয়নি– সাহাবায়ে কেরামের পুরো জামাতকেই কল্যাণময় ঘোষণা করা হয়েছে। পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে তাঁদের কল্যাণময়তা, শ্রেষ্ঠত্ব ও পবিত্রতার কথা ঘোষণা হয়েছে। বর্ণিত হয়েছে–

وَالسّٰبِقُوْنَ الْاَوَّلُوْنَ مِنَ الْمُهٰجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ وَالَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُمْ بِاِحْسَانٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ○

আনসার ও মুহাজিরীনদের মধ্য থেকে যারা প্রথমে ঈমান গ্রহণ করেছে এবং যারা আন্তরিকভাবে তাদের অনুসরণ করেছে তাদের সকলের প্রতি আল্লাহ তায়ালা সন্তুষ্ট এবং তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট। [তাওবা : ১০০]

অত্র আয়াতে পারস্পরিক সন্তুষ্টির কথা বর্ণিত হয়েছে। সাহাবায়ে কেরাম রা. আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট এবং আল্লাহ তাআলাও তাঁদের প্রতি সন্তুষ্ট। সন্তুষ্টির এ ঘোষণা যেহেতু কুরআনের মাধ্যমে ঘোষিত হয়েছে এবং কুরআন যেহেতু চিরস্থায়ী এক আসমানী কিতাব– যার কার্যকারিতা কিয়ামত ও জান্নাতেও বহাল থাকবে সেহেতু সন্তুষ্টির এ ঘোষণাও চিরস্থায়ী এক ঘোষণা। প্রত্যেক যুগের জন্যই এটা প্রযোজ্য। এমন কোন যুগের আগমন ঘটবে না যখন সাহাবায়ের কেরাম রা.-এর কল্যাণময়তায় কোনপ্রকার ব্যতিক্রম কিছু ঘটবে। অন্যথায় আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি ঘোষণার ব্যাপকতা বজায় থাকে না। ঘোষণার ব্যাপকতাই প্রমাণ করে, সাহাবায়ে কেরামের উপর আল্লাহ তায়ালা অনন্তকাল সন্তুষ্ট থাকবেন।

আল্লাহ তাআলার ইচ্ছা বান্দার ইচ্ছার অনুগামী

পারস্পরিক সন্তুষ্টির সম্পর্ককে সুফীদের পরিভাষায় 'নিসবত' বলা হয়। যে কোন ব্যক্তি নিজ প্রচেষ্টার মাধ্যমে নিসবত হাসিলের যোগ্যতা রাখেন। নিসবতের অধিকারী ব্যক্তির অবস্থা এমন যে, আল্লাহ তাআলা যদি তাদেরকে নিরাপদে রাখেন, শান্তিতে রাখেন, তাতে সে যেমন রাজি-খুশি থাকেন তদ্রূপ অসুখ-বিসুখ ও বিপদাপদেও সে সন্তুষ্ট থাকেন; সর্বাবস্থায় তার সন্তুষ্টি ও আনুগত্য বজায় থাকে। বান্দার অবস্থা যখন এমন হয় তখন আল্লাহ তাআলাও সে বান্দার প্রতি রাজি ও সন্তুষ্ট হয়ে যান। বান্দার সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষাকে

পূরণ করে দেয়াই হল তার প্রতি আল্লাহর সন্তুষ্টির নিদর্শন।

হযরত আয়েশা রা. আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার অবস্থা খুবই বিস্ময়কর। আপনার আশা-আকাঙ্ক্ষাকে আল্লাহ তাআলা অত্যন্ত দ্রুততার সাথে পূরণ করে দেন। কোন বিষয়ের খেয়াল আপনার অন্তরে উদয় হওয়ার সাথে সাথেই তা পূরণ করে দেয়া হয়।

এ বিষয়টিকে এভাবেও বলা যায়– আল্লাহ তাআলার ইচ্ছা মানুষের ইচ্ছার অনুগামী হয়ে গিয়েছে। মানুষ যা চাচ্ছে তাই হয়ে যাচ্ছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ক্ষেত্রে এরূপই হত; অন্তরে কোন ইচ্ছার উদয় হওয়ামাত্রই তা পূরণ করে দেয়া হত। এর কারণ ছিল এই– তিনি যেমন ছিলেন সর্বাঙ্গিন কল্যাণের আধার, তেমনি তাঁর আশা-আকাঙ্ক্ষাও ছিল কল্যাণ ও বরকতে পরিপূর্ণ। অপবিত্র ও অকল্যাণকর কোন আকাঙ্ক্ষা কখনোই তাঁর অন্তরে স্থান পায়নি। নবীগণের অন্তর এতই পবিত্র ও কলুষমুক্ত যে, তাতে উদয় হওয়া সকল ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষা কল্যাণ ও বরকতময় হয়ে থাকে। তাঁদের আকাঙ্ক্ষা ও কামনাগুলো কল্যাণময় হয়ে থাকে বিধায় আল্লাহ তাআলাও সেগুলো সাথে সাথেই পূরণ করে দিয়ে থাকেন। আল্লাহ তাআলা নিজেই কল্যাণময় বিধায় কল্যাণময়তাকেই তিনি সাদরে গ্রহণ করে নেন। এ হল সেই সর্বোচ্চ মহান মর্যাদা– যে সম্পর্কে বলা হয়, বান্দা আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত বিষয়াবলির উপর সন্তুষ্ট এবং আল্লাহ তাআলা বান্দার সকল আশা-আকাঙ্ক্ষার উপর সন্তুষ্ট।

হযরত উমর ফারুক রা. সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন– 'উমর যেদিকে ঘোরেন হকও সেদিকেই ঘুরে যায়'। বাহ্যিক দৃষ্টিতে মনে হয় আল্লাহ তাআলার ইচ্ছার অনুকূলে আমরা ধাবিত হই, কিন্তু এখানে এর বিপরীত বিষয় বলা হচ্ছে– উমর রা. যেদিকে ঘোরেন, হকও সেদিকেই ঘুরে যায়। অর্থাৎ আল্লাহর ইচ্ছা বান্দার ইচ্ছার অনুকূলে পরিচালিত হয়।

সুতরাং প্রকৃত বিষয় হলো এই– বান্দার জন্য সূচনাকালের একটি স্তর রয়েছে, যেখানে তারা সর্বতোভাবেই আল্লাহ তাআলার ইচ্ছার অনুসরণ করতে থাকেন। বান্দার জন্য সমাপ্তিকালের আরেকটি স্তরও রয়েছে, যে স্তরে পৌছার পর তার অবস্থা এমন হয় যে, মনে হয় যেন বান্দার ইচ্ছা মাফিক আল্লাহর ইচ্ছা পরিচালিত হচ্ছে। মর্যাদার এ অবস্থান একমাত্র আল্লাহ ও বান্দা উভয়ের পরিপূর্ণ সন্তুষ্টি দ্বারাই অর্জিত হয়ে থাকে। বান্দার প্রতি আল্লাহ সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট এবং আল্লাহর প্রতি বান্দাও সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট– এ পরম মর্যাদা উম্মতের মধ্যে শুধু

সাহাবায়ে কেরামই অর্জন করতে সক্ষম হয়েছেন, অন্য কারো পক্ষে তা অর্জন করা সম্ভব নয়।

আমলের কল্যাণময়তা ও শ্রেষ্ঠত্ব

প্রথমত এই উম্মতকে অন্যসব উম্মতের তুলনায় শ্রেষ্ঠ উম্মত বলে ঘোষণা করা হয়েছে। অতঃপর এ শ্রেষ্ঠত্বকে خَيْرُ الْقُرُوْنِ قَرْنِيْ 'সর্বোত্তম যুগ আমার যুগ' বলে সাহাবায়ে কেরামের জামায়াতকে সুনির্দিষ্ট করা হয়েছে। এরপর কল্যাণময়তায় ঐ ব্যক্তিকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে যিনি নিজে কুরআন শিক্ষা করেছেন এবং অন্যদেরকে তার তালিম দিয়েছেন এবং তালিমে উৎসাহিত করেছেন। রাসূল সা. ইরশাদ করেছেন–

خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْاٰنَ وَ عَلَّمَهٗ

তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ঐ ব্যক্তি যে নিজে কুরআন শিক্ষা করে এবং অপরকে শিক্ষা দেয়।

অত্র হাদীস দ্বারা কুরআনের তালিমকে কল্যাণময় কাজ সাব্যস্ত করা হয়েছে। যেহেতু কল্যাণ ও বরকতের উৎস হল কুরআন, তাই কুরআনের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীগণ হলেন পরিপূর্ণ কল্যাণের অধিকারী। মর্যাদার এ উঁচু স্তরে তারাই অধিষ্ঠিত।

কুরআন মাজিদের হিফাযত

শব্দ ও অর্থ– এই দুটি জিনিসের সমষ্টি হল কুরআন। এ দু'টো বিষয়ই আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ। কুরআনের শব্দাবলি নাযিল হওয়ার সাথে সাথে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপস্থিত সাহাবীদেরকে তিলাওয়াত করে শুনিয়ে দিতেন। যেভাবে নাযিল হত হুবহু সেভাবে শোনাতেন, একটি বর্ণও এদিক-সেদিক করতেন না। শব্দ ও অর্থ– উভয় বিষয়ে তিনি ছিলেন পরম আমীন ও বিশ্বস্ত। শব্দ যেমন আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হত, তার অর্থও তদ্রূপ তাঁরই পক্ষ হতে অবতীর্ণ হত। আয়াতের যে অর্থ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অন্তরে আল্লাহ তাআলা ঢেলে দিতেন তিনি তাই বর্ণনা করতেন; নিজের পক্ষ থেকে কোন অর্থ বর্ণনা করতেন না, কিংবা অর্থের মধ্যে কোনপ্রকারের পরিবর্তন-পরিবর্ধন সাধনও করতেন না।

কুরআনের শব্দ ও অর্থকে কিয়ামত পর্যন্ত সংরক্ষণের ঘোষণা আল্লাহ তাআলা নিজেই দিয়েছেন। এর মধ্যে কোন প্রকারের ভ্রান্তি ও ত্রুটি প্রবেশ করতে পারবে না। কেউ পরিবর্তন-পরিবর্ধন করতে চাইলে সে ব্যর্থ হবে। সত্য সবসময় বিজয়ী ও প্রাধান্য বিস্তার করে থাকবে। কুরআনকে সংরক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণ করে আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করেছেন–

اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَه لَحٰفِظُوْنَ○

আমি স্বয়ং এ উপদেশ গ্রন্থ অবতরণ করেছি এবং আমি নিজেই এর সংরক্ষক। [হিজর : ৯]

ওহী অবতরণের প্রাথমিক যুগে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভুলে যাওয়ার আশঙ্কায় দ্রুততার সাথে বারবার তিলাওয়াত করতে থাকতেন যেন তা মুখস্থ হয়ে যায়। তখন আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করলেন–

لَا تُحَرِّكْ بِه لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِه○ اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَه وَ قُرْاٰنَه○

তাড়াতাড়ি শিখে নেয়ার জন্যে আপনি দ্রুত ওহী আবৃত্তি করবেন না। এর সংরক্ষণ ও পাঠ আমারই দায়িত্ব (আপনার ব্যতিব্যস্ত হওয়ার কোন কারণ নেই)। [কিয়ামাহ : ১৬-১৭]

অত্র আয়াতের মর্ম হল এই, শব্দাবলির হিফাযত করা, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে স্বরণ করিয়ে দেয়া, তাঁর মুখ দিয়ে তিলাওয়াত করিয়ে দেয়া– সবকিছুরই দায়িত্ব আল্লাহ তাআলার। তাঁর অন্তরে মুখস্থ থাকা এবং নির্ভুলভাবে তাঁর থেকে তিলাওয়াত করানোর দায়িত্ব আল্লাহ তাআলা নিজে গ্রহণ করেছেন এবং সাথে সাথে তার ওয়াদাও করেছেন।

আরবী ভাষায় عَلٰى শব্দটি আবশ্যকীয় অর্থে ব্যবহৃত হয়। কেউ যখন কোন জিনিসকে নিজের জন্য আবশ্যকীয় বলে স্বীকার করে নেয় তখন على শব্দ প্রয়োগ করার দ্বারা তা প্রকাশ করে থাকে। যেমন কেউ বলল: عَلَيَّ اَلْفُ دِرْهَمٍ তখন তার অর্থ হবে তোমাকে একহাজার দিরহাম দেয়া আমার উপর অবশ্যকর্তব্য। কুরআনের অত্র আয়াতে على শব্দটি সে অর্থেই প্রয়োগ করা হয়েছে। অর্থাৎ কুরআনের শব্দাবলিকে আপনার অন্তরে সংরক্ষণ করা, আপনাকে স্মরণ করিয়ে দেয়া এবং আপনার মুখ দিয়ে পাঠ করিয়ে দেয় আমার অবশ্যকর্তব্য। সুতরাং ত্রুটি বিচ্যুতিহীনভাবে পাঠ করিয়ে দেয়া এবং অবিকৃতভাবে সংরক্ষণ করা একটি চিরস্থায়ী ব্যাপার, এতে কোন প্রকারের পরিবর্তন-পরিবর্ধন হওয়া সম্ভব নয়। এ

দায়িত্ব স্বয়ং আল্লাহর। আয়াতের এ অংশে কুরআনের শব্দাবলি সংরক্ষণের অঙ্গিকার রয়েছে, অর্থের কথা এখানে উল্লেখ নেই। কেননা শব্দ ও অর্থের সমষ্টিকে কুরআন বলা হয়। পাঠ হয়ে থাকে শব্দের; অর্থের পাঠ হয় না, এটা অনুধাবন ও উপলব্ধির বিষয়। অর্থ সংরক্ষণের নিশ্চয়তা, জিম্মাদারী ও অঙ্গীকার ব্যক্ত করে পরবর্তীয় আয়াতে বলা হয়েছে–

ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَه

এরপর আয়াতের বিশদ বর্ণনা আমারই দায়িত্ব [কিয়ামাহ : ১৯]

অর্থাৎ সুস্পষ্টভাবে কুরআনের আয়াতসমূহের অর্থ উপলব্ধি করিয়ে দেয়ার দায়িত্ব আমি গ্রহণ করলাম। প্রথম আয়াতে قرانه শব্দ দ্বারা শব্দাবলি সংরক্ষণের দায়িত্ব এবং দ্বিতীয় আয়াতে بيانه শব্দ দ্বারা সঠিক অর্থ সংরক্ষণের দায়িত্ব আল্লাহ কর্তৃক গ্রহণ করা হয়েছে।

সংক্ষেপে বলা যায়, শব্দ ও অর্থের সমন্বয়ে গঠিত যে কুরআন তার সংরক্ষণ ও হিফাযতের দায়িত্ব আল্লাহ তাআলা নিজেই নিয়ে নিয়েছেন।

কুরআন এবং তার ব্যাখ্যা

উপরোল্লেখিত আয়াতে بَيَانَه শব্দটি দ্বারা যে ব্যাখ্যার কথা বর্ণিত হয়েছে তাকেই মূলত হয় হাদীস বলা হয়। জনাব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদীসের মাধ্যমেই পবিত্র কুরআনের আয়াতসমূহের উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ও আদর্শকে স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে দিয়েছেন। কোন আয়াতের আল্লাহ কর্তৃক উদ্দিষ্ট অর্থটি কী তা তিনি নির্ধারণ করে দিয়েছেন। এ বর্ণনাসমূহ দ্বারা আরো একটি কথা পরিষ্কার বোঝা গেল যে, রাসূল সা.-এর হাদীসসমূহও কিয়ামত পর্যন্ত অক্ষত অবস্থায় বিদ্যমান থাকবে। কারণ, কুরআনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ যথার্থভাবে রক্ষিত না থাকলে মানুষ নিজের ইচ্ছেমত অর্থ নির্ধারণ করতে থাকবে। প্রকৃত যথার্থ অর্থের বাইরে হাজারো মনগড়া অর্থের সৃষ্টি হয়ে যাবে। সুতরাং কুরআনের যথার্থ সঠিক তাফসীর হলো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীসসমূহ। অত্র বিষয়টি কুরআন স্পষ্টভাবে প্রকাশ করেছে–

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ-

আমি এ কুরআনকে আপনার প্রতি এ জন্য অবতীর্ণ করেছি, যাতে আপনি মানব জাতির জন্য তা স্পষ্টরূপে বর্ণনা করে দেবেন। [নাহল : ৪৪]

কুরআনের শব্দাবলি অবতরণের সাথে সাথে তার অর্থও বলে দেয়ার প্রয়োজন ছিল। অর্থ বর্ণনা করে দেয়াকে আরবী ভাষায় বলা হয় 'বয়ান'। শব্দের পাঠ শিক্ষা দেয়াকে 'বয়ান' বলা হয় না, তাকে বলা হয় তিলাওয়াত। কুরআনের অবতীর্ণ হওয়া আয়াত ও শব্দের অর্থ এবং তা দ্বারা আল্লাহ তাআলার যে উদ্দেশ্য তা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করে দেয়াকে تُبَيِّن বলা হয়। অর্থাৎ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ দ্বারা সুস্পষ্ট ও বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করে দেয়াকেই বুঝানো হয়েছে। কুরআনের এ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণেরই নাম হলো হাদীস।

কুরআন হল আল্লাহ তাআলা কর্তৃক প্রেরিত একটি 'মতন' বা মূল পাঠ। এ মতনের একটি ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণও তিনি অবতীর্ণ করেছেন যার নাম হল হাদীস। উপরোক্ত আয়াতে 'বয়ান' শব্দটি দ্বারা এ কথাটিকেই দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে এবং আল্লাহ তাআলা নিজেই এ উভয় বিষয়ের হিফাযতের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। জনাব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওপর যখন কোন আয়াত অবতীর্ণ হত, তখন সে আয়াত ব্যাপক অর্থবোধক হওয়ার কারণে নানাভাবে এর অর্থ প্রকাশের সম্ভাবনা থাকত। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনও সে একাধিক অর্থের সম্ভাবনাকে জিইয়ে রেখে বলেননি যে, অত্র আয়াতের এ অর্থও হতে পারে কিংবা অন্য আরেক অর্থও হতে পারে। কিংবা এমনও বলেননি যে, আয়াতের বহু অর্থের সম্ভাবনা রয়েছে কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে অর্থ হবে এই, আর যুগের পরিবর্তনে আয়াতের অন্যরূপ অর্থও নেয়া যেতে পারে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমনটি কখনো করেননি, বরং প্রতিটি আয়াতের প্রকৃত অর্থ ও উদ্দেশ্য আল্লাহ তাআলা নিজেই নির্ধারণ করে জনাব রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অন্তরে প্রবিষ্ট করিয়ে দিতেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো আয়াতের অর্থ নির্ধারণের ব্যাপারে নিজের পক্ষ হতে চিন্তাভাবনা করতেন না। প্রকৃতপক্ষে আয়াত দ্বারা আল্লাহ তাআলার উদ্দেশ্য কী তা একমাত্র তাঁর বর্ণনা দ্বারাই নির্ধারণ হতে পারে। জ্ঞান-বুদ্ধি খাটিয়ে আয়াতের প্রকৃত অর্থ নির্ধারণ করা যাবে না। আল্লাহ তাআলার উদ্দেশ্য ঠিক রেখে আপনি যদি জ্ঞান-বুদ্ধিকে কাজে লাগিয়ে চিন্তাভাবনা ও গবেষণা করেন তাহলে বহু রহস্য উদঘাটিত হবে, নানান প্রকারের হিকমত প্রকাশ পাবে। তখন সেগুলো কুরআনের হিকমত নামেই আখ্যায়িত হবে। কিন্তু আল্লাহর উদ্দেশ্য কখনো জ্ঞান-বুদ্ধি খাটিয়ে নির্ধারণ করা যাবে না। তাঁর উদ্দেশ্য কী তা কেবল তিনিই নির্ধারণ করে দেবেন, তিনিই বলে দেবেন যে, আমার উদ্দেশ্য এই।

যদি আয়াতের উদ্দেশ্য জ্ঞান-বুদ্ধি দ্বারা নির্ধারণ করা যেত তাহলে কুরআন একাধিক হত, বিভিন্ন প্রকারের কুরআন সৃষ্টি হয়ে যেত। হাদীসে এমনই একটি ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। রোযা সম্পর্কীয় আয়াত যখন অবতীর্ণ হল তখন প্রাথমিক অবস্থায় আদেশ এমন ছিল যে, রাতে যখনই ঘুম হতে জাগবে তখন থেকেই পরবর্তী সন্ধ্যা পর্যন্ত রোযা রাখবে। মধ্যর্তী সময়ে পানাহার ইত্যাদি নিষিদ্ধ। অতঃপর আল্লাহ তাআলা আদেশটিকে কিছুটা লঘু করে দিয়ে সুবহে সাদিকের পূর্ব পর্যন্ত পানাহারের অনুমতি দিয়ে আয়াত নাযিল করলেন–

كُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الاَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الاَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ.

তোমরা পানাহার কর যতক্ষণ না কাল রেখা থেকে ভোরের শুভ্র রেখা পরিষ্কার দেখা যায়। [বাকারা : ১৭৮]

অত্র আয়াত নাযিল হওয়ার পর মুসলমানগণ কালো ও সাদা– এ দু'ধরনের সূতা প্রস্তুত করিয়ে শিয়রে রেখে দিলেন। যখন কালো ও সাদা সূতার মধ্যে পার্থক্য করা সম্ভব হত, তখন কেবল তারা পানাহার বন্ধ করতেন। হযরত আদী রা.ও অনুরূপ সূতা তৈরি করে বালিশের নিচে রেখে দিয়ে তা দেখতে থাকেন। কালো সূতাকে সাদা সূতা হতে সম্পূর্ণ পৃথক করতে পারা যেত তখন পানাহার বন্ধ করে রোযার নিয়ত কতেন। অথচ ততক্ষণে সুবহে সাদিক হয়ে আরো পনের বিশ মিনিট সময় অতিবাহিত হয়ে গিয়েছে। হযরত আদী রা. শাব্দিক অর্থের প্রতি লক্ষ্য করে এমনটি করেছিলেন যা আভিধানিক অর্থের দিক দিয়ে ভুলও ছিল না। কিন্তু যেহেতু আল্লাহ তাআলার উদ্দেশ্য এটা ছিল না, তাই সকলের অন্তরে একটা অশান্তির ভাব ছিল। শেষে বিষয়টি জনাব রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট উপস্থাপন করা হলে তিনি হযরত আদী রা.কে জিজ্ঞেস করলেন– হে আদী! তুমি কী পদ্ধতি গ্রহণ করেছ? তিনি আরয করলেন, আমি আল্লাহ তাআলার বাণী كلوا واشربوا নাযিল হওয়ার পর দুটি সূতা আমার বালিশের নিচে রেখে দিয়েছি; আমি এগুলো দেখতে থাকি। যতক্ষণ উভয় প্রকারের সূতার মধ্যে পার্থক্য করা না যায়, ততক্ষণ পর্যন্ত পানাহার করি।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'হে আদী! তোমার বালিশ বড়ই প্রশস্ত, তার মধ্যে রাত ও দিন উভয়ই আত্মগোপন করে আছে।' কেননা কালো সূতা দ্বারা রাতের আঁধার এবং সাদা সূতা দ্বারা দিনের আলো বোঝানো হয়েছে। কালো-সাদা উদ্দেশ্য নয়। তখন সাহাবায়ে কেরাম বুঝতে পারলেন যে, এখানে শাব্দিক অর্থ উদ্দেশ্য নয়।

কুরআনের উদ্দেশ্য এবং আভিধানিক অর্থ

উপরোক্ত ঘটনা দ্বারা বোঝা গেল যে, শব্দের একটি আভিধানিক অর্থ থাকে এবং আরেকটি থাকে উদ্দিষ্ট অর্থ। কুরআন মাজিদ যদিও আরবী ভাষায় অবতীর্ণ হয়েছে কিন্তু সর্ব ক্ষেত্রে আভিধানিক অর্থ উদ্দেশ্য নয়। স্থানবিশেষে কুরআন মাজিদ আরবী ভাষা থেকে শব্দ গ্রহণ করলেও অর্থ নিয়েছে নিজস্ব। একেই 'মুরাদী' বা উদ্দিষ্ট অর্থ বলা হয়।

সালাত শব্দটির প্রতি লক্ষ্য করুন, আভিধানিকভাবে শব্দটি দুআ বা প্রার্থনা অর্থে ব্যবহৃত হয়। কেউ যদি প্রার্থনা করে নেয় তবে আভিধানিক অর্থে সে সালাত আদায় করল। শাব্দিকভাবে দুআ করা, করুণা বর্ষণ করা অর্থে সালাত শব্দটি ব্যবহার করা সঠিক হলেও সে নামায আদায় করেছে বলা সঠিক হবে না। কেননা সালাত শব্দের উদ্দিষ্ট অর্থ এটা নয়। তার উদ্দিষ্ট অর্থ হল বিশেষ কিছু আমল ও কার্যকলাপ– যথা এভাবে নিয়ত কর, এভাবে কিয়াম কর, এভাবে রুকু-সিজদা কর, এভাবে বৈঠকে বস প্রভৃতি আমলের সমষ্টিকে সালাত বলা হয়। কুরআন এখানে শব্দ নিয়েছে করেছে আরবী ভাষা থেকে এবং তাতে অর্থ প্রয়োগ করেছে নিজস্ব। বলেছে, সালাত দ্বারা আমার উদ্দেশ্য হল এই। এ উদ্দেশ্যকে সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করে দেয়ার পর শুধু দুআ করা বা প্রার্থনা করাকে নামায বলার অবকাশ থাকে না এবং প্রার্থনা করার দ্বারা কেউ নামাযের দায়িত্ব হতে অব্যাহতি লাভ করতে পারে না।

তদ্রূপ আরবী ভাষায় 'যাকাত' শব্দের অর্থ পবিত্র করা। আপনি পানি দ্বারা হাত ধুয়ে পবিত্র করে নিন, যাকাত আদায় হয়ে গেল; হাজারো টাকার যাকাত দেয়ার অর্থ কোথেকে এল? অভিধানে তো এ অর্থের কোন হদিস নেই। এখানেও কুরআন 'যাকাত' শব্দটি আরবী ভাষা থেকে গ্রহণ করলেও অর্থ নির্ধারণ করেছে নিজস্ব পদ্ধতিতে যে, তোমার নিকট নির্দিষ্ট পরিমাণ ধন-সম্পদ ও টাকা-পয়সা থাকে এবং তার উপর পূর্ণ এক বছর অতিবাহিত হয় তাহলে তার একটি বিশেষ পরিমাণ আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করার নাম হল যাকাত। সুতরাং যাকাত শব্দের আভিধানিক অর্থ যাই হোক না কেন ঐ অর্থটিই উদ্দেশ্য যা কুরআন নির্ধারণ করে দিয়েছে। আল্লাহ তাআলা আরবী ভাষা থেকে বহু শব্দ গ্রহণ করে তাতে নিজস্ব অর্থ প্রয়োগ করেছেন, এটাই মুরাদী বা উদ্দিষ্ট অর্থ। শিক্ষকগণ এ অর্থই বর্ণনা করেন, বুঝিয়ে দেন এবং এরই তালিম দিয়ে থাকেন। যদি আভিধানিক অর্থই যথেষ্ঠ হত এবং মুরাদী অর্থের প্রয়োজন না হত তবে এই যথেষ্ট ছিল যে, হযরত জিবরাঈল আ. কুরআনের একটি কপি নিয়ে এসে কাবা ঘরের ছাদে রেখে দিতেন ঘোষণা করে দিতেন যে, হে লোকসকল! তোমরা হলে আধ্যাত্মিক

ব্যাধিগ্রস্থ আর এ কুরআন হল তোমাদের জন্য তার চিকিৎসাপত্র; তোমরা সবাই ভাষাবিদ, সকলেই আরবী ভাষায় পারদর্শী, সুতরাং এ কিতাব দেখে দেখে নিজ নিজ চিকিৎসা করে নাও। তাহলে পয়গম্বর প্রেরণের প্রয়োজনও পড়ত না। কিন্তু মাসয়ালা মাসাইল কখনো অভিধানিক অর্থ দ্বারা সমাধা হয় না। এজন্যই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রেরণ করা হয়েছে। তিনি আল্লাহ তাআলার নির্ধারিত ও উদ্দিষ্ট অর্থকে পরিষ্কার ভাষায় সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করে দিয়েছেন যে, এ আয়াত দ্বারা আল্লাহ তাআলার উদ্দেশ্য হল এই।

রাসূলুল্লাহ (সা.)কে প্রেরণের উদ্দেশ্যাবলি

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রেরণ করে চারটি দায়িত্ব তাঁর উপর অর্পণ করা হল। প্রথমত দায়িত্ব হল يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ অর্থাৎ লোকজনকে আল্লাহর কালাম তিলাওয়াত করে শোনাবেন এবং তা উম্মতের নিকট পৌঁছে দেবেন। জনাব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ দায়িত্ব অত্যন্ত আমানতদারী সাথে আঞ্জাম দিয়েছেন এবং পূর্ণ কুরআন উম্মতকে শুনিয়েছে ও তাদের পর্যন্ত পৌঁছিয়েছেন।

এর পর তাঁর দ্বিতীয় দায়িত্ব হল يُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ অর্থাৎ কিতাবের তালিম দেয়া। তালিমের অর্থ হল এ আয়াত দ্বারা আল্লাহ তাআলা যে অর্থ ও উদ্দেশ্য নির্ধারণ করে দিয়েছেন, তা তাদেরকে বুঝিয়ে দেয়া। তিনি ঐ সকল অর্থ তাদেরকে বুঝিয়েছেন এবং আল্লাহর উদ্দেশ্যাবলী ব্যক্তি করেছেন। এটা হল তালিমের দায়িত্ব। যখন স্বয়ং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন অর্থ ও উদ্দেশ্য নির্দিষ্ট করে দেন তখন তাতে আর কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকে না।

এরপর তৃতীয় দায়িত্ব হলো হিকমতের তালিম। বর্ণিত হয়েছে يُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ অর্থাৎ তাদেরকে কিতাব ও হিকমাতের তালিম দেবেন। তাই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে হিকমতও শিক্ষা দিয়েছেন। হিকমত দুই প্রকার– হিকমতে নজরী বা পুঁথিগত জ্ঞান এবং হিকমতে আমলী বা ব্যবহারিক জ্ঞান। বালাগাত বা অলঙ্কার শাস্ত্রের নিয়মানুযায়ী হিকমতে নজরী তালিমের মধ্যেই চলে এসেছে, তথাপি হিকমত শব্দ দ্বারা পুনরায় হিকমতের তালিমের নির্দেশ দেয়া দ্বারা একথা নির্দিষ্ট হয়ে গিয়েছে যে, তা দ্বারা হিকমতে আমলী উদ্দেশ্য। আর তা হলো রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উসওয়ায়ে হাসানা তথা উত্তম আদর্শ। তিনি তাআলার উদ্দেশ্যাবলি শুধু শুনিয়ে কিংবা তালিম দিয়েই ক্ষান্ত হননি বরং আমলের মাধ্যমেও তার নমুনা পেশ

করেছেন। এতে করে কোন প্রকার দ্বিধা-সংশয়ের অবকাশ অবশিষ্ট থাকেনি এবং কোন ধরনের ত্রুটি-বিচ্যুতিরও অবকাশ বাকি থাকেনি।

যদি শুধু শব্দ হতে লোকজনকে আমলের আকার-আকৃতি নির্ণয়ের অনুমতি দেয়া হত তবে প্রত্যেক ব্যক্তি তার মন-মানসিকতা ও পছন্দ অনুযায়ী আমালের পৃথক পৃথক রূপ নির্ধারণ করে নিত। কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শব্দাবলির উপর আমলও করেছেন এবং আল্লাহ তাআলার যে উদ্দেশ্য তা আমলের মাধ্যমে বাস্তব আকৃতিতে দেখিয়ে দিয়েছেন। এখন এ বিষয়ে আর কোন প্রকার দ্বিধা-সংশয় অবশিষ্ট থাকতে পারে না। এ জন্যই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে, নামাযের ব্যাপারে যেভাবে আমল করে দেখানো হয়েছে সেভাবে আমল কর–

صَلُّوْا كَمَا رَاَيْتُمُوْنِىْ اُصَلِّىْ

আমাকে যেভাবে তোমরা নামায পড়তে দেখেছ সেভাবে নামায পড়।

আমার আদর্শ ও আমাল তোমাদের জন্য নমুনা। তোমরা নিজ ইচ্ছা মাফিক কোন আমলের আকার-আকৃতি নির্ধারণ করো না। আমার আমলসমূহ আল্লাহ তাআলার উদ্দেশ্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। আমি যে আকৃতি উপস্থাপন করেছি তাই আল্লাহ তাআলার উদ্দেশ্য। এতসবের পর কোন আমলের আকার-আকৃতি সম্পর্কে কোন দ্বিধা-সংশয়ের অবকাশ কী করে অবশিষ্ট থাকতে পারে?

তারপর চতুর্থ দায়িত্বটি এই বলেছেন যে, আপনি আয়ত পড়ে শোনাবেন, অর্থও বুঝিয়ে দিবেন, স্বয়ং আমল করেও দেখিয়ে দেবেন, কিন্তু তাদের অন্তরে এ যোগ্যতাটুকুও থাকতে হবে যে, তারা যেন এসব বিষয়কে গ্রহণ করে নিতে পারে, আমলের আকার-আকৃতির প্রতি আন্তরিক বিশ্বাস স্থাপন করতে পারে। এর জন্য প্রয়োজন পবিত্র আত্মা, নিষ্কলুষ হৃদয়, সুস্থ মন-মানসিকতা ও সঠিক তারবিয়াতের। কারো অন্তর যদি সরল-সঠিক না হয়, বরং তাতে বক্রতা থাকে, তবে সে কুরআনের সঠিক অর্থের পরিবর্তে বাঁকা অর্থটিই সহজে বুঝবে। এজন্য আল্লাহ তাআলা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর অর্পিত চতুর্থ দায়িত্ব হিসেবে বলেছেনঃ وَيُزَكِّيْهِمْ অর্থাৎ তাদের আত্মা ও মানসিকতাকে ঘষেমেজে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে দেবেন, যেন তাদের অন্তরে গ্রহণ করার ক্ষমতা ও যোগ্যতাও সৃষ্টি হয়ে যায়। যেন এমন হয় যে, যখনই তারা আল্লাহর কালাম শুনতে পাবে তখনই ঠিক ঐ অর্থটিই বুঝতে পারবে যে অর্থটি আল্লাহ তাআলার উদ্দেশ্য। এবং আমলের ঐ আকৃতিটিই গ্রহণ করতে পারে যা আল্লাহ

তাআলার উদ্দেশ্য ও পছন্দনীয়। শুধু শব্দকে ভিত্তি করে কোন মানুষ আমলের নমুনা গ্রহণ করতে পারে না যতক্ষণ না তার সামনে কোন বাস্তব আদর্শ ও আমলী আমলি নমুনা না থাকে। বাস্তব নমুনা থাকলেও তা গ্রহণ করার আগ্রহ তার অন্তরে ততক্ষণ পর্যন্ত তৈরি হবে না, যে পর্যন্ত না তার অন্তরের পঙ্কিলতা ঘষেমেজে পরিষ্কার করে দেয়া হবে।

উত্তম আদর্শের আবশ্যকতা

আমি বলে থাকি, রুটি পাকানো বাহ্যিকভাবে খুবই সাধারণ একটি কাজ। আমি-আপনি প্রতিনিয়তই ঘরে রুটি পাকানো দেখছি, কিন্তু শুধু দেখার উপর ভিত্তি করে আপনি রুটি পাকানোর কাজটি সমাধা করতে পারবেন না যে পর্যন্ত রুটি পাকানোর অনুশীলন না করবেন। প্রথমে আপনাকে লক্ষ্য করতে হবে খামিরা কিভাবে বানাতে হয়, রুটির আকার কিভাবে করে তৈরি করা হয়, গরম তাওয়ার উপর কেমন করে রাখতে হয়, কিভাবে সেগুলো উল্টাতে হয় ইত্যাদি ইত্যাদি। যখন নিজ হাতে বারবার এগুলো করবেন, বাস্তাব কাজের মাধ্যমে রুটি তৈরির অভ্যাস হয়ে যাবে, তখনই কেবল আপনি ভাল রুটি তৈরি করতে সক্ষম হবেন। বসে বসে শুধু রুটি পাকানোর পদ্ধতি দেখে নিলেই রুটি তৈরি করা যাবে না। এভাবেই প্রতিটি কাজ করার পূর্বে তার নিয়মনীতি, কার্যপ্রণালী প্রত্যক্ষ করার প্রয়োজন হয়। শুধু শব্দের দ্বারা আকার-আকৃতি অন্তরে প্রোথিত হয় না এবং বারবার অনুশীলন ব্যতীত আমলের সঠিক আকার-আকৃতি প্রকাশ লাভ করে না।

দর্জি বিদ্যা একটি শিল্প ও শাস্ত্র। এ শাস্ত্রের শত সহস্র পুস্তকও যদি আপনি পাঠ করে নেন, সুঁই চালাতে পারবেন না। যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি কোন দরজিকে সেলাই করতে না দখেবেন আপনি সুঁই চালাতে পারবেন না। পৃথিবীর যাবতীয় শিল্প ও কলা-কৌশলের একই অবস্থা– কোন শিল্প ও কলা-কৌশলই শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ব্যতীত আয়ত্ব করা যায় না। যতক্ষণ পর্যন্ত কোন প্রশিক্ষক হাতে কলমে শিক্ষা না দিবেন ততক্ষণ পর্যন্ত শুধু শব্দ ও পুঁথিগত বিদ্যা দিয়ে কেউ শিল্পী ও কারিগর হতে পারবেন না।

ধর্মীয় বিষয়াবলিও তদ্রূপ। শুধু শব্দালি অবতীর্ণ করে দেয়া এবং তার অর্থ বুঝিয়ে দেয়ার দ্বারা আমলের আকার-আকৃতি হৃদয়াঙ্গম হয় না, আমলী নমুনার আবশ্যকতা রয়েছে যাতে সে শব্দ ও অর্থকে বাস্তবে প্রয়োগ করতে পারে। আল্লাহ তাআলা স্বীয় নবী ও রাসূলগণকে এজন্যই প্রেরণ করেছেন যে, তাঁরা যেন নিজ উম্মতকে আল্লাহ তাআলার আদেশ নিষেধ সম্পর্কিত আয়াত ও

শব্দাবলি শিখিয়ে দেন এবং এগুলোর অর্থ ও উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে দেন। শব্দ ও আয়াত দ্বারা যে আমলটি উদ্দেশ্য তার বাস্তব নমুনা তাদের সামনে উপস্থাপন করেন এবং এসবের সাথে সাথে তাদের অন্তরকে যেন নিষ্কলুষ, নিষ্পাপ এবং আলোকোজ্জ্বল করে দেন। তাদের হৃদয়কে দীন গ্রহণ করার উপযোগী করে তোলেন। যেন তারা আল্লাহর কালামের ইচ্ছামাফিক অর্থ না করে, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ না করে। রাসূল কর্তৃক উপস্থাপিত আমলের নমুনার প্রতি তাদের অন্তরে অনাগ্রহ ও উপেক্ষার সৃষ্টি না হয়ে যেন উৎসাহ-আগ্রহের সৃষ্টি হয়। প্রশস্ত চিত্তে সে নমুনাকে যেন গ্রহণ করে নেয়। আত্মশুদ্ধি ও অন্তরের পবিত্রতা লাভের জন্য যদি আয়াতের শব্দ যথেষ্ট হতো, তবে আম্বিয়ায়ে কেরাম আ.-এর উপর আত্মশুদ্ধির দায়িত্ব দেয়া হত না। আত্মশুদ্ধি ও অন্তরের পরিচ্ছন্নতার জন্য দৈহিক শ্রম ও আধ্যাত্মিক সাধনার প্রয়োজন রয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় সাহাবায়ে কেরাম রা.কে রিয়াজাত ও মুজাহাদার (শ্রম ও সাধনার) মাধ্যমে আত্মার তাজকিয়া ও সংশোধন করেছেন; তাঁদেরকে উজ্জ্বল ও পবিচ্ছন করেছেন। এর ফল দাঁড়িয়েছিল এই যে, যখনই তাঁদেরকে আল্লাহ তাআলার কালাম শোনানো হত, তখনই তাঁদের মধ্যে আল্লাহর কালামের যে প্রভাব পরিলক্ষিত হত তা হত ঐ কালামেরই প্রকৃত প্রভাব।

আল্লাহ তাআলার এ কালামই যদি আপনি সাধারণ মুসলমানগণকে শোনান তবে তার আমলী প্রভাব এই হবে যে, তারা একে আল্লাহর কালাম বলে বিশ্বাস করবে এবং এর প্রতি বেয়াদবী করা যাবে না বলে মেনে নেবে। এর চেয়ে বেশি কোন প্রভাব তাদের মধ্যে ক্রিয়াশীল হবে না। পক্ষান্তরে এ কালামই যদি কোন আরিফবিল্লাহকে (আল্লাহর প্রেমে বিভোর ব্যক্তি) শোনানো হয় তবে সে দূর থেকে বহুদূর অগ্রসর হয়ে যাবে। কেননা তাদের আত্মা পরিশুদ্ধ, রিয়াজাত মুজাহাদা দ্বারা তাদের অন্তর উদ্ভাসিত। এই আলোকময়তায় কালামুল্লাহর যে প্রভাব সে প্রত্যক্ষ করবে সাধারণ কোন মুসলমান তা করতে পারবে না।

এ জন্যই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অধিক যিকির-আজকার, নামায আদায় এবং জিহাদ ও অন্যান্য মুজাহাদার মাধ্যমে স্বীয় সাহাবায়ে কেরামের তারবিয়াত করেছেন, তাদের কলবকে ঘষেমেজে পরিচ্ছন্ন ও পরিশুদ্ধ করেছেন এবং তাদের জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছেন। তাদের অন্তরের আকর্ষণ প্রথমে পার্থিব বিষয়াদির প্রতি ধাবমান ছিল, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে আল্লাহর আরশ মুখী করে দিয়েছেন। প্রথমে তাঁরা ছিলেন ভূবনচারী, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর তারবিয়াত তাদেরকে আরশচারী করে তুলল।

এ আলাচনা দ্বারা আমার উদ্দেশ্য এই, পবিত্র কুরআন মাজিদের দুটি দিক– একটি তার শব্দাবলি, অন্যটি হল তার অর্থ; যা নিহিত রয়েছে শব্দের অন্তরালে। এর পর এসব অর্থের গভিরে রয়েছে হাকাইক বা মূলতত্ত্ব। হাকাইকের ভেতরে রয়েছে মাআরিফ বা জ্ঞানভাণ্ডার, মাআরিফের অভ্যন্তরে রয়েছে বিভিন্ন কাইফিয়াত বা বিশেষ অবস্থা– যা আত্মার উপর প্রকাশ লাভ করে হৃদয়কে আচ্ছন্ন করে নেয়।

কুরআন মাজিদ অবতরণের উদ্দেশ্য কেবল শব্দ ও অর্থকে অনুধাবন করাই নয়; বরং এমনসব আত্মা ও প্রতিভার তারবিয়াত ও আত্মশুদ্ধিও উদ্দেশ্য যে আত্মাগুলো শব্দ ও অর্থের অভ্যন্তরে লুকায়িত হাকাইক ও মায়ারিফকে উপলব্ধি করার উপযুক্ত হয়ে যায় এবং এসব মায়ারিফের আধারে পরিণত হয়।

কুরআনের সাথে কল্যাণের সম্মিলন

উপরোল্লিখিত তারবিয়াত ও আত্মশুদ্ধি মুরব্বী ও সংশোধনপ্রাপ্ত ব্যক্তিত্বের উপর নির্ভরশীল থাকে। এ কারণেই আল্লাহর কালামের সাথে সাথে আল্লাহর রাসূলের আগমনকেও আবশ্যক করা হয়েছে। যেখানেই আল্লাহ প্রদত্ত কোন কিতাব বা সহীফা অবতীর্ণের আলোচনা করা হয়েছে তার সাথে সাথে ঐ কিতাব বা সহীফা যে রাসূলের উপর অবতীর্ণ হয়েছে তার আলোচনাকেও আবশ্যক করা হয়েছে।

আল্লাহ প্রদত্ত চারটি প্রসিদ্ধ আসমানী কিতাব চারজন রাসূলের উপর অবতীর্ণ হয়েছে। তাওরাতের সাথে হযরত মুসা আ., যবুরের সাথে হযরত দাউদ আ., ইঞ্জিলের সাথে হযরত ঈসা আ. এবং কুরআনের সাথে আমাদের প্রিয় রাসূল হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রেরিত হয়েছেন। মোটকথা, এমন কোন যুগ অতিবাহিত হয়নি যে, আল্লাহর বিধান অবতীর্ণ করেছেন কিন্তু সাথে কোন ব্যক্তিত্বকে প্রেরণ করা হয়নি। কেননা দীনের নির্ভরশীলতা প্রেরিত ব্যক্তিত্বের উপরেই ন্যস্ত থাকে; কাগজ, কাঠ বা তাতে লিখিত অক্ষরসমূহের উপর নয়।

আল্লাহ কর্তৃক প্রেরিত হরফ ও শব্দাবলির তিলাওয়াত ঐ ব্যক্তিই করবেন, তার সঠিক অর্থও তিনিই বর্ণনা করবেন এবং আমলের নমুনাও ঐ ব্যক্তিই হবেন। কোন কিতাবের পৃষ্ঠা তো আমলের নমুনা হতে পারে না। অন্তরসমূহকে ঘষেমেজে পরিচ্ছন্ন করা, তাকে নির্মল ও পরিশুদ্ধ করার দায়িত্বও ঐ ব্যক্তিই আঞ্জাম দিবেন। পুস্তকের পৃষ্ঠায় লিখিত বা কাঠের উপর খোদাইকৃত অক্ষরসমূহ আত্মার সংশোধন করতে পারে না। সুতরাং বোঝা গেল, প্রত্যেক বিধানের সাথ ব্যক্তিত্বের প্রয়োজনীয়তা আবশ্যকীয় হয়ে থাকে। এ মহান ব্যক্তিবর্গকেই আল্লাহ

তাআলা নবী ও রাসূল নামে নামকরণ করেছেন।

এটি একটি সাধারণ সরল-সহজ কথা যে, পবিত্র কুরআন যখন 'খাইরুল কুতুব' তথা সর্বশ্রেষ্ঠ কিতাব তখন তার সাথে প্রেরিত ব্যক্তিও অবশ্যই 'খাইরুল বাশার' তথা সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ হবেন। আর এই সর্বশ্রেষ্ঠ মানবের সান্নিধ্যে ধন্য শিষ্যগণও হবেন 'খাইরুন্নাস' তথা মানবশ্রেষ্ঠ। আর এঁরা হলেন সাহাবায়ে কেরাম। একই নিয়মে সর্বশ্রেষ্ঠ মানবের যুগও হবে সর্বশ্রেষ্ঠ যুগ। এতসব কল্যাণ ও বরকতের মধ্যে কুরআনুল কারিমের অবতরণ ছিল এমন একটি সর্বব্যাপী কল্যাণ যার চতুর্দিকে বহুবিধ কল্যাণ বিরাজ করছিল। যুগের কল্যাণ, স্থানের কল্যাণ, পবিত্র সত্তার কল্যাণ, শ্রেষ্ঠতম শিক্ষার্থীর কল্যাণ। এসব কল্যাণ ও বরকত যখন একত্রিত হয়েছে তখনই অবতরণ করেছেন খায়রুল কুতুব অর্থাৎ সর্বশ্রেষ্ঠ ও সবোত্তম কিতাব কুরআন। আর এ কিতাব সম্পর্কেই বলা হয়েছে–

خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْاٰنَ وَ عَلَّمَه

তোমাদের মধ্যে যারা নিজে কুরআন শেখে এবং অপরকে শিক্ষা দেয় তারাই সর্বোত্তম মানব।

যে কিতাবের ভেতর-বাইরে, আশপাশে, উপর-নিচে সর্বত্র শুধু কল্যাণ আর কল্যাণ, সে কিতাবের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীগণ সে কল্যাণ থেকে কিভাবে বঞ্চিত থাকতে পারে? তাঁরাও কল্যাণময় হয়ে যাবেন।

কালামুল্লাহর মাধ্যমে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক স্থাপন

এ প্রসঙ্গে একটি হাদীসে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, তোমরা কুরআন থেকে বরকত হাসিল কর। এটা আল্লাহর কালাম এবং তাঁর অভ্যন্তর হতে নির্গত হয়ে এসেছে।

কালাম বা কথা মানুষের থেকে বের হয়, কিন্তু তাই বলে এ কথা বলা যাবে না যে, মানুষ কালাম সৃষ্টি করে, বরং কালাম মানুষ থেকে প্রকাশ পায়। মানুষ তার কথাকে সৃষ্টি করে না। আপনি যখন কাউকে বক্তৃতা করতে শুনবেন, তখন আপনি বলবেন যে, কাথাগুলো তার থেকে নির্গত হচ্ছে বা প্রকাশ লাভ করছে। আপনি বলবেন না যে, বক্তা কথাগুলো সৃষ্টি করছে। আল্লাহ তাআলা এ আকাশ, বাতাস, পৃথিবী, বিশ্বগজৎ সবই সৃষ্টি করেছেন। সব রকমের কল্যাণ ও বরকত আল্লাহ তাআলারই সৃষ্টি, কিন্তু পবিত্র কুরআন তাঁর সৃষ্টি বা মাখলুক নয়। এটা আল্লাহ তাআলার কালাম– যা তাঁর থেকে নির্গত হয়েছে। এজন্যই এ কালাম পাঠ করে আল্লাহর বাতেনের (রহস্যের অন্তরালের অন্য এক স্তর) সাথে বান্দার

সম্পর্ক স্থাপিত হয়ে যায়। অন্যান্য নেয়ামরাজি দ্বারা আল্লাহর জাহিরের সাথে সংযোগ ও সম্পর্ক স্থাপিত হয় আর আল্লাহর কালামের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার বাতেনের সাথে সম্পর্ক স্থাপিত হয়। এ কারণেই পবিত্র কুরআন সম্পর্কে ইরশাদ করা হয়েছে–

وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيْعًا.

তোমরা সম্মিলিতভাবে আল্লাহর রজ্জুকে আকড়ে ধর। [আলে ইমরান : ১০৩]

আর হাদীস শরীফে حَبْلُ اللهِ তথা 'আল্লাহর রজ্জু'-এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলা হয়েছে اَلْقُرْاٰنُ حَبْلُ اللهِ অর্থাৎ কুরআনই হল পৃথিবীতে অবতীর্ণ আল্লাহর রজ্জু। সম্মিলিতভাবে একে তোমরা আকড়ে ধর। কেননা কিয়ামতের দিন এই রশি ধরে টান দেয়া হবে আর এর ধারকগণ তখন এতে সংশ্লিষ্ট থাকবেন। কুরআন যেখানে গিয়ে পৌঁছবে, রশির ধারণকারীগণও সেখানে গিয়ে আল্লাহর বাতেনের সাথে সংযুক্ত হবেন।

কুরআনের বাতেন হল জান্নাত

কোন কোন হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, কুরআন শরীফে যতগুলো আয়াত রয়েছে জান্নাতে রয়েছে সে পরিমাণ সোপান। কুরআনের এক একজন পাঠককে বলা হবে: رتل وارتق কুরআন তিলাওয়াত করতে থাক এবং ঊর্ধ্বারোহণ করতে থাকো। তখন যার যে পরিমাণ কুরআন মুখস্থ থাকবে সে অনুযায়ী মর্যাদার উচ্চ শিখরে আরোহণ করতে থাকবে। কোন কোন হাদীসে আবার এ কথাও রয়েছে যে, স্বয়ং এ আয়াতগুলোই জান্নাত।

এখন যে আয়াতগুলোকে আপনি শব্দের আকারে দেখছেন, জান্নাতে সেই আয়াতগুলোই বাগ-বাগিচা, প্রাসাদ, ঝরণা ও ফলমূলের আকৃতি নিয়ে আত্মপ্রকাশ করবে। একই জিনিস কিন্তু পার্থিব আকৃতি পরিবর্তন হয়ে জান্নাতে ভিন্নরূপ ধারণ করবে। ছোটবেলায় দেখতাম, ইউরোপ থেকে এক জাতীয় খেলনা নিয়ে আসা হত, একটি প্যাকেটে প্রায় বারটির মত ট্যাবলেটের মত একটি জিনিস থাকত। দাম ছিল চার আনা। বাচ্চারা এগুলো শখ করে ক্রয় করত। প্রথমে তারা ট্যাবলেটগুলো পানিভর্তি পাত্রে ছেড়ে দিত। পানির স্পর্শের সাথে সাথে সেগুলো প্রসারিত হয়ে যেত। তখন ঐ ট্যাবলেট থেকে বেরিয়ে আসত নানা প্রকারের খেলনা। কোনটি ইঞ্জিন আকৃতির, কোনটি ঘোড়ার

আকৃতির, কোনটি হাতির আকৃতির, কোনটি ফুলের আকৃতির, আবার কোনটি বা বকের আকৃতির। প্রস্তুতকারক সেগুলো এমন এক কৌশলে তৈরি করেছে যে, যখন এগুলো ফেটে যায়, তখন বিভিন্ন আকার-আকৃতিতে প্রকাশ পায়। তবে শর্ত হল একটি– পানির স্পর্শ লাগতে হবে। বিয়ে-শাদীতে যে আতশবাজি করা হয় তাতেও কারিগররা উপাদানগুলো এমন করে সাজিয়ে রাখে যে, যখনই আগুন ধরিয়ে ছুঁড়ে ফেলা হয় তখন অগ্নিস্ফুলিঙ্গগুলো দর্শকগণ কখনো আরোহীসহ ঘোড়া রূপে দেখতে পান, কখনো বাগানের দৃশ্য রূপে দেখতে পান। এসব দেখে সবাই আশ্চর্যান্বিত হয়ে কারিগরের প্রশংসা করেন, তার কলা-কৌশল দেখে মুগ্ধ হন।

আল্লাহ তাআলাও তাঁর মহান কালামের আয়াতগুলোতে এমন এক কৌশল নিহিত রেখেছেন যে, আয়াতগুলো যতদিন পৃথিবীতে বিরাজ করবে, ততদিন তা জ্ঞান-বিজ্ঞান, ইলম ও মারিফাতের ভাণ্ডাররূপে থাকবে, শিক্ষা গ্রহণ ও শিক্ষা প্রদানের বস্তুরূপে বিরাজ করবে। কিন্তু যখনই তা আখিরাতের স্পর্শ পাবে, তখনই এই আয়াতগুলো বাগ-বাগিচা, ফুল-ফল ও ভবন-প্রাসাদ প্রভৃতিতে রূপান্তরিত হবে। পৃথিবীতে যেসব তার পাঠকদের জন্য সুখ-শান্তি ও সমৃদ্ধির একমাত্র অবলম্বন ছিল, ইলম, মারেফাত, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও আধ্যাত্মিক উন্নয়নের সিঁড়ি ছিল, আধ্যাত্মিক জগতে বিচরণের বাহন ছিল, ঐ শব্দগুলোই তখন জান্নাত, বাগান, মণি-মাণিক্য, দালান কোঠা, আনন্দ উল্লাসের আকারে প্রকাশ লাভ করবে এবং পরকালকে আরাম আয়েশ ও আনন্দ উপভোগের স্থানে পরিনত করে দেবে। ঐ আয়াত ও শব্দাবলি হতে প্রবাহিত হবে ঝরণা ধারা, অক্ষরগুলো হুর ও গিলমানের আকৃতিতে প্রকাশ লাভ করবে, অক্ষরসমূহের নুক্তাগুলো তথায় মণি-মানিক্যের অবয়ব ধারণ করবে। এ জগতের আয়াতগুলো ঐ জগতে এমন বাগিচায় রূপান্তরিত হবে যে, সেখানে বিরাজ করবে চিরবসন্ত। হয়ে উঠবে অফুরন্ত নেয়ামতের প্রাচুর্যের সমাহার।

আমি তো বলে থাকি যে, অন্যান্য জাতি তাদের উপর অবতীর্ণ কিতাব ও সহীফার প্রতি ঈমান গ্রহণ করে পরকালে যে জান্নাতে যাওয়ার আশা পোষণ করছেন, সেই জান্নাতকে মুসলমানগণ ইহজগতেই তাদের হৃদয়ে ধারণ করে চলাফেরা করছেন। ঐসব জাতি-সম্প্রদায় আজ কুরআনের উপর ঈমান গ্রহণ করে সেই জান্নাতকে এখনই কেন অর্জন করছে না?

যে মুসলমান সমস্ত কুরআনকে হিফয করতে সক্ষম হয়েছেন সে যেন সম্পূর্ণ জান্নাতকেই তার অন্তরে সন্নিবেশিত করে রেখেছে। পরকালে যখন অক্ষর ও শব্দের ভিতর থেকে জান্নাত প্রকাশ লাভ করবে, তখন সে মুগ্ধ হয়ে দেখতে

পাবে যে, এতো সেই কুরআন যা এখন জান্নাতের রূপান্তরিত হয়েছে। এই জগতেই মুমিনগণ তাদের অন্তরে জান্নাতকে ধারণ করে বসে রয়েছেন। তবে যেহেতু তার মূল আকৃতি অদৃশ্য রয়েছে তাই সে তা অনুভব করতে পারে না যে, কত মহান বিষয় তার অন্তরে রয়েছে। কিন্তু সে আয়াতগুলোর হাকিকত যখন প্রকাশ পাবে এবং তার আকৃতি রূপান্তরিত হয়ে বাগ ও বাহারের রূপে দৃশ্যমান হবে, তখন ঐ নেয়ামতের মূল্যায়ন করা সম্ভব হবে। মূল কথা হলো এই, মুমিন বান্দা নিজেই এক জান্নাত। কিয়ামতের দিন জান্নাত নামে যে জিনিসটি তাকে দেয়া হবে তা ইহজগতেই কুরআনের আয়াত ও শব্দরূপে তাকে দান করা হয়েছে। এখন যে ব্যক্তিই কুরআন তিলাওয়াত করছে, সে যেন জান্নাতকে একত্রিত করে নিজের মধ্যে সঞ্চিত করে রাখছে। এ জান্নাত যখন প্রকাশ লাভ করবে তখন সে অনুধাবন করতে পারবে যে, এ জান্নাত তো পৃথিবীতেই আমাকে দান করা হয়েছিল।

মোটকথা, আল্লাহ তাআলার বাতেনের সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত করে রাখার মাধ্যমও হল কুরাআন এবং পুরস্কার ও প্রতিদান লাভের মাধ্যমও হল কুরআন। তার এক একটি বর্ণের পবির্তে দশটি করে নেকী আমলনামায় সঞ্চিত হচ্ছে। আর এ কুরআনই জান্নাতের মহল, প্রসাদ ও বাগ-বাগিচা।

মোট কথা কুরআনের অবস্থা অত্যন্ত বিস্ময়কর। একে যদি পাঠ কর তবে এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ কোন অজিফা নেই, যদি এ থেকে জ্ঞান অর্জন কর তবে তার চেয়ে উত্তম কোন জ্ঞান নেই, একে যদি জীবন বিধান সাব্যস্ত কর তবে এর চেয়ে উন্নত কোন জীবনবিধান নেই, যদি তার হাকিকত (অন্তর্নিহিত রহস্য) উদঘাটন কর তবে এর চেয়ে উন্নত কোন জ্ঞান বিজ্ঞান নেই। যদি কুরআনের গুণাবলিকে নিজ অন্তরে প্রতিফলিত কর তবে আত্মার জন্য এর চেয়ে অধিক প্রশান্তি ও আনন্দের বস্তু অন্য কিছু নেই। কোন ব্যক্তির পক্ষে নেয়ামত সম্পর্কে যে যে কল্পনা করা সম্ভব তার সবই কুরআনের মাধ্যে একত্র করে রাখা আছে। যা এখানে ইলমরূপে রয়েছে, পরকালে এগুলো চিরবসন্তের বাগানরূপে প্রকাশ পাবে। এবং মনে হবে যে, কুরআন একটি প্রশস্ত বিরাট আকারের বাগান, দৃষ্টির শেষ সীমা পর্যন্ত যা বিস্তৃত। যেখানে লক্ষ-কোটি বর্ণিল ফুল প্রষ্ফুটিত হয়ে রয়েছে এবং সর্বপ্রকারের সুগন্ধি মজুদ রয়েছে।

তাওরাত এবং হাশরের মাঠ

হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে যে, কিয়ামতের ময়দানে যখন বিশ্বের বিভিন্ন জাতি ও সম্প্রদায় সমবেত হবে তখন আল্লাহ তাআলা লাওহে মাহফুজকে জিজ্ঞেস

করবেন, ঐ 'তাওরাত' কিতাব কোথায় যা আমি তোমাতে রেখেছিলাম? লাওহে মাহফুয বলবে, তাতো জিবরাঈল আ. নিয়ে গেছেন। তখন জিবরাঈল আ.কে জিজ্ঞেস করা হবে, তুমি লাওহে মাহফুয থেকে তাওরাত নিয়েছ? তিনি আরয করবেন হ্যাঁ, নিয়েছি। জিজ্ঞেস করা হবে, তুমি তা নিয়ে কোথায় রেখেছ? তিনি বলবেন, আমি তাওরাত নিয়ে হযরত মুসা আ.-এর অন্তরে অবতীর্ণ করে দিয়েছি। তখন হযরত মুসা আ.-এর কাছে জানতে চাওয়া হবে, জিবরাঈল আ.-এর নিকট থেকে তুমি কি তাওরাত শুনেছ? তিনি আরয করবেন, জ্বী হ্যাঁ, আমি তাঁর নিকট থেকে তাওরাত শুনেছি এবং তার অর্থও বুঝেছি। আল্লাহ বলবেন, তারপর কী করেছ? তিনি আরয করবেন, আমি আমার উম্মতের নিকট তা পৌছে দিয়েছি। তখন আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করবেন, সে তাওরাত এখন তিলাওয়াত করে তোমার উম্মতকে শুনিয়ে দেখাও। হযরতম মুসা আ. সমস্ত তাওরাত পড়ে শোনাবেন। পৃথিবীতে তাওরাতের শব্দগুলো পাঠ করে শোনানো হয়েছে, অর্থ বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে, কিন্তু আজকের তিলাওয়াত দ্বারা শব্দ ও অর্থের আবরণে আবৃত হাকিকতগুলো বিশেষ বিশেষ আকৃতি ধারণ করে প্রকাশ পাবে। তখন দেখা যাবে, এতো একটি বাস্তব রূপধারী বিরাটকায় বাগান। এ দ্বারা অন্তরে নানা আনন্দদায়ক অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে, বহু অজানা গোপন রহস্য প্রকাশ পাচ্ছে। তখন মুসা আ.-এর উম্মতের লোকজন বলাবলি করতে শুরু করবে, এ তাওরাত তো কখনো আমরা দেখিনি। আমরা তো শব্দ ও অর্থ নিয়েই পৃথিবীতে ব্যস্ত ছিলাম। আজ তার প্রকৃত আকার দেখতে পেলাম। ইতোপূর্বে আমারা এ বিষয়ে অবগত ছিলাম না।

কুরআনুল কারীম এবং হাশরের ময়দান

এমনিভাবে জনাব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছেও জানতে চাওয়া হবে যে, আপনার কাছে কি কুরআন পৌঁছেছিল? তিনি উত্তরে বলবেন, হ্যাঁ, কুরআন আমার কাছে পৌছেছিল, আমি তা তিলাওয়াত ও তালিমের মাধ্যমে আমার উম্মতের নিকট পৌছে দিয়েছি। তখন আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করবেন, এখন আপনি তা তিলাওয়াত করুন যাতে বিশ্ববাসীর সম্মুখে কুরআন পাকের শব্দ ও অর্থের মধ্যে নিহিত মূল তত্ত্ব তার প্রকৃত আকার-আকৃতি নিয়ে প্রকাশ পায় এবং বিশ্ববাসী অবলোকন করতে পারে যে, কিভাবে কুরআন সম্পূর্ণ সৃষ্টিকে নিজ অভ্যন্তরে ধারণ করে রেখেছিল।

হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে, কিয়ামতের ময়দানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্য একটি মিম্বর স্থাপন করা হবে। তাতে তিনি উপবিষ্ট হয়ে

প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত পূর্ণ কুরআন তিলাওয়াত করে শোনাবেন। হযরত আদম আ. থেকে আরম্ভ করে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত যেসব মানুষের নিকট কুরআন পৌঁছেনি, তারা অত্যন্ত আক্ষেপের সাথে বলবে– হায়, এ কিতাবটি যদি আমাদের নিকট দুনিয়ায় অবস্থানকালে পৌঁছত! এ তো অত্যন্ত বিস্ময়কর ও রহস্যময় এক কিতাব; এর অভ্যন্তরে লুকিয়ে আছে অত্যন্ত বিস্ময়কর ধনভাণ্ডার। পৃথিবীতে অবস্থানকালে কুরআনের শব্দ ও আয়াতের তিলাওয়াত ও অর্থের অনুধাবন আত্মার উপর যেসব আধ্যাত্মিক কাইফিয়াত প্রকাশ পেত সেসব আজ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর তিলাওয়াতের সাথে সাথে মূর্তমান আকার-আকৃতিতে প্রকাশ লাভ করবে। তখন দেখা যাবে যে, কুরআন এমন এক সুন্দরতম বিশাল বাগান যা নিখিল বিশ্বকে ঘিরে রেখেছিল। সেখানে রয়েছে চির বসন্তের ফুলরাজি, বর্ণিল কারুকার্যময় জিনিসপত্র, নানা ধরনের ফুলের সমারোহ– যাদের সুগন্ধী তুলনাহীন।

এ অবস্থা দেখে স্বয়ং সাহাবায়ে কেরামও আশ্চর্যান্বিত হবেন এবং বলবেন, কুরআনের এ রূপ, এ আবরণ তো আমরা কখনো দেখিনি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর থেকে প্রাপ্ত আধ্যাত্মিক বলে বলীয়ান সাহাবায়ে কেরামের হৃদয় ও আত্মা সর্বদা তিলাওয়াতে কুরআনের কাইফিয়াত ও মাধুর্যে পরিপূর্ণ থাকত। কিন্তু ঐ সকল কাইফয়াত ও আধ্যাত্মিক অবস্থাসমূহকে আজ তাঁরা যে আকার-আকৃতি ও অবয়বে দেখছেন, পৃথিবীতে অবস্থানকালে এ সম্পর্কে পরিজ্ঞাত হতে পারছিলেন না।

আল্লাহ তাআলার তাজাল্লী বিদ্যমান থাকা অবস্থায় সমস্ত আম্বিয়ায়ে কেরাম আ., সকল ফেরেশতা এবং সকল উম্মতের লোকজন হাশরের বিশাল মাঠে সমবেত থাকাকালে যখন কুরআনের হাকিকতরাজি মূর্তমান হয়ে আত্মপ্রকাশ করবে, তখন বিস্ময়াভিভূতির এক আশ্চর্যজনক দৃশ্যের অবতারণা হবে। বিশ্বসমাজ নীরব-নিস্তব্ধ হয়ে যাবে। যারা এ পরম নেয়ামতের ভাগী হতে পারেনি, তারা থাকবে আক্ষেপ ও দুঃখ-বেদনায় বিমর্ষ। যাদের ভাগ্যে এ নেয়ামত জুটেছিল তাদের আক্ষেপ হবে এই ভেবে যে, হায়! আমরা কত বড় মহানেয়ামত হতে বেখবর ছিলাম, পবিত্র কুরআনকে পশ্চাতে ফেলে রেখে তার প্রতি যথাযথ সাম্মান প্রদর্শ ও মূল্যায়ন না করে কত বিরাট ক্ষতি করেছি, কত মহামূল্যবান নেয়ামতসমূহ হতে বঞ্চিত হয়েছি, তার কোন হিসাব নিকাশ নেই।

তো আমি আরয করতে চাচ্ছি যে, কুরআনকে দৈনন্দিন অজিফা হিসেবে তিলাওয়াত করুন, কুরআন থেকে উত্তম কোন অজিফা নেই। কুরআনের জ্ঞান অর্জন করুন, এর চেয়ে উৎকৃষ্ট ও উন্নত আর কোন জ্ঞান নেই। যদি হিকমত ও

বিজ্ঞান অনুসন্ধানে আগ্রহী হন, তবে কুরআনের গবেষণা করুন, পরীক্ষা-নিরীক্ষা করুন। কুরআন হলো জ্ঞানের ভাণ্ডার। এর মত জ্ঞান-বিজ্ঞানে পরিপূর্ণ অন্য কোন কিতাব নেই। যদি আধ্যাত্মিক জ্ঞানের অন্বেষণ করেন, তবে কুরআনের চেয়ে উত্তম আধ্যাত্মিক জ্ঞানভাণ্ডার অন্য কিছু নেই। এ সকল জিনিস শব্দ ও অর্থরূপী ভাণ্ডার থেকে যখন তার প্রকৃত অবয়ব নিয়ে আত্মপ্রকাশ করবে, তখন এগুলোকেই বলা হবে জান্নাত। এ হবে সেই জান্নাত যাকে একজন কুরআনের পাঠক তার অন্তরে সংরক্ষণ করে রেখেছিল। সে জান্নাতই হবে তার চিরস্থায়ী বাসস্থান। যখন তিনি নিজ জান্নাতকে দেখবেন তখন জান্নাতটি পূর্বপরিচিত বলে মনে হবে। তখন নিজেই বলবেন, এ জান্নাত তো সে জান্নাত যা আমার অন্তরে লুকায়িত ছিল। তবে দুনিয়াতে অবস্থানকালে এসব নেয়ামতের প্রকৃত স্বাদ উপভোগ থেকে আমি অজ্ঞ ছিলাম। এখন এগুলোর প্রকৃত স্বাদ তার হাতের মুঠোয় এসেছে। এসবের আলো ও জ্যোতি তার উপর প্রতিভাত হচ্ছে, ঘ্রাণ তাকে মুগ্ধ ও উৎফুল্ল করছে। মোটকথা, কুরআন ও তার আনুষঙ্গিক বিষয়সমূহ সর্বকালে, সর্বস্থানে, সর্বাবস্থায় কল্যাণ ও বরকতময়। পৃথিবীতে একমাত্র কল্যাণ ও বরকতের অধিকারী, পরকালেও একমাত্র কল্যাণ ও বরকতের ধারক ও বাহক এটি। কুরআন শিক্ষা করাই একমাত্র পরিপূর্ণ খায়র ও বরকত। শিক্ষা দেয়াও একমাত্র পরিপূর্ণ কল্যাণ ও বরকত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইরশাদেও এ কথাটি বলা হয়েছে–

خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْاٰنَ وَ عَلَّمَه.

> কুরআন শিক্ষা করা ও শিক্ষা দেয়া যার অজিফা (প্রাত্যাহিক কাজ) হয় সেই তোমাদের মধ্যকার সর্বোত্তম ব্যক্তি।

আহলে কুরআনের অবস্থা

এখন কয়েকজন বুযর্গের অবস্থা শুনাচ্ছি। যদিও তাঁদেরকে আমি দেখিনি, তবে তাঁদের অবস্থা বুযর্গদের মুখে শুনেছি। আমাদের শ্রদ্ধেয় উস্তাদ হযরত মাওলানা সৈয়দ আসগর হুসাইন রহ.-এর খান্দানকে 'উওয়াইসী' খান্দান বলা হত। তাঁর খান্দানে সব সময়ই কোন না কোন একজন জন্মগত ওলী অবশ্যই থাকতেন। রিয়াযত ও মুজাহাদা ব্যতীত আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে এই বেলায়াত তাঁদেরকে দান করা হয়। (উওয়াইসী খান্দানে সাধারণত আল্লাহ কর্তৃক দানকৃত বেলায়াত থাকত বিধায় তাদেরকে উওয়াইসী বলা হয়। নতুব প্রকৃতপক্ষে তাঁরা সৈয়দ খান্দানের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন)।

মিয়া সাহেবের নানা (মাওলানা আসগর হুসাইন সাহেব 'মিয়া সাহেব' নামে পরিচিত ছিলেন) শাহ মুহাম্মাদ হুসাইন রহ. একজন অত্যন্ত পুণ্যবান ও সজ্জন ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর সম্পর্কে হযরত মাওলানা কাসেম নানুতবী রহ. বলতেন– 'তিনি এমন এক ব্যক্তিত্ব ছিলেন যে, তার অন্তরে কখনো সগীরা গুনাহর কল্পনাও আসেনি। তাঁর জানা-ই ছিল না যে, গুনাহ কী জিনিস।'

তো এই শাহ সাহেব কুরআন শিক্ষা দেয়ার কাজ গহণ করে নিয়েছিলেন। রাতদিন শিশুদেরকে কুরআন শিক্ষা দানে ব্যস্ত থাকতেন। সার্বক্ষণিক আল্লাহর প্রেমে বিভোর ও ধ্যানমগ্ন তাঁর মধ্যে বিরাজ করতেন। নিজ সন্তানগণের নামও ভুলে যেতেন। আব্দুল্লাহ (আল্লাহর বান্দা) নামে তাঁর এক জামাতা ছিলেন। তিনি যখনই আসতেন, তখনই জিজ্ঞেস করতেন, তোমার নাম কী? তিনি বলতেন, আমার নাম আব্দুল্লাহ। শাহ সাহেব বলতেন, সঠিক নাম বল। তিনি আবার বলতেন, হুযুর, আমার নাম আব্দুল্লাহ। তিনি বলতেন, আরে ভাই, আমরাও আল্লাহর বান্দা, সঠিক নাম কী তাই বল। শেষে যখন বলতেন, হুযুর আমি আপনার জামাতা, তখন চিনতেন এবং বলতেন, আচ্ছা, বস। তারপর কিছু কথাবার্তা বলে চলে যাওয়ার পর একটু পরে আবার যখন ফিরে আসতেন তখনও সেই একই প্রশ্নোত্তর হত। আল্লাহর সাথে তাঁর এমন সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল যে, 'দুনিয়া ও তাতে যা রয়েছে' তা থেকে সম্পূর্ণ বেখবর ছিলেন। নিজ সন্তানদের নাম পর্যন্ত স্মরণে থাকত না। আর এ অবস্থা তাঁর জন্মগত ও স্বভাবজাত ছিল। (কোন রিয়াযাত ও মুজাহাদার ফল নয়)।

সে যুগে ঘড়ি-ঘণ্টার প্রচলন ছিল না, নানা চিহ্ন দ্বারা সময় নির্ধারণ করা হত। কোনো স্থানে একটি চিহ্ন অথবা কোন জিনিস দাঁড় করানো হত। উহার ছায়া যখন নির্দিষ্ট স্থানে পৌছত তখন ছুটির সময় হয়েছে বলে ধরে নেয়া হতো। বাচ্চারা সব সময়ই দুষ্টুমি করে, তখনও করত। তারা চিহ্নটি উঠিয়ে এমন স্থানে এমনভাবে দাঁড় করিয় রাখত, যেন ছুটির সময় শীঘ্র শীঘ্র হয়ে যায়। ছায়া সেই স্থানে পৌছার সাথে সাথে চিৎকার করে বলে উঠত, ছায়া যথাস্থানে পৌছে গেছে, ছুটির সময় হয়েছে। তখন তিনিও বলতেন, আচ্ছা ভাই যাও, তোমাদের ছুটি।

লোকজন তাকে বললো, মিয়াজী! ছেলেরা দুষ্টুমি করে মিথ্যা বলে সময়ের পূর্বে ছুটি নিয়ে যায়। তখন তিনি উত্তর দিতেন, মুসলমান ছেলেমেয়েরা মিথ্যা বলে না। ছুটির সময় হয়ত হয়ে থাকবে। যাও বাচ্চারা, তেমাদের ছুটি। তাঁর এ দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, মুসলমান মিথ্যা কথা বলতে পারে না। আরবী ভাষায় একটি প্রসিদ্ধ প্রবাদ রয়েছে– اَلْمَرْءُ يَقِيْسُ عَلٰى نَفْسِه অর্থাৎ প্রত্যেক ব্যক্তি অপরকে নিজের মত ধারণা করে। শাহ সাহেবের অন্তরে মিথ্যা বলার কল্পনাও কখনো আসেনি।

তাই অন্যদের সম্পর্কেও তাঁর এ বিশ্বাস ছিল যে, মুসলমান মিথ্যা বলতে পারে না। এ জন্যই যারা তাঁর অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞাত ছিলেন তারা তখন নীরব থাকতেন।

আমাদের সময়ে হাফেজ মুহাম্মাদ আহসান রহ. একজন বুযর্গ ব্যক্তি ছিলেন। কোন এক ব্যক্তি তার জমির উপর মিথ্যা মোকদ্দমা দায়ের করে নিজের জমি বলে দাবি করল। মোকদ্দমা দায়ের করে মিয়াজীর নিকট গিয়ে বলল, মিয়াজী! আমি আমার জমি ফেরত পাওয়ার জন্য মোকদ্দমা করেছি। আপনি দুআ করুন যেন আমি আমার জমি ফেরত পেয়ে যাই। মিয়াজী বললেন, আচ্ছা ভাই, আমি দুআ করব, জমি তুমি পেয়ে যাবে। এদিকে হাফেজ মুহাম্মাদ আহসান একথা জানতে পারলেন যে, এক ব্যক্তি তার জমির উপর মিথ্যা মোকদ্দমা করেছে। প্রকৃতপক্ষে হাফেজ আহসান সাহেবই জামির মালিক ছিলেন। তিনিও মিয়াজীর খেদমতে হাজির হয়ে বললেন, হুযুর, আমি একজন মুসলমান, আর জমিটিও প্রকৃতপক্ষে আমার, সে মিথ্যা দাবি করেছে। মিয়াজী বললেন, আচ্ছা, তুমি আপিল করে দিও। তুমি জমি ফেরত পেয়ে যাবে।

পরবর্তীতে ঘটনা এমনই হল, প্রথমে মিথ্যা দাবিদারের পক্ষে রায় হয়ে গেল। হাফেজ সাহেব আপিল করলে পুনরায় তার পক্ষে রায় হয়ে গেল এবং তিনিই জমি পেয়ে গেলেন। শাহ সাহেবের অন্তর ক্ষণিকের জন্যেও এটা গ্রহণে প্রস্তুত ছিল না যে, মুসলমান মিথ্যা বলতে পারে।

একবার মিয়াজীর চোখে ব্যথা হল, কোন প্রকার চিকিৎসা ও ঔষধপত্র ব্যবহার করলেন না। ফলাফল এই দাঁড়াল, চোখে যখম হয়ে গেল। কেউ একজন বলল, মিয়াজী! এ রোগে চোখের জ্যোতি নষ্ট হয়ে যায়। একথা শুনে তাঁর পূর্ণ বিশ্বাস হয়ে গেল যে, তিনি অন্ধ হয়ে পড়েছেন। সুতরাং দরজা বন্ধ করে ঘরে বসে রইলেন। কেউ সাক্ষাৎ করতে এলে বলতেন, অমুক সাহেব এসেছিলেন, তিনি বলে গেলেন, এ রোগে চোখের জ্যোতি নষ্ট হয়ে যায়। আমি অন্ধ হয়ে গিয়েছি। হযরত মাওলানা ইয়াকুব সাহেব সংবাদটি জানতে পেরে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন ও চিন্তিত হয়ে পড়লেন এবং ব্যাপারটি বুঝতে পারলেন যে, মিয়াজীর অন্তরে মুসলমান মিথ্যা বলতে পারে না– এ বিশ্বাসের কারণে হয়ত নিজেকে অন্ধ ধারণা করে নিয়েছেন। মাওলানার অবস্থা দেখার জন্য তাঁর বাড়ি গেলেন। জিজ্ঞেস করলেন, মিয়াজী! আপনি কেমন আছেন, আপনার অবস্থা কেমন? মিয়াজী উত্তরে বললেন, আমার তো চোখের জ্যোতি নষ্ট হয়ে গেছে। অমুক সাহেব এসেছিলেন; তিনি বলেছিলেন, এ রোগে নাকি চোখের জ্যোতি নষ্ট হয়ে যায়। তিনি কি মিথ্যা বলতে পারেন?

ইয়াকুব সাহেব ছিলেন অত্যন্ত বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ লোক, ব্যাপারটা বুঝতে পেরে বললেন, মিয়াজী! আমি এমনভাবে পানি পড়া দিতে পারি যে, সে পানি চোখে দেয়ার সাথে সাথে দৃষ্টিশক্তি ফিরে আসবে। এ বলে তিনি পানি পড়ে তাঁর চোখের উপর ছিটিয়ে দিলেন এবং বললেন, হযরত! চোখ খোলেন, দৃষ্টিশক্তি ফিরে এসেছে। প্রকৃতপক্ষে দৃষ্টিশক্তি আদৌ নষ্ট হয়নি; যেমন পূর্বে ছিল এখনও তেমনই রয়েছে। তাই চোখ খোলার সাথে সাথে বলে উঠলেন, আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ তোমাকে উত্তম পুরস্কার দান করুন, আমার দৃষ্টিশক্তি ফিরে এসেছে।

এদিকে আরেক কাণ্ড ঘটে গেল! পরদিন সকালে হযরত মাওলানা ইয়াকুব সাহেবের মসজিদের সামনে অন্ধদের বিরাট সমাগম ঘটে গেল। সবার মুখে মুখে একই কথা– মাওলানা এমনভাবে পানি পড়ে দিতে জানেন যা ব্যবহারে অন্ধের দৃষ্টিশক্তি লাভ হয়। এ কারণে চিকিৎসার জন্য অন্ধরা তথায় ভিড় জমাল। মাওলানা বেরিয়ে এসে বললেন, ভাইসব, আমি শুধু মিয়াজীকে প্রবোধ দেয়ার জন্য একটা ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলাম মাত্র, আমার কাছে কোন প্রকার পানি-দানি নেই।

পবিত্র কুরআনুল কারীমের বরকত

কুরআনুল কারিম নিয়ে মশগুল থাকা একটি বরকতময় কাজ। আল্লাহ তাআলার কিতাবের সাথে সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে স্বয়ং আল্লাহ তাআলার সাথে সম্পর্ক স্থাপিত হয়ে যায়। এজন্যই কুরআন অবতীর্ণ করা হয়েছে যে, মানুষ যেন এর সাহায্যে আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছতে পারে। আর এতে কোন সন্দেহ নেই যে, এ পথ ধরেই কোটি কোটি বান্দা আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছেও গেছেন। কেউ নাজাত লাভ করেছে, কেউ তার মাধ্যমে মর্যাদা বহুগুণ উন্নত করেছেন। কুরআনের সাথে যার যত গভীর সম্পর্ক থাকবে, সে অনুযায়ী তার সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে।

মোটকথা, কুরআনের সংস্পর্শে কোটি কোটি মানুষ সফলকাম হয়েছেন এবং আরো কোটি কোটি মানুষ সফল হবেন। (এবং কিয়ামত পর্যন্ত এ ধারা চলতে থাকবে ইনশা আল্লাহ)।

হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, পবিত্র কুরআন যখন আল্লাহ তাআলার সামনে তার প্রকৃত অবয়ব নিয়ে হাজির হবে, তখন আল্লাহ তাআলা তাকে বলবেন, আজ আমি তোমার কারণে বহু মানুষকে উচ্চ মর্যাদা দিয়ে ধন্য করব এবং তোমারই কারণে বহুজনকে নিকৃষ্টতম গভীর গর্তে নিক্ষেপ করব। যারা তোমার উপর আমল করেছিল, তোমার ইলমে মশগুল ছিল তাদের জন্য আজ রয়েছে উঁচু

মর্যাদা ও উত্তমতর প্রতিদান। আর যারা তোমার থেকে বিমুখ ছিল, দূর থেকে দূরে সরে থাকত, যারা না তোমাকে তিলাওয়াত করেছে, না তোমার উপর আমল করেছে, আজ তারা চরম লাঞ্ছিত ও অধঃপতিত হবে। আজ তারা তোমার থেকে বিমুখ থাকার শাস্তি ভোগ করবে এবং বেইজ্জতি ও অপদস্থতায় নিপতিত হবে।

يضع بها اقوام ويرفع بها اقوام.

আল্লাহ তাআলা এ কুরআনের মাধ্যমে কিছু কিছু সম্প্রদায়কে সমুন্নত মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেন এবং কিছু কিছু সম্প্রদায়কে করেন চরম অপদস্থ।

এ দীর্ঘ আলোচনা দ্বারা কুরআনের সর্বময় ও ব্যাপক কল্যাণের বিষয়টি সুন্দরভাবে প্রমাণিত হয়েছে। আর এর দ্বারা এ কথাও প্রমাণিত হলো যে, যারা কুরআনের শিক্ষক ও শিক্ষার্থী, কুরআনের সাথে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক থাকার কারণে তারাও কল্যাণ ও বরকতের অংশীদার। কুরআনের প্রচার ও প্রসারে অংশগ্রহণকারী ব্যক্তিগণের সংখ্যা যত কমই হোক না কেন, তারাও এ কল্যাণ ও বরকতের সমান অংশীদার। অধিকন্তু কুরআনকে যারা কল্যাণের বাণী বলে স্বীকার করবে তারাও এ কল্যাণের অধিকারী হয়ে যাবে। মোটকথা, কুরআনের সাথে যেকোনভাবেই সম্পর্ক হোক না কেন, এ কুরআন তার সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তিকে কল্যাণ ও বরকত হতে বঞ্চিত রাখবে না। সুতরাং এ কথা মনে করা যাবে না যে, কুরআনের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীগণই সকল কল্যাণ নিয়ে নিয়েছেন, অন্যদের জন্য কিছুই থাকল না। বিষয়টি এমন নয়। শিক্ষক ও শিক্ষার্থী, দৈহিক শ্রম ও আর্থিকভাবে সাহায্যকারী, পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা গ্রহণকারী, তাদের তাদরে খোঁজ-খবর গ্রহণকারী– সকলেই এ কল্যাণ ও বরকতের অন্তর্ভুক্ত। কেউ-ই বঞ্চিত হবেন না।

হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, কোন মজলিসে যখন আল্লাহর যিকির হয়, ইলমেদীনের আলোচনা হয়, তখন ঐ মজলিসকে লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি ফেরেশতা পরিবেষ্টন করে রাখেন। মজলিস শেষে ফেরেশতাগণ যখন আল্লাহ তাআলার দরবারে হাজির হন তখন আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁদেরকে জিজ্ঞেস করা হয়, কোথায় গিয়েছিলে? আল্লাহ তাআলার এ প্রশ্ন অজ্ঞানতার কারণে নয়, কেননা কোন জিনিসই তাঁর ইলম ও জ্ঞানের বাইরে নয়; বরং প্রশ্নটি একটি হিকমত নির্ভর। ফেরেশতাগণ উত্তর করবেন, আমরা আপনার বান্দাদের একটি মজলিসে গিয়েছিলাম। আল্লাহ পুনরায় জানতে চাইবেন, আমার বান্দাগণ ঐ মজলিসে কী করছিল? ফেরেশতাগণ উত্তর দিবেন, তারা আপনার আযাব ও শস্তি

তে ঘুরছিল, আপনার নেয়ামতসমূহের অন্বেষণ করছিল, জান্নাতের আকাঙ্ক্ষা এবং জাহান্নামের আযাব হতে পরিত্রাণ চাচ্ছিল।

আল্লাহ তাআলা জিজ্ঞেস করবেন, যে জান্নাত তারা সন্ধান করছে তা কি তা দেখেছে? তারা যে জাহান্নাম থেকে পানাহ চাচ্ছে তারা কি সে জাহান্নামের আযাব ভোগ করেছে?

ফেরেশতাগণ আরয করবেন, তারা তো এসবের কিছুই দেখেনি। আপনার প্রেরিত পয়গম্বরগণ যা তাদেরকে বলেছেন তারা তার প্রতি ঈমান গ্রহণ করে এবং দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করে এ আগ্রহ ও আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করছে।

আল্লাহ তাআলা বলবেন, হে ফেরেশতাগণ! তোমাদেরকে সাক্ষী রেখে বলছি, ঐ মজলিসে যারা অংশগ্রহণ করেছে তাদের সবাইকে আমি ক্ষমা করে দিলাম। তারা যা প্রার্থনা করেছে তা দিয়ে দিলাম, যে সকল জিনিস থেকে নাজাত চাচ্ছে আমি তাদেরকে তা থেকে নাজাত দিলাম। এসব মজলিসে অংশগ্রহণকারীদের জন্য কত বড় সুসংবাদ!

ফেরেশতাগণ আরয করবেন, হে আল্লাহ! এ মজলিসের সকলেই আপনার যিকিরকারী, আপনার পুরস্কার প্রার্থী এবং আপনার আযাব থেকে মুক্তিকামী ছিল না। কেউ কেউ এমন ছিল, যারা সমাবেশ দেখে শুধু দর্শকরূপে চারপাশে দাঁড়িয়ে ছিল। তাদের সম্বন্ধে আপনার ফয়সালা ও সিদ্ধান্ত কী? আল্লাহ তাআলা বলবেন, তারাও কল্যাণ ও বরকতের মজলিসে অংশগ্রহণ করেছে বলে বিবেচিত হলো এবং তাদেরকেও ঐ সাধারণ ক্ষমার অন্তর্ভুক্ত করা হল। যেহেতু এই মজলিসে এমনসব ব্যক্তিবর্গ অংশগ্রহণ করেছেন যাদের আশেপাশে দাঁড়ানো ব্যক্তিগণও বঞ্চিত থাকতে পারে না, বরং ঐ মহান ব্যক্তিদের খাতিরে তারাও ক্ষমার পর্যায়ে পড়ে যায়।

সুতরাং কুরআন শেখা ও শেখানো খায়র ও বরকতময় বলে তো নির্ধারিত রয়েছেই, এ মজলিসে দর্শক হিসেবে উপস্থিত ব্যক্তিবর্গও ইনশাআল্লাহ কল্যাণ ও বরকত হতে বঞ্চিত হবেন না, যদিও তারা শেখা বা শেখানোর উদ্দেশ্যে এ মজলিসে উপস্থিত হননি। এ হল আল্লাহ তায়ালার এমন প্রশস্ত রহমত যে, আশেপাশে অবস্থানকারীদেরকেও এর মধ্যে গণ্য করা হয়। কত মহান ও কত বরকতময় ঐ সমস্ত মানুষ যারা কুরআনের শিক্ষা দান এবং আল্লাহর বান্দাগণের নিকট কুরআন পৌঁছিয়ে দেয়ার জন্য দিবারাত্র ব্যস্ত আছেন, পরিশ্রম করে চলেছেন। কত সৌভাগ্যবান ঐ সকল শিক্ষার্থী যারা আল্লাহর পবিত্র কালাম শিক্ষায় আন্তরিকভাবে সর্বদা নিমগ্ন রয়েছেন। শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়ই ধন্যবাদ পাওয়ার উপযুক্ত।

আনন্দ প্রকাশের ক্ষেত্র

কুরআন শিক্ষা দানের অনুষ্ঠান উদ্বোধন করা প্রকৃতপক্ষেই অত্যন্তখুশি ও আনন্দের কথা। এ হল এমনই এক আনন্দ প্রকাশের উপলক্ষ্য যে, আমরা যতই আনন্দ করি না কেন, তা অত্যন্ত কমই হবে। কেননা খুশি প্রকাশের জন্য মানুষের দুটি মাত্র ক্ষেত্র রয়েছে। প্রথম– যখন কোন কাজের সূচনা ও উদ্বোধন করা হয়, দ্বিতীয়– যখন শুরু করা কাজটি শেষ প্রান্তে উপনীত হয় এবং উদ্দেশ্যে সফলতা আসে। আপনি যখন কোন শিশুকে মক্তবে পড়তে দেন তখন আনন্দিত হয়ে মিষ্টি বিতরণ করেন। তা এজন্য করেন যে, জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ ও কল্যাণময় উদ্দেশ্যের সূচনা হচ্ছে। এ শিশুটি যখন আলেম-ফাযেল হয়ে উদ্দেশ্যকে পূর্ণ করে তোলে তখনও আনন্দ উদযাপন করা হয়। জলসার আয়োজন করা হয়, মিষ্টি বিতরণ করা হয়। কেউ যখন কোন বাগান করে তখন সে আনন্দিত হয়, আবার যখন ঐ বাগানে ফল আসে তখনও সে আনন্দিত হয়।

আনন্দের দ্বিতীয় ক্ষেত্র

আনন্দ ও খুশির দুটি ক্ষেত্র রয়েছে– সূচনা ও পূর্ণতা। যখন কোন শিশু জন্মগ্রহণ করে তখন আনন্দ উৎসব করা হয়, লোকজনকে দাওয়াত করা হয়, অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। আবার যখন তার মৃত্যু হয়, আমার মতে সেটিও একটি খুশির দিন। কারণ, সে আল্লাহ তাআলার দেয়া জীবনকে তাঁরই প্রদর্শিত পথে অতিবাহিত করেছে এবং এ পরীক্ষায় সে সাফল্যের সাথে উত্তীর্ণ হয়েছে।

কবি বলেন–

چوں مرگ آید تبسم بر لب اوست

যখন মৃত্যুর আগমন ঘটল তখন তার মুখে ছিল মুচকি হাসি।

মুমিন ব্যক্তির জন্য আনন্দের বিষয় হল এই যে, সে তার ঈমানকে রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছে। সুতরাং মৃত্যু দুঃখ-শোকের বিষয় নয়; আনন্দের ক্ষেত্র।

আপনি হয়ত বলতে পারেন, মানুষ তো শোকসন্তপ্ত হয়ে পড়ে, কান্নাকাটি করে, কাউকে তো আনন্দিত হতে দেখা যায় না। আমি বলি যে, তার মৃত্যুর কারণে মানুষ কান্নাকাটি করে না, বিচ্ছেদের কারণে করে কিংবা তার দ্বারা উপকৃত হওয়া থেকে বঞ্চিত হয়ে যাওয়ার কারণে করে। মৃত্যুর উপর মানুষ খুশি হয় বলেই তো তারা বলে থাকে– 'হে আল্লাহ! অমুকের মৃত্যুর মত আমাকেও মৃত্যু নসীব কর'। মৃত্যুর উপর ব্যথিত হলে কান্নাকাটি করত, তার আকাঙ্ক্ষা করত না। মাবুদ ও প্রিয়জনের সাক্ষাৎ লাভে কি কেউ কাঁদে? মৃত্যু তো আমাদেরকে

আল্লাহ তাআলার সান্নিধ্যে পৌঁছে দেয়; এটা শোকের বিষয় কি করে হয়? মোটকথা সন্তানের জন্মগ্রহণও আনন্দের বিষয় এবং দুনিয়া ত্যাগ করে চলে যাওয়াও খুশির বিষয়।

হাদীস শরীফ মৃত্যুকে মুমিনের জন্য উপহার বলা হয়েছে–

اَلْمَوْتُ تُحْفَةُ الْمُؤْمِنِ

আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে মানুষের জন্য সর্বোত্তম উপহার হলো মৃত্যু।

সুতরাং উপহার পেয়ে কেউ কি কাঁদে? উপহার প্রাপ্তিতে তো আনন্দ-উল্লাস করা হয়। মৃত্যু কি করে উপহার হল? এ প্রসঙ্গে অপর এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে–

إِنَّ الْمَوْتَ جِسْرٌ يُوْصِلُ الْحَبِيْبُ إِلَى الْحَبِيْبِ

মৃত্যু হল একটি ম্যবর্তী সেতু, যা বন্ধুকে বন্ধুর নিকট পৌঁছে দেয়।

সুতরাং যা বন্ধুর সাথে মিলনের মাধ্যম তা বেদনার কারণ হয় কিভাবে? বন্ধু-প্রিয়জনের সাথে সাক্ষাৎ কি বিলাপ ও মাতমের বিষয়? যে বিষয়টি প্রিয়জনের সাথ মিলন ঘটিয়ে দেয় তা তো ভালবাসার যোগ্য, উপহারের বিষয়। এজন্য মানুষ প্রকৃতপক্ষে এতে সন্তুষ্ট হয়, আনন্দিত হয়। তাই তো বলে, অমুক ব্যক্তি উত্তম সুন্দর জীবন যাপন করেছে, আল্লাহর শুকরিয়া যে ঈমানের সাথে তার মৃত্যু হয়েছে। দুঃখ প্রকাশ ও অশ্রু বিসর্জন করা হয় শুধু বিচ্ছেদ ব্যথার জন্য। প্রিয় ব্যক্তিটি আজ আমাদের থেকে দূরে সরে গেল, তার দ্বারা আমরা বিভিন্নভাবে উপকৃত হতাম, সে পথ বন্ধ হয়ে গেল। আমরা বঞ্চিত হয়ে গেলাম। নিজের স্বার্থের কারণে কান্না তো নিছক স্বার্থপরতা, মৃত্যুর হন্য কান্না নয়।

যাই হোক, জন্ম ও মৃত্যু উভয়ই আনন্দ প্রকাশের ক্ষেত্র। পবিত্র কুরআন শিক্ষার সূচনাও আনন্দেরই বিষয় আর যখন শিক্ষা সমাপ্ত হবে, হাফেয ও আলেম হয়ে যাবে তাও খুশি ও আনন্দের বিয়ষ। তবে পার্থক্য এই যে, সূচনালগ্নের আনন্দ হলো আশার উপর ভিত্তিশীল। কেননা সূচনাকালে এ আশা পোষণ করা হয় যে, ছেলেটি পড়াশোনা করবে, আলেম হবে, হাফেয হবে, কিন্তু তা নাও হতে পারে। কাজেই প্রাথমিক আনন্দ আশার ওপরই নির্ভরশীল। আর শিক্ষা সমাপ্তিকালে যে আনন্দ করা হয়, তা হয়ে থাকে পূর্ণতা ও সফলতার উপর। প্রথমে যে আশা পোষণ করা হয়েছিল তা পূরণ হয়েছে। সন্তানের জন্ম উপলক্ষ্যে যে উৎসব করা হয়, আনন্দ প্রকাশ করা হয় তাও আশার নির্ভর। সন্তানটি লালিতপালিত হবে, জোয়ান হবে, আলেম হবে, কারিগর হবে, শিল্পী হবে, ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার হবে–

এ সবই তো আশা। যখন সন্তানটি আশানুরূপ জীবনযাপন করে, নিরাপদ ঈমান নিয়ে মৃত্যুর ঘাট পার হয়ে যায় তখনও মানুষ খুশি-ই হয়। তবে জীবনভরের সান্নিধ্য ছিন্ন হয়ে যাওয়ার কারণে মানুষ শোকাতর হয়, কান্নাকাটি করে। তবে এসব কান্না মৃত্যুর কারণে নয়; মৃত্যু তো আল্লাহ্ পর্যন্ত পৌঁছে যাওয়ার মাধ্যম। এজন্যই এটা তো আনন্দিত হওয়ার বিষয়।

ওলীর নিদর্শন

মৃত্যু খুশির বিষয় হওয়া ছাড়াও ওলী হওয়ার লক্ষণ। কেননা, অন্তরে মৃত্যুর প্রতি ভালবাসা ওলী হওয়ার আলামত। এ কারণেই যখন ইহুদীগণ দাবি করল, আমরা আল্লাহর প্রিয়জন, তখন কুরআন তাদের কাছে এ দাবি উত্থাপন করল যে, তোমরা যদি তোমাদের দাবিতে সত্যবাদী হও, অন্যদের তুলনায় আল্লাহ্ তাআলার অধিক প্রিয়জন হও তবে মৃত্যুর জন্য আকাঙ্ক্ষা করে স্বীয় দাবির সত্যতা প্রমাণ কর। পবিত্র কুরআন ঘোষণা করেছে–

قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ هَادُوْا إِنْ زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلّٰهِ مِنْ دُوْنِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ○

বলুন, হে ইহুদীগণ! যদি তোমরা দাবী কর যে, তোমরাই আল্লাহর বন্ধু– অন্য কোন মানব নয়, তবে তোমরা মৃত্যু কামনা কর যদি তোমরা সত্যবাদী হও। [জুমুআ : ৬]

বোঝা গেল, মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষা করা ওলী হওয়ার নিদর্শ। সুস্পষ্ট কথা যে, বেলায়েত (আল্লাহর নৈকট্য বা ওলিত্ব) যদি বিদ্যমান থাকে, তবে (পরীক্ষাকালীন সময়ে) মৃত্যুকে ভয় করার কোন কারণ থাকতে পারে না।

হাদীস শরীফে দুআ হিসেবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর একটি ইরশাদ পাওয়া যায়–

اللهم حبب الموتَ إلى الذى يعلم انى رسول الله.

হে আল্লাহ! আমার রেসালাতকে যে ব্যক্তি মেনে নেয় এবং তা স্বীকার করে তার অন্তরে মৃত্যুকে প্রিয় করে দাও।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দুআর মধ্যে মৃত্যুর প্রতি ভালবাসা ও আকাঙ্ক্ষার কথা বলা হয়েছে। এ দ্বারা ছাত্রসুলভ একটি প্রশ্ন প্রশ্ন আপনার মনে উদিত হতে পারে যে, অন্য হাদীসে মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষাকে নিষেধ করা হয়েছে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

لايتمنين احدكم الموت.

তোমাদের কেউ যেন মৃত্যু-কামনা না করে।

কোন কোন সাহাবী থেকে বর্ণিত হয়েছে–

إنا نكره الموت.

আমরা মৃত্যুকে অপছন্দ করি।

সুতরাং এ কেমন কথা হল যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আকাঙ্ক্ষাও করেছেন, দুআও করেছেন, আবার নিষেধও করেছেন।

এ সন্দেহের উত্তর হলো এই, এখানে দুটি জিনিস পৃথক পৃথক রয়েছে। প্রথম হল পার্থিব আপদ-বিপদ, দুঃখ-কষ্টের কারণে ভীত শংকিত হয়ে মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষা কর না, এমন নিষিদ্ধ। কিন্তু যার অন্তরে আল্লাহ তাআলার প্রেম-ভালবাসা রয়েছে, তাঁর সাক্ষাৎ লাভের আকাঙ্ক্ষা ও বাসনা রয়েছে তার জন্য মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষা করা দূষণীয় নয় বরং কাঙ্ক্ষিত ও পছন্দনীয়। বিষয় দুটো হল পৃথক পৃথক; তাই হাদীসেরও এ বিষয়টি পৃথক পৃথক বলা হয়েছে। সুতরাং এগুলোর মধ্যে পারস্পরিক বিরোধ নেই। মোটকথা, সন্তানের জন্ম যেমন আনন্দের বিষয়, তেমনি তার মৃত্যুও আনন্দের জিনিস।

আনন্দ অনুষ্ঠান

সুতরাং আজ যারা কুরআন শিক্ষার সূচনা করল তাদের জন্য এর চেয়ে অধিক আনন্দের বিষয় আর কী হবে, এর চেয়ে অধিক আনন্দানুষ্ঠান আর কী হতে পারে? আমাদের বুযর্গগণের উৎসব অনুষ্ঠানের যে নীতি ছিল, কোন্ অনুষ্ঠানটি তাঁদের দৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ছিল তার অনুমান এ ঘটনা দ্বারা করা যেতে পারে। আমার সম্মানিত দাদা হযরত মাওলানা কাসেম নানুতবী রহ. তাঁর মেয়ের বিয়ের অনুষ্ঠান এভাবে করেছিলেন যে, মসজিদে চুপি চুপি নিজেই বিয়ে পড়িয়ে দিয়েছিলেন এবং বরকে সঙ্গে করে বাড়িতে নিয়ে এসে বললেন, ইনি তোমার স্ত্রী। তাকে বাড়িতে নিয়ে যাও। ঘরের অন্যান্য সদস্যদের এ বিষয়ে কিছুই জানা ছিল না, সবাই পেরেশান হয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু আমার সম্মানিত পিতা বলতেন যে, আমি যখন কুরআন শরীফ হিফয শেষ করলাম, তখন অত্যন্ত ধুমধাম করে দাওয়াতের আয়োজন করলেন। পানাহার শেষে সবাই যখন চলে

গেলেন, তখন একাকী আমাকে ডেকে বললেন, মিয়া আহমদ! তুমি হাফেয হয়েছ, তোমার সম্মানও বৃদ্ধি হল, দাওয়াতও করা হল কিন্তু দ্বিতীয়বার এরূপ আর কিছু করা হবে না। এসবই আমি তোমার জন্য করলাম, কিন্তু তোমাকে কুরআন শিখিয়েছি আমার নিজের জন্য (যাতে পরকালে তা আমার উপকারে আসে)। এজন্য আমার পিতা রহ.-এর অভ্যাস এই ছিল যে, প্রতিদিন তার পিতার উদ্দেশ্যে দুই পারা কুরআন তিলাওয়াত করতেন।

মোটকথা, কুরআন শিক্ষার সূচনাও বরকতময় এবং সমাপ্তিও বরকতময়। আজ এর উদ্বোধনের দিন। এর চেয়ে মহৎ কোন অনুষ্ঠান আর হতে পারে না। এর চেয়ে অধিক আনন্দের বিষয়ও আর হতে পারে না। বিয়েশাদি ও জন্মদিন উপলক্ষ্যেও উৎসব হয়ে থাকে কিন্তু প্রকৃত আনন্দ উৎসব হচ্ছে কুরআনের সূচনার উৎসব। যার সূচনাও বরকতময়, সমাপ্তিও বরকত। এমন উৎসবে মোবারকবাদ প্রদান করাও বরকতময়। তাই আমার উপস্থিতিও আপনাদেরকে মোবারকবাদ দেয়ার জন্য। আপনারা একটি অতি উত্তম কাজের উদ্বোধন করছেন। আল্লাহ তাআলা তাঁর সমাপ্তিকেও সূচনার মত কল্যাণকর করুন।

দুআ করুন, আল্লাহ তাআলা যেন দুনিয়াতেও এর বরকতের অংশ আমাদেরকে দান করেন এবং পরকালেও দান করেন। আমীন!

اللهم أنس وحشتنا فى قبورنا ــ اللهم ارحمنا بالقران العظيم واجعله لنا إمامًا ونورًا وهدى ورحمة ــ اللهم ذكّرنا منه ما نسينا وعلّمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته اناء الليل واناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.

اللهم اجعل القران رضاء قلبى وجلاء حزنى، فاغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فى امرنا، وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين، غير خزايا ولا مفتونين. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد واله واصحابه اجمعين، برحمتك يا ارحم الراحمين.

বয়ান : ২

রহমাতুল্লিল আলামীন
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

এক হাদীসে জনাব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– انا رحمة مهداة 'আমি আল্লাহর পক্ষ হতে মানুষের জন্য উপহারস্বরূপ প্রেরিত এক বিশেষ রহমত।' আল্লাহ তাআলার যে উপহারটি মানব জাতি লাভ করেছে তা হল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বরকতময় সত্তা। এমন মহান নেয়ামত দান করা হয়েছে যে, বিশ্বজগতের যত নেয়ামত রয়েছে সবই তাঁর উসিলায় পাওয়া যাচ্ছে। আমাদের জীবন একটি নেয়ামত, যা তাঁরই তোফায়েছে পেয়েছি।

– হযরত হাকীমুল ইসলাম রহ.





اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُه وَنَسْتَعِيْنُه وَنَسْتَغْفِرُه وَنُؤْمِنُ بِه وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّاٰتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَّهْدِه اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَه، وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلا هَادِىَ لَه، وَنَشْهَدُ أَنْ لاَّ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَه لاَ شَرِيْكَ لَه، وَنَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَمَوْلاَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُه وَرَسُوْلُه، أَرْسَلَهُ اللهُ إِلىٰ كَافَّـةً لِّلنَّاسِ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا وَّدَاعِيًا إِلَيْهِ بِإِذْنِه وَسِرَاجًا مُّنِـيْرًا.

أَمَّـابَعْدُ:

فَاَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ○ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ○ وَمَا أَرْسَلْنٰكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ○

নেয়ামতের প্রকারসমূহ

বুযুর্গানে মুহতারাম!

পৃথিবীতে আল্লাহ তাআলার নেয়ামতরাজি এ পর্যায়ের যে, এগুলো গণনা করা ও সংখ্যা নিরুপণ করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। আল্লাহর রহমত ও করুণার বৃষ্টি সর্বদা বর্ষিত হচ্ছে। আপনি যদি বৃষ্টির ফোঁটা গণনা করতে উদ্যোগী হন তবে বিশ্বের সকল মানুষ সম্মিলিতভাবেও যদি আকাশ থেকে বর্ষিত বৃষ্টির ফোঁটা গণনা করতে চেষ্টা করে তবু তা সম্ভব হবে না। এ কাজ আপনার শক্তি ও সামর্থ্যের আওতাধীন বিষয় নয়। এর চেয়ে বহু অধিক পরিমানে আল্লাহর রহমতের বৃষ্টি পৃথিবীতে বর্ষিত হচ্ছে। সে রহমতের সংখ্যা হিসাব করার সামর্থ্য কোন মানুষের নেই। এজন্যই কুরআনুল কারীম দাবী করেছে–

وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللهِ لَا تُحْصُوهَا.

তোমরা যদি আল্লাহ তাআলার নেয়ামতরাজিকে গণনা করতে শুরু কর, তবে তোমরা কখনই তা হিসাব করে শেষ করতে পারবে না। [ইবরাহীম : ৩৪]

আকাশের তরকারাজি গণনা করা কিংবা বৃষ্টির ফোঁটাসমূহ গণনা করা সম্ভব হলেও হতে পারে, কিন্তু আল্লাহর রহমতসমূহের হিসাব করা সম্পূর্ণ অসম্ভাব্য পর্যায়ের বিষয়। তবে যতদূর দেখা যায়, নেয়ামতগুলোকে মৌলিকভাবে আমরা দুই ভাগে ভাগ করতে পারি। এরপর এ প্রত্যেক প্রকার নেয়ামতের মধ্যে যদিও কোটি কোটি ও অসীম অগণিত নেয়ামত রয়েছে; কিন্তু প্রকার মাত্র দুটি। একটি হল জাহেরী বা দৃশ্যমান নেয়ামত আরেকটি হল বাতেনী বা অদৃশ্য নেয়ামত। প্রথম প্রকারের নেয়ামতরাজি আমরা চোখ দ্বারা দেখতে পাই, আমাদের দেহও তা অনুভব করতে পারে। আর দ্বিতীয় প্রকারের নেয়ামতরাজি চোখের দৃষ্টিতে পরিদৃষ্ট হয় না এবং বাহ্যিকভাবে শরীরের সাথেও এর কোন সংযোগ-সম্পর্ক নেই; কিন্তু তা এক বিস্ময়কর নেয়মত, মানুষ যাকে হৃদয়ে অনুভব করে এবং অন্তরে সংরক্ষণ করে। নেয়ামত হিসেবে সূর্যও আল্লাহর এক নেয়ামত, তার থেকে যে আলো বিচ্ছুরিত হয় তাও আল্লাহর এক নেয়মাত। এ নেয়ামত না হলে আমরা কোন কাজকর্ম করতে পারতাম না। সূর্য হতে যে তাপ উৎপন্ন হয় তা আল্লাহর এক নেয়ামত, যা না থাকলে মানুষ জীবিত থাকতে পারত না। লক্ষ প্রকারের আহার্য আল্লাহ মানুষকে দিয়েছেন, খাবার তৈরির প্রণালি ও পন্থা শিখিয়ে দিয়েছেন, যা দ্বারা মানুষ রকমারি খাবার তৈরি করছে; এটিও একটি বিরাট নেয়ামত। পোশাক-পরিচ্ছদ একটি স্বতন্ত্র নেয়ামত, গৃহ-বাসস্থান একটি স্বতন্ত্র নেয়ামত। মোটকথা চাষাবাদ, বাগ-বাগিচা, আহার-বিহার, জীবনোপকরণের নানা বিষয়– সবকিছুই আল্লাহর নেয়ামত এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ নেয়ামত। এগুলোর প্রত্যেকটির মধ্যে আবার এত শ্রেণীবিভাগ রয়েছে যে, যদি শ্রেণীগুলোকে মানুষ গণনা করতে ইচ্ছা করে তবে তাও করতে পারবে না, পারা সম্ভবও নয়। কিন্তু মানুষ এগুলো দ্বারা সর্বদা উপকৃত হচ্ছে। ফলমূল শুধু একটি নেয়ামতই নয়; বরং নেয়ামতের এক অফুরন্ত ভাণ্ডার। ফলের মধ্যেও আবার শত-সহস্র প্রকার ও শ্রেণী রয়েছে। শস্যাদির প্রতি লক্ষ্য করুন, শত-সহস্র প্রকার শস্য রয়েছে– কোন দেশে চাল, কোন দেশে গম, কোথাও ছোলা, কোথাও যব-ভুট্টা প্রভৃতি। মোটকথা, পানাহার, বসবাস ও ব্যবহারের জন্য অগণিত নেয়ামত রয়েছে। এসবই হল ঐ প্রকারের নেয়ামত যা আমরা চোখ

দিয়ে দেখতে পাই, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দিয়ে স্পর্শ করতে পারি এবং আমাদের দেহও তা অনুভব করতে পারে। এগুলোকে জাহেরী নেয়ামত বা ইন্দ্রিয়ানুভূত নেয়ামত বলা হবে।

আরেকটি প্রকার রয়েছে বাতেনী বা অদৃশ্য নেয়ামতের, যা অন্তর অনুভব অনুভব করতে পারে, চোখ দিয়ে দেখা যায় না। যেমন ইলম ও আল্লাহর মারেফাত। অন্তরে ইলম প্রবেশ করা এমন কোন বস্তু নয় যে, মানুস তাকে ধরে পটেকে রেখে দিল। ইলম জাহেরী বিষয় নয়। দেহের সাথে তার কোন সংযোগ নেই। ইলম অন্তর থেকে অন্তরে বিচরণ করে। মানুষ তাকে নেয়ামত বলে জানে কিন্তু চোখে দৃশ্যমান হয় না। তদ্রূপ আল্লাহর ভালবাসা একটি মহান নেয়ামত। নিজ পরওয়ারদেগারের সাথে ভালবাসা না থাকলে ঈমানই নসিব হয় না। কিন্তু ভালবাসা চোখ দিয়ে দেখার মত কোন জিনিস নয়, অন্তরে রাখার জিনিস। ঈমান একটি স্বতন্ত্র নেয়ামত। কিন্তু তা চোখে দেখার মত জিনিস নয়। ইসলাম চোখ দিয়ে দেখা সম্ভব। কেননা বাহ্যিক আমলের নাম ইসলাম। নামায, রোযা, হজ, যাকাত প্রভৃতি আমলকারীকে দেখে মানুষ বুঝতে পারে যে, সে এই আমলটি করছে। সুতরাং ইসলাম হল একটি জাহেরী নেয়ামত। যা কাজরূপে শরীরের উপর প্রকাশ পায়। কিন্তু ঈমান অন্তরে লুকায়িত থাকে, মানুষ তাকে চোখ দিয়ে দেখতে পারে না কিন্তু প্রত্যেক অন্তর জানে যে, তাতে ঈমান রয়েছে। সুতরাং ঈমান একটি নেয়ামত, আল্লাহর প্রতি মহব্বত একটি নেয়ামত। জনাব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি ভালবাসা একটি মহান নেয়ামত, ঈমানের ভিত্তি। যদি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সত্তার সাথে ভালবাসা না থাকে তাহলে ঈমানই নসিব হয় না।

নেয়ামতের মাধ্যমে নয়, মুসিবতের মাধ্যমে ভালবাসার পরীক্ষা

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি ভালবাসা ঈমানের ভিত্তি। এজন্যই জনাব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন–

لايؤمنُ أحدكم حتى اكونَ أحب إليه من ولده ووالده والناس اجمعين.

যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা স্বীয় পিতামাতা, সন্তান সন্ততি ও পুরো মানব জাতি অপেক্ষা আমাকে অধিক ভাল না বাসবে তক্ষণ পর্যন্ত তোমরা মুমিন হতে পারবে না।

এ ভালবাসা কখন প্রকাশ পায়? যখন আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ভালবাসার সাথে অন্য ভালবাসার সংঘাত ঘটে। কোন ব্যক্তি শুয়ে রয়েছে, মিষ্টি মধুর ঘুম আসছে, এ ঘুমের প্রতি ভালবাসা তাকে উঠতে নিষেধ করছে। ওদিকে আযান হচ্ছে– 'মজিদে এসো' তখনই পরীক্ষা হবে, নফসের সাথে বেশি ভালবাসা না কি আল্লাহর সাথে? যদি লেপ-কম্বলকে ছুড়ে ফেলে দেয়, শীত-গ্রীষ্মের পরোয়া না করে অজু করে মসজিদে হাজির হয়, তাহলে সে নিজের নফসকে ছেড়ে দিয়ে খোদাকে গ্রহণ করল। এমনিভাবে আল্লাহর পথে যাওয়ার সময় সন্তানের ভালবাসার বাধা বিরত রাখতে চায়। এও এক ভালবাসার পরীক্ষা। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ভালবাসার দাবী হল চলে যাওয়া। যদি চলে যায় তবে সে ভালবাসায় কামিয়াব, আল্লাহ ও রাসূলের ভালবাসা সন্তানের ভালবাসার উপর প্রাধান্য পেয়েছে।

যেমন আল্লাহর রাসূল পবিত্র মদীনা হিজরত করলেন, সাহাবায়ে কেরামের ঘর বাড়ি, সন্তান সন্ততি মক্কাতেই ছিল, জায়গ জমি মক্কায় ছিল, প্রিয়জন ও নিকটজনরা মক্কায় ছিল। সবকিছু ছেড়ে দিয়ে আল্লাহর রাসূলের সাথে রওয়ানা হলেন। না জায়গা জমির পরোয়া করলেন, না সন্তান বা ঘর বাড়ির পরোয়া করলেন। একে বলা হবে ভালবাসায় কামিয়াব হয়ে যাওয়া, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া। যখন আল্লাহ ও রাসূলের ভালবাসার বিপরীতে সন্তান ও বাড়ি ঘরের ভালবাসার সাংঘাত তৈরি হল, তাঁরা সন্তান ও বাড়ি ঘর ছেড়ে দিয়ে আল্লাহ ও রাসূলের পথ গ্রহণ করলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী 'যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা স্বীয় পিতা মাতা, সন্তান সন্ততি ও সমগ্র মানব জাতি অপেক্ষা আমাকে ভাল না বাসবে ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা পূর্ণ মুমিন হতে পারবে না'–এর দ্বারা উদ্দেশ্য ঐ ভালবাসা যা বিপরীতমুখী ভালবাসার সাথে সংঘাতের সময় প্রাধান্য পাবে। অন্যথায় সকলেই তো আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি ভালবাসা থাকার দাবী করে। কিন্তু দুনিয়ার ভালবাসার সাথে আল্লাহ ও রাসূলের ভালবাসার মুখোমুখি অবস্থানকালে প্রকৃত ভালবাসার পরিচয় পাওয়া যাবে।

হযরত উমর রা. আরয করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার সাথে আমার মুহাব্বত রয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, কী বলছ ভেবেচিন্তে বল। তিনি আরয করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার সাথে আমার মুহাব্বাত রয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, দেখ! তুমি কিন্তু খুব বড় কিছু দাবি করছ। কী বলছ চিন্তা করে বলো। তিনি পুনরায় আরয করলেন, আপনার সাথে আমার ভালবাসা রয়েছে। রাসূল সা. বললেন, যদি ভালবাসা থেকে থাকে তবে দারিদ্র্য ও অনাহার, অভাব মসিবতের জন্য

তৈরি হয়ে যাও। অর্থাৎ এসব অবস্থায় যদি এ ভালবাসা বিদ্যমান থাকে, তবেই কেবল এ দাবি সত্য বলে প্রমাণিত হবে যে, প্রকৃতই আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে ভালবাসা রয়েছে। আরাম আয়েশের মধ্যে থেকে সকলেই বলে থকে যে, হে আল্লাহ! তুমি আমার রব এবং আমি তোমার বান্দা। কিন্তু সবকিছু ছিনিয়ে নেয়ার পরও যদি এ কথা বলে যে, হে আল্লাহ! আপনি আমার রব এবং আমি আপনার বান্দা– তখনই কেবল বলা যাবে যে, ইনিই আল্লাহর সত্যবাদী বান্দা। নেয়ামতের মধ্যে থেকে বন্দেগীর ঘোষণা করা সহজ কাজ। মুসিবতের মধ্যে থেকে ভালবাসা ও বন্দেগীর ঘোষণা করা অত্যন্ত কঠিন কাজ। আর এটাই হল পরীক্ষার ক্ষেত্র। কোন এক কবি বলেছেন–

دلا اندر جہاں یاراں سہ قسم اند زبانی اند ونانی اند وجانی

জেনে রেখ হে মন! পৃথিবীতে তিন ধরণের বন্ধু রয়েছে–
মৌখিক বন্ধু, রুটির বন্ধু, প্রাণের বন্ধু।

অর্থাৎ মানুষ যখন বন্ধুত্বের দাবি করে তখন তাকে পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হয় যে, বন্ধুত্বের দাবিতে সে সত্যবাদী কি না? তাই কবি বলেছেন যে, বন্ধুত্ব তিন ধরণের। এক– মৌখিক, যা মৌখিক জমাখরচ মাত্র। তখন শুধু মুখে দাবি করা হয় যে, আমি তোমার বন্ধু, আমি তোমার মঙ্গল প্রার্থী। দুই– রুটির বন্ধু। অর্থাৎ যতদিন দস্তারখানে সুস্বাদু খাবার মিলতে থাকবে, আমি তোমার বন্ধু। খানা বন্ধ হয়ে গেলে কিসের বন্ধুত্ব! কোথায় তুমি আর কোথায় আমি? ব্যাস, বন্ধুত্ব খতম। তিন– প্রাণের বন্ধু। যে বন্ধু সুখের দিনে যেমন সদা সঙ্গী হয়ে থাকে দুঃখের দিনেও তেমনি বন্ধুর মুসিবতকে প্রথমে নিজে মাথা পেতে নেয়। একেই বলা হয় প্রাণের বন্ধু। উক্ত কবি বলেন, এ তিন ধনের বন্ধুর প্রত্যেকেরই মত ও পথ ভিন্ন ভিন্ন। তাই তাদের সম্পর্কে কবি বলেন–

بنانی ناں بدہ از دربدر کن تلطف کن بیاران زبانی

ولیکن یار جانی را بدست آر مدارا تش بیگری تا توانی

উক্ত কবিতায় কবি যা বলেছেন তার মর্ম হল এই– মৌখিক বন্ধু সম্পর্কে বলেছেন, যারা ভাত-রুটি বা স্বার্থের বন্ধু তাদেরকে কিছু পানাহার করিয়ে বিদায় দিয়ে দাও, এদেরকে বন্ধু মনে কর না। তারা এসেছিল, খানা-দানা পেয়েছে, ব্যাস, এই যথেষ্ঠ। যারা মৌখিকভাবে বলে যে, আমি তোমার বন্ধু, আপনিও মৌখিকভাবে বলে দিন– অনেক শুকরিয়া, আমিও তোমার বন্ধু। প্রকৃত অর্থে সেও আপনার বন্ধু নয় আর আপনিও তার বন্ধু নন। সে মৌখিকভাবে আপনাকে

খুশি করতে চায়, আপনিও মৌখিকভাবে তাকে খুশি করে দিন। কিন্তু তাদের উপর ভরসা করবেন না, তারা প্রকৃত বন্ধু নয়।

এ বন্ধুত্ব কোন একজন কবির ঘটনার মত। সে কবি একজন আমীরের কাছে গিয়েছিলেন। আমীরের অনেক প্রশংসা ও গুণকীর্তন করে তিনি একটি কবিতা রচনা করেন। কবিতা রচনার ক্ষেত্রে সাধারণত কবিগণ সত্য কথা কমই বলে থাকেন, অতিরঞ্জনই ততে বেশি থাকে। অবাস্তব কথাবার্তা যে কবিতায় বেশি সেটিই উন্নত কবিতা বলে বিবেচিত হয়। সাদাসিধাভাবে কোন কোন বিষয় বলে তাতে মানুষ খুশি হয়, তাকে পছন্দ করে না। তাই অতিশয়োক্তি এবং সীমা বহির্ভূত কথাবার্তাই হয় অধিক। কবি বন্ধুগণ নারাজ হবেন না, কখনো কখনো আমিও কবিতা লিখে থাকি। আমাকেও অতিরঞ্জন বা মিথ্যার আশ্রয় নিতে হয়। তো কবিতা বলাই হয় ঐ জিনিসকে যাতে মানুষ সত্য কম বলে এবং মিথ্যা অধিক বলে। যাই হোক, ঐ কবি কবিতা রচনা করলেন এবং ইরান-তুরানকে একাকার করে ফেললেন। আপনার রাজত্ব তো এমন যে, সিংহাসনের পায়াগুলি আকাশে অবস্থিত। আপনার রূপলাবণ্যের নিকট চাঁদও লজ্জা বোধ করে, তারকারাজিও লজ্জায় মাথা নত করে– এই ভেবে যে, এমন রূপলাবণ্য আমাদের নসিব হয়নি। তিনি কবিতা আবৃত্তি শেষ করার পর আমীর সাহেব বললেন, পরশুদিন আসবেন, আপনাকে দু'হাজার টাকা পুরস্কার দেব। তিনি অত্যন্ত খুশি হয়ে বাড়ি ফিরলেন। যেহেতু একজন আমির ওয়াদা করেছেন, তিনি তা অবশ্যই পূরণ করবেন। কাজেই এখান থেকে বের হয়ে পাঁচশত টাকা ধার করলেন এবং উন্নত মানের একটি শেরওয়ানী বানালেন। বাড়িতে গিয়ে মুরগী-খাসি রান্নার আয়োজন করা হল। পরশু যেহেতু দু'হাজার টাকা পাওয়া যাচ্ছে, সেহেতু পাঁচশত টাকার ঋণ শোধ করে দেয়া যাবে। দু'হাজার থেকে আরো বেঁচে যাবে। এটা একটা বেশ বড় অংকের টাকা। কাজেই বেশ আনন্দ-ফুর্তি করলেন। নির্ধারিত তারিখে আমীরের দরবারে গিয়ে উপস্থিত হলেন। আমীর দরবারেই ছিলেন। তিনি গিয়ে সালাম করলেন। কিন্তু আমীর সাহেব সালামের জবাব দিলেন না; এমনকি মাথা তুলে দেখলেনও না। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন। অতঃপর গলা পরিস্কার করে বললেন, হুযুর! আমি এসেছি। আমীর বললেন, আপনি কে? তিনি বললেন, আমি ঐ কবি, যে আপনার প্রশংসায় কবিতা রচনা করে পেশ করেছিলাম এবং আপনি বলেছিলেন, পরশু দিন আসবেন, দু'হাজার টাকা দেব। আমীর সাহেব বললেন, তুমি দেখছি অত্যন্ত বোকা। তুমি আমাকে যে বাক্য ব্যয়ে খুশি করেছিলে যেগুলোর কোন অর্থ ছিল না, বাস্তবতা ছিল না। আমিও শব্দ দ্বারা তোমাকে খুশি করেছি, বাস্তবে এর কোন গুরুত্ব নেই। কবিতারও কোন বাস্তব অর্থ ছিল না, ওয়াদারও কোন বস্তব অর্থ নেই।

মূল কথা হলো, যাদের বন্ধুত্ব শুধুই মৌখিক বিষয়, আপনিও তাদেরকে মৌখিক বন্ধুত্ব দেবেন। কিন্তু প্রকৃত হল বন্ধু ঐ ব্যক্তি যে বিপদে বন্ধুর পাশে থাকে এবং সহযোগিতা করে। শেখ সাদী বলেন–

دوست آں باشد کہ گیرد دست دوست در پریشاں حالی و درماندگی

প্রকৃত বন্ধু ঐ ব্যক্তি যে বিপদের সময় বন্ধুর হাত ধরে।

কিন্তু হাত ধরার মানে এই নয় যে, হাত ধরে তাকে আরো বেশি বিপদে ফেলা। জনৈক ব্যক্তি যেমন করেছিল। তার একজন বন্ধু ছিল। ঘটনাক্রমে শত্রুগণ ঐ ব্যক্তির বন্ধুকে ঘেরাও করে মারধর করতে লাগল। বন্ধু দৌড়ে গিয়ে আপন বন্ধুর হাত ধরল। এতক্ষণ সে শত্রুদের আক্রমণ প্রতিহত করছিল; দু'চারটি আঘাতও করছিল। এখন সে বন্দী হয়ে পড়ল; প্রতিহত করাও সম্ভব হচ্ছিল না। বন্ধু বলল, এ কি করছ হতভাগা! আমি মার খাচ্ছি আর তুমি হাত ধরে রেখেছ! ছেড়ে দাও, আমিও তাদের মোকাবেলা করব। সে বলল, না না, শেখ সাদী বলেছেন, প্রকৃত বন্ধু ঐ ব্যক্তি, যে বিপদে বন্ধুর হাত ধরে রাখে। কাজেই আমিও তোমার হাত ধরে রেখেছি। বেচারা হাত ধরার অর্থ বুঝতে পারেনি। হাত ধরার মানে হল সাহায্য করা, সহায়তা করা। যখন বন্ধু বিপদগ্রস্থ হয়ে পড়ে তখন তার সাহায্যতার এগিয়ে আসা।

যাই হোক, পার্থিব বন্ধুত্বেও যখন গ্রহণীয় নীতি যে, বিপদকালে সাহায্য করে প্রকৃত বন্ধুত্বের সত্যতা প্রমাণ করবে, দীন ও ধর্মের ক্ষেত্রে আরো কঠিন পরীক্ষা হওয়া আবশ্যক। যখন আল্লাহর সাথে দাবি করা হয় যে, আমি আপনার বন্ধু, তখন যদি আল্লাহ তাআলা তাকে কোন বিপদে ফেলেন তখনও বলবে যে, আমি আপনার মুখাপেক্ষী, আপনার গোলাম। এমন হলেই কেবল বলা হবে যে, সে আল্লাহর প্রকৃত বান্দা। আর যদি আল্লাহর পক্ষ থেকে নেয়ামত বর্ষিত হতে থাকা অবস্থায় বলে যে, আমি আল্লাহর বান্দা, তবে তা পরীক্ষিত সত্য নয়। নেয়ামত ছিনিয়ে নিয়ে যাওয়ার পরও যদি বলে যে, আমি পূর্বে যেমন আল্লাহর বান্দা ছিলাম এখনো তেমন রয়েছি, তখনই বলা হবে, হ্যাঁ সে আল্লাহ তাআলার প্রকৃত বন্দা।

আল্লাহর ভালবাসা একটি মহামূল্যবান নেয়ামত। ঈমানও একটি নেয়ামাত, ইলম ও মারেফাতও নেয়ামত। কিন্তু এগুলোকে বাতেনী বা অদৃশ্য নেয়ামত বলা হয়, বান্দার সম্পর্ক অন্তরের সাথে। ইলম, ঈমান এবং ভালবাসা রুটির মত বস্তু নয় যে প্লেটে রেখে সামনে পেশ করা হবে; বরং এগুলো আধ্যাত্মিক দৌলত। যাই হোক, নেয়ামত দু'প্রকারের– একটি হল বস্তু জাতীয় নেয়ামত, যা চোখ

দিয়ে দেখা যায়। অপরটি হল রূহাণী নেয়ামত, যা চোখ দিয়ে দেখা যায় না কিন্তু আত্মা উপলব্ধি করতে পারে যে, গুলো নেয়ামত।

সর্বোত্তম নেয়ামত এবং সৃষ্টিজগতের উদ্দেশ্য

প্রকৃতপক্ষে এ সকল বাতেনী নেয়ামতের মধ্যে সর্বোচ্চ ও সর্বোত্তম নেয়ামত হচ্ছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সত্তা ও তাঁর অস্তিত্ব। যাঁকে আল্লাহ তাআলা বিশেষ নেয়ামত ও দানরূপে দুনিয়ায় প্রেরণ করেছেন। তাঁরই বরকতময় সত্তার বদৌলতে আমাদের ইলম লাভের সৌভাগ্য হয়েছে এবং ঈমান নসিব হয়েছে। তাঁরই নিষ্পাপ পবিত্র সত্তার তোফায়েলে বান্দাদের আল্লাহর মহব্বত ও ভালবাসা লাভ করা সম্ভব হয়েছে। যা দ্বারা মানুষ আল্লাহর পরিচয় লাভ করতে সক্ষম হয়েছে, নিজ জীবনের উদ্দেশ্যাবলী জানতে পেরেছে। এটা একমাত্র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর তোফায়েলেই সম্ভব হয়েছে। যদি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আগমন না ঘটত তবে এ বিশ্বজগৎ সৃষ্টি করা হত না। একটি হাদীসে এ প্রসঙ্গে বর্ণনা রয়েছে। যদিও এ হাদীসটি জয়ীফ (দুর্বল) কিন্তু অর্থের দিক দিয়ে গ্রহণীয়। ইবনে কাসির মাক্কী রহ. 'আল বিদায়া ওয়াননিহায়া' কিতাবে এ হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন যে, আল্লাহ তাআলা হযরত আদম আ.-এর দেহটি তৈরি করলেন, তার মধ্যে রূহ ফুঁকে দেয়া হলো, তখন সর্বপ্রথম তাঁর দৃষ্টি আরশের উপর পতিত হল। তিনি দেখতে পেলেন, আরশের পায়ার উপর লেখা রয়ছেঃ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ হযরত আদম আ. বললেন, এ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ কে? আল্লাহ বললেন, তোমার সন্তানদের একজন। তিনি আমার সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ পয়গাম্বার। হে আদম! যদি তাঁকে সৃষ্টি করা আমার উদ্দেশ্য না হত, তবে আমি তোমাকেও সৃষ্টি করতাম না। তোমাকে এ জন্যই সৃষ্টি করেছি যে, তোমার মাধ্যমে তাঁকে দুনিয়ায় প্রেরণ করব। সুতরাং সমস্ত সৃষ্টির পূর্ণতা ও সাফল্য মূলত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সত্তার উপরই নির্ভরশীল।

এর হুবহু উদাহরণ হল এমন, যেন আপনি একটি গাছের চারা রোপণ করলেন, দশ বছর যাবত তার সেবাযত্ন করলেন, পানি দিলেন, প্রখর সূর্য তাপ ও ঝড়োহাওয়া থেকে রক্ষা করলেন। এসবের পর সেটি উপযুক্ত হল। আপনি কেন এ চারাটি রোপন করেছিলেন? কেন তার উপর এত পরিশ্রম করলেন? এজন্যই তো যে, গাছটি যেন ফলতী হয়। যদি ফল এসে যায় তাহলে আপনি বলবেন, আমার শ্রম সার্থক হয়েছে। আর যদি গাছটিতে ফল না ধরে তবে আপনি বলবেন, আমার শ্রম বৃথা গিয়েছে, বরবাদ হয়ে গিয়েছে। সুতরাং গাছ দ্বারা

ফললাভ উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। গাছে ফল এসে গেলে মনে করবেন গাছ লাগাবার উদ্দেশ্য সফল হয়েছে।

এ সম্পূর্ণ সৃষ্টি যেন একটি গাছ। এ গাছটিকে তার মালিক ছয় হাজার বছরে তৈরি করেছেন। কুরআন শরীফে বলা হয়েছে–

إِنَّ رَبَّكُمُ اللهُ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَ الْأَرْضَ فِىْ سِتَّةِ أَيَّامٍ

নিশ্চয়ই আপনার প্রতিপালক আল্লাহ নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলকে ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন। [আরাফ : ৫৪]

কুরআনের অন্য আয়াতে বলা হয়েছে–

وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّوْنَ ○

আপনার পালনকর্তার কাছে একদিন আপনাদের গণনার এক হাজার বছরের সমান। [হজ : ৪৭]

সুতরাং ছয়দিনে সৃষ্টি করার অর্থ হল ছয় হাজার বছরে এক বিশ্বজগৎ তৈরি করা হয়েছে। রবিবার থেকে আরম্ভ হয়েছে এবং শুক্রবার শেষ হয়েছে। শনিবার দিন ছিল অবসর। আমাদের এখানে একদিন চব্বিশ ঘণ্টায় হয়, কিন্তু আল্লাহ তাআলার সেখানে একদিন আমাদের হাজার বছরের সমান। শেষ দিন ছিল শুক্রবার, শুক্রবারের শেষ মুহূর্তে সূর্যাস্তের পূর্বক্ষণে হযরত আদম আ.কে সৃষ্টি করা হয়েছে। ছয় হাজার বছরে সমস্ত মাখলুককে সৃষ্টি করা হয়েছে। সর্বশেষ যে সৃষ্টি তা হলেন হযরত আদম আ.। কারণ আদম আ.-এর জন্যই এ বিশ্বজগৎ সৃষ্টি করা হয়েছে। পৃথিবী, আকাশ, চন্দ্র-সূর্য, তারকারাজি– সবই এজন্য সৃষ্টি করা হয়েছে যে, যেন আদম আ. এখানে বসবাস করতে পারেন। আকাশকে ছাদ বানিয়েছেন, পৃথিবীকে করেছেন বিছানা, তারকারাজির প্রদীপ জ্বেলে দিয়েছেন, সমুদ্রে পানি প্রবাহিত করেছেন, মাটিতে উৎপাদন ক্ষমতা দিয়েছেন, চতুষ্পদ জন্তুসহ প্রাণীগজৎ সৃষ্টি করেছেন। সবকিছুই মানুষের উপকারে আসে। মেহমানকে দাওয়াত করার পূর্বেই সকল আয়োজন সম্পন্ন করা হয়। ঘর, বিছানাপত্র, খাট, কাজের লোক ও খাবার-দাবার প্রস্তুত রাখা হয়। যেন মেহমানের কোন প্রকার কষ্ট না হয়। আদম আ.কে এখানে প্রেরণ করা উদ্দেশ্য ছিল বিধায় তাই প্রথমে ঘররূপে পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, সমস্ত আসবাবপত্র তৈরি করেছেন। যখন দুনিয়া পূর্ণাঙ্গ হল তখন শেষ মুহূর্তে আদম আ.কে সৃষ্টি করা হল। যেন আদম আ.ই সৃষ্টির প্রধান উদ্দেশ্য, পূর্ণ সার্থকতা। বৃক্ষরাজি এজন্য সৃষ্টি করা হয়েছে যে, এখানে আদম আ.-এর আগমন ঘটবে। তারপর তাঁর

একটি শাজারা বা বংশধারা সৃষ্টি হবে। যেমন আপনরা আপনাদের বংশ তালিকা লিখে রাখেন। প্রথমে পিতার নাম, তারপর যারা তার পুত্র ছিলেন তাদের নাম লিখেন; তাদের মাধ্যমে বংশের চারটি শাখা গঠিত হল। তারপর এ চারজন হতে আরো শাখা-প্রশাখা বিস্তৃত হতে থাকলো। এটাকেই বংশের শাজারা বলা হয়। বিশ্বও একটি বৃক্ষতুল্য এবং হযরত আদম আ. হলেন এর কাঙ্ক্ষিত ফল। তারপর হযরত আদম আ.-এর দ্বারা যে শাজারা সৃষ্টি হয়েছে, সে বৃক্ষের শেষ ফল এবং সৃষ্টির মুখ্য উদ্দেশ্য যা, তা হলো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। সুতরাং সমগ্র বিশ্বজগৎ সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য হল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সত্তা। তাঁর আগমনার্থেই এতসব করা হয়েছে।

মুহাম্মাদ সা.-এর আবদিয়াতকে কেন্দ্র করে বিশ্বজগৎ সৃষ্টি

হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পৃথিবীতে কেন প্রেরণ করা হল? এজন্য যে, বিশ্বজগৎসৃষ্টির একমাত্র উদ্দেশ্য মানব জাতিকে তথায় প্রেরণ করা, আর মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য হলো ইবাদত। অর্থাৎ মানুষ তার প্রভুকে স্মরণ করবে, তাঁর আনুগত্য করবে। ইবাদাতের জন্যই এই বিশাল আয়োজন করা হয়েছে। যেন মানুষ আল্লাহ প্রতি মুখাপেক্ষী হয়, তার সামনে মাথা অবনত করে, লুটিয়ে পড়ে। আর আদম আ. ও তার সন্তান-সন্ততিগণের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম ও পূর্ণাঙ্গ ইবাদত করেছেন একমাত্র জনাব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তাঁর চেয়ে উত্তম ও অধিক ইবাদতকারী কেউ সৃষ্টি হয়নি এবং ভবিষ্যতেও হবে না। ইবাদতের স্তরসমূহ ও মর্যাদা তাঁর ওপর শেষ হয়ে গেছে। বন্দেগী ও ইবাদতের যত শাখা-প্রশাখা ছিল সবই তিনি করে দেখিয়েছেন। এ বিশ্বে এ পরিমাণ অন্য কেউ করে দেখাতে পারেনি। কথাটি এভাবে বলা উচিত– যেমন আল্লাহ তাআলা মাবুদ হওয়ার মধ্যে এক ও অদ্বিতীয়, তাঁর কোন শরিক নেই, তিনিই একচ্ছত্র মাবুদ; তেমনিভাবে আবদিয়াত বা গোলামীতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ও অদ্বিতীয়, তাঁর কোন শরিক নেই, কোন তুলনা নেই। আল্লাহ তাআলার দরবারে যে পরিমাণ পরিপূর্ণ আবদিয়াত তিনি পেশ করেছেন, এ বিশ্বের কেউ তা করতে পারেনি। হাদীসে বলা হয়েছে–

كَانَ يَذْكُرُ اللهَ عَلَى كُلِّ إِحْيَانِه

তাঁর কোন মুহূর্ত আল্লাহর যিকির ও স্মরণ থেকে শূন্য ছিল না।

كانَ دائم الفكرة حزينا.

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বদা আল্লাহ তাআলার স্মরণ ও পরকাল চিন্তায় নিমগ্ন থাকতেন।

তাঁকে দেখে মনে হত যেন চিন্তার সাগরে ডুবে আছেন। এমনই ছিল তাঁর অস্থা। সাহাবায়ে কেরাম আরয করতেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি সময়ের পূর্বে বৃদ্ধ হয়ে পড়ছেন, অথচ আপনি অত্যন্ত শক্তিশালী ছিলেন। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন–

شيبتنى هود و اذا الشمس كورت.

সূরা হুদ এবং সূরা তাকবীর আমাকে বৃদ্ধ করে দিয়েছে।

এ সূরা দু'টিতে কিয়ামতের ভয়াবহ দৃশ্য বর্ণিত হয়েছে। সে দৃশ্যগুলো সামনে থাকায় আমার উপর বার্ধক্যের ছাপ প্রকাশ লাভ করেছে। তাই তাঁর কোন একটি মুহূর্ত পরকালের চিন্তা থেকে খালি ছিল না, কোন মুহূর্ত আল্লাহর যিকির থেকে খালি ছিল না। প্রতি কদমে আল্লাহর যিকির, তাঁর আনুগত্য ও ইবাদত-বন্দেগীতে বিভোর থাকতেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র ও বরকতময় সত্তা যেভাবে পরিপূর্ণ ইবাদত আল্লাহর দরবারে পেশ করেছেন তেমন ইবাদতই সৃষ্টির কাছ থেকে প্রত্যাশিত ছিল। পৃথিবীতে তাঁর আগমণের দ্বারা কাঙ্ক্ষিত সে ইবাদত আদায় হয়েছে এবং সৃষ্টির প্রকৃত উদ্দেশ্যও পূর্ণতা লাভ করেছে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর তাশরীফ আনার পরও তাঁর উম্মতগণের ইবাদত-বন্দেগী করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। যাতে তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আদর্শের ওপর পরিচালিত হয়ে তাঁর আদর্শকে বিশ্ব সম্প্রদায়ের কাছে পৌঁছাতে পারেন। নতুবা মূল উদ্দেশ্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আগমনের মাধ্যমে পূর্ণ হয়ে গিয়েছে। এ জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ.

আমি এবং কিয়ামত এভাবে রয়েছি, যেমন দুটি আঙুল কাছাকাছি রয়েছে।

অর্থাৎ আমি কিছু পূর্বে এসেছি, আর কিয়ামত আমার পেছনে পেছনে দৌড়ে আসছে। এজন্য যে, যখন বিশ্ব সৃষ্টির উদ্দেশ্য পূরণ হয়েছে, তখন এ বিশ্বকে রেখে দেয়ার আর কোন প্রয়োজীয়তা নেই। বৃক্ষ যখন ফলবতী হয়ে অবসর হয়ে

যায়, ভবিষ্যতে ফল লাভের আশা ও প্রয়োজন অবশিষ্ট না থাকে, তখন গাছটি কেটে জ্বালিয়ে ফেলা হয়। যেহেতু বিশ্ব সৃষ্টির উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়ে গিয়েছে; ফল যা ছিল তা আমরা খেয়ে ফেলেছি; প্রকৃত ফল যা ছিল তা এসে গেছে; মুখ্য উদ্দেশ্য পূরণ হয়েছে; এখন বিশ্বকে রেখে দেয়ার, সংরক্ষণ করার কোনই প্রয়োজনীয়তা নেই।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কিয়ামতের হাজারো নিদর্শন রয়েছে, তন্মধ্যে সর্বপ্রথম নিদর্শন হল দুনিয়াতে আমার আগমন। মনে রেখ, পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাওয়ার সময় নিকটবর্তী। যেহেতু, বিশ্ব সৃষ্টির উদ্দেশ্য আমার আগমনে পূর্ণ হয়েছে, কাজেই এরপর দুনিয়াকে সংরক্ষণ করে রাখার কোন প্রয়োজন নেই। শুধু এ কারণে কিছু দিন রেখে দেয় হবে, যেন আমার পয়গামটি সমস্ত দুনিয়াবাসীর নিকট পৌঁছে যায়। আবার আমার উম্মত আদর্শ হয়ে দুনিয়াবাসীকে দেখিয়ে দিতে পারে যে, ইবাদতের প্রকৃত আদর্শ ও নমুনা হল এই, যার জন্য এ পৃথিবীকে সৃষ্টি করা হয়েছে। সুতরাং প্রমাণিত হল যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আগমনই সর্ববৃহৎ নেয়ামত। সকল নেয়ামতের উৎস ও কেন্দ্রবিন্দু। তিনি বিশ্বের জন্য রহমতস্বরূপ। সমস্ত বিশ্বকে তিনি ইবাদতের পদ্ধতি শিক্ষা দিয়েছেন।

সকল আম্বিয়া আ.-এর ধর্ম হল ইসলাম

কয়েকজন অমুসলিম এখানে আমার কাছে জানতে চেয়েছেন যে, ইসলাম আমাদেরকে কী এমন নতুন জিনিস দিয়েছে যে আমরা ইসলামকে গ্রহণ করব? আমরা তো আমাদের নিজ নিজ ধর্মের উপর রয়েছি। আমি বললাম, ইসলাম কোন প্রকার নতুন জিনিস নিয়ে আসেনি। সমস্ত নবী আ.গণের যে দীন ছিল, ইসলাম সে দীন নিয়েই আগমন করেছে। ইসলাম সে ধর্মই, যা সকল নবী আ.-এর ধর্ম ছিল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আগমন এ ধর্ম নিয়েই। এ কারণেই কুরআন সমস্ত নবী আ.-এর দীনকেই ইসলাম নামে অভিহিত করেছে। যেমন হযরত ইবরাহীম আ.-এর ধর্ম। কুরআনের এক স্থানে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন–

إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

স্মরণ করুন সেই সময়ের কথা, যখন তাঁর প্রতিপালক বললেন, হে ইবরাহীম, তুমি মুসলিম হয়ে যাও। তিনি বললেন, আমি বিশ্ব প্রতিপালকের প্রতি মুসলিম (সমর্পিত) হয়ে গেলাম। [বাকারা : ১৩১]

আল্লাহ বললেন, যদি মুসলমান হয়ে থাক তবে ঘোষণা কর–

قُلْ إِنَّ صَلَاتِيْ وَنُسُكِيْ وَ مَحْيَايَ وَمَمَاتِيْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ○
لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَبِذٰلِكَ اُمِرْتُ وَ اَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ○

আপনি বলুন, আমার নামায, আমার কুরবানী এবং আমার জীবন ও মরণ বিশ্ব-প্রতিপালক আল্লাহরই জন্যে। তাঁর কোন অংশীদার নেই। আমাকে এ নির্দেশই দেয়া হয়েছে এবং (বর্তমান যুগে) আমিই সর্বপ্রথম মুসলমান। [আনআম : ১৬২-১৬৩]

এখানে হযরত ইবরাহীম আ.-এর দীনকে ইসলামের সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে যে, তিনিও মুসলিম ছিলেন। ইসলাম নিয়েই পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছিলেন।

হযরত ইউসুফ আ. বলেন–

تَوَفَّنِيْ مُسْلِمًا وَّاَلْحِقْنِيْ بِالصّٰلِحِيْنَ○

হে আমার প্রতিপালক! আমাকে মুসলমান বানিয়ে মৃত্যু দান করুন (যেন আমি মৃত্যু পর্যন্ত ইসলামের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারি), এবং আমাকে সৎকর্মশীলদের সাথে মিলিত করুন। [ইউসুফ : ১০১]

প্রমাণিত হল, হযরত ইউসুফ আ.-এর দীনও ইসলাম ছিল। এমনিভাবে হযরত ইবরাহী আ. স্বীয় সন্তানদেরকে অসিয়ত করেছেন। বর্ণিত হয়েছে–

وَوَصّٰى بِهَا اِبْرٰهٖمُ بَنِيْهِ وَيَعْقُوْبُ ؕ يٰبَنِيَّ اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰى لَكُمُ
الدِّيْنَ فَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ○

এই ওসিয়ত করেছেন ইবরাহীম (আ.) তাঁর সন্তানদেরকে এবং ইয়াকুব (আ.)ও যে, হে আমার সন্তানগণ, নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের জন্যে একটি ধর্মকে মনোনীত করেছেন। কাজেই তোমরা মুসলমান না হয়ে কখনও মৃত্যুবরণ করো না। [বাকারা : ১৩২]

সুতরাং ইবরাহীম আ.-এর বংশধরদের দীনও ইসলাম ছিল, হযরত ইউসুফ আ.-এর দীনও ইসলামই ছিল। মুসা আ. বলেছেন যে, আমার দীনও ইসলাম, যা কুরআনে বর্ণিত হয়েছে। হযরত ঈসা আ.-এর হাওয়ারী বা অনুসারীগণ বলেছেন–

وَاشْهَدْ بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ○

হে ঈসা (আ.)! আপনি সাক্ষী থাকুন, আমরা সবাই মুসলমান। [আলে ইমরান : ৫২]

সুতরাং হযরত ঈসা আ.-এর দীনও ইসলাম। হযরত সুলায়মান আ.-এর ধর্ম গ্রহণ করে বিলকিসের মত রাণী বলেছিলেন–

قَالَتْ رَبِّ إِنِّيْ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ وَاَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمٰنَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ○

বিলকিস বলল, হে আমার পালনকর্তা, আমি তো ইতোপূর্বে গুনাহগার ছিলাম। কিন্তু এখন আমি সুলায়মান (আ.)-এর হাতে বিশ্ব জাহানের পালনকর্তার প্রতি ইসলাম গ্রহণ করলাম। [নমল : ৪৪]

সুতরাং হযরত সুলায়মান আ.-এর দীনও ইসলাম ছিল। মোট কথা, এমন কোন নবী-রাসূল ছিলেন না, ইসলাম-এর সাথে যাকে সম্পৃক্ত করা হয়নি। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও ইসলাম ধর্ম নিয়ে আগমন করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন–

إِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْإِسْلَامُ

নিঃসন্দেহে আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য দীন একমাত্র ইসলাম। [আলে ইমরান : ১৯]

তাই আমি বলছিলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন নতুন দীন নিয়ে আসেননি; বরং ঐ দীন সাথে নিয়ে এসেছেন, যা পূর্বের সকল নবী-রাসূল আ.গণ নিয়ে এসেছিলেন।

দীনের পূর্ণতা একটি স্বতন্ত্র নেয়ামত

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا○

আজ আমি তোমাদের জন্যে তোমাদের দীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম (আকার-আকৃতি ও অবকাঠামো দিয়ে দুনিয়াবাসীর নিকট পেশ করলাম, এ দীন কোন নতুন দীন নয়, বরং এটি পূর্ণতাপ্রাপ্ত দীন মাত্র)। এবং তোমাদের প্রতি আমার অবদান সম্পূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্যে দীন হিসেবে পছন্দ করলাম। [মায়েদা : ৩]

জনাব রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দীনের প্রতিটি শাখা-উপশাখা এবং মূলনীতি ও আনুসঙ্গিক বিষয়াবলীকে এমনই পরিপূর্ণ রূপদান করেছেন যে, তাতে কোন প্রকার পরিবর্তন-পরিবর্ধন বা সংযোজন-বিয়োজনের কোন অবকাশ অবশিষ্ট থাকেনি। যেন প্রথম হতেই ইসলাম নামক একটি দীন চলে আসছিল, শরীয়তসমূহ অবতীর্ণ হচ্ছিল। এতে হ্রাস-বৃদ্ধিও হচ্ছিল। পুরাতন আদেশ-নিষেধ রহিত হচ্ছিল। নতুন নবী আগমন করে নতুন নতুন প্রোগ্রাম দিচ্ছিলেন। কিন্তু সর্বশেষে জনাব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে প্রোগ্রাম পেশ করেছেন তা এতই পূর্ণাঙ্গ যে, এতে হ্রাস-বৃদ্ধির কোন অবকাশ নেই। সুতরাং তিনি দীনকে পূর্ণতা দান করেছেন, নতুন কোন দীন নিয়ে আসেননি। এ দীন হল সেই দীন, যা সমস্ত নবীগণ নিয়ে এসেছিলেন। শরীয়ত পরিপূর্ণ নিয়ে এসেছেন, যাকে জীবন পদ্ধতি বা প্রোগ্রাম বলা হয়। এটা অবশ্যই নতুন এবং পূর্ণাঙ্গ। কিন্তু এখানে হ্রাস-বৃদ্ধি করার কোন অবকাশ নেই।

এর উদাহরণ ঠিক এমন যে, সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর আপনি তাকে যে জামা পরাবেন তার দৈর্ঘ্য হবে এক বিঘত। কিন্তু এরপর যখন তার বয়স ছয়মাস হবে তখন তার জামা হবে দেড় বিঘতের। যখন তার বয়স আট বছর হবে তখন তার জামায় একগজ কাপড়ের প্রয়োজন পড়বে। বাচ্চা কিন্তু সেই একজনই, যে মাতৃগর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হয়েছিল। আট বছর পূর্বেও সেই শিশুই ছিল, চার বছর পূর্বেও সেই একই শিশু ছিল। তার জামা পরিবর্তিত হচ্ছে, জামার মাপ পরিবর্তিত হচ্ছে। বাচ্চা কিন্তু ঐ একজনই। এরপর যখন তার বয়স চৌদ্দ বছর হল তখন সোয়া গজ কাপড়ের প্রয়োজন হল। এরপর যখন সে তেত্রিশ বছরের যুবক হল– যা দেহের বৃদ্ধি ও পূর্ণতার প্রান্তসীমা, তখন তার জামার যে পরিমাপ হবে তা হবে পূর্ণাঙ্গ ও চূড়ান্ত। এখন আর কোন প্রকার হ্রাস-বৃদ্ধির প্রশ্ন নেই। কেননা তার সমাপ্তি হয়ে গিয়েছে। তার দেহ যে পরিমাণ হওয়ার ছিল তা হয়ে গিয়েছে। এখন তার জামার যে পরিমাপ হবে, তা আমৃত্যু অপরিবর্তনীয় থকবে, কোন প্রকার হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটবে না।

তদ্রূপ দীনকেও একটি শিশুর ন্যায় মনে করুন। আদম আ. যে দীন নিয়ে এসেছিলেন তা ইসলামই ছিল, কিন্তু তখন এটি ছোট ছিল, মাত্র জন্ম লাভ করেছে। সুতরাং তার শরীয়তকেও ছোট রাখা হয়েছিল। এক বিঘত পরিমাণ জামা-ই তার জন্য যথেষ্ট ছিল। অস্থায়ীভাবে সেটা তার শরীরে ফিটও হয়েছিল। ক্রমান্বয়ে ইসলামের দেহ যখন বৃদ্ধি পেতে লাগলো তখন তার গায়ের জামা অর্থাৎ বিধি-বিধানও বৃদ্ধি পেতে লাগলো। তো হযরত আদম আ.-এর যুগে শরীয়ত অত্যন্ত ছোট ও সংক্ষিপ্ত ছিল। হাদীসে বলা হয়েছে, তখন মাত্র এক ওয়াক্তের নামায ছিল তাও আবার বর্তমানে আমাদের শরীয়তের ন্যায় পরিপূর্ণ

ছিল না। শুধু আল্লাহর সম্মুখে হাত বেঁধে দাঁড়িয়ে যাও। দাঁড়িয়ে আনুগত্য প্রকাশ কর। অথবা নিম্নমুখী হয়ে শুয়ে যাও, এটাই যথেষ্ট। আমাদের শরীয়তের এই রুকু, সিজদা, তাশাহহুদ, কিয়াম, বৈঠক ইত্যাদি কিছুই আদম আ.-এর শরীয়তে ছিল না। ইসলাম যেমন তখন শিশু ছিল, মাত্র জন্মগ্রহণ করেছে, তদনুযায়ী তার শরীয়তও তেমন ছিল। যেন পোশাকও তার ছোট ছিল। যখন ইসলাম-এর দেহের আকার-আকৃতি বৃদ্ধি পেল এবং হযরত ইবাহীম আ.-এর যুগ এল, তখন শরীয়তও একটু বিস্তৃত হল। মুসা আ.-এর যুগ এল, তখন উচ্চতা ও আকৃতি আরো বৃদ্ধি পেল, তখন শরীয়তের পোশাকও আরো বিস্তৃত হল। আল্লাহ তাআলা বলেন–

وَتَفْصِيْلاً لِّكُلِّ شَيْءٍ.

আমি দীনকে বিস্তৃত করে দিয়েছি; ব্যাখা-বিশ্লেষণসহকারে উপস্থাপন করেছি। [আরাফ : ১৪৫]

আর যখন সর্বশেষ আমাদের নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যুগ এল, তখন দীনের বৃদ্ধি ও সম্প্রসারণ বন্ধ হয়ে গিয়ে যুবক ও পরিপূর্ণ হয়েগেল। তাই এখনকার শরীয়তে আর কোন হ্রাস-বৃদ্ধির অবকাশ নেই। কেউ যদি তালিম লাভ করে এবং অন্যান্য শরীয়তের সাথে ইসলামী শরীয়তের তুলনামূলক বিচার-বিশ্লেষণ করে, তবে আকাশ-জমিন ব্যবধান দেখতে পাবে। অন্যান্য শরীয়তের আহকাম, আদেশ-নিষেধ দেখলে মনে হয় যেন কচি শিশু, আর হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শরীয়তের নির্দেশাবলি এমন মনে হয়, যেন যুবক ও প্রাপ্তবয়স্ক। এর গঠন ও গড়ন পূর্ণাঙ্গ, হুকুম-আহকাম ব্যাপক বিস্তৃত।

তাওহীদের পূর্ণতা

মোটকথা, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে শরীয়ত পেশ কেরছেন তা হল পূর্ণতা প্রাপ্ত দীন। পূর্ব থেকে চলমান দীনই তিনি উপস্থাপন করেছেন কিন্তু এখন তাতে পূর্ণতা এসেগিয়েছিল। যেমন মনে করুন তাওহীদ বা একত্ববাদ। সকল নবী আ. তাওহীদের আকিদা শিক্ষা দিয়েছেন, কোন নবী আ. শিরকের তালিম দেননি। সকলেই বলেছেন, আল্লাহ তাআলাকে এক বলে বিশ্বাস কর। কিন্তু জনাব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাওহীদের পূর্ণতা দান করেছেন যে, আল্লাহকে এক বিশ্বাস কর, তাঁর সত্তাকে এক, তাঁর গুণাবলিকে এক, তাঁর কার্যাবলিকে এক, এবং সমস্ত কিছুতে তিনি এক ও একক বলে বিশ্বাস

কর। প্রতিটি বিষয়ে তাঁকে এক ও অদ্বিতীয় বলে বিশ্বাস করা আবশ্যক। যখন সমস্ত কিছুতে তিনি এক ও একক তখন তাঁর হকও হবে অনেক। অতঃপর ইবাদতও হবে বহু প্রকারের। যথা– কলব দ্বারা এভাবে ইবাদত কর, জবান দ্বারা এভাবে ইবাদত কর, দেহ ও শরীর দ্বারা এভাবে ইবাদত কর। কারণ, যখন বান্দার উপর আল্লাহ তাআলার অনেক হক ও অধিকার রয়েছে এবং তাঁর শান ও গুণাবলিও অনেক, কজেই তাঁর সম্মুখে অনুনয় বিনয় ও প্রার্থনা করার পন্থা ও পদ্ধতিও অনেক এবং তা পরিপূর্ণ হওয়া বাঞ্ছনীয়। এমনিভাবে অন্যান্য নবী আ.গণ শিরক থেকে বাধা দিয়েছেন, নিষেধ করেছেন, কিন্তু ইসলাম শুধু শিরক থেকেই বাধা প্রদান করেনি বরং শিরকের উপকরণও বন্ধ করে দিয়েছে যে, এগুলোও নিষিদ্ধ। যে সকল উপায়-উপকরণ দ্বারা শিরক সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে সেগুলোকেও নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। যেখানে শিরকের সামান্যতম সম্ভাবনা রয়েছে, ঐ সম্ভাবনার পথকেও খতম করে দিয়েছে।

শিরকের উপকরণকেও শরীয়তে মুহাম্মাদী ধ্বংস করে দিয়েছে

হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, হযরত উমর রা. কাবা ঘরের তাওয়াফ করছিলেন, হজ্জের সময় ছিল বিধায় 'মাতাফে' হাজারো মানুষ তাওয়াফে ব্যস্ত ছিলেন। যারা হজ করে এসেছেন তাদের জানা আছে যে, বায়তুল্লাহর চারদিকে সাতবার প্রদক্ষিণ করাকে তাওয়াফ বলা হয়। জান্নাতী পাথর 'হাজরে আসওয়াদ'কে চুম্বন করে তাওয়াফ শুরু করা হয় এবং এখানে এসেই তাওয়াফ শেষ করা হয়। প্রতিবার প্রদক্ষিণ শেষে পাথরটিকে চুম্বন করা হয়। হযরত উমর রা. দেখলেন, মানুষ দৌড়ে যাচ্ছিল পাথরের দিকে এবং ঝুঁকে ঝুঁকে তাকে চুম্বন করছিল। সাধারণ মানুষের হাজরে আসওয়াদের প্রতি ঝোঁক ছিল বেশি। তাওয়াফ হোক বা না হোক– চুম্বনকে তারা অগ্রাধিকার দিচ্ছিল। চুম্বন করা নিয়ে কলহ-বিবাদেরও উপক্রম হচ্ছিল। লোকজনের বিরাট জটলা তৈরি হয়েছিল।

হযরত উমর ফারুক রা. দেখলেন, অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে, মানুষ যেন হাজরে আসওয়াদের পুজা ও ইবাদত করছে। তিনি যেখানে ছিলেন সেখানেই দাঁড়িয়ে পড়লেন, উচ্চস্বরে সবাইকে আহ্বান করলেন, তাঁর আওয়াজে তাওয়াফ থেমে গেল। তিনি হাজরে আসওয়াদকে লক্ষ্য করে বললেন–

انى أعلم انك حجر، لاتنفع ولا تضر، لولا انى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما اقبلك.

আমি জানি, তুমি একটি পাথর মাত্র। কারো উপকার করার সাধ্য তোমার নেই এবং কারো ক্ষতি সাধনের ক্ষমতাও

তোমার নেই। যদি আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে না দেখতাম যে, তিনি তোমাকে চুম্বন করছেন, তবে আমি তোমাকে কখনো চুম্বন করতাম না।

অর্থাৎ আমাদের উপকার-অপকারের কোন কিছুই তোমার সাধ্যের মধ্যে নেই। আমি জানি, তুমি শুধুই একটি পথর বৈ কিছু নও। উদ্দেশ্য এই, একমাত্র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাতের অনুকরণার্থে তোমাকে চুম্বন করছি; ইবাদতের জন্য নয়। তার কথা শুনে মানুষের ধারণাও পরিবর্তিত হয়ে গেল। যারা এটা মনে করছিল, অথবা যাদের প্রতি এরূপ বিশ্বাস করার আশঙ্কা ছিল যে, হয়ত এ পাথরের ইবাদত করাও উদ্দেশ্য, তখন মূর্তি পূজা আর আল্লাহ পূজার মধ্যে কী পার্থক্য থাকত? হযরত উমর রা. এ ধারণাকে প্রতিহত করলেন। লক্ষ্যণীয় যে, ইসলাম শিরকের সামান্যতম সম্ভাবনাকেও প্রতিরোধ করেছে। শিরক তো দূরের কথা, শিরকের সন্দেহ ও ধারণাকেও প্রতিহত করার চেষ্টা করা হয়েছে।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রা. একবার মাঠে নামায আদায় করলেন। মাসআলা আপনাদের জানা আছে যে, মাঠে নামায পড়ার সময় সামনে একটি সুতরা দাঁড় করাতে হয়। অর্থাৎ একটি লাঠি পুঁতে রাখতে হবে বা একটি পাথর রেখে দিতে হবে, যেন পথচারীগণ নামাযীর সম্মুখে না এসে সুতরার বাইরে দিয়ে যাতায়াত করেন। সুতরা দেয়ার উদ্দেশ্য হল এই, মুসল্লির সামনে দিয়ে যদি কোন ব্যক্তি যাতায়াত করে তবে আল্লাহ ও বান্দার মধ্যে যে সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে তা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, অন্তরে দুশ্চিন্তা উদিত হয়। আর যখন সুতরা রাখা হয় এবং যাতায়াতকারী এর বাইরে দিয়ে চলে যায়, তখন অনন্তরে কোনরূপ প্রতিক্রিয়া হয় না। তাই সুন্নাত তরিকা হল কোন প্রকার সুতরা রাখা। সেমতে হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমর রা.ও সম্মুখে একটি পাথর রেখে সুতরা দেয়ার নির্দেশ দিলেন। উপস্থিত লোকদেরকে তিনি পাথরটি নাক বরাবর না রেখে ডান অথবা বাম কাঁধ বরাবর রাখার নির্দেশ দিলেন। বললেন, একেবারে নাক বরাবর যদি রেখে দাও তবে কোন দর্শকের অন্তরে ধারণা জন্মাতে পারে যে, এরা কি পাথরের ইবাদত করছে? এরূপ সন্দেহ থেকেও বেঁচে থাক। তো এখানে শিরকের উপকরণকেই রহিত করা হয়েছে। শুধু শিরক্‌কেই প্রতিহত করা হয়নি। অন্যথায় এ কথা স্পষ্ট যে, হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমর রা. নামায পড়ছিললেন, তাঁর অন্তরে শিরক উদিত হবে, তা কল্পনাও করা যায় না। তিনি অত্যন্ত মর্যাদাবান সাহাবী ছিলেন। তাঁর চেয়ে অধিক সুন্নতের অনুসারী আর কে হতে পারে? এ আশংকাও হতে পারে না যে, (নাউযুবিল্লাহ) হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমর রা.-এর অন্তরে শিরকের সামান্যতম গন্ধও ছিল। তথাপি দৃশ্যটিও যেন

শিরকের মত না হয়। নাক বরাবর পাথরটি রেখে দিলে বাহ্যিক দৃষ্টিতে মনে হতে পারে যে, পাথরের পূজা করা হচ্ছে। এই সন্দেহকে শেষ করে দিলেন। বাহ্যিক দৃষ্টিতেও যেন কোন সন্দেহ উদিত হতে না পারে। দূর থেকে দূরের সম্ভাবনাকেও প্রতিরোধ করলেন, যেন কোনভাবেই শিরক অন্তরে স্থান না পায়। তা থেকে কলব পূত-পবিত্র থাকে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন–

الشرك اخفى من دبيب النمل.

শিরক পিপিলিকার পদধ্বনি অপেক্ষা তীক্ষ্ণ।

শিরক এত সূক্ষ্ম, যেন একটি মিহিন পাথরের উপর ছোট পিপিলিকা, যার পদচারণার আওয়াজ এতই ক্ষীণ যে, তা কখনো শোনাই যায় না। বর্ণিত হয়েছে, এ পিপিলিকার পদধ্বনী যত সূক্ষ্ম, শিরকের গতি তার চেয়েও সূক্ষ্ম। অনেক সময় মানুষ শিরকে লিপ্ত হয়ে যায় কিন্তু তার খবরই থাকে না যে, আমি শিরকে লিপ্ত হয়ে গিয়েছি। উদাহরণত বর্ণিত হয়েছে, কোন ব্যক্তি নামায পড়তে শুরু করল। তার অন্তরে এই ধারণ উদিত হল যে, মানুষ আমাকে দেখে মনে করবে যে, লোকটি অত্যন্ত ইবাদতগুজার। এ প্রসঙ্গে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন–

الرياء شرك

রিয়া বা লোক দেখানো ইবাদত একটি শিরক।

এ ব্যক্তি আল্লাহর জন্য নামায পড়ছে না বরং বান্দার জন্য পড়ছে। মানুষকে দেখানোর উদ্দেশ্যে নামায পড়ছে। যাতে তারা তাকে ইবাদতগুজার মনে করে। যে ব্যক্তি এভাবে লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে ইবাদত করছে তার অন্তরে এ কল্পনাও নেই যে, সে শিরক করছে। নিজ ধারণানুযায়ী সে আল্লাহর ইবাদত করছে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা আল্লাহর ইবাদত নয়। তা তো দর্শকদের ইবাদত, যারা তাকে দেখছে তাদরে ইবাদত। সুতরাং রিয়াও এক প্রকারের শিরক, কিন্তু তা প্রকাশ্য শিরক নয়।

আরো এক প্রকার শিরক রয়ছে যা এর চেয়েও অধিক সূক্ষ্ম। অর্থাৎ কোন দর্শক না থাকা সত্ত্বেও শিরক হচ্ছে। একে 'উজব' বা আত্ম-অহমিকা বলা হয়। অর্থাৎ এ ক্ষেত্রে ব্যক্তি নির্জনে বসে ইবাদত করছে, কিন্তু তার অন্তরে এ অহংকার রয়েছে যে, আমি যেভাবে ইবদাত করছি তা আজ পর্যন্ত কেউ করতে পারেনি। যেন একমাত্র আমিই পৃথিবীতে এ জাতীয় ইবাদত করার জন্য সৃজিত হয়েছি। এ প্রকারের ইবাদতকেও শিরক বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। সে তার নফসের

জন্য ইবাদত করছে, আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নয়। তার অন্তরে অহংকার ও গর্ব পয়দা হচ্ছে। নিজের নফসের সাথেই নিজে গর্ব করছে– আমি অত্যন্ত মহান ব্যক্তি, অত্যন্ত ইখলাসের সাথে ইবাদত করছি। আল্লাহর সম্মুখে দাঁড়িয়ে যখন সে নিজেকে বড় মনে করতে শুরু করেছে তখন সে যেন আল্লাহর মহত্ত্বকে অস্বীকার করছে। আল্লাহর বড়ত্ব ও মহত্ত্বের স্থলে তার নফসকে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। এটিও শিরকেরই অন্তর্ভুক্ত। যখন একাকী ইবাদত করে তখনও যেন অন্তরে 'উজব' বা আত্ম-অহমিকার সৃষ্টি না হয়। যখন মানুষের সামনে নামায পড়বে তখন মানুষকে দেখানোর নিয়তে নামায পড় না। এও শিরকের অন্ত র্ভুক্ত। প্রয়োজনবোধে গোপনে নামায পড়, কিন্তু এখানেও লক্ষ্য রেখ, শিরক যেন না হয়। সুতরা রাখার প্রয়োজন হলে এমনভাবে রাখ, যেন দৃশ্যত শিরক হয়ে না যায়। শিরকের আকার-আকৃতি যেখানে নিষিদ্ধ সেখানে প্রকৃত শিরক কেমন করে প্রকাশ পাবে। অন্যান্য ধর্মও শিরককে নিষিদ্ধ করেছে কিন্তু উপায়-উপকরণে নিষিদ্ধ করেনি। তা নিকটের হোক অথবা দূরের হোক। কিন্তু ইসলাম এসবকেও নিষিদ্ধ করেছে। যেন তাওহীদ তার পরিপূর্ণ রূপ নিয়ে বিশ্ববাসীর সামনে প্রকাশ পায়। একমাত্র ইসলামই তাওহীদের পূর্ণতা দান করেছে। শুধুতাওহীদই পেশ করেনি, তাওহীদ তো পূর্ববর্তী নবী আ.গণও পেশ করেছেন, কিন্তু ইসলাম সে তাওহীদকে এত পরিপূর্ণভাবে উপস্থাপন করেছে যে, প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য– কোন প্রকার শিরকেরই অবকাশ রাখেনি।

শিরকের সম্ভাবনা থাকার কারণে ইসলাম ধর্মে ছবি ও প্রতিকৃতিকে হারাম করা হয়েছে। ছবি বা ফটো দ্বারাই শিরকের সূচনা হয়েছে। হযরত নূহ আ.এর সম্প্রদায়ের মধ্যে সর্বপ্রথম শিরকের প্রচলন হয়েছিল। তাদের কওমে পাঁচজন বুযর্গ বক্তি ছিলেন। যখন তারা ইন্তেকাল করলেন তখন তাদের কওম ঐ ব্যক্তিগর্বের মূর্তি বানিয়ে ইবাদতখানায় রেখে দিল। এজন্য যে, তাদের মূর্তিগুলো দেখে দেখে আল্লাহর কথা স্মরণ হবে, যেমন স্মরণ হত তাদের মজলিসে বসে। প্রথম প্রজন্ম মূর্তিগুলো দেখে ঠিকই আল্লাহর ইবাদত করেছে, মূর্তির ইবাদত করেনি। কিন্তু যখন পরবর্তী বংশধরগণের যুগ এল তখন তাদের অন্তরে সে পরিমাণ ইলম ও মারেফাত ছিল না, যা তাদের পূর্বপুরুষদের অন্তরে ছিল। তারা ইবাদতখানায় রক্ষিত মূর্তিগুলোর প্রতি কিছুটা সম্মান প্রদর্শন করতে শুরু করল এবং আল্লাহর প্রতিও তাদের মনোযোগ ছিল। তৃতীয় পর্যায়ের বংশধরগণের যুগ যখন এল, তখন তারা আল্লাহকে ভুলে গিয়ে মূর্তিগুলোর জন্য ইবাদত করতে লাগল। এখান থেকে শিরকের সূচনা হল। তাই শিরকের সূচনা ঐসব জিনিস দ্বারাই হয়েছে। প্রথমে ছবি বা প্রতিকৃতি রাখা হয়েছে, এরপর সেগুলো শিরকের মাধ্যম হয়ে গেছে।

এভাবেই পৃথিবীর বিভিন্ন জাতি পথহারা হয়েছে। কোন বুযর্গ হয়ত বিশেষ ভাবাবেগে কোন কাজের আমল করে ফেলেছেন, পরবর্তীগণ বিধানরূপে সে কাজের উপর আমল করতে শুরু করেছে এবং শিরকে লিপ্ত হয়ে গিয়েছে। নূহ আ.-এর কওমের লোকেরা আল্লাহকে স্মরণ করিয়ে দেয়ার জন্য পূর্বপুরুষদের মূর্তি রেখেছিলেন, ইবাদত করার জন্য নয়; কিন্তু পরবর্তীগণ তাদের বাহ্যিক রূপকে গ্রহণ করেছে যে, তারা মূর্তির সামনে মাথা নত করছে, সুতরাং আমরাও তাই করব।

একই পদ্ধতিতে বৃক্ষপূজারও সূচনা হয়েছে। কোন বুযর্গ হয়ত কোন এক গাছের নিচে বসে ইবাদত করেছেন। এরপর তার অনুসারীগণ গাছের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে আরম্ভ করেছে। প্রথম প্রজন্ম শুধুই সম্মান করেছন; কিন্তু তাদের পরবর্তীগণ গাছের পূজা আরম্ভ করে দিয়েছে। বর্তমানে হিন্দু সমাজে পিপল গাছকে অবশ্য পূজনীয় বলে মান্য করা হয়। হিন্দু সম্প্রদায়ের কোন বিশেষ ব্যক্তি হয়ত এ বৃক্ষের নিচে পূজা পাঠের জন্য বসেছিল। তা দেখে পরবর্তীগণ গাছেরই পূজা আরম্ভ করে দিয়েছে, গাছটি মাবুদে পরিণত হয়েছে।

হযরত উমর ফারুক রা. এ বিষয়টিকে অনুভব করতে সক্ষম হয়েছিলেন। জনাব রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হুদায়বিয়া নামক স্থানে বসে চৌদ্দশত সাহাবীর থেকে জিহাদের জন্য বাইয়াত গ্রহণ করেছিলেন। তিনি একটি বাবলা গাছের নিচে বসেছিলেন। এখানে বসেই বাইয়াত গ্রহণ করলেন। যেটি ছিল একটি সাময়িক ব্যাপার।

একটি বাস্তব সত্য হল এই যে, কোন বুযর্গ ও আল্লাহওয়ালাগণ যে স্থানেই বসেন সেখানেই তাঁদের বরকতের নিদর্শন প্রকাশ পায়। তো সাইয়েদুল আউয়ালিন ওয়াল আখেরিন কোন স্থানে বসবেন আর তথায় বরকত প্রকাশ পাবে না, তা অসম্ভব। ঐ গাছের ভেতর বরকতের নিদর্শন প্রকাশ পেল। সাহাবায়ে কেরাম রা. এই শুরু করলেন যে, যখনই এ পথে যাতায়াত করতেন তখন বরকত লাভের মানসে এ গাছের নিচে দুরাকায়াত নফল নামায আদায় করতেন। যদি নামাযের সময় না হত কিংবা মাকরূহ সময় হত, তবে এ গাছটির নিচে বসে অন্তত কিছু তাসবীহ-তাহলিল আদায় করে নিতেন। বরকত হাসিলের উদ্দেশ্যে তাঁরা এটা করতেন। হযরত উমর ফারুক রা. দেখলেন, এখন সাহাবায়ে কেরামের জামায়াত রয়েছেন, যাঁরা সকলেই আরিফ বিল্লাহ। আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে তারা সঠিকভাবে জানেন ও চিনেন। তাঁরা এ গাছের নিচে শুধু বরকত লাভের উদ্দেশ্যে বসেন, তাদের উদ্দেশ্য কখনো বৃক্ষ পূজা হতে পারে না– এ সবই ঠিক। কিন্তু পরবর্তী প্রজন্মের অন্তরে এ পরিমাণ ইলম ও মারেফাত নাও থাকতে পারে। তারা এ গাছের প্রতি

সম্মান প্রদর্শন করতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত হয়ত বৃক্ষ পূজায় লিপ্ত হয়ে যেকে পারে। এসব বিবেচনা করে তিনি গাছটি কেটে ফেলার নির্দেশ দিলেন। অতঃপর গাছটি কেটে ফেলা হল। সাহাবায়ে কেরাম অসন্তুষ্ট হলেন যে, একটি বরকতময় গাছকে কেটে ফেললেন। হযরত উমর রা. বললেন, এ গাছটি তোমাদের নিকট বরকতময়, কিন্তু আগত বংশধরদের নিকট এটাই ইবাদত ও পূজার কারণ হয়ে দাঁড়াবে এবং এ বাবলা গাছটিই মাবুদে পরিণত হবে, এর পূজা শুরু হয়ে যাবে। দুনিয়ার বিভিন্ন সম্প্রদায় এভাবেই পথভ্রষ্ট হয়েছে। কোথাও বৃক্ষ মাবুদ হয়েছে, কোথাও পানি পূজনীয় হয়েছে। আর এসব এভাবেই হয়েছে যে, কোন বুযর্গ ব্যক্তি সেখানে বরকত হাসিলের উদ্দেশ্যে অবস্থান করেছিলেন। পরবর্তীতে তাঁর অনুসারী ও অনুগামীগণ নেক নিয়তে এর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে উপকৃত হয়েছেন। তাদের পরবর্তী বংশধরদের মধ্যে সে পরিমাণ নেক নিয়ত ও নেক আমল ছিল না, তাই তারা ঐ বস্তুটিকে মাবুদ বানিয়ে নিয়েছে এবং এখান থেকেই শিরকের সূচনা হয়ে গিয়েছে।

আমাদের দারুল উলুম দেওবন্দ-এর প্রথম ছদরে মুদাররিসীন ছিলেন হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ ইয়াকুব সাহেব রহ.। তিনি ছিলেন একজন কামিল আরিফ এবং কাশফ ও কারামতের অধিকারী বুযর্গ ও কামিল ওলী। মাওলানার মধ্যে ধ্যানে মগ্নতার প্রাধান্য ছিল, কিছুটা আত্মহারা ধরণের অবস্থা ছিল তাঁর। যেন অর্ধের বুদ্ধিমান ও অর্ধের বুদ্ধিহারা। চোখ লাল হয়ে থাকত। এক নিমগ্নভাব সদা বিরাজমান ছিল। যে জিনিসের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়তেন সে দিকে আকর্ষণ থেকে যেত। একদিন তিনি বসে ছিলেন, হঠাৎ অন্তরে এ ধারণা জন্ম নিল যে, গঙ্গা নদীর (পদ্মা নদী) উৎপত্তিস্থল কোথায় তা অনুসন্ধান করা উচিত। এটি ভারতের একটি বিরাট নদী। হিন্দুগণ এ নগীর পূজা করে থাকে। গঙ্গার পানিকে তারা অতি সম্মানের বস্তু মনে করে। গঙ্গাকে সামনে রেখে পূজা-পার্বণ করে। নদীতে দাঁড়িয়ে তাদের ধর্মীয় অনুষ্ঠনাদি করে থকে। তাদের অন্তরে এ নদীর প্রতি অনেক সম্মান ও মর্যাদা রয়েছে। এ নদীকে তারা গঙ্গামাতা বলে। অর্থাৎ এ নদী আমাদের মা বা মূল উৎস। তারা যখন গঙ্গার পানি বহন করে নিয়ে যায় তখন পানি কাঁধে থাকা অবস্থায় পায়ে জুতা পরে না, কোথাও বসে না, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নিয়ে যায়। এমনই সম্মান করে তারা এ নদীকে।

মরহুম মাওলানা ইয়াকুব সাহেবের অন্তরে এক আবেগ সৃষ্টি হল যে, এ গঙ্গা নদী কোথা হতে প্রবাহিত হয়েছে? এ নদী প্রবাহিত হওয়ার কারণ কী? অথচ এসব অনুসন্ধান করা একটি অনাবশ্যকীয় কাজ ছিল। কিন্তু তার অন্তর এ কাজ করার জন্য বদ্ধপরিকর হয়ে গেল। একদিন রাত বারটায় বিছানা থেকে নেমে গঙ্গা নদীর উৎস অনুসন্ধানে বেরিয়ে পড়লেন।

দেওবন্দ থেকে গঙ্গা নদীর দূরত্ব চল্লিশ মাইল। এ চল্লিশ মাইল পথ পায়ে হেঁটে সফর করার জন্য তিনি বেরিয়ে পড়লেন। সকালে যখন তিনি ক্লাসে এলেন না, তখন সমস্ত দারুল উলুমে তালাশ আরম্ভ হল– মাওলানা কোথায় গেলেন? কিন্তু কোথাও তার কোন হদিস পাওয়া গেল না। ছাত্রগণ রেরেশান, শিক্ষকগণ পেরেশান– আমাদের সদরুল মুদাররিসীন গেলেন কেথায়? চতুর্দিকে লোকজন পাঠানো হল। কেউ গেলেন নানুতায়, কেউ গেলেন গাংগুহে, কিন্তু মাওলানার কোন খোঁজই পাওয়া গেল না। সবাই হয়রান-পেরেশান। কেউ কেউ তো কাঁদতে আরম্ভ করে দিলেন যে, মাওলানার কী হল? অপরদিকে মাওলানা সফর করে গঙ্গা নদীর উৎসে যাচ্ছেন, পূর্ণ চব্বিশ ঘণ্টা পায়ে হেঁটে সেখানে গিয়ে পৌছলেন। হিমালয় পর্বতের পাদদেশে ছোট একটি গ্রাম, নাম হলো গাংগুত্রী। এখান থেকে গঙ্গা নদী প্রবাহিত হয়েছে। এখানেই তার উৎস। গ্রামের নাম অনুযায়ী নদীটির গঙ্গা নামকরণ করা হয়েছে। মাওলানা সেখানে গিয়ে পৌছলেন। সেখানে একটি ঝরণাও রয়েছে। মাওলানা সেই গ্রামে সাত দিন অবস্থান করলেন। সাত দিনই নামায, তিলাওয়াত ইত্যাদিতে ব্যস্ত থাকলেন। দিবারাত্র শুধু ইবাদতই করলেন। যেহেতু মাওলানা ছিলেন অত্যন্ত বুযর্গ ব্যক্তি, তাই কাশফেল মাধ্যমে জঙ্গা নদী প্রবাহের কারণ ও মূল বিষয়টি জেনে গেলেন।

মাওলানা বলেন, আমার নিকট প্রকাশ পেল যে, যেখান থেকে গঙ্গা নদী প্রবাহিত হয়েছে, সেখানে হয়ত কোন নবীর কবর রয়েছে অথবা সেটি কোন নবীর বসার স্থান। সে নবীর বরকতের নিদর্শন স্বরূপ সেখান থেকে ঝরণা প্রবাহিত হয়েছে। একে কেন্দ্র করে আজ কওমের পর কওম শিরকে লিপ্ত হয়ে পড়েছে। যাই হোক, গঙ্গা নদীটি হয়ত কোন এক নবীর দুআয় প্রবাহিত হয়েছিল, এতে নবীর বরকতের কিছু নিদর্শনও প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু জাতি অজ্ঞতা বশত সে পানিকে মাবুদ জ্ঞান করে নিয়েছে। প্রথম দিকে হয়ত শুধু সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেছে। কিন্তু যখন তাদের অন্তরে ইলম ও মারিফাত আর অবশিষ্ট থাকেনি তখন নদী ও তার পানি মাবুদে পরিণত হয়েছে, পূজনীয় বস্তুতে রূপান্তরিত হয়েছে। মুসলমানদের ওপর আল্লাহর বিশেষ এক রহমত ও দয়া যে, মক্কায় অবস্থিত জমজমের পানিরও এই অবস্থা, যা হিন্দু সম্প্রদায় গঙ্গা নদী সম্পর্কে মনে করে। কিন্তু আল্লাহ তাআলার মেহেরবানী, আজ পর্যন্ত জমজমের পানির পূজা কেউ করেনি। জমজম কূপকে সামনে রেখে কেউ সিজদা করেনি, সম্মান ও শ্রদ্ধা করেনি। শরীয়তে আদেশ রয়েছে যে, অন্যসব পানি বসে পান কর কিন্তু জমজমের পানি বরকতের জন্য দাঁড়িয়ে কিবলামুখি হয়ে পান কর। এসবই আছে, কিন্তু মুসলমানগণ এ কূপের নিকট বা পানির নিকট কোন প্রকার প্রার্থনা করেন না যে, হে জমজম! আমাকে ছেলে সন্তান দান কর, হে জমজম! আমাকে

খাবার দান কর, মাল-দৌলত দান কর; এসব কেউ করে না। মাবুদ বলে কেউ ধারণাও করে না, বিশ্বাসও করে না। এই উম্মতের উপর এ হল আল্লাহ্ তাআলার ফজল ও করম। এ উম্মতের নিকটও বহু বরকতময় জিনিস রয়েছে। কিন্তু ইবাদত ও পূজার যোগ্য একমাত্র আল্লাহকেই বিশ্বাস করে। গায়রুল্লাহর নিকট মাথা নত করে না।

এটা কি করে সম্ভব হল? এজন্য যে, ইসলাম শুধু শিরককেই বাধা দেয়নি বরং শিরকের দূর হতে দূরতম উপকরণসমূহকেও নিষিদ্ধ করেছে, যাতে শিরকের অনুপ্রবেশ ঘটতে না পারে। এজন্যই এ উম্মত পূর্ণ তাওহীদের উপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। ইসলাম যদি শিরক-এর উপকরণসমূহকে নিষিদ্ধ না করত তবে আমরাও সেসব কাজে লিপ্ত হতাম যেসব কাজে অন্যান্য জাতি লিপ্ত হয়েছে। প্রত্যেক গাছের পূজা করতাম, প্রত্যেক পানির পূজা করতাম, প্রত্যেক পাথরের সামনে মাথা নত করতাম। যাদের মধ্যে অজ্ঞতা রয়েছে তারা আজ যা কিছু করছে তার কোন কিছু থেকেই আপনিও বিরত থাকতেন না। কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ, সম্মিলিতভাবে এ উম্মত গোমরাহীর ওপর কখনো একমত হবে না। মানুষ যদিও অজ্ঞতা ও মূর্খতার কারণে ভুলভ্রান্তি করে থাকে কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক রেখে যাওয়া মূল দীন বিদ্যমান রয়েছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে। মূল দীনে কোন প্রকারের বিকৃতি ঘটবে না। এ হল তার বরকত যে, ইসলাম তাওহীদকে গ্রহণ করেছে এবং শিরকে বর্জন করেছে; আর শিরকের দূরতম উপকরণকেও বন্ধ করে দিয়েছে। সাহাবায়ে কেরামের যুগেই শিরকের অনুপ্রবেশকে বন্ধ করে দেয়ার কাজ শুরু হয়েছিল। হাদীসে একটি ঘটনা বর্ণিত হয়েছে যে, দামেশকে একজন নবীর কবর ছিল। ঘটনা চক্রে বৃষ্টিপাতের কারণে বা অন্য কোন কারণে কবরটি উন্মুক্ত হয়ে পড়ল। এ কবরে একটি কিতাব পাওয়া গেল। এ কিতাবে এমন কিছু নিয়মনীতি লিপিবদ্ধ ছিল, যেগুলো দ্বারা ভষ্যিতের কিছু সংবাদ জানা সম্ভব হত। কোন এক ব্যক্তি এগুলো পড়ে বলতে লাগল যে, আগামীকাল এটা হবে, পরশু এটা হবে ইত্যাদি। এতে জনগণের মধ্যে ফেৎনার সৃষ্টি হল। এক পর্যায়ে ঐ ব্যক্তি দাবি করে বসল, আমি নিজে একজন নবী। দেখ, আমি তিনদিন পরের কথা বলে দিচ্ছি যে, এই হবে, এক সপ্তাহ পরে এই হবে। সেই কিতাব দেখে দেখে এ জাতীয় কর্থাবার্তা বলতে আরম্ভ করল। এতে জনসাধারণের মধ্যে ফেৎনা দেখা দিল। হযরত ফারুকে আযম রা.কে বিষয়টি জানানো হলে তিনি মদীনা থেকে সুদূর শামের সফর করলেন এবং বায়তুল মুকাদ্দাস গিয়ে পৌছলেন। ঐ ব্যক্তিকে ডেকে পাঠানো হল এবং তার থেকে কিতাবটি নিয়ে নেয়া হল। এ বিতাবে এমন কিছু রীতিনীতি লেখা ছিল যা দ্বারা ভবিষ্যতের কিছু কিছু বিষয়

অবগত হওয়া সম্ভব হত। কিন্তু এ কথা স্পষ্ট যে, কোন নিয়মনীতির মাধ্যমে যেসব কথা জানা যায় তা অকাট্য ও নিশ্চিত কিছু হয় না; তা কেবল ধারণাপ্রসূত বিষয় হয়ে থাকে । যেমন, কোন ডাক্তার যদি চিকিৎসা বিজ্ঞানের নিয়মনীতি অনুযায়ী ভবিষ্যদ্বাণী করে যে, অমুক রোগী তিনদিন পর মারা যাবে তবে এটা কোন ঐশী বাণী নয় যে, তার প্রতি ঈমান আনতে হবে। এটি একটি ধারণপ্রসূত কথা মাত্র, হতেও পারে আবার না হওয়ারও সম্ভাবনা আছে। অনেক মানুষ রাজনৈতিক ভবিষ্যদ্বাণী করে থাকেন যে, দুই বছর পর অমুক রাষ্ট্রের এ অবস্থা হবে। তারা তাদের অভিজ্ঞতা এবং রাজনৈতিক নিয়মনীতি অনুসারে বলে থাকেন। এগুলো এমন ঐশী বাণী নয় যে, তা বিশ্বাস করতে হবে। প্রত্যেক বিষয়ের অভিজ্ঞ ব্যক্তি তার বিষয় ও বিভাগ সম্পর্কে কিছু কিছু ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারে। এভাবে উলামায়ে কেরামও এমন কিছু নিয়মনীতি লিখেছেন, যা দ্বারা পরবর্তী কালের কিছু কথাবার্তা সম্পর্কে জানা যায়, ভবিষ্যতের কিছু জিনিস সম্পর্কে অবগত হওয়া যায়।

ইসলাম এ সকল জিনিস থেকে এজন্য বাধা প্রদান করেছে যে, এ সবই হল আনুমানিক জিনিস, নিশ্চিত কিছুই নয়। এসবের প্রতি ঈমান গ্রহণ করা আবশ্যকীয় নয়। সঠিকও হতে পারে আবার বিপরীত বিষয়টিও হতে পারে। মুমিনের কর্তব্য হল আল্লাহর উপর ভরসা রাখা। আল্লাহ তাআলা তাঁর পয়গাম্বর আ.-এর মাধ্যমে যেসব সংবাদ দিয়েছেন সেগুলোকেই অকাট্য ও নিশ্চিত বিষয় বলে জানবে অন্য কোন বিষয় অটাক্য ও নিশ্চিত নয়।

হযরত উমর কারুক রা.-এর সামনে কিতাবটি উপস্থাপন করা হল। যে কবরটি উন্মুক্ত অবস্থায় ছিল সেখানে তিনি আরো এগারটি নতুন কবর খনন করার জন্য আদেশ দিলেন। এগারটি কবর খনন করা হল এবং ঘোষণা করা হল যে, নবীর যে লাশ মোবারক প্রকাশ হয়ে পড়েছিল তা পুনরায় দাফন করা হবে। লাশ মোবারক কবর থেকে বের করে আনা হল। রাত্রে যখন সবাই ঘুমিয়ে পড়ল, তখন এগারটি কবরের একটিতে নবীর লাশ দাফন করে দেয়া হল এবং কিতাবটিও তাঁর সাসে দিয়ে দেয়া হল। এরপর সবগুলো কবর সমতল করে দেয়া হল। তখন মানুষ বুঝতে পারল না যে, কোন কবরেটিতে কিতাব খানা দাফন করা হয়েছে। সন্ধানও করতে পারল না। চিরকালের জন্য কিতাবটি দৃষ্টির আড়ালে চলে গেল। এ কাজটি এজন্য করলেন যে, যদি কিতাবটি থেকে যেত তবে লোকজন এ দ্বারা নানান ফেৎনা ছড়াত। এ দ্বারা মানুষ ভবিষ্যদ্বাণী করে নিজেকে নবী বলে দাবি করত, তার ইলহাম হয় বলে প্রচার করত। এর দ্বারা খতমে নবুওয়াতকে অস্বীকার করা হত। কাজেই অনেক দূরের সম্ভাবনাকে বন্ধ করে দিলেন, যেন লোকজন কবরটিকে ছিনতেই না পায়।

যাই হোক, তাওহীদের পূর্ণতার জন্য ইসলাম এ জাতীয় উপকরণকে নিষিদ্ধ করেছে। যাতে করে তাওহীদ পূর্ণাঙ্গরূপে মানুষের অন্তরে প্রবেশ করতে পারে।

গুনাহের উপকরণাদিও হারাম

একই কারণে 'শিরকের ধারণা জন্মাতে পারে'– এমন সম্মান প্রদর্শনকে ইসলাম নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। যেমন ফিকাহবীদগণ লিখেছেন– কাউকে সালাম করার সময় ঝুঁকে সালাম কর না। মুসলমানের সালাম হল 'আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু'। সালাম দেয়া ও গ্রহণ করার সময় ঝুঁকে যাওয়া বা মাথা নত করা শরীয়তে নেই। এগুলোকে নিষেধ করা হয়েছে। সামান্য ঝুঁকে গেলে তাতে অসুবিধা নেই, কিন্তু যদি এত অধিক পরিমাণ ঝুকে যায় যে, রুকুর মত মনে হয় তখন তাকে শাস্তি দেয়া হবে। এ কারণে যে, সে ইবাদতের আকার ধারণ করেছে। অথচ মানুষের ইবাদত করার কোন বিধান শরীয়তে রাখা হয়নি। তাই সালামে যে পরিমাণ ঝুঁকে যাওয়া দ্বারা রুকুর আকার হয়ে যায় তাকে মাকরূহ তাহরিমী সাব্যস্ত করা হয়েছে। এর দ্বারা শিরক হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। ইসলাম এমনই সতর্কতা অবলম্বন করেছে। আর দূরতম উপকরণকেও নিষিদ্ধ করছে।

এমনিভাবে ব্যভিচার ও অন্যান্য গুনাহের ব্যাপারেও অত্যন্তসতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে। যেমন ব্যভিচার প্রতিরোধ করা উদ্দেশ্য, অথচ তাকে প্রতিরোধ করার জন্য ব্যভিচার হওয়ার যত উপায়-উপকরণ ছিল তাকে হারাম সাব্যস্ত করা হয়েছে। অপর মহিলার প্রতি ইচ্ছাকৃত দৃষ্টিপাতকে নিষিদ্ধ করেছে। তাকে স্পর্শ করা নিষিদ্ধ, তার পদাঙ্কানুসরণে চলা নিষিদ্ধ। অথচ প্রকৃতপক্ষে কোন মহিলাকে দেখা কোন নিষিদ্ধ জিনিস নয়, খারাপ বিষয় নয়। মন্দ ও খারাপ কাজ হলো ব্যভিচার। কিন্তু যেহেতু অনেক সময় এগুলো মূল অপকর্মটির মাধ্যম হয়ে থাকে তাই এগুলোকেও নিষিদ্ধ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, মহিলারা যেন সুগন্ধি ব্যবহার করে রাস্তায় বের না হন। এজন্য যে, সুগন্ধিও একটি আহ্বান– আমাকে দেখ। সুগন্ধি যখন মানুষের নাকে প্রবেশ করবে, তখন তাদের মনোযোগ আকৃষ্ট হবে। তাই হাদীসে বলা হয়েছে, সুগন্ধি ব্যবহার করে যে মহিলাগণ ঘরের বাইরে যায়, তারা ব্যভিচারিণীদের অন্তর্ভুক্ত। সে যেন এ পাপকর্মে লিপ্ত আছে এবং এ অপকর্মের জন্য লোকজনকে দাওয়াত দিচ্ছে। শরীয়ত এমনই সতর্কতা অবলম্বন কেরছে। সুতরাং পর্দাহীন অবস্থায় বাইরে বের হওয়া, সুগন্ধি লাগিয়ে বের হওয়া কিংবা এমন অলংকার পরিধান করে বের হওয়া যার আওয়াজ অন্যদের কর্ণগোচর হয়– এসব কিছুই নিষিদ্ধ করেছে। যাতে করে মানুষ মূল পাপকর্ম থেকে বিরত থাকে। ব্যভিচার থেকে বিরত রাখাই এর মূল উদ্দেশ্য।

উপরোক্ত কাজগুলো মূলত নাজায়িয ছিল না, কিন্তু নিষিদ্ধ করা হয়েছে এ জন্য যে, যাতে এগুলো ব্যভিচারের কারণ হয়ে না দাঁড়ায়। একে শরীয়তের পরিভাষায় سدّ الذرائع বা উপসর্গ বন্ধকরণ বলা হয়। অর্থাৎ মাধ্যমগুলোকে প্রতিরোধ কর, যেন মানুষ তার অসৎ উদ্দেশ্যে সফল হতে না পারে।

এমনিভাবে চুরি করাকে প্রতিরোধ করা উদ্দেশ্য; যাতে অন্যায়ভাবে অপরের সম্পদ কেউ না নেয়। তাই অন্যের ঘরে দৃষ্টিপাত করা, খবরা খবর নেয়া, দেয়ালের প্রতি লক্ষ্য করা যে, কোন দিক দিয়ে কিভাবে ভাঙ্গা যায়, মালামাল কোথায় কিভাবে রক্ষিত আছে তার খোঁজ নেয়া– এ জাতীয় দেখাকে শরীয়ত নিষিদ্ধ ও হারাম সাব্যস্ত করেছে। এজন্য যে, আজ যে ব্যক্তি এভাবে দেখছে সে আগামীকাল হয়ত চুরি করবে। এ দেখাই তার চুরির জন্য সহায়ক হবে। কাজেই চুরি থেকে বিরত রাখার জন্য এর যত উপকরণ আছে, চুরির প্রতি উৎসাহিত করার যত বিষয় রয়েছে, সবই নিষিদ্ধ ও নাজায়িয সাব্যস্ত করা হয়েছে।

হাদীসে ইরশাদ করা হয়েছে–

مَن أتى عَرَّافًا فقد كَفَرَ بِمَا أنزلَ على محمد صلى الله عليه وسلم.

যে ব্যক্তি কোন যাদুকর বা গণকের নিকট গমন করল সে যেন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক আনীত শরীয়তকে অস্বীকার করল।

অথচ যাদুকরের কাছে গমন করা স্বতন্ত্রভাবে কোন কুফরী কাজ নয়। কেননা, সে যখন যাদুকরের নিকট গমন করল তখন আল্লাহর তাওহীদকে অস্বীকার করেনি, নবী-রাসূল, ফেরেশতা, কিয়ামত ইত্যাদি অস্বীকার করেনি। অথচ ঈমানের সম্পর্ক হল এ সমস্ত জিনিসের সাথে। কাজেই এসবের উপর বিশ্বাস থাকা অবস্থায় সে কুফরী কেমন করে করল? বলা হয়েছে– কারণ এই যে, আজ যখন সে যাদুকর বা গণকের কাছে গেল তখন সর্বপ্রথম যাদুবিদ্যার 'নিকৃষ্টতা' তার অন্তর থেকে বেরিয়ে গেল। অর্থাৎ যাদু করা হারাম বলে তার অন্তরে যে বিশ্বাস ছিল, সে পবিত্র বিশ্বাসটি অন্তর থেকে বেরিয়ে গেল। দ্বিতীয় দিন গিয়ে যাদুকরকে বলবে আমাকেও দু'একটি মন্ত্র শিখিয়ে দাও। একটি মন্ত্র সে শিখে নিবে। তৃতীয় দিন সে নিজে মন্ত্র করবে। চতুর্থ দিন সে নিজে একজন যাদুকর হয়ে যাবে এবং এভাবে কুফরীতে লিপ্ত হয়ে পড়বে। এ থেকে রক্ষা করার জন্য এভাবেই বাধা প্রদান করা হয়েছে যে, যাদুকরের কাছে যাওয়াই কুফরী। একেই

বলা হয় আমলের পূর্ণতা। অর্থাৎ গুনাহের দূরতম অনুসর্গকেও বন্ধ করে দাও, যেন মূল গুনাহে লিপ্ত হওয়ার সুযোগ না পায়।

তেমনিভাবে শরাব বা মাদকদ্রব্য প্রতিরোধ করা ছিল উদ্দেশ্য, কিন্তু বলা হল-

مَا أسكرَ كثيرُه فقليله حرام.

যে জিনিস অধিক পরিমাণে ব্যবহারে নেশা হয় তার সামান্য অংশ ব্যবহার কারাও হারাম।

অর্থাৎ শরাবের পূর্ণ এক গ্লাস পান করা যেমন হারাম, এক ফোঁটা চেখে দেখাও তদ্রূপ হারাম। শরাবকে 'নাজাসুল আইন' বলা হয়েছে, যেমন শুকর নাজাসুল আইন। অর্থাৎ তার যাত-ই (সম্পূর্ণ অস্তিত্ব) নাপাক। তদ্রূপ শরাবের ব্যাপারেও বলা হয়েছে যে, তার যাত ও জাওহার (অস্তিত্ব ও স্বরূপ) সবই নাপাক। এজন্যই বলা হয়েছে যে, এর এক ফোঁটাও সেভাবে হারাম যেভাবে এক ঢোক বা এক পেয়ালা পান করা হরাম।

তবে কেউ যদি এ প্রশ্ন করে, শরাব এজন্য হারাম করা হয়েছে যে, এর দ্বারা মানুষ নেশাগ্রস্থ হয়ে পড়ে এবং নেশার দ্বারা জ্ঞান বুদ্ধি হারিয়ে যায়। কিন্তু এক ফোঁটা পান করলে তো নেশার সৃষ্টি হয় না, তবু কেন তা হারাম করা হল? এ ক্ষেত্রেও কারণ ঐ একটাই, আজ যে ব্যক্তি এক ফোঁটা পান করবে, সে আগামীকাল এক ঢোক পান করবে, আগামীকাল যে এক ঢোক পান করবে, পরশু সে এক গ্লাস পান করবে। আর যে ব্যক্তি পরশু এক গ্লাস পান করবে সে চতুর্থ দিনে গিয়ে শরাবীতে পরিণত হয়ে যাবে। তাই শরাবী হওয়া প্রতিরোধ করার জন্য এক ফোঁটাকেও নিষিদ্ধ করা হয়েছে, যেন প্রথম পদক্ষেপেই মানুষ ফিরে থাকে।

শুধু এই নয় যে, এক ফোঁটা বা এক ঢোক পান করাই কেবল হারাম; বরং জাহিলিয়াতের যুগে শরাব পানের জন্য যে চার প্রকার পাত্র ব্যবহৃত হত সেগুলোকেও নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। আজকাল যেমন শরাব পানের বিশেষ পাত্র– জাম (পানপাত্র) ও সুরাহী (সুরা পাত্র)-এর পৃথক পৃথক ব্যবহার রয়েছে, জাহিলিয়াতের যুগেও এরূপ ছিল। তারা চার প্রকার পাত্রে ব্যবহার করত- হানতাম, দুববাহ, নাকীর ও মুযাফফাত।

'দুববাহ' ছিল এক বিশেষ ধরনের লাউ, যার ভিতর খুঁড়ে খালি করে নিয়ে এতে শরাব রাখা হত। এতে শরাবে অতিরিক্ত নেশার সৃষ্টি হত। এভাবে 'নাকীর' একটি বিশেষ বৃক্ষের মূল, এটাকে খুঁড়ে পেয়ালা বানানো হত, এর উপর তেল ও অতি উন্নতমানের রং লাগিয়ে তাতে শরাব পান করা হত। এতে শরাবকে উন্নত মনে হত।

এভাবে অন্যান্য পাত্রগুলো ছিল। হাদীসে বলা হয়েছে, শরাব পান করা যেমন হারাম, এ চার প্রকারের পাত্রের ব্যবহারও তদ্রূপ হারাম। এগুলো দিয়ে পানি পান করাও নিষিদ্ধ। এজন্য যে, পানি পানকালে হয়ত শরাবের কথা স্মরণ হয়ে যেতে পারে এবং মন তার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়তে পারে।

এই দীর্ঘ আলোচনা দ্বারা আমার উদ্দেশ্য হল এই, প্রকৃতপক্ষে হারাম কাজ থেকে বিরত রাখা শরীয়তের উদ্দেশ্য, কিন্তু এ উদ্দেশ্য হাসিল কারার জন্য অনেক দূরের উপায়গুলোকেও বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। যেন মানুষ সেগুলোর কাছেও পৌঁছতে না পারে। যাই হোক, শিরক ছিল একটি গর্হিত কাজ। একে প্রতিরোধ করার জন্য এর যতগুলো মাধ্যম ও উপায়-অনুসঙ্গ ছিল সেগুলোকেও নিষিদ্ধ করা হয়েছে, যেন মানুষের মধ্যে পরিপূর্ণ তাওহীদ ও পরিপূর্ণ তাকওয়ার সৃষ্টি হয়।

আপনারা সগীরা গুনাহ ও কবীরা গুনাহ'র কথা শুনেছেন। সগীরা ও কবীরা গুনাহর সংজ্ঞা হল এই– প্রত্যেকটি গুনাহর মধ্যে যে কাজটি মূল উদ্দেশ্য হয়, তা হলো কবীরা গুনাহ, আর যে সব কাজ সে গুনাহ'র মাধ্যম ও আনুষঙ্গিক বিষয় হয়ে থাকে সেগুলো হল সগীরা গুনাহ। ব্যভিচার একটি কবীরা গুনাহ। অপর মহিলাকে দেখা, স্পর্শ করা, খারাপ উদ্দেশ্যে তার নিকট যাওয়া– এ সবই সগীরা গুনাহ। আল্লাহ না করুন, যদি ঐ মূল অপকর্মটি ঘটে যায়, তাহলে তার এ সব গুনাহ-ই উপস্থিত করা হবে এবং সবকিছুর শাস্তি ভোগ করতে হবে। আর যদি এ সবই করে কিন্তু মূল পাপকর্মটি সংঘটিত না হয়, তাহলে এসব গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে। সৎকর্ম দ্বারা সগীরা গুনাহ মাফ হয়ে যায়। তাই ইসলামী শরীয়ত শুধু গুনাহকেই প্রতিরোধ করেনি বরং গুনাহ'র আনুষঙ্গিক বিষয়াবলী, অর্থাৎ সগীরা গুনাহকেও প্রতিরোধ করেছে। যেন মানুষ প্রকৃত গুনাহ থেকে অনেক দূরে অবস্থান করে। প্রকৃতপক্ষে এগুলো হল দীনের পূর্ণতা। অর্থাৎ মূল উদ্দেশ্য থেকে বিরত রাখার জন্য এর উপায়-উপকরণ ও আসক্তি সৃষ্টিকারী বিষয়াবলীকে পর্যন্ত প্রতিরোধ করা হয়েছে। এভাবেই পূর্ণাঙ্গ বিধান তৈরি করা হয়েছে।

ফরযের আনুষঙ্গিক বিষয়ে সাওয়াব ও প্রতিদান

অনুরূপভাবে ফরয ইবাদতগুলোর মধ্যে ফরযই প্রকৃত উদ্দেশ্য। কিন্তু ফরযকে সম্পাদন করার জন্য আনুসঙ্গিক নানা উপকরণকে বিস্তৃত করে রাখা হয়েছে। যেমন, মূল উদ্দেশ্য হল নামায, যা একটি ফরয কাজ। কিন্তু এর জন্য ইসলামী শরীয়ত অনেক দূর থেকে কার্যক্রম শুরু করেছে। বলা হয়েছে, এক ব্যক্তি লেপ জড়িয়ে ঘুমিয়ে রয়েছে, এমন সময় আযান দেয়া হল, মুয়াজ্জিন 'হাইয়া আলাস

সালাহ' বলার সাথে সাথে তার শয্যা ত্যাগ করা উচিত। এজন্য যে, যদি সে মনে করে– মাত্র আযান হচ্ছে, আযান দিতেই তো পাঁচ মিনিট লেগে যাবে, তারপর নামায শুরু হতে আরো পনের মিনিট সময় রয়েছে, আরেকটু ঘুমিয়ে নেই। তবে সে এমন করতে করতে আধা ঘন্টা ঘুমাবে। এভাবে সে জামাত থেকে বঞ্চিত হবে, মসজিদে যাওয়াই নসিব হবে না। তাই বলা হয়েছে, হাইয়া আলাস সালাহ আওয়াজ কানে আসার সাথে সাথে উঠে দাঁড়াও, এটাই সহজ হবে। অতঃপর ব্যক্তি ওযু করল। বলা হয়েছে, মানুষ যখন ওযু করতে বসে, তখন যে অঙ্গ ধৌত করে সে অঙ্গ দ্বারা সম্পাদিত গুনাহ ঝরতে শুরু করে। হাত দ্বারা গুনাহ করেছে, যখন হাত ধৌত করবে তখন হাতের নখ থেকে গুনাহগুলো ঝরে যাবে, যখন পা ধৌত করবে তখন পায়ের গুনাহগুলো ঝরে যাবে, যখন কুলি করবে তখন মুখের দ্বারা সম্পাদিত গুনাহ ঝরে যাবে। যখন নাকে পানি দেবে তখন নাজায়িযভাবে ঘ্রাণ নিয়ে যে গুনাহ করেছে সেসব গুনাহ ঝরে যাবে।

حتى يخرج نقيا من الذنوب

যখন ওযু করে উঠবে তখন এমনভাবে পবিত্র হয়ে যাবে যেন সে এ সকল গুনাহ করেইনি।

এসকল পবিত্রতা নামাযের জন্য করা হচ্ছে। এরপর বলা হয়েছে, ওযু করে যখন নামাযের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হবে, তখন মসিজদ পর্যন্ত যেতে যেতে প্রতি কদমে একটি নেকী লেখা হয় এবং একটি গুনাহ মাফ করে দেয়া হয়। এ থেকে নেকীর একটি ভাণ্ডার তার কাছে জমা হয়ে গেল। অতঃপর বলা হয়েছে, যদি মসজিদে গিয়ে নামায শুরু হওয়ার পূর্বে কিছুক্ষণ বসে থাকে এবং জামায়াতের অপেক্ষা করে, তবে নামাযের জন্য অপেক্ষমান ব্যক্তিকে নামাযরত ব্যক্তি বলে গণ্য করা হবে। অপেক্ষাকালীন অবস্থায়ও সে পরিমাণ সাওয়াব দেয়া হবে, যে পরিমাণ সাওয়াব নামায পড়াকালীন দেয়া হয়। এখান থেকেও সাওয়াবের এক ভাণ্ডার তৈরি হল। প্রথম থেকে সাওয়াবের ওয়াদা করা হয়েছে– যদি লেপ ত্যাগ করে উঠে পড়ে তবে সাওয়াব; ওযু করার সময় প্রতিটি অঙ্গ ধোয়ার সাথে সাওয়াব, মসজিদের দিকে যাওয়া অবস্থায় প্রতি কদমে সাওয়াব; মসজিদে গিয়ে জামায়াতের জন্য অপেক্ষমান অবস্থায় প্রতি মিনিটে সাওয়াব। প্রকৃত উদ্দেশ্য নামাযে সাওয়াব প্রদান করা। এজন্য একটি ধারাবাহিক কর্মসূচি প্রদান হয়েছে। যেন নামায কাযা হয়ে যাওয়ার কোন সম্ভবনা অবশিষ্ট না থাকে।

অবৈধ ও অন্যায় কার্যকলাপ থেকে বিরত রাখার জন্য যেভাবে তার আনুসঙ্গিক বিষয়াবলী থেকে বিরত থাকার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে, ঠিক সেভাবে ফরয ইবাদতগুলোর সাথেও কিছু আনুসঙ্গিক বিষয়াবলী সংযুক্ত হয়েছে। যাতে করে

মানুষ পরিপূর্ণভাবে তার দীনকে পালন করতে পারে।

এসব কথা আমার এজন্য স্মরণ হলো যে, ঐ ব্যক্তি প্রশ্ন করেছিল– ইসলাম আমাদেরকে এমন কী নতুন জিনিস দিয়েছে যে, আমরা তার প্রতি আকৃষ্ট হব। আমি বলেছিলাম, ইসলাম নতুন কোন দীন নিয়ে আসেনি। দীন তো সেই দীনই যা সকল পয়গাম্বরের ছিল। তবে ইসলাম ঐ দীনের পূর্ণতা এনেদিয়েছে। প্রত্যেকটি হুকুমকে এমনই পূর্ণতা দান করেছে যে, সেগুলো স্বতন্ত্রভাবে এক একটি বিধান, এক একটি নীতিতে পরিণত হয়েছে। তাওহীদের পূর্ণতা, নামাযের পূর্ণতা, সদকার পূর্ণতা, হজ্জের পূর্ণতা, নিদ্রা ও জাগরণের সময়কে ইবাদত দ্বারা পূর্ণতা দান– এসব কিছুই একমাত্র ইসলামেরই অবদান। আমরা তারই দাওয়াত দিচ্ছি। অন্যান্য ধর্মে এ সমস্ত বিষয় পাওয়া যায় না। প্রত্যেক ধর্ম বলবে, ব্যভিচারে লিপ্ত হয়ো না, এটা অত্যন্ত জঘন্য বিষয়। কোন ধর্মই এর অনুমতি দেয় না। কিন্তু এ থেকে বেঁচে থাকার উপায় কী? ব্যভিচার থেকে আত্মরক্ষার জন্য ইসলামের মত এমন দীর্ঘ এক ধারাবাহিক বিধান কোথাও প্যওয়া যাবে না। প্রত্যেক ধর্ম বলবে, শরাব পান করো না। কিন্তু ইসলাম শরাব তৈরির উপকরণ ও পানপাত্রকেও প্রতিরোধ করেছে। আরো হলা হয়েছে, এমন লোকের সাহচর্য গ্রহণ করো না যার দ্বারা শরাব পানের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হতে পারে। এমন দুর্জন ব্যক্তিদের কাছেও যেও না যারা তোমাদেরকে শরাব পান করাবে বা শরাবের প্রতি আগ্রহী করে তুলবে।

ইসলামের প্রতিটি বিধানের বৈশিষ্ট এই যে, সকল প্রকার আশঙ্কা, সম্ভাবনা ও উপকরণকে প্রতিরোধ করা হয়েছে। প্রতিটি আদেশ-নিষেধ যেন এক একটি স্বতন্ত্র পূর্ণাঙ্গ বিধান। একেই বলে দীনের পূর্ণতা। এ পূর্ণতা জনাব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বরকতে লাভ হয়েছে। পূর্ণাঙ্গ দীন একটি স্বতন্ত্র নেয়ামত। আর এ নেয়ামতের বাহক হলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। এ কারণেই পৃথিবীতে তাঁর আগমন সবচেয়ে বড় নেয়ামত।

আল্লাহর পক্ষ হতে উপহার

এক হাদীসে জনাব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

انا رحمة مهداة

আমি আল্লাহর পক্ষ হতে মানুষের জন্য উপহার স্বরূপ প্রেরিত এক বিশেষ রহমত।

আল্লাহ তাআলার যে উপহারটি মানব জাতি লাভ করেছে তা হল রাসূল সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বরকতময় সত্তা। এমন মহান নেয়ামত দান করা হয়েছে যে, বিশ্বজগতের যত নেয়ামত রয়েছে সবই তাঁর উসিলায় পাওয়া যাচ্ছে। আমাদের জীবন একটি নেয়ামত, যা তাঁরই তোফায়েছে পেয়েছি। হযরত আদম আ.কে বলা হল যে, যদি তাঁকে সৃষ্টি করা না হত তবে তোমাকেও সৃষ্টি করতাম না। যদি আদম আ.কে সৃষ্টি করা না হত, তবে আমি-আপনি কোথা থেকে আসতাম? আমাদের অস্তিত্ব ও জীবন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর তোফায়েলে প্রাপ্ত। জীবন প্রাপ্তির পর বিশ্বে যত নেয়ামতরাজি রয়েছে তাও তাঁরই তোফায়েলে প্রাপ্ত। কেননা যদি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আগমন না হত তবে এই বিশ্বজগত সৃষ্টি করা হত না। আমরা পানীয় ও আহার্য রূপে যত নেয়ামত পাচ্ছি সবই তাঁর তোফায়েলে পাওয়া যাচ্ছে। পরকালে যদি নেয়ামত মেলে তবে তা মিলবে ঈমানের বরকতে। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের জন্য ঈমান এনে দিয়েছেন। ঈমানও একটি স্বতন্ত্র নেয়ামত। মোটকথা, দুনিয়া থেকে কবর পর্যন্ত এবং কবর থেকে হাশর পর্যন্ত নেয়ামতের একটি ধারাবাহিকতা রয়েছে। এ সবই লাভ হচ্ছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর তোফায়েলে। কজেই এ নেয়ামত পেয়ে যতই গৌরব করা হোক না কেন, তা তুলনামূলক কমই হবে। আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হক আমরা যতই অনুধাবন করি না কেন, তা সামান্যই হবে।

জনাব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হক আমাদের উপর মৌলিকভাবে তিন প্রকার, যেগুলো আদায় করা আবশ্যক। এক. আযমত বা শ্রেষ্ঠত্বের সম্মান প্রদর্শন। দুই. মুহাব্বত বা ভালবাসা। তিন. মুতাবায়াত বা আনুগত্য। আযমতের অর্থ হল এই, তাঁকে এমন মহান মনে করা যে, আল্লাহ তাআলার র সৃষ্টিরাজির মধ্যে তাঁর মত এমন মহান আর কিছুই নেই।

بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر

আল্লাহর পর আপনিই মহান, এটাই সংক্ষিপ্তসার।

দ্বিতীয় জিনিস হল মুহাব্বত বা ভালবাসা। কারো অন্তরে যদি তাঁর প্রতি ভালবাসা না থাকে তবে তার ঈমানই নসীব হবে না। আমরা তাঁকে অন্তর দিয়ে ভালবাসব– আমাদের উপর এ হল তাঁর অধিকার। আর ভালবাসার বৈশিষ্ট্য এই যে, শুধু প্রিয়জনই প্রিয় হয় না, বরং তাঁর প্রতিটি কাজ, প্রতিটি ভঙ্গি প্রিয় হয়ে যায়। কারো সাথে ভালবাসা থাকলে মানুষ চায় যে, আমিও আমার আকার-আকৃতি আমার প্রিয়জনের মত করে নেই, আমার চালচলন আমার প্রিয়জনের

মত করে নেই, আমার বসবাসেরও ধরণও যেন আমার প্রিয়জনের মত হয়। বন্ধুর সাথে যখন সত্যিকারের ভালবাসা হয়ে যায়, তখন তাঁর প্রতিটি অঙ্গভঙ্গি প্রিয় হয়ে ওঠে। তার বাড়ি-ঘর, আসবাবপত্র প্রিয় হয়ে যায়। যেমন মজনু লাইলীর প্রতি আসক্ত হয়ে পড়েছিল, জনসাধারণ তখন দেখল, মজনু লাইলীর ঘরের এক একটি ইটকে চুম্বন করছে। মানুষ তখন জিজ্ঞেস করল, ভাই ইটে কী আছে? মজনু তখন এই কবিতাটি পাঠ করল–

أمرُّ على الدِّيار دِيار ليلى :: أقبلُ ذا الجدار وذا الجدارا

আমি যখন লাইলীর ঘরের পাশ দিয়ে যাই তখন কখনো এই ইটকে চুমু খাই, কখনো ঐ ইটকে চুমু খাই, কখনো অলিন্দকে আবার কখনো তার দরজাকে চুম্বন করি।

وما حب الديار شغفن قلبى :: ولكن حب من سكن الديارا.

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এসব ইট আমার হৃদয়কে আচ্ছন্ন করে রাখেনি; বরং আমার ভালবাসা হল তার সাথে যিনি এ ইটের বেষ্টনীতে রয়েছেন।

তার কারণেই ইটগুলো আমার প্রিয় হয়ে গিয়েছে। তিনি আমার প্রেমাস্পদ বিধায় আমার কাছে তার ঘরটিও প্রিয়, এমনকি কুকুরটিও প্রিয়।

জনাব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের প্রিয়জন বিধায় তাঁর আবাসভূমি মদীনাও আমাদের প্রিয়, কারণ এটি তাঁর শহর। মসজিদে নববীও আমাদের প্রিয়, কারণ এটি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মসজিদ। মদীনার বাসিন্দাগণও আমাদের প্রিয় এবং নিজেদেরকে আমরা তাদের সেবক মনে করি, কারণ তাঁরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পড়শী। যখন প্রিয়জন প্রিয়, তখন তার সকল কাজ-কর্ম ও অঙ্গভঙ্গি প্রিয়। তাঁর সাথে যাদের নাম সংযুক্ত হয়েছে কিংবা সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে তারাও আমাদের প্রিয়জনে পরিণত হয়েছে। সুতরাং সেই দেশ, সেই ভূখণ্ড এবং সেই স্থানে বসবাসকারীগণও আমাদের প্রিয়।

সর্ববৃহৎ নেয়ামতের মর্যাদা অনুধাবনকারীগণ

আযমত বা শ্রেষ্ঠত্ব অনুধাবনকারীগণই কেবল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করেছেন। আমরা তো শুধুই মুখে দাবি করছি, কিন্তু প্রকৃত সম্মান প্রদর্শনকারীগণ তো চলে গেছেন। প্রকৃত সম্মান যারা

প্রদর্শন করেছিলেন তাদের একজন হলেন ইমাম আবু হানিফা রহ.। হজ করতে গিয়ে মদীনায় অবস্থান শেষে তিনি যখন ফিরে যেতে চাইলেন তখন মদীনাবাসী এসে তাঁর পথ রুদ্ধ করে দিয়ে বললেন, আমরা আপনাকে যেতে দেব না। ইমাম সাহেব রহ. প্রকৃত সম্মান অনুধাবন করতে সক্ষম হয়েছিলেন বিধায় মদীনাবাসীর সম্মানে ও ভালবাসায় তাদের অনুরোধ রক্ষা করার জন্য থেকে গেলেন। পাঁচদিন অতিবাহিত হওয়ার পর পুনরায় যখন রওয়ানা হলেন, তখনও মদীনাবাসী এসে বাধা দিলেন যে, আমরা এখনও যেতে দেব না। তিনি বহু অনুনয়-বিনয় করলেন, বহু অপারগতা পেশ করলেন কিন্তু মদীনাবাসী মানতে চাইলেন না। এবারও তিনি থেমে গেলেন। এভাবে কয়েকবার করতে করতে যখন এগার দিন হয়ে গেল তখন ইমাম সাহেব রহ. চলে যাওয়ার ইচ্ছা করলেন। এবারও মদীনাবাসী আরো কিছু দিন থেকে যাওয়ার অনুরোধ করলেন। ইমাম সাহেব রহ. বললেন, এরপর অবস্থান করা আমার শক্তি ও সামর্থ্য বহির্ভূত। তারা আরয করলেন, হযরত! সামর্থ্যের কথা কেন বলছেন? তিনি বললেন, এগার দিন অতিবাহিত হয়ে গিয়েছে, আজ পর্যন্ত আমি ইস্তেনজা করিনি। একই অযু দ্বারা এতগুলো দিন অতিবাহিত করেছি। এজন্য যে, আমার হৃদয় এটা সহ্য করতে চায়নি যে, রাসূলের মদীনায় এসে এখানে মলমূত্র ত্যাগ করব, এ জমিনকে অপবিত্র করব। জানি না রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পা মুবারক কোথায় কোথায় পড়েছে, আর আমি সেথায় বর্জ্য ত্যাগ করব! এটাই ছিল প্রকৃত আযমত, প্রকৃত সম্মান প্রদর্শন। আপনি-আমি তো এরূপ আযমতের কল্পনাও করতে পারি না। এটা ইমামেরই মর্যাদাগত অবস্থান ও হক ছিল যে, এগার দিন পর্যন্ত একই অযু দ্বারা কাটিয়ে দিয়েছেন। তখন মদীনাবাসী বললেন, এখনই আমরা আপনাকে বিদায় দিচ্ছি। তারা দ্রুত তাঁকে বিদায় করলেন। মদীনা থেকে বের হয়ে তনি ইস্তেনজা করলেন। যাই হোক, এ ছিল এক কারামতের স্তর। সবাই তা করতে পারবে না।

মালেক রহ.কে 'ইমামু দারুল হিজরত' বা মদীনার ইমাম বলা হত। মদীনার সাথে তাঁর ছিল অসীম ভালবাসা। তিনি কামনা করতেন, আমার ওফাত যেন মদীনাতেই হয় এবং মদীনার মাটি যেন আমাকে গ্রহণ করে। তাই শেষ জীবন মদীনায়ই অতিবাহিত করেছেন। মদীনার বাইরে যেন ইনতেকাল না হয়ে যান এ ভয়ে নফল হজ করতেও যাননি।

তাঁর অবস্থা ছিল এমন– যতদিন মদীনায় অবস্থান করেছেন ততদিন মদীনার পথে-ঘাটে এবং হাটে-বাজারে খালি পায়ে চলাচল করতেন। এজন্য যে, জানি না রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কদম মোবারক কোথায় কোথায় পড়েছে, আর আমি তথায় জুতা পায়ে করে চলাচল করি! আমার জন্য কর্তব্য

ছিল সে স্থানে পায়ের পরিবর্তে মাথা দিয়ে হাঁটা। কিন্তু এটা আমার সামর্থ্য বহির্ভূত। তাই অন্তত বিনা জুতায় চলাফেরা করা কর্তব্য। প্রকৃত সম্মান প্রদর্শন তো ছিল এই, যা আমাদের আকাবির করে গেছেন, সারাটা জীবন মদীনায় জুতা পায়ে হাঁটেননি।

দারুল উলুম দেওবন্দের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ কাসেম নানুতবী রহ. যখন হজ্জে গেলেন, তখন মদীনায় যাত্রাকালে পথিমধ্যে মদীনার নিকটে 'বিরে আলী' নামক স্থানে এসে এক অদ্ভুত কাণ্ড করে বসলেন। স্থানটি খানিকটা উঁচু প্রকৃতির। উট বা গাড়ি এ স্থানে পৌঁছলে একেবারে মদীনার হারাম শরীফের মিনার দৃষ্টিগোচর হতে থাকে। সেখান থেকে মদীনার দূরত্ব তিন-চার মাইল হবে। কাফেলায় হযরত মাওলানা নানুতবী রহ., হযরত মাওলানা রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহী রহ.সহ বহু বুযর্গ ছিলেন। তাঁরা যখন 'বিরে আলী'তে পৌঁছলেন এবং মিনার দৃষ্টিগোচর হল, তখন হযরত মাওলানা কাসেম নানুতবী রহ. আত্মহারা হয়ে উটের উপর থেকে লাফিয়ে পড়লেন এবং খালি পায়ে দৌড়াতে আরম্ভ করলেন। মুখ থেকে উচ্চারিত হচ্ছিল কিছু প্রেমপূর্ণ শের। দেখে মনে হচ্ছিল হুঁশ-জ্ঞান শূন্য হয়ে পড়েছেন। অথচ সেখানের কংকরগুলো এমন ছিল যে, যখন সেগুলো পায়ে বিদ্ধ হত তখন মনে হত যেন চাকু বিদ্ধ হচ্ছে। অন্যরাও হযরতকে দেখে দৌড়াতে শুরু করলেন। তখন মাওলানা গাঙ্গুহী রহ. বললেন, অন্যরা যে দৌড়াচ্ছেন তা হল অনুকরণ মাত্র। আর তিনি রয়েছেন এক বিশেষ হালাতের উপর। তিনি নিজের উপর নিজের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছেন। এর অনুকরণ করা যায় না। তিন-চার মাইল পথ এভাবে খালি পায়ে চললেন। পা রক্তাক্ত হয়ে গেল, কিন্তু তাঁর এসবের কোন হুঁশ ছিল না। প্রকৃত সম্মান প্রদর্শন তো আল্লাহওয়ালাগণই করে থাকেন, যাঁদের উপর সম্মান প্রদর্শনের হাল জারি হয়ে থাকে। কিন্তু আমি বলি, যদি আমরা অল্পবিস্তর অনুকরণও করি তবে তাও আমাদের জন্য সৌভাগ্য। সে বিশেষ অবস্থা তো 'হালওয়ালাদের' হয়ে তাকে, আমাদের মধ্যে সে হাল কোথায়!

মোটকথা, মদীনার সাথে আমাদের ভালবাসা কেন? এজন্য যে, মদীনার স্থপতির সাথে আমাদের ভালবাসা রয়েছে। এ মদীনা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্মভূমি হয়েছি। এ মদীনা যাঁর জন্মভূমি তিনি যখন আমাদের প্রিয় তখন এ ভূমিও আমাদের প্রিয়, এর বাসিন্দাগণও আমাদের প্রিয়, এর বায়ু-জল ও ইট-পাথরও আমাদে প্রিয়। এ জন্যই মদীনার মাটি 'খাকে শেফা' বা আরোগ্য মৃত্তিকা। সবাই অল্প অল্প করে নিয়ে আসেন। বরকত হাসিলের উদ্দেশ্যে নিজেদের ঘরে রেখে দেন। কারণ, যে মহান ব্যক্তিত্বের সাথে আমাদের মুহাব্বত রয়েছে, এ তো তাঁরই মাটি। এ মাটিও আমাদের প্রিয়, এর প্রতিটি

অণুকণা আমাদের প্রিয়।

ইমাম মালেক রহ.-এর অবস্থা এমন ছিল যে, তিনি চাইতেন তাঁর মৃত্যু যেন মদীনায় হয়। মদীনার বাইরে মৃত্যু ও দাফন হওয়ার আশঙ্কায় তিনি নফল হজ আদায় করার জন্য মক্কায় যেতেন না। একদিকে মদীনায় মৃত্যু ও দাফন হওয়ার বাসনা অন্যদিকে নফল হজ আদায় করার জন্য মনের ব্যাকুলতা। ইমাম মালেক রহ. একদিন স্বপ্নে দেখলেন যে, হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দরবার চলছে, সাহাবায়ে কেরাম রা. উপস্থিত রয়েছেন। ইমাম মালেক রহ. এগিয়ে গেলেন এবং আরয করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! অনুগ্রহ করে আমাকে বলে দিন, আমার জীবনের আর কত দিন বাকী আছে? যদি আমি জানতে পারি জীবনের আরো কয়েক বছর বাকী আছে তাহলে প্রতি বছর নফল হজ আদায় করতে যেতে পারি, এবং আশা করতে পারব যে, ফিরে আসতে পারব এবং মদীনায় আমার ইন্তেকাল হবে। আমি মদীনার জমিন ছাড়তে চাই না।

ইমাম মালেক রহ.-এর আবেদন শুনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাত তুলে পাঁচটি আঙুল খুলে দেখালেন। এ সময় ইমাম মালেক রহ.-এর ঘুম ভেঙ্গে গেল।

জাগ্রত হয়ে ইমাম মালেক রহ. অত্যন্ত পেরেশানীর মধ্যে পড়ে গেলেন। পাঁচ আঙুলের রহস্য তিনি উদঘাটন করতে পারছিলেন না। কী হতে পারে? পাঁচ দিন? পাঁচ পাঁচ মাস? পাঁচ সপ্তাহ? না কি পাঁচ বছর? রহস্যের সমাধানের জন্য স্বপ্নের তাবির বিশেষজ্ঞ ইমাম ইবনে সিরিন রহ.-এর কাছে এক ব্যক্তিকে পাঠালেন। ইবনে সিরিন রহ. ছিলেন একজন তাবেয়ী এবং ইমাম মালেক রহ.-এর সমসাময়িক। তিনি এমনভাবে তাবির করতেন যে, একদিকে তাবির করতেন আর অপরদিকে সঙ্গে সঙ্গে ঘটনা প্রকাশ পেত। স্বপ্নের তাবির বিষয়ে তিনি বড় ইমাম ছিলেন। এ বিষয়ের উপর 'তাসিরুল আনাম ফি তাবিরিল মানাম' নামক তাঁর লিখিত দুই খণ্ডে সমাপ্ত একটি কিতাব রয়েছে। তাতে তিনি স্বপ্ন তাবিরের বহু মূলনীতি লিপিবদ্ধ করেছেন।

তাঁর কথা প্রসঙ্গে মনে পড়ল, একবার তাঁর কাছে এক ব্যক্তি এসে আরয করল যে, আমি স্বপ্নে দেখলাম আমার খাটের নিচে আগুন দাউ দাউ করছে। এর ব্যাখ্যা কী? তিনি বললেন, জলদি বাড়ি গিয়ে স্ত্রী-সন্তান ও মালামালসমূহ ঘর থেকে বের কর, তোমার ঘর ভেঙ্গে পড়বে।

লোকটি তাই করল। দুই তিন ঘণ্টা পর পুরো বিল্ডিংটি ধসে পড়ল। স্বপ্নের তাবির হাতে হাতে পেয়ে গেল। এ ঘটনার পাঁচ ছয় মাস পর আরেক ব্যক্তি এসে

আরয করল যে, আমি স্বপ্নে দেখলাম আমার খাটের নিচে আগুন দাউ দাউ করছে। এর ব্যাখ্যা কী? তিনি বললেন, বাড়ি গিয়ে খাটের নিচে খনন কর, তুমি স্বর্ণ পাবে। খনন শুরু করলে লাখো টাকার স্বর্ণ পেয়ে গেল, একটি প্রোথিত ধনভাণ্ডার বেরিয়ে এল।

লোকেরা হযরত ইবনে সিরিন রহ.-এর কাছে আরয করল, দুই ব্যক্তি একই রকমের স্বপ্ন দেখল, আর আপনি একজনের ঘর ধসিয়ে দেওয়ালেন, আরেকজনকে অঢেল সম্পদ পাইয়ে দিলেন। তিনি বললেন, প্রথমজন স্বপ্ন দেখেছিল গ্রীষ্মকালে। আর গ্রীষ্মকালে খাটের নিচে আগুন স্বপ্নে দেখা বুনিয়াদ নিশ্চিহ্ন হওয়ার দলিল হয়ে থাকে। তাই আমি ব্যাখ্যা করলাম যে, তোমার ঘর ধসে পড়বে। আর দ্বিতীয় ব্যক্তি একই স্বপ্ন দেখেছে শীতকালে। শীতকালে খাটের নিচে আগুন দেখা অতি উন্নত নেয়ামত, এর চেয়ে বড় কোন নেয়ামত নেই। আগুনের রূপ যেহেতু স্বর্ণের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ তাই আপমি স্বর্ণ পাওয়ার তাবির করেছি। আমার উভয় তাবিরই বাস্তব হয়েছে।

যাই হোক, ইমাম ইবনে সিরিন রহ. এ পর্যায়ের ইমাম ছিলেন যে, তাঁর তাবির হুবহু মিলে যেত। ইমাম মালেক রহ. তাঁর স্বপ্নের তাবির জানার জন্য ইমাম ইবনে সিরিনের কাছে এক ব্যক্তিকে পাঠালেন। তাকে বলে দিলেন, তুমি বলবে না যে, এ স্বপ্ন ইমাম মালেক দেখেছে, বরং বলবে, একজন মুসলমান এ স্বপ্ন দেখেছে। ঐ ব্যক্তি ইবনে সিরিনের কাছে গিয়ে স্বপ্নের কথা বিস্তারিত জানিয়ে তার ব্যাখ্যা জানতে চাইল।

ইবনে সিরিন রহ. বললেন, সত্যি করে বল, এ স্বপ্ন কে দেখেছে। লোকটি বলল, যিনি এ স্বপ্ন দেখেছেন তিনি নাম বলতে নিষেধ করে দিয়েছে। এ টুকু বুঝে নিন যে, এ স্বপ্ন একজন মুসলমান দেখেছেন।

ইমাম ইবনে সিরিন রহ. বললেন, এ স্বপ্ন খুব বড় কোন আলেমের পক্ষেই কেবল দেখা সম্ভব। সাধারণ মানুষের কেউ দেখতে পারে না। আরো বললেন, মদীনায় ইমাম মালেক (রহ.)-এর চেয়ে বড় কোন আলেম নেই। তো ইমাম মালেক (রহ.) এ স্বপ্ন দেখেননি? এ কথা শুনে ঐ ব্যক্তি চুপ করে রইল, তার নাম বলা নিষেধ ছিল। ইমাম ইবনে সিরিন রহ. বললেন, ঠিক আছে যাও, নাম বলার অনুমতি নিয়ে এস।

ঐ ব্যক্তি ফিরে এসে আরয করল, হযরত! তিনি তো চিনে ফেলেছেন যে, আপনিই স্বপ্ন দেখেছেন। অনুমতি ছিলনা বলে আমি নাম বলিনি, চুপ করে থেকেছি। তিনি বললেন, ঠিক আছে যাও, আমার নাম বলে দাও। ঐ ব্যক্তি ইবনে সিরিন রহ.কে গিয়ে বলল, বাস্তবিকই ইমাম মালেক রহ. এ স্বপ্ন দেখেছেন, আপনি ঠিকই বুঝেছিলেন। ইবনে সিরিন রহ. বললেন, ইমাম

মালেকের পক্ষেই এ স্বপ্ন দেখা সম্ভব, অন্য কারো নয়। গিয়ে বলে দাও, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে পাঁচ আঙুল তুলে দেখিয়েছেন তা দ্বারা পাঁচ বছর, পাঁচ মাস, পাঁচ সপ্তাহ বা পাঁচ দিন উদ্দেশ্য নয়; বরং তা দ্বারা ইশারা করা হয়েছে এই দিকে–

هى من خمس لايعلمهن الاالله

এটি হল সেই পাঁচ বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত যার জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো নেই।

জীবন এবং মৃত্যু এই পাঁচ বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত। যার জ্ঞান আল্লাহ ব্যতীত কারো নেই। আল্লাহ তাআলা বলেন–

اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗ عِلْمُ السَّاعَةِ ۚ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ ۚ وَيَعْلَمُ مَا فِى الْاَرْحَامِ ؕ وَمَا تَدْرِىْ نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا ؕ وَمَا تَدْرِىْ نَفْسٌ بِاَىِّ اَرْضٍ تَمُوْتُ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ ○

নিশ্চয়ই আল্লাহর কাছেই কেয়ামতের জ্ঞান রয়েছে। তিনিই বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং গর্ভাশয়ে যা থাকে, তিনি তা জানেন। কেউ জানে না আগামীকাল সে কি উপার্জন করবে এবং কেউ জানে না কোন দেশে সে মৃত্যুবরণ করবে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সর্ববিষয়ে সম্যক জ্ঞাত। [লোকমান : ৩৪]

সুতরাং ইবনে সিরিন রহ. বললেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে পাঁচ আঙুল দেখিয়েছেন তার উদ্দেশ্য এই যে, কোন জমিনে আপনার ইন্তেকাল হবে তা ঐ পাঁচ বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত যার জ্ঞান আল্লাহ তাআলা ব্যতীত অন্য কারো নেই।

সর্ববৃহৎ নেয়ামতের অধিকারসমূহ

এ কথা আমার এজন্য স্মরণ হয়েছে যে, জনাব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হলেন বিশ্বের জন্য সর্দাধিক দয়ালু ব্যক্তিত্ব। তাঁরই বরকতে বিশ্ববাসী সকল নেয়ামত পেয়েছে। সুতরাং তাঁর হক বা অধিকারসমূহের পরিচয় লাভ করা সর্ববৃহৎ নেয়ামত। তাঁর হক তিনটি– তাঁকে আমরা ভালবাসব, তাঁকে সম্মান প্রদর্শন করব এবং তাঁর আনুগত্য করব।

সম্মান প্রদর্শন সম্পর্ক ইতোপূর্বে আমি আলোচনা করেছি যে, প্রকৃত সম্মান প্রদর্শনকারীগণ তো অতিবাহিত হয়েগিয়েছেন। তবে তাঁদেরকে দেখে দেখে যদি

আমরা কিছুটা অনুকরণ করতে পারি তাহলে তাও আমাদের জন্য সৌভাগ্যের কারণ হবে– চাই যতটুকুই করতে পারি না কেন। অন্যথায় প্রকৃত বক্ষমান প্রদর্শন তো এই ছিল যে, ইমাম মালেক রহ. সারাটি জীবনের জন্য জুতা পরিধান ত্যাগ করেছেন; ইমাম আবু হানিফা রহ. এগার দিন পর্যন্ত ইস্তেনজা করেননি– এই ভেবে যে, আমি রাসূলের শহরে থেকে তথায় নাপাকি ছড়াব!

দ্বিতীয় হক হল মুহাব্বত বা ভালবাসা। এর উদ্দেশ্য এই যে, সন্তান-সন্ততির প্রতি যে ভালবাসা রয়েছে তা যেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি ভালবাসার পর্যায়ের না হয়। অর্থাৎ সন্তানের ভালবাসার সাথে যদি সংঘাত তৈরি হয় তাহলে যেন আমরা আল্লাহ ও রাসূলের ভালবাসাকে অগ্রাধিকার দিতে পারি; সন্তানের ভালবাসাকে যেন প্রাধান্য না দেই। যখন শরীয়তের কোন হুকুমের সাথে সন্তানের ভালবাসা প্রতিদ্বন্দ্বি হয়ে দাঁড়ায় তখন যেন আমরা শরীয়তের আদেশকে প্রাধান্য দিতে পারি। উদাহরণত, আল্লাহ না করুন কারো সন্তান যদি অসুস্থ হয়ে পড়ে তখন পুরুষগণ না হলেও মহিলাগণ ঝাড়-ফুঁকে ও অন্যান্য শিরকী প্রথা-প্রচলনে লিপ্ত হয়ে পড়েন। এ আশায় যে, হয়ত এতে সন্তানটি সুস্থ হয়ে উঠবে। অথচ এ কাজটি শরীয়ত বিরোধী। সুতরাং ভালবাসার দাবি হল এই যে, এমতাবস্থায় শরীয়তকে প্রাধান্য দিবে, সন্তানের ভালবাসায় মাতাপিতা শিরকী কাজে লিপ্ত হবে না। তাদের মানসিকতা যেন এমন না হয় যে, যে কোন উপায়ে সন্তানের প্রাণ বাঁচাতে হবে। প্রাণ বাঁচানোর মালিক তো আল্লাহ তাআলা। যখন তাঁর বিধান মেনে চলবে তখন হয়ত তার বরকতে প্রাণ রক্ষা পাবে। সন্তানের প্রাণ রক্ষার জন্য শিরকী কাজে লিপ্ত হয়ে পড়া এ প্রমাণ বহন করে যে, সন্তানের প্রতি যতটুকু ভালবাসা রয়েছে আল্লাহর প্রতি ততটুকু নেই। সন্তানের ভালবাসার প্রশ্ন যখন সামনে এল তখন আল্লাহর বিধানকে ছেড়ে দিল। ভালবাসার দাবি হল এই যে, শরীয়তের মোকাবিলায় সন্তানের জীবনের পরোয়া করা হবে না। এ হল দ্বিতীয় হক।

তৃতীয় হক হল আনুগত্য। অর্থাৎ তিনি যে বিধি-বিধান এনে দিয়েছেন তার অনুসরণ করা। তাঁর প্রমাণিত সুন্নাতসমূহের আনুগত্য করা। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এক একটি সুন্নাতের অনুসরণে যে জ্যোতির্ময়তা ও বরকত রয়েছে আমাদের জ্ঞানবুদ্ধি প্রসূত হাজারো বিধানে সে খায়র ও বরকত লাভ হওয়া সম্ভব নয়। সুতরাং তাঁর এক একটি সুন্নাতের উপর আমল করা যথা পোশাক পরিধানে, আহার গ্রহণে, পান করণে, চলাফেরায়, ওঠা-বসায় তাঁর কৃত পদ্ধতি গ্রহণ করার প্রচেষ্টা করা এক একটি স্বতন্ত্র নেয়ামত ও বরকত। এরই নাম আনুগত্য।

ফরযগুলোতেও তাঁর অনুসরণ রয়েছে। যেমন নামায আদায় করলাম, তাও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাত অনুযায়ী আদায় করব। রোযা রাখলেও তাঁর সুন্নাত তরিকা অনুযায়ী রাখব। এগুলো আমাদের অবশ্য করণীয় দায়িত্ব। প্রকৃতপক্ষে আমাদের সম্পূর্ণ জীবনকে তাঁর জীবন অনুযায়ী পরিচালিত করার প্রচেষ্টা করা আবশ্যক। এরই জন্য আমরা তালিম গ্রহণ করি, ইলম শিক্ষা করি। তাই প্রতি পদক্ষেপে তাঁর অনুকরণ করার চেষ্টা করা উচিত।

আমি আমার বুযর্গদের থেকে শুনেছি, হযরত মাওলানা কাসেম নানুতবী রহ.কে নিয়ে কোন এক বুযর্গ স্বপ্ন দেখলেন যে, জনাব রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আগমনের সংবাদ এসেছে, তিনি তাশরিফ নিয়ে যাচ্ছেন, হাজারো সাহাবায়ে কেরামের জমায়েত তাঁর পেছনে পেছনে রয়েছেন। আরো হাজার হাজার সাধারণ লোক তাঁদের পেছনে এগিয়ে যাচ্ছেন। এদের মধ্যে হযরত মাওলানা কাসেম নানুতবী রহ.ও রয়েছেন। সকলেই দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছিলেন যেন তাড়াতাড়ি গিয়ে রাসূল সা.-এর সাথে সাক্ষাৎ করা যায়। কিন্তু নানুতবী রহ. ধীরে ধীরে চলছেন, চিন্তা করে করে পা ফেলছেন। যে কারণে তিনি অনেক পেছনে রয়ে গেছেন। লোকজন তাঁকে বলল, হযরত! জনাব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সামনে রয়েছেন, সবাই দ্রুতগতিতে এগিয়ে যাচ্ছেন যেন জলদি গিয়ে পৌঁছতে পারেন এবং কোন ভাবে তাঁর সাক্ষাতের সৌভাগ্য হয়। আপনিও তো যাচ্ছেন, কিন্তু খুব ধীর পায়ে, চিন্তাশীল পদক্ষেপে। এর কারণ কী? তিনি বললেন, আমি চাচ্ছি যে, যে স্থানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পা পড়েছে, আমার পাও যেন সে স্থানে পড়ে, তাই এর সন্ধানে আমার বিলম্ব হচ্ছে, এজন্যই আমার দেরি হচ্ছে। আলহামদুলিল্লাহ, আমার একটি কদমও হুজুরের চিহ্নের বাইরে পড়েনি। ঠিক চিহ্নের উপর পা রেখে রেখে আমি অগ্রসর হচ্ছি; যদিও আমি দেরিতে পৌঁছব। এই ছিল তাঁর সুন্নতের অনুসরণের ধরন, যা স্বপ্নে দেখানো হয়েছে। মুসলমানদের অন্তরে এ আবেগ ও আগ্রহ থাকা উচিত যে, নিজ জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত যেন ঐভাবে অতিবাহিত হয়। এটা স্পষ্ট যে, হুবহু নকশা-নমুনা অনুযায়ী আমরা চলতে পারব না। এমন সৌভাগ্য আমাদের কোথায়? কিন্তু আমাদের কাজ হল প্রচেষ্টা ও পরিশ্রম করা, অন্তরে তড়প বা প্রবল আকাঙ্ক্ষা তৈরি হওয়া। যদি অন্তরে প্রবল আকাঙ্ক্ষা তৈরি হয়ে যায় তবে হয়ত আল্লাহ তাআলা পরিপূর্ণ অনুসরণ ও অনুকরণ নসিব করবেন। নতুবা যতটুকুই তাওফীক হোক, ঐ প্রবল আকাঙ্ক্ষার কারণে আমরা নাজাতের জন্য আশাবাদী। যাই হোক, আমাদের উপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর তিনটি হক রয়ছে– সম্মান করা, ভালবাসা ও আনুগত্য করা।

ভালবাসার মধ্যে ফানা হয়ে যাওয়া বা নিজেকে বিলীন করে দেয়ার ব্যাপার থাকে। অর্থাৎ প্রিয়জনের জন্য মানুষ নিজেকে বিলীন করে দিতে চায়। এমনিভাবে আনুগত্যের মধ্যে কদমে কদমে চলার আগ্রহ সৃষ্টি হয়ে থাকে। অর্থাৎ যেন প্রত্যেক কাজে, প্রত্যেক বিষয়ে অনুসরণের তাওফিক লাভ হয়। তদ্রূপ আযমত দ্বারা বিশ্বাস স্থাপিত হয়। যদি অন্তরে আযমত বা শ্রদ্ধাবোধ না থাকে তবে ইতিকাদ বা বিশ্বাস স্থাপন হতে পারে না। আর ইতিকাদ ব্যতীত ঈমান নসিব হবে না। এ কারণেই এ তিন প্রকারের হকেরই আবশ্যকতা রয়েছে।

শুরুতে আমি যে আয়াত খানা পাঠ করেছিলাম তাতে জনাব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সত্তা সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেছেন–

وَمَا أَرْسَلْنٰكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ○

আমি আপনাকে বিশ্ববাসীর জন্যে রহমত স্বরূপই প্রেরণ করেছি। [আম্বিয়া : ১০৭]

সুতরাং বিশ্বের অস্তিত্ব, তার নেয়ামতরাজি এবং নেয়ামতরাজির অস্তিত্ব– সব কিছুই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর তোফায়েলেই হয়েছে। এত বরকতময় যে সত্তা, তাঁকে যে উম্মতের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে সে উম্মত কতই না ভাগ্যবান যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মত এমন একজন রাসূল তাদেরকে দান করা হয়েছে। সুতরাং উম্মতের দায়িত্বে নবীর হকও অর্পিত হয় যে, তাঁকে ভালবাসবে, সম্মান করবে ও তাঁর আনুগত্য করবে। কেউ যদি শুধু মুখে দাবি করে যে, আমি আশেকে রাসূল কিন্তু তাঁর অনুসরণ ও আনুগত্য করে না তবে সে ভালবাসা অসম্পূর্ণ। ভালবাসার নির্দশনই হল এই যে আনুগত্য করবে। ভালবাসা হল দাবি আর আনুগত্য হল তার প্রমাণ। যখন কেউ ভালবাসার দাবি করবে তখন তার কাছে প্রমান চাইতে হবে। যদি আনুগত্যের প্রমাণ উপস্থাপন করে তবে বলা হবে যে, নিঃসন্দেহে এটাই যথার্থ ভালবাসা। ধরুন কেউ তার পিতাকে বলল, আমি আপনাকে খুব ভালবাসি। পিতা বলল, আমার হুঁকো পানের অভ্যাস আছে, হুঁকোটা একটু তৈরি করে নিয়ে আস। ছেলে বলল, আমি তো বলেছি যে আমি আপনাকে ভালবাসি, এ কথা কখন বললাম যে, হুঁকো ভরে দেব বা পানি পান করাবো? পিতা তখন বলবে, তাহলে আর ভালবাসা রইল কিভাবে? ভালবাসার দাবিই হল এই যে, আমি যা বলব তাই কর। যাই হোক, আমরা দাবি করেছি যে, আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ভালবাসি। ভালবাসার দাবি হল অনুসরণ ও অনুকরণ করা।

অনুকরণ বিহীন ভালবাসার দাবি হল ভুল ও মিথ্যা দাবি।

এক হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ কথাটিই বলেছেন–

مَنْ أَحَبَّنِيْ فَقَدْ أَطَاعَنِيْ، وَمَنْ أَطَاعَنِيْ كَانَ مَعِيْ فِي الْجَنَّةِ.

আমাকে যে ভালবাসবে সে আমার অনুসরণ করবে। আর যে ব্যক্তি আমার অনুসরণ করবে সে আমার সাথে জান্নাতে থাকবে।

সুতরাং মূল ভিত্তি হল ভালবাসা। আর ভালবাসার নিদর্শন হল অনুসরণ করা এবং অন্তরে সম্মান ও শ্রদ্ধা থাকা।

আমার তিলাওয়াত করা আয়াতের আলোকে এ কয়েকটি কথা আরয করা আমার উদ্দেশ্য ছিল, যাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হকগুলো আমাদের সামনে স্পষ্ট হয়ে যায়। পুরো দীন ও ইসলাম এজন্যই যে, মানুষ যেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হক বা অধিকারসমূহের পরিচয় লাভ করতে পারে।

দুআ করুন, আল্লাহ যেন আমাদেরকে আনুগত্য, ভালবাসা, আযমত ও আকিদা-বিশ্বাসের তাওফীক দান করেন এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাতের অনুসরণ নসিব হয়। আর আল্লাহ যেন আমাদেরকে তাঁর সন্তুষ্টি অনুযায়ী পরিচালিত করেন। আমীন!

اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك انت الوهاب، واخر دعوٰنا ان الحمد لله رب العالمين.

বয়ান : ৩

বাইতুল্লাহিল কারিম

[মহা মহিমান্বিত আল্লাহর ঘর]

বাইতুল্লাহ শুধু একটি ঘর, একটি ইমারতই কেবল নয়; বরং তা হল আল্লাহর নূরানী তাজাল্লির স্থান। আল্লাহ তাআলার সত্তার অধিক নিকটবর্তী তাজাল্লি এখানে বিদ্যমান রয়েছে। একেই আমরা সিজদা করি। এ তাজাল্লিকে সিজদা করার অর্থ হল আল্লাহর সত্তাকে সিজদা করা। তাজাল্লির প্রকৃত অর্থ হল প্রতিচ্ছবি বা প্রতিবিম্ব। সুতরাং বাইতুল্লাহ হল আল্লাহর জামাল অবলোকন করার আয়না বিশেষ, যার উপর আল্লাহ তাঁর সত্তার প্রতিচ্ছবি স্থাপন করেছেন।

– হযরত হাকীমুল ইসলাম রহ.





اَلْحَمْدُ لله نَحْمَدُه وَنَسْتَعِيْنُه وَنَسْتَغْفِرُه وَنُؤْمِنُ به وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِالله مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّاٰتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَّهْدِه اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَه، وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلا هَادِىَ لَه، وَنَشْهَدُ أَنْ لاَّ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَه لاَ شَرِيْكَ لَه، وَنَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَمَوْلاَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُه وَرَسُوْلُه، أَرْسَلَهُ اللهُ إِلٰى كَافَّـةً لِّلنَّاسِ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا وَّدَاعِيًا إِلَيْهِ بِإِذْنِه وَسِرَاجًا مُّنِـيْرًا.

أَمَّـابَعْدُ:

فَاَعُوْذُ بِالله مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ○ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ○ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُّضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِىْ بِبَكَّةَ مُبٰرَكًا وَّهُدًى لِّلْعٰلَمِيْنَ○ فِيْهِ اٰيٰتٌ بَيِّنٰتٌ مَّقَامُ إِبْرٰهِيْمَ ۚ وَمَنْ دَخَلَه كَانَ اٰمِنًا ؕ. صدق الله العلى العظيم.

বুযুর্গানে মুহতারাম!

আল হামদুলিল্লাহ, এ সময়ে আমরা দীনের খাদেমগণ এমন এক স্থানে অবস্থান করছি যা হল জগতের প্রথম সৃষ্টি।* এ স্থানটি একাধারে পৃথিবীর প্রথম সৃষ্ট স্থান, বিশ্বের কেন্দ্র, বিশ্বের মধ্যবর্তী এবং বিশ্বের মূল। আমি এখানে মক্কার ব্যাপারে চারটি শব্দ ব্যবহার করেছি: (১) আউয়ালে আলম বা জগতের প্রথম

---

* ১৩৯৫ হিজরীর মুহাররম মাসে মদীনা শরীফে মাদ্রাসায়ে উলুমে শারয়িয়্যাহ'র ছাদের উপর হযরত শায়খুল হাদীস মরহুম মাওলানা যাকারিয়া রহ.-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হাজীদের বিরাট সমাবেশে এ ওয়াজ করেছিলেন।

সৃষ্টি (২) আসলে আলম বা জগতের মূল (৩) মারকাজে আলম বা জগতের কেন্দ্র (৪) ওয়াসাতে আলম বা জগতের মধ্যবর্তী স্থান। এ চারটি বিষয়ের কোন কোনটি অকাট্য দলিল দ্বারা প্রামাণিত। অর্থাৎ কুরআন মাজিদ সুস্পষ্টভাবে তা বর্ণনা করে দিয়েছে। আর কোনটি সাহাবায়ে কেরামের বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে। অর্থাৎ এ বিষয়ে হয়ত কোন মারফু হাদীস নেই, অথবা আছে কিন্তু আমাদের জানা নেই। কিন্তু সাহাবায়ে কেরাম রা.-এর বর্ণনা প্রচুর পরিমাণে রয়েছে, যা দ্বারা এ চারটি দাবি প্রমাণিত হয়।

পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُّضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِىْ بِبَكَّةَ مُبٰرَكًا وَّهُدًى لِّلْعٰلَمِيْنَ○

> নিঃসন্দেহে সর্বপ্রথম ঘর যা মানুষের জন্যে নির্ধারিত হয়েছে, সেটাই হচ্ছে এ ঘর, যা বাক্কায় অবস্থিত এবং সারা জাহানের মানুষের জন্য হেদায়েত ও বরকতময়। [আলে ইমরান : ৯৬]

'বাক্কা'র অর্থ মক্কা হতে পারে অথবা ঐ স্থান যেখানে বাইতুল্লাহ অবস্থিত এবং এর আশপাশের এলাকাকে মক্কা বলা হয়। এ হল কুরআনে উল্লেখিত 'বাক্কা' শব্দের অর্থ সম্পর্কে মতের ভিন্নতা। কিন্তু সর্বাবস্থায় মূল কথা হল এই, আল্লাহর সর্বপ্রথম ঘর যা ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে তা মক্কায় অবস্থিত। যার নাম হল বাইতুল্লাহিল কারিম।

অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা যখন এ বিশ্বকে সৃষ্টি করার ইচ্ছা করলেন তখন সর্বপ্রথম বাইতুল্লাহ নির্মিত হলো। যেমনিভাবে সাহাবায়ে কেরামের বর্ণনায়ও স্পষ্ট হয়েছে যে, সমগ্র জগৎ জুড়ে ছিল শুধু পানি আর পানি। অর্থাৎ চারটি মৌলিক পদার্থের মধ্য থেকে আল্লাহ তাআলা সর্বপ্রথম পানিকে সৃষ্টি করলেন। যখন আল্লাহ তাআলা এ পানি থেকে অন্যান্য মৌলিক পদার্থ ও জগতের যাবতীয় কিছু সৃষ্টির ইচ্ছা করলেন তখন সর্বপ্রথম এ পানির মধ্যে একটি কাঠামো তৈরি হলো। যে জায়গাটুকুতে বাইতুল্লাহ অবস্থিত সে স্থানটুকু একটু উঁচু হয়ে উঠল; পাহাড়ের চূড়া যেমন হয়ে থাকে। প্রথমে ভরাট হয়ে ওঠা এ স্থানটিই ছিল বাইতুল্লাহর স্থান। এরপর এ উঁচু স্থানের পার্শ্ববর্তী এলাকা কিছুটা দেবে গেল ও গভিরতা তৈরি হল। তখন পানির সাথে এ উঁচু জায়গায় ঘাত-প্রতিঘাত হতে লাগল। পানি, বিশেষ করে সমুদ্রের পানি যখন কোন বস্তুর সাথে প্রতিনিয়ত ধাক্কা লাগতে থাকে তখন সে পানি কিছুটা গাঢ় হয়ে যায়। যেমন আপনারও দেখে থাকবেন– সাগরের পানি যখন তীরের গায়ে আছড়ে পড়তে থাকে তখন ফেনার

সৃষ্টি হয়। সাগরের সে ফেনা পাথরের মত হয়ে থাকে। এভাবে পানি ধাক্কা দিতে লাগল এবং এ দ্বারা সৃষ্ট ফেনাগুলো শক্ত হয়ে ইটের মত হয়ে উঠল। এর অর্থ হল এই যে, সর্বপ্রথম পৃথিবীর এক ইট পরিমাণ স্থান সৃষ্টি হল, আর এ স্থানটিই হল বাইতুল্লাহ। এরপর আল্লাহ তাআলা এ স্থানটুকুকে আরো বিস্তৃত ও প্রসারিত করতে আরম্ভ করলেন। তারপর প্রসারিত হতে হতে বর্তমান পর্যায়ে এসে প্রসারণ থেমে গেল। এসব কতদিনে হল তা একমাত্র আল্লাহই জানেন। কুরআন শরীফের কোথাও কোথাও তার সুস্পষ্ট বর্ণনাও রয়েছে, কিন্তু এখন আমাদের আলোচনা সে বিষয়ে নয়। কথা হল পৃথিবী ক্রমান্বয়ে বিস্তৃত হয়েছে। এর অর্থ এই দাঁড়ায়, বাইতুল্লাহ হল সমগ্র পৃথিবীর মূল। এখানেই সর্বপ্রথম এক ইট পরিমাণ স্থান সৃষ্টি হয়েছিল তারপর একে কেন্দ্র করে জমিন বিস্তৃত হয়েছে। এক পর্যায়ে এসে তার প্রসারণ থেমে গেছে, যাকে আজ আমরা পৃথিবী বলে থাকি।

আমাদের সকলের মূল হল বাইতুল্লাহ

যে স্থানে বাইতুল্লাহ অবস্থিত সেটাই পৃথিবীর প্রথম অংশ। একে কেন্দ্র করেই পৃথিবীর বিস্তার শুরু হয়েছে। আর আপনারা জানেন যে, আমাদেরকে আল্লাহ তাআলা মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেছেন। যেমন হাদীস শরীফে ইরশাদ করা হয়েছে–

كُلُّكُمْ بَنُوْ اٰدَمَ، وَاٰدَمُ مِنْ تُرَابٍ

তোমরা সকলেই আদম আ.-এর সন্তান এবং আল্লাহ তাআলা আদম আ.কে মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেছেন।

আদম আ.-এর মূল হল মাটি, আমাদের সকলের মূলও মাটি। এজন্য মানুষকে 'মুশতে খাক' (একমুঠো মাটি) ও 'মুশতে গুবার' (একমুঠো ধুলো) বলা হয়। কোন এক কবি বলেছেন–

قدرت خدا کی دیکھیں تو انسان کو دیکھئے

کیا کیا تکلفات میں مشت غبار میں

কেউ আল্লাহর কুদরত দেখতে চাইলে সে যেন মানুষকে দেখে। এক মুঠো ধুলোর মধ্যে কী অপরূপ কলাকৌশল রয়েছে।

মাত্র তো এক মুঠো মাটি, অথচ তা দ্বারা কী অপার মহিমা দেখিয়েছেন; কী সুন্দরভাবে পৃথিবীকে আবাদ করিয়েছেন এবং কোথা থেকে কোথায় নিয়ে গিয়েছেন। যাই হোক, আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেছেন এবং মাটির মূল হল বাইতুল্লাহ। এর নির্যাস হল এই, আমাদের সকলের মূল

হল বাইতুল্লাহ। আর একটি সাধারণ নীতি হল–

كُلُّ شَيْئٍ يَرْجِعُ إِلَى أَصْلِهِ

সকল জিনিস তার মূলের দিকে প্রত্যাবর্তিত হয়।

শাখা-প্রশাখা তার শিকড়ের দিকে প্রত্যাবর্তন করবে, পনি তার কেন্দ্রের দিকে প্রত্যাবর্তন করবে, মাটি তার ভারি কেন্দ্রের দিকে প্রত্যাবর্তন করবে– স্বাভাবিক নিয়মেই প্রতিটি জিনিস তার মূলের দিকে ছুটতে থাকবে, তাকে বলে দিতে হবে না। পিতার প্রতি সন্তানের আকর্ষণ থাকবেই। তাকে শিখিয়ে দিতে হবে না যে, বাবার কাছে যাও। সে বাবার দিকে প্রত্যাবর্তন করবেই। এ কারণেই সৃষ্টিগত ও স্বভাবগতভাবেই সকল মানুষের বাইতুল্লাহর প্রতি আকর্ষণ রয়েছে।

বাইতুল্লাহকে ইবাদতের কেন্দ্র সাব্যস্ত করার হেকমত

বাইতুল্লাহ যে আমাদের মূল তা কারো কারো জানা আছে আবার কেউ কেউ জানেনও না। যদি জানা হয়ে যায় তাহলে বাইতুল্লাহর প্রতি আকর্ষণ বেড়ে যাবে। এর উদাহরণ এমন যে, কোন এক ব্যক্তির সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর সে দূরে কোথাও চলে গেল, ছেলেটির বড় হওয়ার পর যদি পিতা তার সামনে আসেন তাহলে স্বভাবগতভাবেই পিতার প্রতি তার আকর্ষণ তৈরি হবে কিন্তু কেউ না বলে দেয়া পর্যন্ত সে জানতে পারবে না যে ঐ ব্যক্তি তার পিতা। যখন জানতে পারবে যে, এ ব্যক্তি তার পিতা তখন স্বাভাবিক আকর্ষণের পরিবর্তে সেখানে বিবেক প্রসূত আকর্ষণ তৈরি হবে। সর্বান্তকরণে আকৃষ্ট হয়ে পড়বে। অদ্রূপ স্বাভাবিকভাবে সকল মানুষই জানে যে, বাইতুল্লাহ আমাদের মূল, তার প্রতি মানুষের স্বাভাবিক আকর্ষণ রয়েছে। আম্বিয়ায়ে কেরাম আ. এসে আমাদেরকে জানিয়ে দিলেন যে, যে জিনিসটির প্রতি তোমাদের আকর্ষণ রয়েছে তা হল এই। যদিও জানা নেই তথাপি তার প্রতি আকর্ষণ বিদ্যমাণ রয়েছে। যারা জানতে পেরেছে তারাই ঈমান এনেছে। তাদের জানাও আছে, আন্তরিক বিশ্বাসও রয়েছে এবং তারা এর প্রকৃত পরিচয় লাভ করতে পেরেছে। মোটকথা, বাইতুল্লাহর প্রতি মানুষের আকর্ষণ জন্মগত ও স্বাভাবিক।

যেহেতু স্বাভাবিক আকর্ষণ বিদ্যমান ছিলই, এরপর আল্লাহ জ্ঞানজনিত আকর্ষণও সৃষ্টি করে দিলেন যে, ইবাদতের সময়ও একে কেন্দ্র মনে কর। ইবাদতের কেন্দ্র যদি এমন কোন জিনিস হত যার প্রতি স্বাভাবিক আকর্ষণ নেই তবে মানুষকে জবরদস্তিমূলক আকৃষ্ট করা হত। স্বাভাবিক মনোযোগ ও আকর্ষণ তাতে থাকত না। কিন্তু আল্লাহ তাআলা এমন জিনিসকে ইবাদতের কেন্দ্র বানিয়েছেন যার

প্রতি স্বভাবজাত আকর্ষণ রয়েছে, আর এই স্বাভাবিক আকর্ষণ মানুষকে এর দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে।

এখন এ লক্ষ লক্ষ মানুষ এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সময় থেকে কোটি কোটি মানুষ যারা مِنْ كُلِّ فَجٍ عَمِيْقٍ প্রত্যেক ঘাঁটি থেকে, বিশ্বের সকল স্থান থেকে দলে দলে আসছেন, সফরের ক্লান্তি সহ্য করছেন, কষ্ট-শ্রম সহ্য করছেন। স্বভাব বিরুদ্ধ কত কিছু সহ্য হচ্ছে, তথাপি আসছেন। সুতরাং কোন আকর্ষণ নিশ্চয়ই রয়েছে। ঐ আকর্ষণটি স্বভাবজাত, বিবেক-বুদ্ধিপ্রসূত ও শরীয়ত নির্দেশিত আকর্ষণ। কয়েক প্রকারের আকর্ষণ একত্রিত হয়েছে।

স্বভাবজাত আকর্ষণ এ জন্য যে, বাইতুল্লাহ হল আমাদের মূল। বিবেক-বুদ্ধিজনিত আকর্ষণ এ জন্য, মূলের দিকে আকর্ষণ ও প্রত্যাবর্তন যুক্তিসঙ্গত বিষয়। আর শরীয়ত সমর্থিত আকর্ষণ এভাবে– রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন, বাইতুল্লাহ তোমাদের মূল ও উৎস। এ কারণেই কোন কোন বর্ণনা দ্বারা জানা যায়, এমন নবী অতিবাহিত হননি, যিনি বাইতুল্লাহ তাওয়াফ করেননি। যখন সকল নবী আ. তাওয়াফ করেছেন, নিশ্চয়ই তাদের উম্মতগণও তাওয়াফ করেছেন। তারাও বুঝতে পেরেছেন, বাইতুল্লাহ হল আমাদের মূল উৎস। বাইতুল্লাহ শুধু আপনাদের অর্থাৎ মুসলমানদের মূল নয়; বরং এটা হযরত আদম আ.-এর সমগ্র সন্তানেরই মূল।

বাইতুল্লাহর সীমা

হযরত আদম আ. বাইতুল্লাহ নির্মাণ করেছেন, ফেরেশতাগণ ভিত্তি স্থাপন করেছেন। আর সে ভিত্তিও দশ-বিশ বা পঞ্চা-একশ গজ নয় বরং হাদীসের বক্তব্য অনুযায়ী ভূমণ্ডলের তলদেশ পর্যন্ত এর ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে। এর অর্থ হল এই, আপনাদের চোখের সামনে দৃশ্যমান চারটি দেয়ালের নাম কেবল বাইতুল্লাহ নয় বরং ভূমণ্ডলের নিম্নতমদেশে বাইতুল্লাহর ভিত্তি রয়েছে। এমনিভাবে যদি উপরের দিকে যান তবে আরশ পর্যন্ত সবই বাইতুল্লাহ।

হাদীসে ইরশাদ করা হয়েছে যে, প্রত্যেক আকাশে একটি কিবলা রয়েছে। সে কিবলাগুলো ঠিক বাইতুল্লাহর সোজাসুজি অবস্থিত। আর সপ্তম আকাশে রয়েছে বাইতুল মামুর। এ হল সপ্তম আকাশের কিবলা। তো প্রত্যেক আকাশেই কিবলা রয়েছে। এটা এমন, যেন একটি ফিতায় কয়েকটি লাটিম যদি একটু দূরে দূরে বেঁধে দেয়া যায়, তবে প্রত্যেকটি লাটিম অন্য লাটিমের সামনাসামনি হবে। তদ্রূপ ঠিক একই রেখায় বাইতুল্লাহ রয়েছে। যেমন হাদীসে বলা হয়েছে, যদি বাইতুল মামুর থেকে সরাসরি কোন পাথর নিক্ষেপ করা হয়, তবে পাথরটি ঠিক

বাইতুল্লাহর ছাদের উপর এসে পতিত হবে। সুতরাং বাইতুল্লাহ শুধু দেয়াল চতুষ্ঠয়ের নামই নয়, যা কাবা নামে ও আকৃতিতে বিদ্যমান রয়েছে; এটি একটি চিহ্ন মাত্র। অন্যথায় আরশ থেকে শুরু করে ভূমণ্ডলের তলদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত অংশের নাম বাইতুল্লাহ।

এ কারণেই যদি আপনি আকাশে উঠে যান, তবে বাইতুল্লাহর দিকে নামায আদায় করার জন্য আপনাকে নিম্নমুখি হতে হবে না যে, বাইতুল্লাহ তো নিচে রয়েছে। এভাবেই নামায পড়বেন, যেভাবে পৃথিবীতে পড়ছেন। কারণ সেখানেও বাইতুল্লাহ সামনে রয়েছে। আপনি যদি নৌকা যোগে ভূমণ্ডলের নিম্নাংশে পৌছে যান তবে সেখানে আপনাকে উল্টো হয়ে সিজদা করতে হবে না যে, বাইতুল্লাহ তো উপরে রয়ে গেছে। আপনি সেভাবেই সিজদা করবেন যেভাবে মাটির উপরে থেকে করেছেন। সুতরাং বাইতুল্লাহ একটি পেরেকের ন্যায় নিম্ন হতে উপর পর্যন্তই রয়েছে। একটি নূরানী আলোকময় স্তম্ভ, যার চারপাশে এ বিশ্বজগৎ চক্রের ন্যায় ঘুরপাক খাচ্ছে এবং স্তম্ভটি মধ্যখানে একটি কেন্দ্রের ন্যায় রয়েছে।

বাইতুল্লাহর উপর আল্লাহর সত্তার নিকটতম তাজাল্লির প্রতিচ্ছবি

আল্লাহ তাআলা এ স্থানটিকে কেন্দ্র সাব্যস্ত করে এদিকে দৃষ্টি দিলেন, যাতে এটিকে অস্তিত্ব প্রদান করা যায়। আর এটাই নিয়ম যে, কেন্দ্র থেকে যা পরিচালিত হয় তা চতুর্দিকে সমভাবে প্রসার লাভ করে। আপনি যদি পানিতে ঢিল নিক্ষেপ করেন তবে পানিতে বৃত্ত তৈরি হয়ে চতুর্দিকে তীর পর্যন্ত পৌছে যাবে। কিন্তু কেন্দ্র সকলের একই থাকবে। বৃত্ত একের পর এক তৈরি হতেই থাকবে। সুতরাং প্রত্যেক কেন্দ্রে যে আন্দোলন বা নড়াচড়া হয় তা পূর্ণ বিষয়ের ভেতর বিস্তৃতি লাভ করে। পৃথিবীকে অস্তিত্বমান করার জন্য আল্লাহ যখন ইচ্ছা করলেন তখন ঐ কেন্দ্রকে নির্বাচন করলেন। 'তাজাল্লিয়ে অজুদী' বা অস্তিত্ব প্রদানকারী নূরানী দৃষ্টি সেখানেই নাযিল হল। এজন্য বাইতুল্লাহ শুধু একটি ঘর, একটি ইমারতই কেবল নয়; বরং তা হল আল্লাহর নূরানী তাজাল্লির স্থান। আল্লাহ তাআলার সত্তার অধিক নিকটবর্তী তাজাল্লি এখানে বিদ্যমান রয়েছে। একেই আমরা সিজদা করি। এ তাজাল্লিকে সিজদা করার অর্থ হল আল্লাহর সত্তাকে সিজদা করা। তাজাল্লির প্রকৃত অর্থ হল প্রতিচ্ছবি বা প্রতিবিম্ব। সুতরাং বাইতুল্লাহ হল আল্লাহর জামাল অবলোকন করার আয়না বিশেষ, যার উপর আল্লাহ তাঁর সত্তার প্রতিচ্ছবি স্থাপন করেছেন। আর যাত বা সত্তা ও তার প্রতিচ্ছবি এক জিনিসই হয়ে থাকে। সত্তায় যা হয়, সত্তা যা করে, প্রতিচ্ছবি তাই করে। যদি ব্যক্তি হাসে তবে ছায়াও হাসে, যদি ব্যক্তি চলতে থাকে, তবে ছায়াও চলতে থাকবে। যদি ব্যক্তি থেমে যায় তবে ছায়াও থেমে যাবে। মোটকথা,

প্রতিচ্ছবি ও ছায়া সম্পূর্ণভাবে মূলের অধীন থাকে। অবশ্য সবল ও দুর্বলের পার্থক্য থাকে কিন্তু নড়াচড়া ও স্থিরতায় মূলেরই অনুরূপ হয়। যাই হোক, আল্লাহর নূরের তাজাল্লি বাইতুল্লাহর উপর অবতীর্ণ হয়েছে, যাকে আমরা সিজদা করি। এ তাজাল্লিকে সিজদা করার অর্থ মূল সত্তাকে সিজদা করা। কেননা আল্লাহর সত্তা এত অধিক সূক্ষ্ম যে, প্রত্যক্ষভাবে তার মুখোমুখি হওয়া যায় না। যদি আল্লাহর সত্তাকে সিজদা করানো হত তবে এ হত একটি কাল্পনিক ব্যাপার, যার কোন বাস্তবতা থাকত না।

কিন্তু যখন সত্তার প্রতিচ্ছবি অবতীর্ণ করে দেয়া হল তখন তাকে সিজদা করা আমাদের সাধ্যের মধ্যে চলে এল। প্রতিচ্ছবির বৈশিষ্ট্য হল এই যে, বিশাল থেকে বিশাল জিনিসের প্রতিচ্ছবিও ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্র জিনিসে এসে যেতে পারে। সূর্যকে আপনি আয়নার মধ্যে দেখতে পান। আয়না পৃথিবীরই একটি অংশ; সূর্যের তুলনায় এর কোন অস্তিত্বই নেই। অথচ সূর্য তার পরিপূর্ণ আকার-আকৃতি নিয়ে আয়নার ভেতর বিদ্যমান রয়েছে। তারপর মূল সূর্য যে কাজ সম্পাদন করে, আয়নার সূর্যও সে কাজ করে। আপনি এ আয়নাকে অন্য এক আয়নার সামনে ধরে রাখুন, প্রতিচ্ছবিটি সেখানে পৌঁছে যাবে, তৃতীয় আরেকটি আয়নার সামনে রাখুন, সেখানেও প্রতিচ্ছবি পৌঁছে যাবে। সূর্যের কাজ হল আলোকিত করা। আপনি যেখানেই আয়না লাগাতে থাকবেন সেখানেই সূর্যের আলো পৌঁছতে থাকবে। আপনি ইচ্ছা করলে অন্ধকার প্রকোষ্ঠে এ আলো পৌঁছাতে পারেন। এমনিভাবে সূর্যের কাজ হল তাপ পৌঁছানো, আয়নার দ্বারা ঐ তাপও সেখানে পৌঁছে যাবে। তবে সবল ও দুর্বল, প্রখর ও কোমলের পার্থক্য থাকবে। তাই যে কাজ সূর্য করে, তার প্রতিচ্ছবিও সে কাজ করে থাকে।

এ কারণেই প্রতিচ্ছবি দেখে আমরা বলে থাকি আমি সূর্যকে দেখেছি। সূর্যের মূল নক্ষত্রকে কেউ সরাসরি তাকিয়ে দেখতে পারে না। এতে চোখের জ্যোতি নষ্ট হয়ে যাবে। কিন্তু আয়নায় যখন সূর্যের প্রতিচ্ছবি প্রদর্শিত হয় তখন দেখা যেতে পারে। তার চতুর্দিককে আপনি দেখতে পারেন, পরিদর্শন করতে পারেন। যাই হোক, মূল বস্তু (যাত বা সত্তা) ও প্রতিচ্ছবি (আক্স)-এর মধ্যে কোন পার্থক্য হয় না। আল্লাহর যাতকে সিজদা করা অসম্ভব ছিল, কেননা তা অনেক অনেক সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম এবং অদৃশ্যের পর অদৃশ্য। তাঁর যাতের কল্পনা করাও অসম্ভব।

এ জন্যই আল্লাহ তাআলা বান্দাদের উপর দয়াপরবশ হয়ে তাঁর প্রতিচ্ছবিকে বাইতুল্লাহ নামক আয়নায় ঢেলে দিয়েছেন, যেন একটি সীমার মধ্যে আবদ্ধ হয়ে যায়, এবং এ পর্যন্ত বান্দাদের দৃষ্টি পৌঁছতে পারে, এর সম্মুখে তারা মাথা নত করতে পারে। নতুবা মাথা নত করার কোন পথ ও পদ্ধতি ছিল না। এ আল্লাহর দয়া ও মেহেরবানী যে, তার যাতের নিকটতম তাজাল্লি অবতীর্ণ করে

বান্দাদেরকে সিজদা করার সুযোগ করে দিয়েছেন। নতুবা কোথায় আল্লাহ্ তাআলার পবিত্র নিরাকার যাত, আর কোথায় পাপ পঙ্কিলতাময় বান্দাগণ? আল্লাহ্ তাআলা নূর ও জ্যোতিময় আর আমরা অন্ধকারাচ্ছন্ন। এ দুয়ের মাঝে কোন সম্পর্ক হতে পারে না। কাজেই মাধ্যম হিসেবে একটি তাজাল্লি অবতীর্ণ করেছেন। যেন আমরা সিজদা করতে পারি। তাওয়াফ ও প্রদক্ষিণ করতে পারি। আর এর ইবাদতকে তাঁর যাতের ইবাদত বলে সাব্যস্ত করেছেন।

আমাদের মৌলিক উপাদান, রূহানিয়াত ও নূরানিয়াতের মূল বাইতুল্লাহ্

প্রকৃতপক্ষে বাইতুল্লাহ আমাদের মৌলিক উপাদানেরও মূল এবং রূহানিয়াতেরও মূল। মানব সৃষ্টির উপাদানের মূল এভাবে যে, বাইতুল্লাহ হতেই জমিনের সৃষ্টি আর আমরা সবাই জমিন তথা মাটি হতে সৃষ্ট। সুতরাং বাইতুল্লাহ আমাদের মৌলিক উপাদানের মূল। আর আধ্যাত্মিক মূল হল এভাবে যে, যখন আমরা ইবাদত করব তখন আল্লাহর নূর বাইতুল্লাহর মাধ্যমেই আমাদের অন্তরে প্রবেশ করবে। সুরতাং বাইতুল্লাহ আমাদের আধ্যাত্মিক মূলও সাব্যস্ত হল।

আর এ বাইতুল্লাহ যেহেতু নিম্নদিকে ভূমণ্ডলের তলদেশ পর্যন্ত রয়েছে এবং ঊর্ধ্বে আরশ পর্যন্ত রয়েছে তাই আমি বলি, যে যে স্থানে বাইতুল্লাহ রয়েছে তার আশেপাশে যে সমস্ত মাখলুক রয়েছে তাদেরও মূল ঐ বাইতুল্লাহ। পার্থক্য শুধু এতটুকু, প্রত্যেক স্থান অনুযায়ী তার আকার আকৃতি তৈরি হয়ে থাকে। মাটির পৃথিবীতে বাইতুল্লাহ আছে তাই তার আকার আকৃতি হয়েছে পাথর দ্বারা তৈরি। ঊর্ধ্বাকাশে যান, সেখানে সূক্ষ্মতা বৃদ্ধি পাবে, আলো ও জ্যোতি বৃদ্ধি পাবে, এভাবে আল্লাহর আরশের নিকটবর্তী হয়ে গেলে শুধু নূর আর নূর, জ্যোতি আর জ্যোতিই থেকে যাবে, সেখানকার সৃষ্টি বা মাখলুক হল নূরের। আর এখানে হল মাটি এবং পদার্থের মাখলুক। কিন্তু সবার মূল হল বাইতুল্লাহ। সকলের প্রত্যাবর্তন হবে সেখানে। ফেরেশতাগণও বাইতুল্লাহর তাওয়াফ করেন, মানব জাতিও তাওয়াফ করেন। কোন কোন জীবজন্তুও তাওয়াফ করে, সবাই জানেন যে, বাইতুল্লাহই আমাদের মূল।

আমি আরয করেছিলাম যে, বাইতুল্লাহ হল সৃষ্টির মূল বা প্রথম সৃষ্টি। প্রকৃতপক্ষেই তা জগতের প্রথম সৃষ্টি। আল্লাহ বলেছেন–

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُّضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِىْ بِبَكَّةَ مُبٰرَكًا وَّهُدًى لِّلْعٰلَمِيْنَ○

নিঃসন্দেহে সর্বপ্রথম ঘর যা মানুষের জন্যে নির্ধারিত হয়েছে, সেটাই হচ্ছে এ ঘর, যা বাক্কায় অবস্থিত এবং সারা জাহানের মানুষের জন্য হেদায়েত ও বরকতময়। [আলে ইমরান : ৯৬]

আর হাদীসে বলা হয়েছে, যখন পৃথিবী সম্প্রসারিত হতে শুরু করল তখন সর্বপ্রথম ঐসব পাহাড়গুলো সৃষ্টি হল যেগুলো মক্কার আশেপাশে রয়েছে। এরপর সম্প্রসারিত হতে হতে অন্যান্য পাহাড় সৃষ্টি হল। এ কথা স্পষ্ট যে, যখন পৃথিবী চতুর্দিকে সম্প্রসারিত হতে শুরু করল তখন যে জিনিসের মধ্যে যে সকল বৈশিষ্ট্য ছিল সেগুলো ঝলমল করে প্রকাশ পেতে লাগল।

মদীনা মুনাওয়ারাও তো এরই মধ্যে এসে যায়, অন্যান্য স্থানের তুলনায় মদীনাও প্রথম সৃষ্টি। এভাবে যে, মদীনার গণ্ডির বাইরে পৃথিবীর যে সকল অংশ রয়েছে, সেগুলোর তুলনায় মদীনা প্রথম এবং সেগুলো পরের সৃষ্টি। এমনিভাবে অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচ্য হতে থাকবে। ফলে বাইতুল্লাহই সবার মূল সাব্যস্ত হবে। এজন্যই আমি বলেছি, বাইতুল্লাহ হল জগতের প্রথম সৃষ্টি।

বাইতুল্লাহ জগতের মধ্যস্থিত হওয়ার হেকমত

বাইতুল্লাহ সৃষ্টির মূল এবং তা সৃষ্টির মধ্যবর্তীও। বোঝা গেল, এটি কোন কেন্দ্রীয় স্থান। যার উপর আল্লাহ তাআলা বিশেষ তাজাল্লী ছড়িয়েছিলেন, যেন এখান থেকে নূর ও বরকত চতুর্দিকে সমভাবে বিস্তৃত হয়। এ জন্যই হযরত ইবনে আব্বাস রা. বলতেন–

يااهل مكة انتم فى وسط من الأرض

হে মক্কাবাসী! তোমরা পৃথিবীর মধ্যবর্তী স্থানে রয়েছ।

এ দ্বারা বোঝা গেল, বাইতুল্লাহ পৃথিবীর মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত। আর কেন্দ্র তো মধ্যখানেই হয়ে থাকে। বৃত্ত তখনই তৈরি হবে যখন কেন্দ্রটি মধ্যখানে অবস্থিত হবে। কম্পাসের একটি কাঁটাকে আপনি কেন্দ্রে রেখে অন্য কাঁটাটি ঘুরালে তখনই কেবল বৃত্ত তৈরি হবে। যদি কেন্দ্র থেকে কাঁটাটি সরে যায় তবে বৃত্ত তৈরি হতে পারবে না। সুতরাং বোঝা গেল যে, বাইতুল্লাহ পৃথিবীর প্রথম ও মূল, কেন্দ্র ও মধ্যবর্তী।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সৌভাগ্যময় শুভ জন্ম মক্কায় হওয়ার এটাই বাহ্যিক কারণ বলে মনে হয়। আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে ইসলাম ও পরিপূর্ণ দীনের যেন প্রথম দাওয়াত মক্কা থেকেই সূচনা হয়েছে। যেন কেন্দ্র থেকে দাওয়াত পরিচালিত হয় এবং সমভাবে বিশ্বের চতুর্দিকে তার আওয়াজ প্রসারিত হতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ বলছি, যদি আল্লাহ তাআলা বাইতুল্লাহ

রাশিয়া অথবা চীন দেশের পাহাড় পর্বতের উপর তৈরি করে দিতেন তবে বিশ্ববাসীকে বহু কষ্ট স্বীকার করে সেখানে পৌছতে হত। আর যদি পশ্চিমা দেশ আমেরিকার ঐদিকে তৈরি করে দিতেন তবে রাশিয়ার যাত্রীগণকে লাখো মসিবত সহ্য করে পৌছতে হত। অনেকের পক্ষে সেখানে পৌছাও সম্ভব হত না। আল্লাহ তাআলা বাইতুল্লাহকে মধ্যে রেখেছেন, যেন ঠাণ্ডা ও গরম সব দেশের মানুষই সেখানে পৌছতে পারে। সকলেই যেন সম পর্যায়ের পরিশ্রম সহ্য করে স্বীয় কেন্দ্রে পৌছতে পারে। মধ্যস্থলে হওয়ার কারণেই এ আসানী হয়েছে। এমনিভাবে কেন্দ্র থেকে যা পরিচালিত হবে তাও চতুর্দিকে সমভাবে বিস্তার লাভ করা সহজ হবে। আল্লাহ তাআলা দাওয়াত ইলাল্লাহ ও পরিপূর্ণ দীনের কারখানা মক্কা থেকেই আরম্ভ করেছেন। ইসলামের সর্বপ্রথম দাওয়াত মক্কা থেকেই শুরু হয়েছে।

কেন্দ্রের স্থানান্তর

জনাব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা থেকে দাওয়াতের কাজ আরম্ভ করেছেন। এরপর কেন্দ্র হয়েছে মদীনা। এ হল আল্লাহ তাআলার ইচ্ছা ও শান যে, প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য কোন কামালাতকে তিনি কোন স্থানের সাথে বিশেষ করে সম্পৃক্ত করেননি। যেমন ইলম ও জ্ঞান কোন খানদান বা গোত্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখেননি, কাউকে বিশেষত্ব দান করেননি যে, ইলম তাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে, অন্য কোথাও থাকবে না, অন্য কারো মধ্যে থাকবে না। আধ্যাত্মিক কামালাত ও পূর্ণতা অমুক গোত্রে থকবে, একমাত্র তারাই এর উত্তরাধিকারী হবে, অন্য সকলে এ থেকে বঞ্চিত থাকবে। ইলম ও জ্ঞান অমুক ভূখণ্ডেই সীমাবদ্ধ থাকবে, অন্য কোথাও হবে না, এমনটি নয়। আল্লাহ তাআলা আদম সন্তানের প্রতিটি স্তর, প্রতিটি জামায়াতকে ইলম ও রূহানিয়াত দ্বারা অলংকৃত করেছেন এবং পৃথিবীর প্রতিটি ভূখণ্ডকে এ থেকে অংশ দান করেছেন। তাই প্রথম কেন্দ্র ছিল মক্কা, তারপর একে মদীনায় স্থানান্তর করা হয়। খোলাফায়ে রাশেদীনের হুকুমাত এখানেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ইলমের দরিয়া ও নহরগুলোও এখান থেকেই প্রবাহিত হয়েছে। এর পর কেন্দ্র ইরাকের দিকে স্থানান্তরিত হয়। খেলাফতের কেন্দ্র সাব্যস্ত হয় বাগদাদ। তখন সেখান থেকে লক্ষ লক্ষ্য উলামায়ে কেরাম তৈরি হয়েছেন। তারপর স্থানান্তরিত হল খোরাসানের (ইরানের একটি এলাকা) দিকে। তখন খোরাসান অঞ্চলে হাজারো প্রসিদ্ধ উলামা ও ফুযালা তৈরি হলেন। কখনো ইলম স্পেনের দিকে স্থানান্তরিত হয়ে গিয়েছে, তখন স্পেন কেন্দ্রের মর্যাদা লাভ করেছে। বড় বড় আকাবির উলামা স্পেনে জন্ম নিয়েছেন।

মোটকথা হল এই– আল্লাহ তাআলা ভূখণ্ডের কোন একটি স্থানকে বিশেষত্ব দান করেননি যে, তাঁর বরকত শুধু সেখানেই অবতীর্ণ হবে, সেটাই কেবল ফয়েযের উৎস হবে। বরং এর জন্য সকল ভূখণ্ডই সমান। হিকমতেরও চাহিদা এই যে, বরকত ও ফয়েয কোন স্থানের সাথে নির্দিষ্ট থাকবে না।

এমনিভাবে খান্দানও স্থির থাকেনি, পরিবর্তন হতে রয়েছে। দীর্ঘদিন নবুওয়াত বনী ইসরাঈলে ছিল। তারা যখন এ নেয়ামতের অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করল, যথাযথ সম্মান প্রদর্শনে ব্যর্থ হল, তখন বনী ইসরাঈল খান্দানকে বঞ্চিত করে তাদের স্থলে নবুওয়াত বনী ইসমাঈল খান্দানে অর্পিত হল এবং এমনই একটি নবুওয়াত এল যার মর্যাদা সকল নবুওয়াতের শীর্ষে। খাতামুন্নাবিয়্যিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দান করে বনী ইসমাঈলকে ধন্য করা হল।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বরকত ও কামালাতও কোন গোত্রের সাথে খাছ নয়। হযরত সিদ্দিকে আকবর রা. প্রথম খলিফা ছিলেন বলে সিদ্দিকিয়াতের গুণের সাথে খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হল। তারপর এল ফারুকিয়াতের গুণের সাথে, তারপর উসমানিয়াতের গুণের সাথে, তারপর উলুবিয়াতের গুণের সাথে। প্রত্যেক খান্দান এর ভাগ লাভে ধন্য হতে লাগল এবং প্রত্যেক ভূখণ্ড উপকৃত হতে লাগল। কখনো মক্কা কেন্দ্রের মর্যাদা লাভ করেছে, কখনো লাভ করেছে মদীন। কখনো কেন্দ্র ছিল খোরাসানে, কখনো স্পেনে, কখনো বা ভারত উপমহাদেশে। কেন্দ্র স্থানান্তরিত হয়ে দিল্লী এসে পৌঁছল। হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ রহ.-এর খান্দান এবং শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী রহ.-এর দ্বারা সারা ভারতে ইলমে হাদীস প্রচার ও প্রসার লাভ করল। তারপর সে কেন্দ্র দিল্লী থেকে সাহারানপুর জেলায় স্থানান্তরিত হল। এখানে বড় বড় বিজ্ঞ উলামা জন্মগ্রহণ করেছেন। সুতরাং কোন ভূখণ্ডের সাথে নির্দিষ্ট হয়ে থাকেনি। কিন্তু সকলের কেন্দ্র সর্বাবস্থায় একই থাকবে। প্রকৃত ও মূল কেন্দ্র হওয়ার মর্যাদ শুধু বাইতুল্লাহরই রয়েছে। সেখান থেকেই ইলম ও কামালাতের প্রস্রবণ প্রবাহিত হচ্ছে।

বরকত ও হিদায়াতের ঘর

এ জন্যই আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন–

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُّضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِىْ بِبَكَّةَ مُبٰرَكًا وَّهُدًى لِّلْعٰلَمِيْنَ○

নিঃসন্দেহে সর্বপ্রথম ঘর যা মানুষের জন্যে নির্ধারিত হয়েছে, সেটাই হচ্ছে এ ঘর, যা বাক্কায় অবস্থিত এবং সারা জাহানের মানুষের জন্য হেদায়েত ও বরকতময়। [আলে ইমরান : ৯৬]

সুতরাং এ ঘর যেমন বরকতময় তেমনি হিদায়াতময়।

সাধারণভাবে বরকত শব্দটি জড় পদার্থের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। যদিও রূহানিয়াতের ক্ষেত্রেও ব্যবহার করা যায়, কিন্তু সাধারণ ব্যবহার জড় পদার্থেই হয়ে থাকে। যেমন বলা হয়, খাবারে বরকত হয়েছে, অমুকের জীবনে ও বয়সে বরকত হয়েছে, অমুক কাজে বরকত হয়েছে। সুতরাং বরকত শব্দটি জড় পদার্থে ব্যবহৃত হয়। আর হিদায়াত শব্দটি বাতেনী কামালাতের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। যেমন ইলম, মারেফাত, আত্মিক পূর্ণতা প্রভৃতির ক্ষেত্রে। মোটকথা হল এই, বাইতুল্লাহ বরকতেরও ঘর এবং হেদায়াতেরও ঘর। অর্থাৎ পদার্থগত বরকতও তাতে বিদ্যমান এবং রূহানী বরকতও বিদ্যমান।

প্রকৃষ্ট নিদর্শন

আল্লাহ তাআলা বলেছেন–

فِيْهِ اٰيٰتٌۢ بَيِّنٰتٌ مَّقَامُ اِبْرٰهِيْمَ.

এতে রয়েছে 'মাকামে ইবরাহীমের' মত প্রকৃষ্ট নিদর্শন। [আলে ইমরান : ৯৭]

আজ এখানে লক্ষ লক্ষ মানুষ সমবেত হয়েছেন। এ আল্লাহ তাআলার এক প্রকাশ্য কুদরতের নিদর্শন যে, লক্ষ লক্ষ মানুষের খাবার ও পানীয় জুটছে, ফলমূলও পাওয়া যাচ্ছে। অথচ মক্কা এমন মরু অঞ্চল, যাকে وادى غير ذى زرع 'তৃণ-লতাহীন বালুময় মরু-প্রান্তর' বলা হয়েছে। যেখানে না আছে সবুজের চিহ্ন, না আছে পানি, না আছে ঝরণা ধারা, না আছে কোন বাগবাগিচা– অথচ সর্বপ্রকার তাজা ফল পাওয়া যাচ্ছে।

হযরত ইবরাহীম আ. দুআ করেছিলেন–

وَارْزُقْ اَهْلَه مِنَ الثَّمَرٰتِ مَنْ اٰمَنَ مِنْهُمْ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ؕ

হে আল্লাহ! এ ঘরের (নিকটের) অধিবাসীদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও কিয়ামতে বিশ্বাস করে, তাদেরকে ফলের দ্বারা রিযিক দান করুন। [বাকারা : ১২৬]

হযরত ইবরাহীম আ. সর্বোত্তম পর্যায়ের রিজিকের জন্য দুআ করেছিলেন, অর্থাৎ তাজা ফল। যদি তিনি সিরিয়ার জন্য এ দুআ করতেন তবে তা স্বাভাবিকই হত,

কারণ সেখানে ফল উৎপন্ন হয়। দুআ করেছেন এমন বালুময় মরু অঞ্চলের জন্য, যেখানে না আছে পানি, না আছে কোন সবুজের চিহ্নি। অথচ সেখানে বিশ্বের সকল প্রকার টাটকা ফল বিদ্যমান, সকল মওসুমে, সকল ঋতুতে। প্রতিটি মানুষ এর দ্বারা উপকৃত হচ্ছে। দশ-বিশ হাজার মানুষ সমবেত হলে সব জিনিসের অভাব দেখা দেয়, পরস্পরের ঝগড়া-ফাসাদ লেগে যায়। فِيْهِ اٰيٰتٌ بَيِّنٰتٌ 'এখানে রয়েছে প্রকৃষ্ট নিদর্শনাবলী'। রিযকও পাওয়া যাচ্ছে, ঝগড়া বিবাদও হচ্ছে না। লক্ষ মানুষের সমাগম। আরাফাতের ময়দানে তো এক জায়গায় জড় হচ্ছে। চৌদ্দ-পনের লক্ষ লোকের সমাগম হয়, (বর্তমানে এ সংখ্যা আরো অধিক) কিন্তু শ্বাসপ্রশ্বাসের শব্দও শোনা যাচ্ছে না, প্রতিটি মানুষ নিজ নিজ কাজে ব্যস্ত। প্রতিটি ব্যক্তি নিজ কেন্দ্রের দিকে ধ্যানমগ্ন। কোন আওয়জ, কোন আলাপ-আলোচনা, কথাবার্তা, ঝগড়া-ফাসাদ, দ্বন্দ্ব-কলহ কিছুই নেই। পরিবেশ অত্যন্ত শান্ত, আমাদের অঞ্চলের মসজিদগুলোতেও এমন নীরব, শান্ত পরিবেশ হয় না, যেমন শান্ত পরিবেশ আরাফাতের ময়দানে লক্ষ লক্ষ লোকের বিরাট সমাগমে পরিদৃষ্ট হয়। এগুলো কি আল্লাহর কুদরতের নিদর্শনের অন্তর্ভুক্ত নয়?

দৈহিক প্রশান্তির সাথে আধ্যাত্মিক প্রশান্তি

মানুষের মধ্যে দুটি শক্তিই রয়েছে, যা দ্বারা সকল গুনাহ বিস্তার লাভ করে। একটি কামশক্তি, দ্বিতীয়টি ক্রোধশক্তি। একটি দ্বারা অশ্লীল ও গর্হিত কার্যাবলি বিস্তার লাভ করে, দ্বিতীয়টির দ্বারা মারামারি ও ঝগড়া-কলহ বিস্তার লাভ করে। কিন্তু আমি বলি মাতাফে (বাইতুল্লাহ প্রদক্ষিণ করার স্থান) পুরুষ মহিলা একত্রে তাওয়াফ করছেন, কাঁধে কাঁধ মিলিত হয়ে হচ্ছে। শুধু এ-ই নয় যে, পুরুষেরা সেদিকে কোন ভ্রুক্ষেপ করছে না; বরং কোন সময় খারাপ লাগে যে, মহিলা কেন সম্মুখে এল! তাই আমি বলি, একটি আবেগকে নিস্তেজ করে দেয়া কি কুদরতের নিদর্শন নয়? এতো আল্লাহর কুদরতের স্পষ্ট নিদর্শন। নতুবা নারীদের প্রতি পুরুষের আকর্ষণ স্বভাবজাত ব্যাপার। কিন্তু হাজারো নারী রয়েছেন, কাঁধে কাঁধ, কোমরে কোমর লাগছে, কিন্তু আকর্ষণ তো তৈরি হয়ই না, বরং অনেক সময় বিরক্তি ধরে যায় যে, কোথা থেকে এ মহিলা এসে মধ্যখানে ঢুকে পড়ল এবং আমাদের ইবাদত-বন্দেগীর মধ্যে ঝামেলা হয়ে দাঁড়াল? সুতরাং অন্তরকে বদলিয়ে দেয়া নিঃসন্দেহে 'সুস্পষ্ট নিদর্শন'-এর অন্তর্ভুক্ত।

ক্রোধ শক্তিরও অবস্থা তদ্রূপ, নতুবা এত অধিক পরিমাণ ঝগড়া- কলহ সহ্য করতে হতো যে, প্রশাসনের পক্ষেও এগুলো নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন হয়ে পড়ত।

কিন্তু কোথাও কোন ঝগড়া নেই, বিবাদ নেই। এমনকি কাঁধে কাঁধে ধাক্কা লাগছে, স্বভাব বিরুদ্ধ কাজকর্ম সামনে এসে যাচ্ছে। আর এ লক্ষ লক্ষ জনতার মধ্যে দ্বীনের বুঝ সম্পন্ন আলেমের সংখ্যা তো অতি নগণ্য, অশিক্ষিতেরই সংখ্যা বেশি, তথাপি কোন প্রকার ঝগড়া-বিবাদের নাম গন্ধও নেই। আর কখনো যদি হঠাৎ করে হয়েও যায়, তবে মানুষ হিসেবে দু'একটি হয়ে যেতে পারে। কিন্তু যে পরিমাণ হওয়া খুব স্বাভাবিক ছিল, কখনোই তার কিছুই হয় না। তো ক্রোধশক্তিও এখানে সম্পূর্ণ শান্ত-নিস্তেজ, কামশক্তিও সম্পূর্ণ শান্ত-নিস্তেজ। তবে কি এটা বলা যায় না যে, বাইতুল্লাহ বাতেনী ভাবেও নিরাপত্তার ঘর। ভিতরেও শান্তি ও নিরাপত্তা, বাইরেও শান্তি ও নিরাপত্তা এবং কলবেও শান্তি ও নিরাপত্তা। কলব ও নফসের শক্তিগুলোকে এমনভাবে পদদলিত করা হয় যে, তারা তাদের কাজের সূচনাই করতে পারে না। স্বীয় বরকতময় সত্তার ইবাদত, আনুগত্য ও রূহানিয়াতের প্রতি মনোযোগী করে তোলা হয়। সুতরাং فِيْهِ اٰيٰتٌ بَيِّنٰتٌ 'এখানে রয়েছে প্রকৃষ্ট নিদর্শনাবলী'-এর রিজিক প্রাপ্তি ও ঝগড়া-বিবাদ না হওয়াও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। কামোদ্দীপক বিষয়গুলো নিস্তেজ হয়ে যাওয়া ও না হওয়া এসবও তার অন্তর্ভুক্ত। নির্ভেজাল দৈহিক ও আধ্যাত্মিক প্রশান্তি, প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য– সর্বপ্রকারের প্রশান্তি। وَمَنْ دَخَلَهٗ كَانَ اٰمِنًا 'যে-ই সে স্থানে প্রবেশ করেছে সে নিরাপত্তা লাভ করেছে।' শুধু প্রাণ রক্ষা পাওয়াকেই নিরপত্তা বলা হয় না; বরং একেও নিরাপত্তা বলা হয় যে, মানুষ কুপ্রবৃত্তি থেকে নিরাপদ হয়ে যাবে, শয়তানের প্ররোচনা থেকে নিরাপদ হয়ে যাবে, নফস ও শয়তানের প্রতারণা থেকে রক্ষা পাবে। আর এখানে এসে এসব জিনিস থেকে রক্ষা পাচ্ছে। সুতরাং 'সুস্পষ্ট নিদর্শন' প্রকাশ্যেও বিদ্যমান, অভ্যন্তরেও বিদ্যমান।

যাই হোক, মক্কা মুকাররমা এবং বাইতুল্লাহ সৃষ্টির প্রথম, সৃষ্টির কেন্দ্র, সৃষ্টির মূল এবং আমাদের সকলেরও মূল।

পৃথিবীর মধ্যবর্তী স্থানে রাসূল সা.-এর জন্মগ্রহণের হেকমত

জনাব রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এজন্যই মক্কায় জন্ম দান করা হয়েছে যে, এ দীন বিশ্বজনীন। এটা কোন আঞ্চলিক দীন নয় যে, কোন এক বিশেষ ভূখণ্ড অথবা বিশেষ সম্প্রদায়ের জন্য সীমিত থাকবে। বরং এ দীন সমগ্র দুনিয়াবাসীর জন্য। কাজেই এ দীনের আওয়াজ এমন স্থান থেকে উচ্চারিত হতে হবে যেন তা সমভাবে বিশ্বের সর্বত্র পৌঁছতে পারে। এমন স্থান একমাত্র মক্কাই হতে পারে। এজন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বরকতময় জন্ম

মক্কাতেই হয়েছে। তিনি যখন বিশ্ববাসীকে আল্লাহর দীনের দিকে আহ্বান করতে শুরু করেছেন তখন মক্কা থেকেই করেছেন এবং বিশ্বের চতুর্দিকে তাঁর দাওয়াত ও আওয়াজ সমভাবে প্রসারিত হয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি পৃথিবীর কোন এক প্রান্তে অবস্থান করতেন তবে সেখানেই দীনের প্রাধান্য হত এবং অন্যান্য অঞ্চল অন্ধকার থেকে যেত। কিন্তু দীন যতটুকু বিস্তার লাভ করেছে, চতুর্দিকে সমভাবেই করেছে। এমন কোন দেশ নেই যেখানে আল্লাহ তাআলার নাম নেয়ার মত লোক নেই।

তারপর এ অঙ্গীকারও করা হয়েছে যে, এমন এক সময় আসবে যখন সমস্ত বিশ্বে একটিমাত্র দীনই থাকবে। হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন–

لا يبقى على ظهر الأرض بيت مدرٍ ولاوبر إلا ادخله الله كلمة الإسلام بعز عزيز وبذل ذليل.

বিশ্বের বুকে এমন কোন কাঁচাঘর বা ইট পাথরের তৈরি দালানকোঠা কিংবা কাপড় অথবা চামড়ার তৈরি তাঁবু অবশিষ্ট থাকবে না– যেখানে ইসলামের কালিমা প্রবেশ করবে না। চাই আগ্রহের সাথে তা গ্রহণ করুক অথবা বাধ্য হয়ে করুক।

বাধ্য করার অর্থ এ নয় যে, মুসলমানগণ তাদের গলায় তরবারি ধরে কালিমা পড়াবেন। এটা তো সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّيْنِ দীন গ্রহণের ব্যাপারে কোন প্রকার বাধ্যবাধকতা নেই।

আল্লাহ তাআলা আরো বলেছেন–

اَفَاَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتّٰى يَكُوْنُوْا مُؤْمِنِيْنَ○

হে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! আপনি কি মানুষকে বাধ্য করবেন যেন তারা দীন গ্রহণ করে নেয়? [ইউনুস : ৯৯]

সুতরাং দীন বাধ্যবাধকতার বিষয় নয়, জবরদস্তির বিষয় নয়। এজন্যই ইসলামে 'ইকরাহ' বা বাধ্যকরণ অবৈধ। তারপর এও বলা হয়েছে যে, بذل ذليل অর্থাৎ পৃথিবীর চতুর্দিক হতে ঘাত-প্রতিঘাতে জর্জরিত হয়ে ইসলামী বিধানাবলীর ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণে বাধ্য হবে। ইসলাম ব্যতীত আশ্রয়ের আর কোন স্থান থাকবে না। অপারগ ও বাধ্য হয়ে ইসলামের দিকে ছুটে আসবে।

ইসলামী নীতিমালার বিশ্বজনীন স্বীকৃতি

সাধারণত বাদশাহদের মধ্যে উত্তরাধিকারের প্রচলন রয়েছে। খান্দানের মধ্যেও উত্তরাধিকার চালু ছিল। শতাব্দীর পর শতাব্দী একই খান্দান রাজত্ব করত। বর্তমানে গণতান্ত্রিকতা প্রাধান্য লাভ করেছে বিধায় রাজতন্ত্র ও ব্যক্তিশাসনের অবসান ঘটতে শুরু হয়েছে। 'যোগ্যতর ব্যক্তি নির্বাচন'-এর নীতি কার্যকর রয়েছে। অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি সর্বোত্তম তাকে নেতা নির্বাচন কর। এটা ভিন্ন বিষয় যে উত্তম বাছাইয়ের মাপকাঠি কী নির্ধারণ করা হয়েছে।

ইসলামে উত্তম ব্যক্তি নির্বাচনের নীতি হল এই: যে ব্যক্তি জ্ঞানী হবে, মুত্তাকী হবে, আল্লাহমুখী হবে– সে-ই সর্বোত্তম ব্যক্তি। যাকে খলিফা বলা হয়ে থাকে। ইসলাম বহির্ভূত বিশ্বে কেউ কেউ বলেছেন যে, সর্বাধিক বিত্তশালী ব্যক্তিই অধিক যোগ্য। কেউ বলেছেন, যার পক্ষে জনসমর্থন অধিক সেই উত্তম ইত্যাদি। এগুলো ভিন্ন বিষয়। কিন্তু সর্বোত্তম ও যোগ্যতম ব্যক্তিকে নির্বাচন করার নীতিকে সবাই মেনে নিয়েছে। যোগ্যতম ব্যক্তিকে মনোনীত করা ইসলামের নীতি। ইসলামই এ নীতি নির্ধারণ করেছে যে, যোগ্যতম ব্যক্তিকে রাষ্ট্রপ্রধান মনোনীত কর। সেখানে খান্দান ও গোত্রের কোন বিশেষত্ব নেই, ঘটনাক্রমে যদি কোন বিশেষ গোত্রের হয়েও যায় তাতে কোন অসুবিধা নেই। কোন গোত্রে যেমন বিশেষত্ব নেই, তদ্রূপ বাধা-নিষেধও নেই। যদি কোন খলিফার গোত্রে যোগ্যতম ব্যক্তি থাকেন, তবে তাকে খলিফা মনোনীত করতে কোন অসুবিধা নেই; তাতে বরং উভয় দিকই রক্ষা হবে। কিন্তু মূল উদ্দেশ্য হল আমীর সালেহ ও যোগ্যতম ব্যক্তি হবেন। কিন্তু সর্বাবস্থায় 'নির্বাচন' হতে হবে। এ থেকেই 'যোগ্যতম ব্যক্তি নির্বাচন'-এর বিধান এসেছে। আজ বিশ্বের মানুষ 'নির্বাচন ব্যবস্থা' গ্রহণ করতে বাধ্য হচ্ছে। ইসলামের এই বিধানটি গ্রহণ করা ছাড়া তাদের অন্য কোন আশ্রয় জোটেনি। এখন এটাই ব্যাপক ভিত্তিতে বিশ্বব্যাপী চলছে।

এমনিভাবে ইসলামের 'উত্তরাধিকার আইন'। পৃথিবীতে বহু জাতি এমন ছিল যে, পিতার সম্পত্তিতে মেয়েরা উত্তরাধিকারী হত না। ইসলাম ছেলে মেয়ে উভয়কে অধিকার দিয়েছে। তবে অংশের পার্থক্য করেছে, কিন্তু ছেলে যেমন পিতার উত্তরাধিকারী হবে, মেয়েও তদ্রূপ উত্তরাধিকারী হবে। কোন কোন জাতির মধ্যে মেয়েদের কোন অধিকারই স্বীকৃত ছিল না। ভারতের কোন কোন সম্প্রদায়ের মহিলাগণ বিক্ষোভ করেছেন, লোকসভা ঘেরাও করেছেন, আন্দোলন করেছেন যে, ছেলে যেমন পিতার সন্তান আমরাও পিতার সন্তান, আমরা সম্পদের অংশ পাব না তার কারণ কী? তাদের আন্দোলনের মুখে বাধ্য হয়ে সরকারকে আইন প্রণয়ন করতে হয়েছে। পিতার সম্পত্তিতে তাদেরকে অংশীদার করতে হয়েছে।

এই আইন প্রণয়নে এ জাতিগুলো কার দ্বারস্থ হয়েছে? তাদের নিকট কিছুই তো ছিল না। ইসলামী আইনের ধারাগুলো তারা নিজস্ব শব্দে উচ্চারণ করেছে মাত্র, এ ছাড়া আর কী বলা যেতে পারে? তো মানুষ ইসলামের নাম নেয় না, কিন্তু তার মূলনীতি গ্রহণ করে চলেছে।

ভারতের উত্তর প্রদেশের হিন্দু গভর্ণর কে. এম. মুন্সী লক্ষ্ণৌর এক জনসভায় তার বাণী পাঠিয়েছিল, সে সভায় আমিও উপস্থিত ছিলাম। তাকে সভায় উপস্থিত হওয়ার জন্য দাওয়াত করা হয়েছিল। সরকারী নানা কাজে অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে পড়ায় উপস্থিত হতে না পারার জন্য অপারগতা প্রকাশ করে বাণী পাঠিয়েছিলেন। সীরাতের জলসা ছিল, সেখানে তার বাণী পড়ে শুনানো হল। এর দুটি অংশ ছিল। প্রথম অংশে সে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মর্যাদা ও গুণাবলি বর্ণনা করেছিল। আর তা এমন সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছিল যে, মনে হয়েছিল কোন মুসলমানও এভাবে বর্ণনা করতে পারবে না। বলেছিল, পৃথিবীতে এমন ব্যক্তিত্ব, এমন সত্তা যার জীবনের উপর কোন প্রকার খুঁত নির্দেশ করার সুযোগ নেই, হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যতীত দ্বিতীয় কোন মানুষ এমন নেই, দ্বিতীয় কোন ব্যক্তিত্ব নেই। পূর্ণাঙ্গ ও পরিপূর্ণ ব্যক্তিত্ব নিয়ে পৃথিবীতে মাত্র একজনই সৃষ্টি হয়েছেন।

তার বক্তৃতার দ্বিতীয় অংশে ছিল– 'আমরা ভারতের আইনকানুন ইসলামী মূলনীতির উপর প্রণয়ন করেছি, আমরা ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠা করেছি, সাম্য প্রতিষ্ঠা করেছি, সকল সম্প্রদায়ের সমান অধিকার নিশ্চিৎ করেছি। এটা ভিন্ন কথা যে, পথিমধ্যে চোর ডাকাতরা এ অধিকারগুলোকে হরণ করে নিয়ে গেছে। তারা তা বুঝতে পারেনি। কিন্তু আইনে সবার অধিকার সমান রাখা হয়েছে।'

এর অর্থ এই দাঁড়াল যে, তাদের নিকট এ জাতীয় কোন মূলনীতি ছিল না, বাধ্য হয়ে ইসলামের আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়েছে এবং সেখান থেকে মূলনীতি গ্রহণ করেছে।

সাহাবায়ে কেরাম ও অমুসলিম সম্প্রদায়

ভারতে যখন কংগ্রেসের অস্থায়ী শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তখন মহাত্মা গান্ধী বলেছিলেন– 'আমাদের মন্ত্রীবর্গ যদি বিশ্ববাসীর সম্মানের পাত্র হতে চান তবে তাদের অবশ্য কর্তব্য হল ছুত-অচ্ছুত প্রথাকে খতম করতে হবে, বংশগত মর্যাদা ও বিভাজনকে খতম করতে হবে, উঁচু-নিচুর প্রভেদকে উৎখাত করতে হবে এবং আবু বকর সিদ্দিক রা. ও উমর ফারুক রা.-এর আদর্শকে অনুসরণ করতে হবে।'

গান্ধীর স্বজাতি তার এ বক্তব্যকে অপছন্দ করে বলল, আপনি উদাহরণ দেয়ার জন্য আবু বকর রা. ও উমর রা.-কেই পেলেন? তিনি উত্তরে বললেন– 'অন্য কোন জাতির মধ্যে এর নমুনা থাকলে তোমরা পেশ কর। অন্য জাতির মধ্যে যখন এ আদর্শ পাওয়া যায় না তখন আমি কার নাম নেব? এসব আদর্শ একমাত্র তারাই স্থাপন করেছেন যে, একই সাথে রাষ্ট্র পরিচালনা ও দরবেশীকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন, প্রভাব-প্রতিপত্তিও অক্ষুণ্ন রয়েছে আবার দেহে তালি দেয়া চাদরও জড়ানো রয়েছে, ধার্মিকতা ও অল্পে তুষ্টিও যথাস্থানে বিদ্যমান রয়েছে। এসব আদর্শ একমাত্র মুসলমানদের মধ্যেই যথাযথ রয়েছে। তোমরা উদাহরণস্বরূপ এমন একটি রাজ্যের নাম পেশ কর, যেখানে ন্যায়ানুগভাবে রাষ্ট্রও পরিচালিত হচ্ছে এবং শাসক গোষ্ঠীর সকলেই দরবেশ।'

খোলাফায়ে রাশিদীন কোন সোনা-রূপার প্রাসাদ নির্মাণ করাননি, সাধারণ মানুষের সরল সহজ জীবনের মতোই ছিল তাদের জীবন, কিন্তু বিশ্বের সর্বত্র তাঁরা সত্য ধর্মের প্রভাব-প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। যাই হোক, গান্ধী তাদের বলেছিলেন যে, যখন নমুনা নেই তখন আমি কী উপস্থাপন করব? তোমরা ভাল মনে কর আর খারাপ মনে কর, আমার কিছু করার নেই। সুতরাং কথা হল এই, লোকজন স্বতঃস্ফূর্তভাবে ইসলামে আকৃষ্ট হবে, ইসলাম গ্রহণ করতে কেউ তাদের গলায় তরবারি ধরে বাধ্য করবে না, বরং ইসলামের নীতিমালা ও বিধি-বিধানই তাদেরকে ইসলাম গ্রহণ করতে বাধ্য করবে। সময় ও যুগ তাদেরকে বাধ্য করবে। অন্য কোথাও তাদের আশ্রয় জুটবে না। ইসলামের নীতিমালাই কেবল তাদেরকে আশ্রয় দিতে সমর্থ হবে। কেননা এগুলো হল মানুষের স্বভাবজাত এবং মানব প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। সুতরাং তারা নিরুপায় হয়ে তা গ্রহণে বাধ্য হবে।

নবুওয়াতের প্রভাব বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়া

জনাব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওয়াদা করেছেন, বলেছেন–

لا يبقى على ظهر الأرض بيت مدرٍ ولاوبر إلا ادخله الله

كلمة الإسلام بعز عزيزٍ وبذل ذليل.

ভূপৃষ্ঠে কোন কুঁড়েঘর, কোন দালান-কোঠাই বাকি থাকবে না, সর্বত্রই ইসলামের কালিমা প্রবেশ করবে।

فيكون الدين كله لله

সমগ্র পৃথিবীতে একমাত্র আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠিত হবে।

কোন কোন ব্যাখ্যাকারের মতে এ বাক্যটি হাদীসেরই অংশ আর কারো কারো মতে এটি হযরত আবু হুরায়রা রা.-এর নিজস্ব উক্তি। তবে উক্তি যারই হোক, কথাটি সঠিক। কেননা, যখন বিশ্বের সকল ঘরে ইসলাম প্রবেশ করবে তখন বিশ্বে একটিই দীন থাকবে।

এ ছিল মক্কার আওয়াজ, যা বিশ্বের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়া উচিত ছিল। এর জন্য আল্লাহ তাআলা একটি সময়ও নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগেও এ আওয়াজ কেন্দ্র থেকে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েছিল এবং তা পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়েছিল। কিন্তু সে পূর্ণতা ছিল অবস্থার ভিত্তিতে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক লক্ষ চব্বিশ হাজারের এমন একটি পূত-পবিত্র জামায়াত তৈরি করেছিলেন, যারা নবী ছিলেন না বটে, কিন্তু নবুওয়াতের সকল নিদর্শন তাদের মধ্যে পূর্ণ মাত্রায় বিদ্যমান ছিল।

علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل.

আমার উম্মতের আলেমগণ বনী ইসরাঈলের নবীদের মত।

তাঁরা নবী ছিলেন না বটে কিন্তু হযরত খোলাফায়ে রাশিদীন এবং সাহাবায়ে কেরাম সেই কাজ করেছেন যা নবীগণ করতেন। যিনি যে এলাকায় পৌঁছে গেছেন সে এলাকাকে ঈমান ও ইলমের নূর দ্বারা আলোকিত করেছেন। সাহাবায়ে কেরামের স্থান ও মর্যাদা তো অনেক উর্ধ্বে, আইম্মায়ে মুজতাহিদীনের যে যেখানে বসে পড়েছেন, তিনি সে অঞ্চলকে ঈমান এবং ইলম ও মারেফাতের নূর দ্বারা নূরানী করে দিয়েছেন।

ইমাম আবু হানিফা রহ. খোরাসানের বাসিন্দা ছিলেন, সেখানেই তাঁর মাজহাব বিস্তার লাভ করেছে। খোরাসান, ভারতবর্ষ ও আফগানিস্তানে তাঁর মাজহাবই প্রচলিত রয়েছে। তাঁর মাজহাবের অনুসরণ করে কোটি কোটি মানুষ জান্নাতে পৌঁছে গিয়েছেন। ইমাম শাফিয়ী রহ.-এর অবস্থান প্রথমে হিজাযে ছিল এবং মৃত্যুকালে তাঁর অবস্থান ও বসবাস ছিল মিসরে। এজন্যই মিসর ও হিজাযে তাঁর মাজহাবের অনুসারীগণই বেশি। মোটকথা, যে ইমাম যে স্থানে অবস্থান করেছেন, সে স্থানকে ইলম ও ফিকহ এবং দীনি কামালাত দ্বারা পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন। দীনের রঙে এলাকাকে রাঙিয়ে তুলেছেন। যদিও এসব বুযুর্গানে দীন নবী ছিলেন না, কিন্তু কাজকর্ম এমনভাবে করেছেন, যা পূর্বযুগে নবীগণ করতেন। এক একজন নবী এসে তার জন্য নির্ধারিত এলাকাকে ঈমানের আলোয় আলোকময় করে দিতেন। এ উম্মতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খাদেমদের মধ্যে এমনসব ব্যক্তিবর্গ জন্মগ্রহণ করেছেন যাঁরা নবীগণের কার্যাবলী সম্পাদন করেছেন। কিন্তু তাদের মূল শক্তি ছিল একটি,

আর তা হল খতমে নবুওয়াতের শক্তি। এ শক্তির অধীনে থেকে উলামায়ে কেরাম এতসব খেদমত আঞ্জাম দিতে সক্ষম হয়েছেন। ফয়েজ ও শক্তির মাধ্যমে একই নবুওয়াতের ছত্রছায়ায় ইলম ও জ্ঞান, কামালাত ও পূর্ণতা বিশ্বের সর্বত্র বিস্তার লাভ করেছে এবং করতে থাকবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র যুগে দীন পূর্ণতা লাভ করে চতুর্দিকে প্রসার লাভ করেছে, কিন্তু তা ছিল কাইফিয়াত বা গুণগত হিসেবে যে, এক লাখ চব্বিশ হাজারের এমন একটি জামাত তৈরি হয়েছিলেন, যাঁদের প্রতিজন যে কোন নবীর নিসবতের সমকক্ষ ছিলেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেমন সকল নিসবতের আধার ছিলেন, তাঁরই তারবিয়াত ও শিক্ষায় এ নিসবত সম্মুখপানে অগ্রসর হল এবং কাইফিয়াত হিসেবে দীন তার পূর্ণ রূপ ধারণ করল। কিন্তু এ আওয়াজ মক্কা কেন্দ্রিক ছিল, একে সমগ্র বিশ্বের সর্বত্র পৌছাতে হবে। তাই হযরত ঈসা আ.এর যুগে এবং ইমাম মাহদীর যুগে– যিনি শেষ মুজাদ্দিদ হবেন সে যুগ সম্পর্কে বলা হয়েছে– فيكون الدين كله لله সম্পূর্ণ পৃথিবীতে একই দীন থাকবে। একমাত্র ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন দীন থাকবে না, সমগ্র বিশ্বে ইসলামই প্রসার ও বিস্তার লাভ করবে। তখন পরিমাণ ও সংখ্যার দিক দিয়ে পূর্ণতা লাভ করবে। গুণগতভাবে পূর্ণতা প্রাথমেই অর্জন করেছ। সুতরাং মক্কার দাওয়াত ও আহ্বান যা কেন্দ্র থেকে উচ্চারিত হয়েছিল তা নিষ্ফল হতে পারে না। সুতরাং গুণগত পরিমাণ ও সংখ্যাগত উভয় দিক দিয়েই পূর্ণতা লাভ করেছে, পূর্ণাঙ্গ রূপ ধারণ করেছে। যখন সংখ্যানুপাতে সমগ্র বিশ্বের একই দীন ইসলাম থেকে যাবে, তখন সৃষ্টির উদ্দেশ্যও পূরণ হয়ে যাবে, ইবাদতের কারখানা সম্পূর্ণ হয়ে যাবে। তারপর শুরু হবে কিয়ামতের যুগ। তখন এ বিশ্বকে ধ্বংস করে দেয়া হবে।

আমার এ বক্তব্যের উদ্দেশ্য ছিল এই যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দাওয়াতের আওয়াজ মক্কা থেকে উচ্চারিত হয়েছিল, তাঁর খায়র ও বরকতময় যুগের পর সম্পূর্ণ উম্মতই তাঁর ওয়ারিশ। কাজেই উম্মতের উপর কর্তব্য হল এ আওয়াজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া এবং কেন্দ্র থেকে পরিচালিত করা।

আন্তর্জাতিক তাবলীগের কেন্দ্র বিশ্বের কেন্দ্রে হওয়া উচিত

আনুমানিক ঊনপঞ্চাশ বছর পূর্বে প্রথমবারের মত আমি এ মক্কায় হাজির হয়েছিলাম। তখন মরহুম বাদশাহ আব্দুল আজিজ ইবনে সউদ জীবিত ছিলেন। ঐ সময় তাঁর উপর একটি দুর্ঘটনা ঘটেছিল। মাতাফে তাঁকে এক ঘাতক

অতিক্রম করেছিল, আল্লাহ তাআলার রহমতে তিনি রক্ষা পেয়ে যান। ভারতীয় নেতৃবৃন্দের পক্ষ থেকে এ ব্যাপারে বাদশাহকে মোবারকবাদ দেয়ার জন্য একটি সংবর্ধনা সভার আয়োজন করা হল, এজন্য যে, আল্লাহ তাআলা তাঁকে হেফাযত করেছেন, রক্ষা করেছেন। মক্কা হোটেলে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। প্রায় তিন-চারশত মেহমান এতে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তন্মধ্যে উলামায়ে কেরাম, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, ব্যবসায়ী, গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ– সকলেই উপস্থিত ছিলেন। ঐ বছরের হজকে জনগণ হজ্জুল উযামা (মহামনীষীদের হজ) বলে আখ্যায়িত করেন। অর্থাৎ প্রত্যেক দেশের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ এ হজ্জে উপস্থিত ছিলেন। মোটকথা সভা হল, বক্তৃতা হল, প্রস্তাব পাস করা হল। এগার সদস্যবিশিষ্ট একটি প্রতিনিধি দল গঠন করা হয়েছিল। এ দলের মধ্যে মাওলানা মুফতী নাঈম লুধিয়ানী সাহেব, হফেজ হেদায়েত হুসাইন কানপুরী সাহেব, মাওলানা আযাদ সুবহানী সাহেব ছিলেন। আমাকে প্রতিনিধি দলের দলপতি নির্বাচন করা হল। আমাদের দায়িত্ব ছিল, গতকাল অনুষ্ঠিত সভার প্রস্তাবাবলি ও কার্যবিবরণী বাদশাহর খেদমতে পেশ করা ও বাদশাহকে অবহিত করা। বাদশাহ আমাদেরকে অনুমতি দিলেন এবং আমাদেরকে অত্যন্ত সম্মান করলেন। বাদশাহ বললেন, মেহমানদের বসার জন্য যে গেস্টহাউস রয়েছে, উলামায়ে কেরামকে যেন সেখানে বসানো না হয়। এ জন্য যে, আমি সেখানে গেলে উলামায়ে কেরাম আমার সম্মানার্থে দাঁড়িয়ে পড়বেন। আমি চাই যে, আমি তাঁদের সম্মান করব, আমার সম্মানার্থে তাঁদেরকে যেন দাঁড়াতে না হয়।

এরপর রাজপ্রাসাদে তাঁর নিজের কক্ষে আমাদেরকে আমন্ত্রণ জানালেন এবং তাঁর কর্মচারীবৃন্দকে বলে রাখলেন, যখন উলামায়ে কেরাম আসবেন, তখন আমি যেন আমার রাজসিংহাসন থেকে নেমে তাঁদের অভ্যর্থনা জানাতে পারি তার প্রতি লক্ষ্য রেখ। আমরা যখন ভিতরে পৌছলাম তখন বাদশাহ সিংহাসন থেকে নেমে এলেন এবং সবার সাথে মুসাফাহা করলেন, নিজের পরিচয় দিলেন। মোটকথা, সব কিছু শেষ হলে সর্বশেষে আমি একটি প্রস্তাব পেশ করলাম যে, বর্তমানে এমন কোন খ্রিস্টান রাজ্য নেই, যেখানে তাদের ধর্ম প্রচারের জন্য কোন মিশন নেই। আমেরিকা, ইউরোপ এবং ফ্রান্সের সরকারগুলো এ কাজে কোটি কোটি টাকা ব্যয় করছে। বিশ্বের সর্বত্র তাদের মিশন রয়েছে। হিজায সরকারের পক্ষ থেকে যদি এ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় এবং ইসলামের তাবলীগ ও প্রচারের জন্য হিজায থেকে বিভিন্ন জামায়াত সকল দেশে প্রেরণ করা হয় তবে বিশ্বের মুসলমানদের জন্য এটি একটি সম্মান ও গর্বের বিষয় হবে এবং মানুষের অন্তরে আপনার সরকারের প্রতি ভালবাসা বৃদ্ধি পাবে এবং এর ফলাফলও অত্যন্ত শুভ হবে। আমি বললাম, এরূপ দল যখন ভারতে যাবে, তখন দেশের সকল

উলামায়ে কেরাম মনে প্রাণে এ দলের সাহায্য-সহযোগিতা করবেন। আপনি যে যে দেশে দল পাঠাবেন সর্বত্র একইভাবে কাজ হবে। সকলেই সমবেতভাবে সাহায্য-সহায়তার জন্য এগিয়ে আসবেন।

আমার এ প্রস্তাবকে বাদশাহ অত্যন্ত পছন্দ করলেন এবং বললেন, অত্যন্ত যথার্থ প্রস্তাব, কিন্তু এরূপ করার সময় এখনও হয়নি। এজন্য যে, মনে করুন, ব্রিটেনে যদি এখন আমরা তাবলীগী জামায়াত প্রেরণ করি তখন তারা বলবে ও প্রচার করবে যে, এতে কোন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিহিত রয়েছে; এটা হয়ত কোন রাজনৈতিক দুরভিসন্ধি। নিশ্চয়ই তখন তাবলীগ তো হবেই না বরং নানা ধরনের রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হবে, সন্দেহের সৃষ্টি হবে। কিন্তু আপনার প্রস্তাব অবশ্যই অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত। সামনে সময় আসছে, তখন এ কাজ করতে হবে। সময়ের অপেক্ষা করতে হবে।

আমার প্রস্তাব কার্যকর হতেও পারে। লোকমুখে এ ব্যাপারে শোনা যাচ্ছে যে, অচিরেই এ প্রস্তাব কার্যকর হবে। যাক, এ হল হুকুমতের কাজ, হুকুমত যেভাবে হজ উপলক্ষে অনেক ব্যবস্থা গ্রহণ করছেন, হারাম শরীফ প্রশস্ত করছেন, হজ্জের সমূহ ইন্তেজাম করছেন, হাজীগণের আরামের জন্য অনেক কিছু করছেন, দীনের তাবলীগ ও ইশায়াতের জন্যও উদ্যোগী হবেন, প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন। এ হল তাদের কাজ, তবে একথা অনস্বীকার্য, যে পর্যন্ত হুকুমত এদিকে মনোযোগ না দিবে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ না করবে, সে পর্যন্ত উলমায়ে কেরামকে নিজ নিজ শক্তি ও সামর্থ্যানুসারে এ কাজ চালিয়ে যেতে হবে। যদি এ মক্কাকে কেন্দ্র হিসেবে স্থির করা হয় তবে ভাল, আলহামদুলিল্লাহ; আমাদের তাবলীগী জামায়াতগুলো একে কেন্দ্র বানিয়েছেন, অনেকে হিজরত করে এখানে এসে পড়েছেন। অনেকে এমনও আছেন যারা এখানে অবস্থান করছেন এবং তাবলীগের কাজ করছেন। তাবলীগের কাজ গ্রামেগঞ্জে পৌঁছিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু হিজাযবাসী এ কাজের জন্য সর্বাধিক যোগ্য ছিলেন। এখানে থেকেই এ কাজের উদ্বোধন হওয়া উচিত ছিল এবং অগ্রণী ভূমিকা তাঁদেরই থাকা উচিত ছিল। তাহলে এ কাজে যেমন বরকত হত, তেমন ব্যাপকতাও আসত। মক্কার কোন অধিবাসী যখন দীনের দাওয়াত নিয়ে অপর কোন দেশে পৌঁছবেন, তখন আলোচনা করা হবে– আরবের ভাইয়েরা তাবলীগে দীনের জন্য এসেছেন। তখন মানুষের অন্তরে কত ভাল প্রতিক্রিয়া হবে। এরূপ জামায়াত যাতে আরবরা রয়েছেন, তারা ভারতে গেলে মানুষের মধ্যে অনেক শুভ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। তাদের অন্তরেও তখন এই নিয়ত হয়, আরবগণ যখন তাবলীগের জন্য এসেছেন তখন আমরা বসে থাকব কেন? দীনের তাবলীগ করা তো আমাদেরও দয়িত্ব।

মোটকথা, আলহামদুলিল্লাহ তাবলীগী জামায়ত আরবে এবং বিশ্বের সকল দেশে রয়েছে। তাবলীগের মারকায হিজাযেও কায়েম হয়েছে, মক্কা মদীনায়ও তাদের মারকায রয়েছে। এখান থেকে বিভিন্ন জেলায় জামায়াত প্রেরিত হয়। এ কাজ সমাজের বিভিন্ন স্তরের লোকদের মধ্যে চালু হয়েছে। এ কাজের প্রকৃত অধিকারী মক্কাবাসী ছিলেন। এ আওয়জ তাদের থেকে উচ্চারিত হওয়া উচিত ছিল।

সিরিয়া হল রাজনীতির কেন্দ্র

মক্কা মুকাররমা আজ যেমন আন্তর্জাতিক ইবদাতকেন্দ্র, তদ্রূপ আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক কেন্দ্রেও পরিণত হয়েছে। পৃথিবীর সকল দেশের দ্রব্যসামগ্রী অন্য কোথাও পাওয়া না গেলেও এখানে পাওয়া যায়। সুতরাং আন্তর্জাতিক তাবলীগের কেন্দ্র এখানেই হওয়া উচিত। এখান থেকেই আল্লাহর দীনের কালিমা সমুন্নত হবে। এখান থেকেই সামনে অগ্রসর হবে এবং বিশ্বের আনাচে কানাচে পৌছবে। কোন কোন বর্ণনা দ্বারা বোঝা যায়, শেষ জমানায় আরবগণ এ কাজে নিজেদেরকে নিয়োজিত করবে। তাদের দ্বারা এ কাজটি পূর্ণ প্রভাব-প্রতিপত্তি সহকারে অগ্রসর হবে এবং বাতিল শক্তি আপনা থেকেই নিঃশেষ হয়ে যাবে। ভেঙে খান খান হয়ে যাবে তাদের অহমিকা। মোট কথা, ইমাম মাহদী আরবই হবেন এবং হযরত হাসান রা.-এর বংশের হবেন। তাঁর যুগেই চশ্চিমা শক্তিগুলো চূর্ণ বিচূর্ণ হবে। মক্কার পবিত্র মাটিতেই তাঁর হাতে বাইয়াত অনুষ্ঠিত হবে এবং সিরিয়া হবে তাঁর কেন্দ্র বা রাজধানী। এ জন্য যে, সিরিয়া হল ইসলামের রাজনীতির কেন্দ্র এবং হিজায হল ইবাদতের কেন্দ্র। আমাদের জন্য শান্তিপূর্ণ পরিবেশ প্রয়োজন রয়েছে। যদি ফিৎনা-ফাসাদ ও বিশৃঙ্খলা থাকে তবে মানুষ যিকির আজকার, তিলাওয়াত ইত্যাদি কোন ইবাদতই করতে পারবে না। ইবাদতের জন্য প্রয়োজন শান্তির। আল্লাহ তাআলা যখন মক্কাকে ইবাদতের কেন্দ্র বানিয়েছেন তখন শান্তি ও নিরাপত্তার কেন্দ্রও বানিয়েছেন। কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَ أَمْنًا.

আর আমি কাবাগৃহকে মানুষের জন্যে সম্মিলন স্থল ও শান্তির আলয় করেছি। [বাকারা : ১২৫]

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَّيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ

তারা কি দেখে না যে, আমি হারাম শরীফকে নিরাপদ করেছি। অথচ এর চারপাশে যারা আছে, তাদের উপর আক্রমণ করা হয়। [আনকাবুত : ৬৭]

অতঃপর মক্কাকে নিরাপদ আন্তর্জাতিক কেন্দ্র বানিয়েছেন। কেননা মক্কা হল ইবাদতের কেন্দ্র, আর ইবাদত ফিতনা-ফাসাদের মধ্যে সম্পাদিত হতে পারে না। এখানে জীবজন্তু বৃক্ষলতারও পূর্ণ নিরাপত্তা রয়েছে, এমনকি ঘাসও কাটা যায় না। এখানকার মাটি, পাথর প্রভৃতিকে নিয়ে যাওয়া পছন্দনীয় কাজ মনে করা হয়নি। কেননা এখানে 'আমান' বা নিরাপত্তা রয়েছে। মুহরিমের (ইহরামকারী) জন্য শিকার করাও নিষিদ্ধ। তো জীবজন্তুর নিরাপত্তা, মালামালের নিরাপত্তা– অর্থাৎ পরিপূর্ণ নিরাপত্তা। এমনই নিরাপত্তা যখন রয়েছে তখন এখানেই ইবাদতের কারখানা চালু থাকতে পারে।

অপরদিকে রাজনীতির জন্য নানাবিধ সম্পর্ক, কূটনৈতিক যোগাযোগ, তোড়জোড় ও পদমর্যাদার উত্থান-পতনের আবশ্যকতা রয়েছে। রাজনীতির কেন্দ্রও যদি মক্কা হত তবে ইবাদতকে সসম্মানে বিদায় নিতে হত। তাই ইসলাম শাম বা সিরিয়াকে রাজনীতির কেন্দ্ররূপে মনোনীত করেছে এবং হিজাযকে করেছে ইবাদতের কেন্দ্র। এটাই মূলনীতি। যখন যুদ্ধ করার প্রয়োজন হবে, সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করা আবশ্যক হবে, তখন তা সিরিয়া থেকে হবে। যাই হোক, সিরিয়াকে রাজনীতি ও রাষ্ট্র শাসনের কেন্দ্র সাব্যস্ত করা হয়েছে।

মিসর হল সামরিক কেন্দ্র

মিসরকে সাব্যস্ত করা হয়েছে সামরিক কেন্দ্র। অর্থাৎ সেখানে সামরিক শক্তি জমা করে রাখ। সিরিয়া ও হিজাযকে হিজরতের স্থান সাব্যস্ত করা হয়েছে। কেউ হিজরত করতে চাইলে সিরিয়া অথবা হিজাযে হিজরত করবে। মিসরকে হিজরতের স্থান বানানো হয়নি; বরং মিসর হল সেনানিবাস। কারণ যারা সামরিক বাহিনীতে ভর্তি হতে চায়, তারা দেশত্যাগ করে হিজরত করে যায় না, তারা তো যায় শক্তি বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে। সার কথা হল, মিসরকে সেনানিবাস বানাও এবং একে শক্তিশালী করার জন্য সর্ব প্রকার সাহায্য সহায়তা কর, কিন্তু হিজরত করে সেখানে যেও না, শুধু শক্তি বৃদ্ধির জন্য সেখানে পৌঁছতে থাক।

কারণ প্রকৃতপক্ষে মিসর হল ইউরোপের জন্য এশিয়া মহাদেশের মোহনা এবং এশিয়ার জন্য ইউরোপের মোহনা। সেদিকের জন্য এদিকের মোহনা এবং এদিকের জন্য সেদিকের মোহনা। এ মোহনার উপর যার প্রাধান্য থাকবে তারই প্রভাব বিস্তার লাভ করবে। মিসরের উপর যদি এশিয়ার প্রাধান্য ও কর্তৃত্ব বলবৎ থাকে তবে ইউরোপের উপর এর প্রভাব পড়বে, আর যদি সুয়েজ খাল ও মিসরের উপর ইউরোপের প্রাধান্য ও কর্তৃত্ব বিস্তারে সক্ষম হয় তবে সম্পূর্ণ এশিয়া ইউরোপের প্রভাবে প্রভাবান্বিত হবে। এ জন্য হাদীসে মিসরকে সামরিক

কেন্দ্র হওয়ার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। মিসরকে সেনা শক্তির কেন্দ্র নির্ধারণ কর, সিরিয়াকে রাজনীতির কেন্দ্র বানাও, আর এখানে (মক্কায়) পূর্ণ নিরাপত্তা থাকা আবশ্যক। মিসর ও সিরিয়ায় যদি যুদ্ধও হয় তাতে কোন অসুবিধা নেই। এ কারণেই বাইতুল মুকাদ্দাস সর্বদা যুদ্ধের মধ্যেই রয়েছে। কখনো ইহুদীগণ প্রবল হয়েছে, কখনো বা খ্রিস্টানগণ, আবার কখনো রয়েছে আমাদের প্রাধান্য।

كلما نصبت حرب نصبت أخرى

যখনই এক যুদ্ধ শেষ হয়, তখনই আরেক যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে যায়।

যদি মিসর ও সিরিয়াকে ইবাদতের কেন্দ্র সাব্যস্ত করা হত তবে কখনো ইবাদতের কারখানা জমে উঠতে পারত না। রাতদিন যুদ্ধবিগ্রহ, ভাঙ্গা-গড়া হতে থাকত। সুতরাং হিজাযকে ইবাদতের কেন্দ্র মনোনীত করে তাকে নিরাপদ বানিয়ে দেয়া হয়েছে। রাজনীতির কেন্দ্র বানানো হয়েছে সিরিয়াকে। এখানে তোমরা যুদ্ধ বিগ্রহ করতে থাক, যে পার বিজয়ী হও।

ইসলামের স্থায়িত্ব তাবলীগের মধ্যেই নিহিত

দীনের তাবলীগও আমান বা শান্তির অন্তর্ভুক্ত বিষয়। অশান্তি, নিরাপত্তাহীনতা ও বিশৃঙ্খলার মধ্যে নামায পড়া যেমন কঠিন ও দুষ্কর তদ্রূপ দীনের তাবলীগ করাও কঠিন। সুতরাং এই দেশই (হিজায) তাবলীগের মারকায ও কেন্দ্র হওয়ার সর্বাধিক যোগ্য। আল্লাহ তাআলার দীনের দাওয়াত এখান থেকেই উচ্চারিত হবে। যেমন পূর্বে হয়েছিল। আল্লাহর শোকর, তাবলীগের বুযর্গান এ কথাটি অনুধাবন করেছেন এবং কাজও চালু হয়েছে। গ্রাম-গঞ্জের সাথে তাদের সম্পর্ক ও যোগাযোগ রয়েছে। এখান থেকেই বিভিন্ন জামায়াত ভারতসহ অন্যান্য দেশে যেতে শুরু করেছে। আমাদের সকলের ওপর এ কাজে অংশগ্রহণ করা, সাহায্য-সহযোগিতা করা আবশ্যক। এজন্য যে, এর বলে আমরা বলিয়ান হব, এর শক্তিতে শক্তিশালী হব। ইসলামের শক্তি তার তাবলীগ ও প্রচারেই নিহিত রয়েছে, নিষ্ক্রিয়তার মধ্যে কোন শক্তি নেই। আপনি যদি ইসলামকে কোন ঘটির মধ্যে আবদ্ধ করে রেখে দেন এবং বিস্তার লাভ করতে না পারে, তবে ইসলামের মৌলিকত্ব নিঃশেষ হয়ে যাবে। পূর্ণতা, ব্যাপকতা ও প্রসারতাই হল ইসলামের মূল শক্তি। এগুলো যতদিন স্বরূপে ও স্বমহিমায় তার মধ্যে টিকে থাকবে ততদিন তা বিশ্বের মধ্যে বিস্তৃত হতে থাকবে। لا إسلام إلا بجماعة (জামায়াত ব্যতীত ইসলাম হয় না) এ দীনে জামায়াতী রং থাকা বাঞ্ছনীয়। ইসলাম যদি অরাজনৈতিক দীন না হত তবে হিজাযের বাইরে আসত না। কিন্তু ইসলাম আজ সমগ্র পৃথিবীতে বিস্তার লাভ করেছে। এটা তাবলীগেরই বরকত। মক্কা যখন

দীনের কেন্দ্র তখন তাবলীগেরও কেন্দ্র। তাই এখানকার মানুষকে উৎসাহিত করতে হবে যে, তারা যেন দীনি তাবলীগ ও তালিমের জন্য এবং আল্লাহর দিকে আহ্বান করার জন্য অগ্রসর হয়। এজন্যই আমি এ কয়েকটি কথা আরয করলাম যে, মক্কা জগতের প্রথম সৃষ্টি হওয়ার দাবী হল এই– দীনী কাজের সূচনাও এখান থেকেই হোক; মক্কা পৃথিবীর কেন্দ্র হওয়ার দাবী হল এই– এ নগরী দীনেরও কেন্দ্র হোক; মক্কা জগতের মূল হওয়ার দাবী হল এই– এখান থেকেই চতুর্দিকে ইসলামের আওয়াজ ছড়িয়ে পড়ুক।

আপনাদের আদেশ রক্ষার্থে আমি এ কয়েকটি কথা আরয করলাম। নতুবা আমি কিছুটা অসুস্থ। আর প্রকৃত কথা হল মক্কা-মদীনায় বসে কোন কিছু বলার সাহসও আমাদের হয় না, কিন্তু যদি বড়গণ ডেকে বাধ্য করেন তবে তা ভিন্ন কথা। প্রসিদ্ধ প্রবাদ আছে– 'বড়রা মারেন আবার কাঁদতেও দেন না।' আদেশ করেছেন, বক্তৃতা করো, কোন ওজর আপত্তি শোনা যাবে না। সুতরাং আদেশ রক্ষার্থে এ কয়েকটি কথা আরয করলাম। নতুবা কিছুটা অসুস্থতা এবং স্থানের মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য করে কিছু বলার সাহস হয় না। যে কয়েকটি বাক্য উচ্চারণ করলাম তাও নিজের সাহস ও শক্তিতে নয়, হয়ত আপনাদের শক্তি ও সাহস দ্বারা এটা সম্ভব হয়েছে। আমি তো বলেই দিয়েছিলাম যে, আমার কিছু বলার সাহস হয় না। অনেকে বললেন, হারাম শরীফে ওয়াজ হওয়া দরকার। আমি বললাম, আলোচনা করার মত বহু স্থান রয়েছে, হারাম শরীফ আমাদের আলোচনার জন্য নয়। যাদের শক্তি সামর্থ্য রয়েছে তাঁরা আলোচনা করবেন। আমার ন্যায় তালিবে ইলমের জন্য এ কাজ উচিত হবে না। যাই হোক, আদেশ পালনার্থে এ ক'টি কথা আরয করলাম, যেন এ স্থানের বরকত জানা হয়ে যায় এবং তাবলীগী কাজের বিস্তার ঘটানোর যে মূল উদ্দেশ্য রয়েছে তার প্রতি যেন কিছুটা ইঙ্গিত করা হয়। আল্লাহ তাআলা এ কাজে অগ্রগতি দান করুন এবং আমাদের সকলকে এ কাজে অংশগ্রহণ করার তাওফিক দান করুন। আমীন!

اللهم ربنا تقبل منا إنك انت السميع العليم — وأرنا مناسكنا
وتُبْ علينا إنك انت التواب الرحيم.



বয়ান : ৪

ইবাদাত ও খেলাফত

প্রকৃত অর্থে মানুষ ঐ ব্যক্তি, যে স্বীয় সত্তাকে আল্লাহ তাআলার সম্মুখে নত করে দেয় এবং ইবাদতের প্রতি অগ্রসর হয়। এভাবে তার নাসিকা, ললাট, হাত-পা, রূহ ও ধ্যান-ধারণা সবই আল্লাহ তাআলার সম্মুখে অবনত হয়ে ঝুঁকে যায়। এ কাজ স্বীয় সত্তার মঙ্গল ও উপকারের জন্যই করবে। এ হল ইবাদত। দ্বিতীয় দায়িত্ব হল খেলাফতের মসনদে বসে পৃথিবী থেকে অন্যায়-অত্যাচার ও অসৎ কর্মের মূলোৎপাটন করা। এজন্যই, শুধু ইবাদত কিংবা শুধু খেলাফত মানব জীবনের উদ্দেশ্য নয়; বরং দু'টোই উদ্দেশ্য।

– হযরত হাকীমুল ইসলাম রহ.



اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُه وَنَسْتَعِيْنُه وَنَسْتَغْفِرُه وَنُؤْمِنُ بِه وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّاٰتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَّهْدِه اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَه، وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلا هَادِىَ لَه، وَنَشْهَدُ أَنْ لاَّ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَه لاَ شَرِيْكَ لَه، وَنَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَمَوْلاَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُه وَرَسُوْلُه، أَرْسَلَهُ اللهُ إِلىٰ كَافَّــةً لِّلنَّاسِ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا وَّدَاعِيًا إِلَيْهِ بِإِذْنِه وَسِرَاجًا مُّنِــيْرًا.

أَمَّــابَعْدُ:

فَاَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ○ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ○ يٰبُنَىَّ أَقِمِ الصَّلٰوةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوْفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِوَاصْبِرْ عَلٰى مَا أَصَابَكَ ط إِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الأُمُوْرِ○

لقمان:١٧

বুযুর্গানে মুহতারাম!

কুরআন মাজিদের যে আয়াতখানা আপনাদের সামনে তিলাওয়াত করলাম তাতে হযরত লোকমান আ. কর্তৃক স্বীয় সন্তানকে প্রদত্ত উপদেশ বাণী বর্ণিত হয়েছে। পূর্ণ এক রুকুব্যাপী লোকমান আ.-এর উপদেশ বর্ণিত হয়েছে। তার উপদেশাবলী হতে একটি উপদেশ আমি তিলাওয়াত করলাম। এ সম্বন্ধে কোন দীর্ঘ আলোচনা করা কিংবা আয়াতের তাফসীর করা উদ্দেশ্য নয়, আয়াতের তাফসীর অনেক দীর্ঘ ও বিস্তৃত ব্যাপার, এত দীর্ঘ সময়ও নেই। এ আয়াত দ্বারা বিশেষ একটি বিষয় বর্ণনা করাই আমার উদ্দেশ্য। আর তা দ্বারা উদ্দেশ্য হবে দু'টি। যা দ্বারা জানা যাবে, মানব জাতিকে আল্লাহ তাআলা কেন পৃথিবীতে

প্রেরণ করলেন? কেন তাদের আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন? মানব জীবনের জন্য কী উদ্দেশ্য নির্ধারিত? আর এ উদ্দেশ্যাবলীর কতটুকু আমরা পূরণ করছি?

এ দু'টি উদ্দেশ্যর কথা বিশ্লেষণের পূর্বে ছোট্ট একটি ভূমিকা বুঝতে হবে, তা হলে উদ্দেশ্য দু'টি বুঝতে সহজ হবে। তা হল এই: যে বিশাল বিস্তৃত পৃথিবী আপনাদের সামনে রয়েছে, যার আকাশকে শামিয়ানার মত করে টানানো হয়েছে, জমিনকে বিছানার মত করে বিছিয়ে রাখা হয়েছে। আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যে সুবিন্যস্তভাবে কোটি কোটি বিভিন্ন মাখলুকও সৃষ্টি করা হয়েছে। তাঁর সৃষ্টির মধ্যে জড় পদার্থ রয়েছে, এর আবার হাজারো প্রকার ও শ্রেণী রয়েছে, তৃণলতার মধ্যে রয়েছে হাজারো শ্রেণী, প্রাণীকুলের মধ্যেও হাজারো শ্রেণী ও প্রকার- জলচর প্রাণী ও স্থলচর। মোটকথা জড়পদার্থ, উদ্ভিদ ও প্রাণীদের রয়েছে অসংখ্য প্রজাতি ও প্রকরণ, যা আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যে বিস্তৃত রয়েছে। এরপর আকাশে রয়েছে এক মহাসৃষ্টি, যাদেরকে মালাইকা বা ফেরেশতা বলা হয়। বিশাল বিস্তৃত অবস্থায় রয়েছেন তারা। হাদীসে বলা হয়েছে, আকাশে চার আঙ্গুল পরিমাণ স্থানও খালি নেই যেখানে কোন না কোন ফেরেশতা ইবাদতে রত না আছেন। অগণিত ফেরেশতা আকাশের উপর বিস্তৃত অবস্থায় আছেন। এ বিশ্বজগতের ঊর্ধ্ব প্রান্তে হল আল্লাহর আরশ। আরশে আজিমের উপর কোন মাখলুকের অস্তিত্বের কথা শরীয়তে পাওয়া যায় না। সেখানে রয়েছে স্রষ্টার কামালাত ও তাজাল্লিয়াত। শুধু একটি মাখলুকের কথা পাওয়া যায় যে, আল্লাহ তাআলা একটি ফলক বা 'লাওহ' তৈরি করে রেখেছেন। যাকে লাওহে মাহফুজ বলা হয়। আসমান ও জমিনের চেয়েও অধিক যার বিস্তৃতি। তাতে লেখা রয়েছে: إِنَّ رَحْمَتِيْ سَبَقَتْ غَضَبِيْ 'আমার রহমত আমার ক্রোধের উপর অধিক প্রবল।' রহমত আগে আগে এগিয়ে চলে এবং ক্রোধ চলে এর পশ্চাতে। রহমত হল মূল, ক্রোধ তার অনুগামী। এটি একটি লিখিত দলিল। আরশের উপর লাওহে মাহফুজ নামক এ সৃষ্টির সন্ধান পাওয়া যায়। এ ছাড়া আরশের ওপর স্রষ্টার কামালাত, তাজাল্লিয়াত ও তাঁর সিফাত ও গুণাবলি বিস্তৃত রয়েছে। তো ভূমণ্ডল, আসমান-জমিনের মধ্যবর্তী মহাশূন্য, আকাশ, জান্নাত, আরশ, কুরসী অতঃপর আল্লাহ তাআলার তাজাল্লিয়াত– এ হল এক দীর্ঘ ধারাবাহিকতা। সুতরাং এ এক অতি দীর্ঘ সৃষ্টি।

মানুষের মধ্যে সকল সৃষ্টির নমুনা বিদ্যমান রয়েছে

আল্লাহ তাআলার কুদরত দেখুন, কোটি কোটি মাইল বিস্তৃত বিশাল সৃষ্টিরাজিকে ছোট্ট একটি কৌটার মধ্যে আবদ্ধ করে দিয়েছে। বর্তমান যুগের বৈজ্ঞানিকদের

মতে পৃথিবী থেকে সতের লক্ষ মাইল দূরে চাঁদ অবস্থিত। তারপর এর বহু ঊর্ধ্বে রয়েছে আকাশ। আকাশও আবার অনেকগুলো। এরপর রয়েছে অনেকগুলো জান্নাত। লক্ষ কোটি মাইল ব্যাপী বিস্তৃত তাঁর সৃষ্টি। কিন্তু যখন একে সংকুচিত করলেন, তখন এক-দেড় গজের মধ্যে তা এসে গেল। ঐ দেড় গজ স্থান কী? তা হলেন আপনি। সমগ্র সৃষ্টিজগৎকে আল্লাহ তাআলা মানুষের মধ্যে একত্র করে দিয়েছেন। যার মধ্যে জমিন রয়েছে, আকাশ রয়েছে, পাহাড়-পর্বত রয়েছে। জড় পদার্থ, উদ্ভিদ ও প্রাণীকূলও তার মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে।

মানুষকে যদি লক্ষ্য করা হয় তবে দেখা যাবে তার মধ্যে মাটিও রয়েছে। মানুষ তো সৃষ্টি হয়েছে মাটি দ্বারা, যাকে 'মুশতে খাক' বা একমুঠো মাটি বলা হয়। আমাদের দেহটি হল মাটির একটি কাঠামো। আত্মা এ দেহকে সচল করে রেখেছে। আত্মা বের হয়ে গেলে পুনরায় মাটির সাথে মিলে মাটি হয়ে যায়। আর এ জীবনেও দেহ থেকে মাটি নির্গত হয়ে থাকে। যদি আপনি প্রতিদিন গোসল না করেন, তবে শরীরে মর্দন করলে শরীর হতে কালো কালো ময়লা বের হয়, এগুলো মাটি ব্যতীত আর কী? শরীর হল মাটির তৈরি কাজেই এ থেকে মাটিই বের হয়। যদি কারো শরীরে খোসপাঁচড়া হয় তাহলে শরীর থেকে ভূসির ন্যায় যা বের হয় তা মাটিরই অনুরূপ। তাই মানুষের দেহ আজ যেমন একটি মাটির স্তুপ, মৃত্যুর পরও তা মাটিতেই রূপান্তরিত হয়ে যাবে। সুতরাং মানুষের মধ্যে যেন জমিন রয়েছে। সাধারণ জমিনের যেসব বিশেষত্ব ও গুণাগুণ রয়েছে, তা আপনার দেহস্থিত জমিনের মধ্যেও রয়েছে। যদি আপনি এর প্রতি চিন্তা ও গবেষণা করেন তবে দেখবেন, আপনার এ জমিতেও পাহাড়-পর্বতের সারি রয়েছে। হাজারো ছোটবড় পাহাড়, টিলা বিস্তৃত রয়েছে। মানব দেহে যে হাড়ের বাঁধ রয়েছে, এগুলো হল পাহাড়-পর্বতের ন্যায়। কোন হাড় বড় কোনটি ছোট, কোনটি লম্বা, কোনটি চ্যাপ্টা, যেভাবে পাহাড় বিভিন্ন প্রকার হয়ে থাকে। এ হল মানুষের মধ্যে বিস্তৃত এক সিলসিলা। এভাবে যদি আপনি চিন্তা করেন তবে দেখতে পাবেন যে, পৃথিবীর মাটিতে যেমন ঘাস, লতাপাতা ও উদ্ভিদ উৎপন্ন হয়, আমাদের দেহের জমিতেও সেভাবে লতা-পাতা, ঘাস ও উদ্ভিদ উৎপন্ন হয়। শরীরের উপরস্থিত চুল ও পশমগুলো হল উদ্ভিদতুল্য। আবার কোন কোন জমিতে থাকে গহিন জঙ্গল, গাছগুলো থাকে কাছাকাছি। আমাদের মাথাও তদ্রূপ, জঙ্গল অত্যন্ত গহিন। হাজার হাজার গাছপালা নিকটে নিকটে উৎপাদিত হয়েছে। কোন কোন জমি আবার এমনও থাকে, যেখানে বৃক্ষরাজি দূরে দূরে অবস্থিত। এরূপ জমির তুলনা শরীরের অন্যান্য পশম। এগুলো একটু দূরে দূরে থাকে। কোন জমি এমন থাকে, যেখানে কোন প্রকার গাছপালা উৎপন্ন হয় না,

এ হল হাতের তালু। এখানে কোন পশম হয় না। নাকের উপরিভাগেও কোন পশম হয় না। সুতরাং আমাদের দেহের জমি এমন যে, কোথাও কোথাও অধিক পরিমানে পশম রয়েছে, কোথাও স্বল্প পরিমানে আর কোন কোন স্থান এমন রয়েছে যেখানে কোন পশমই নেই। মোটকথা আমাদের দেহের জমিনে মাটি, পাহাড় এবং উদ্ভিদের ধারাবাহিকতা বজায় রয়েছে।

এমনিভাবে আমাদের মধ্যে প্রাণীকূলের অস্তিত্বও বিরাজমান রয়েছে। বর্তমানের চিকিৎসা বিজ্ঞানীগণ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, রক্তের মধ্যে অনেক অনুজীব ও জীবন্ত কোষ রয়েছে, যেগুলো অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে দেখা যায় এবং তা এক প্রকারের নয়, শরীরের বিভিন্ন অঙ্গে বিভিন্ন রং এবং বিভিন্ন আকৃতির অনুজীব রয়েছে। এগুলোর সমষ্টি দ্বারা রক্ত সৃষ্টি হয়। যদি এগুলো মরে যায় তবে মানুষও মৃত্যুমুখে পতিত হয়। মানুষের সম্পূর্ণ দেহে অনুজীবগুলো ছড়িয়ে রয়েছে।

আপনার ভূ-ভাগে যেমন বিভিন্ন প্রদেশ রয়েছে, এক এক প্রদেশে রয়েছে এক এক ধরনের প্রাণী। এক প্রদেশে যা রয়েছে তা অন্য প্রদেশে নেই। কোথাও এক জিনি জন্মে, কোথাও অন্য জিনিস জন্মে। আমাদে এই হাত ও পা হল দেহ নামক রাজ্যের প্রদেশসমূহ। এগুলোতে বিভিন্ন প্রকারের জীবজন্তু রয়েছে, যাদের আকার-আকৃতি ভিন্ন ভিন্ন। এগুলো দ্বারা নানা রকম রোগ-ব্যাধিও সৃষ্টি হয়। যদি সেগুলোকে ধ্বংস করে দেয়া যায় তবে দেহটি আবার সুস্থ হয়ে ওঠে। এ জীবাণু দ্বারাই আবার জীবনও সচল থাকে। এ জীবাণুগুলো আমাদের রক্তের মধ্যে ছড়িয়ে রয়েছে।

মানুষের মাথার উকুনগুলো যেন জঙ্গলের জীবজন্তুর মত। আমাদের জমিতে যেমন নানা ধরন ও আকার-আকৃতির প্রাণীর জন্ম হয় এবং সেখানেই বিচরণ করে, মানবদেহের জমিতেও তদ্রূপ প্রাণীকুল জন্মগ্রহণ করে এবং মরে গিয়ে এখানেই সামাহিত হয়ে যায়। কোন কোন সময় পাকস্থলীতে ছোট-বড় কৃমি হয়ে থাকে। ডাক্তারগণ এর চিকিৎসা করেন। এ কৃমিগুলো আহার্য বস্তু খেয়ে ফেলে এবং মানুষ দিন দিন দুর্বল হতে থাকে। খাদ্যের দ্বারা শরীরের কোন পুষ্টি হয় না। যাই হোক, মাথায় উকুন জন্ম নেয়, পাকস্থলীতে কৃমি হয়, ক্ষতস্থানে কিড়ার সৃষ্টি হয়– মোটকথা মানবদেহের জমিতে নানা প্রকারের প্রাণীজগত রয়েছে এবং তারা স্বাধীনভাবে বিচরণ করছে। পৃথিবীতে যেমন নানা ধরনের সৃষ্টিরাজি রয়েছে আমাদের দেহাভ্যন্তরেও তদ্রূপ সৃষ্টিরাজি রয়েছে। ভূমি, পাহাড়-পর্বত, উদ্ভিদ এবং নানা ধরণ ও আকার-আকৃতির প্রাণীকুল সৃষ্টিও হচ্ছে এবং মারাও যাচ্ছে।

তারপর আপনাদের এই পৃথিবীতে যেমন যথা সময়ে বৃষ্টিপাত হয় মানব দেহের জমিতেও অদ্রূপ বর্ষণ হয়। গ্রীষ্মকালে ঘাম ঝড়ে। বৃষ্টিপাতের মত ফোঁটা ফোঁটা ঘাম ঝরে। তারপর এ পৃথিবীতে যত প্রকারের পানি রয়েছে, দেহাভ্যন্তরেও তত প্রকার পানি রয়েছে। পৃথিবীর কোথাও কোথাও গরম পানির ঝরণা প্রবাহিত রয়েছে। ভারতের মণ্ডেল জেলার কোন কোন অঞ্চলে গরম পানির ঝরণা রয়েছে। এ পানিকে ঠাণ্ডা করে মানুষ গোসল করে। মনে হয় যেন ভীষণ আগুনে এ পানিকে গরম করা হয়েছে। কোন কোন ঝরণা হতে নির্গত হয় ঠাণ্ডা ও মিঠা পানি। সাগরের পানি অত্যন্ত লবণাক্ত, মুখেও দেয়া যায় না। কোন কোন জায়গার পানিতে থাকে তিক্ততা। মানবদেহেও এ জাতীয় সব পানি রয়েছে। মুখের ভিতর আল্লাহ মিঠা পনির ঝরণা রেখেছেন। যদি মুখের মধ্যে তিক্ত পানি হত তবে মানুষের জীবনধারণ কষ্টকর হয়ে যেত। তাই অত্যন্ত মিষ্ট প্রকৃতির পানির ঝরণা মুখের ভিতর রেখে দিয়েছেন। এ পানির সাহায্যে আহার্য বস্তুগুলো ভেতরে প্রবেশ করছে আর এগুলোর সাহায্যে হজম হচ্ছে। চক্ষু থেকে যে অশ্রুবিন্দু ঝরে, তা হল লবণাক্ত পানি। চোখের মধ্যে রয়েছে লবণাক্ত পানির ঝরণা। পিত্তকে দেখুন, সেখানে তিক্ত পানি ভরে রাখা হয়েছে। সেখানে তিক্ত পানির ঝরণা প্রবাহিত। পাকস্থলির ভিতর টক পানি ভর্তি রয়েছে। যার দ্বারা খাদ্যদ্রব্য হজম হয়। তারপর রয়েছে পাক পানি, আবার কোথাও নাপাক পানি। মূত্রথলীতে রয়েছে নাপাক পানি আর মুখে রয়েছে পাক পানি। থুথু ফেললে ওযু ভঙ্গ হয় না; কিন্তু প্রশ্রাবের এক ফোঁটা বের হলেও অযু ভেঙ্গে যায়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, শরীরের মধ্যে পবিত্র পানি, অপবিত্র পানি, ঠাণ্ডা পানি, গরম পানি, টক পানি, মিঠা পানি, তিতা পানি ইত্যাদি সব রকমের পানিই রয়েছে। শরীর থেকে টপ টপ করে ঘামের ফোঁটা ঝরতে থাকে, এ যেন তার বর্ষাকাল। মোটকথা, এ বিশ্বে যা কিছু রয়েছে তার সবই রয়েছে মানবদেহে। বিশ্বের সবকিছু মানবদেহে বিরাজমান রয়েছে।

পৃথিবীতে যেমন বায়ু প্রবাহিত হয়, মানবদেহেও বায়ু প্রবাহ রয়েছে। পৃথিবীর বায়ু প্রবাহের মতই ঠাণ্ডা ও গরম উভয় প্রকারের বায়ু প্রবাহ রয়েছে। আপনি শ্বাস গ্রহণ করার সময় ঠাণ্ডা আর যখন শ্বাস বের করেন তখন গরম বাতাস বের হয়। পৃথিবীতে যে সময় বায়ুপ্রবাহ হ্রাস পায় তখন মানুষ অস্থির হয়ে যায়, পাখা নিয়ে বাতাস করতে থাকে, মানব দেহেও এরূপ হয়। মাঝে মাঝে পাকস্থলিতে বায়ু আটকে পড়ে, তখন বাতাস বের করার জন্য চিকিৎসকদের কাছে ছুটতে হয়। দেখা গেল মানুষের শরীরে পানি রয়েছে, বাতাস রয়েছে এবং প্রবাহের নিয়ম পদ্ধতিও তা-ই রয়েছে যা বাইরের পৃথিবীতে রয়েছে।

এমনিভাবে মানুষের মধ্যে আগুনও রয়েছে। কখনো কখনো শরীরে হাত রাখলে আপনি গরম অনুভব করেন। যদি দেহে আগুন না-ই থাকত তবে এ গরম কেন? মানুষ যদি সজোরে হস্তদ্বয়কে ঘর্ষণ করে তবে আগুনের মত উত্তপ্ত হয়ে যায়। যদি এক মাইল পর্যন্ত দৌড়ে আসে তবে মনে হবে সম্পূর্ণ শরীর যেন আগুনে ভরে গেছে। ভিতরে যদি তাপ না থাকত, তবে কী জিনিসে উত্তপ্ত করে? তাই আগুন, পানি, বাতাস আমাদের শরীরের ভেতরে রয়েছে এবং এগুলোর কাজও চালু রয়েছে।

মোটকথা, আপনার এ দেহটি সম্পূর্ণ বিশ্বের ন্যায় একটি বিশ্ব, এ বিশ্বে যেমন উপরে আকাশ আর নিচে মাটি রয়েছে, আপনার দেহেও মাথা আকাশতুল্য এবং নিম্নে পাগুলো জমিনতুল্য। আকাশে যেমন চন্দ্র-সূর্য রয়েছে, যার আলো দ্বারা আপনি এ বিশ্বকে দেখছেন, মানুষের লালাটেও চাঁদ-সূর্যের ন্যায় দু'টো চোখ রয়েছে। যদি এগুলোত জ্যোতি না থাকে, আপনি বিশ্বকে দেখতে পারবেন না। তাই আপনার মধ্যে চন্দ্র-সূর্য এবং জ্যোতি রয়েছে।

তারপর মানব দেহে শাসন ব্যবস্থাও চালু রয়েছে। হাত-পা হল অন্তরের আজ্ঞাবহ। অন্তরের সামান্য ইঙ্গিতের সাথে সাথে হাত-পা চলতে শুরু করে। সমগ্র বিশ্বজগৎ যেমন সুশৃঙ্খল রয়েছে, আমাদের ভিতরের জগৎও তদ্রূপ রয়েছে। অন্তর হল শাসনকর্তা ও বাদশাহ এবং হাত-পা তার কর্মচারী। মোটকথা, ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ কত আর করা যাবে, মানুষের ভিতরে বাতাস, বৃষ্টি, আগুন, মাটি, পর্বতমালা, উদ্ভিদ ও প্রাণীকুল রয়েছে এবং জীবন ও মরণও রয়েছে। সকল কর্মকাণ্ড বিশ্বজগতের কর্মকাণ্ডের অনুরূপ। মানুষের একটি রূপ আপনি প্রত্যক্ষ করেছেন আর তার উদাহরণও দেখছেন যে, আকশ থেকে পতাল পর্যন্ত বিশ্বের যাবতীয় সৃষ্টি মানুষের মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে। এ হল আল্লাহ তাআলার কলাকৌশল যে, বিশ্বকে কোট কোটি মাইল ব্যাপী বিস্তৃত করে রেখেছেন, যখন একে সংকুচিত করলেন, তখন তিন হাতের মানুষের মধ্যে তা কেন্দ্রীভূত করে দিলেন। এ কারণেই উলামায়ে কেরাম লিখেন, মানুষ হল 'হাকিকতে জামিয়া' অর্থাৎ এমনই পূর্ণাঙ্গ একটি সত্তা, যার মধ্যে ঐ সকল পূর্ণতা কেন্দ্রীভূত হয়ে রয়েছে যেগুলো সমস্ত বিশ্বব্যাপী বিস্তৃত আছে।

মানুষের মধ্যে বিশ্বজগতের স্রষ্টার নিদর্শন

এমন নয় যে, মানুষের মধ্যে কেবল সৃষ্টি জগতের নিদর্শনই বিদ্যমান রয়েছে, চিন্তা করলে দেখা যাবে যে, স্রষ্টার নিদর্শনও তার মধ্যে সন্নিবেশিত হয়েছে। এমন সব নিদর্শনাবলী রয়েছে যে, সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে যদি আমরা সেগুলোকে দেখি

তবে আল্লাহ তাআলার যাত, সিফাত ও কামালাত (সত্তা, গুণাবলী ও পূর্ণতা) স্পষ্টরূপে প্রকাশ পাবে। আল্লাহর পরিচয় লাভের জন্য আমাদেরকে অন্য কোথাও যেতে হবে না। আমরা যদি আমাদের দেহের অভ্যন্তর নিয়ে চিন্তাভাবনা করি, গবেষণা করি, তবে আল্লাহ তাআলার কামালাত ও গুণাবলী আমাদের মধ্য থেকে পরিস্ফুটিত হয়ে উঠবে।

চিন্তা করুন, আপনার শরীরের এ পূর্ণ জগৎটি কিসের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে? 'রূহ' দ্বারাই তো নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। রূহ যদি বের হয়ে যায় তবে পূর্ণ জগৎটি বিগড়ে যাবে। মাটি ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে মাটির সাথে, পানি পানির সাথে, আগুন আগুনের সাথে এবং বায়ু বায়ুমণ্ডলের সাথে মিশে যাবে। সমগ্র দেহজগৎ চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাবে। রূহ হল এক মহানিয়ন্ত্রক, যে সব কিছুকে নিয়ন্ত্রণে রেখেছে, পূর্ণ জগৎকে সামলে রেখেছে। আমরা একে প্রমাণস্বরূপ উপস্থাপন করতে পারি যে, আমাদের দেহবিশ্বকে নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য যেমন এক শক্তিশালী রক্ষকের প্রয়োজন রয়েছে, তদ্রূপ সমগ্র সৃষ্টিজগৎকে নিয়ন্ত্রণের জন্য একজন মহাশক্তিশালী রক্ষক রয়েছেন। যিনি বিশ্বজগতের রক্ষণাবেক্ষণ করছেন। সুতরাং আল্লাহর অস্তিত্বের প্রমাণ আমরা নিজেদের মধ্য থেকেই পেয়ে যাই।

আপনি চিন্তা করুন, আপনার দেহ ও মুখমণ্ডলে লালিমার আভা রয়েছে, চুল ও পশমগুলো কালো। এমনিভাবে শরীরের কোথাও শুভ্র, কোথাও লাল, কোথাও কাল অর্থাৎ শরীরে বিভিন্ন রং ও বর্ণ রয়েছে। এসব বর্ণ 'রূহ'-এর কারণেই টিকে আছে। কিন্তু রূহের কোন রং নেই, বর্ণ নেই। সকল রঙের ঊর্ধ্বে, রং হতে পবিত্র। ঠিক এভাবেই আমরা বলবো, এ বিশ্বজগতে রয়েছে হাজারো প্রকারের রং ও বর্ণের সমাহার– মানুষের মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন রং, বিভিন্ন বর্ণ, সবুজ বৃক্ষের রয়েছে লাল রঙের ফুল। এ সকল রং ও বর্ণকে ঐ 'মহারূহ' নিয়ন্ত্রণ ও রক্ষণাবেক্ষণ করছেন যাকে 'যাতে খোদাওয়ান্দি' (আল্লাহ তাআলার মহান সত্তা) বলা হয়। আর স্বয়ং তিনি সকল রং, রূপ ও বর্ণের ঊর্ধ্বে, এসব হতে পবিত্র। কিন্তু সকল রংকে তিনিই বিকশিত করে তুলছেন। সুতরাং আল্লাহর অস্তিত্বের প্রমাণ নিজের ভিতর থেকেই পাওয়া যায়।

আরো এভাবে চিন্তা করুন, যদি কাউকে আপনার শরীরের ভেতরে প্রবেশের সুযোগ দেয়া হয় এবং সে ব্যক্তি আপনার শরীরের মধ্যে প্রবেশকরত সর্বত্র পরিভ্রমণ করে আসে আর আপনি তাকে জিজ্ঞেস করেন, ভাই! 'রূহ' নামের বস্তুটি কোথায় বসা আছে? হাতে, পায়ে, মাথায় নাকি অন্তরে? সে উত্তর দিবে, আমি তো প্রতিটি কোষে কোষে রূহের অস্তিত্বের বিচ্ছুরণ দেখেছি, আমি (বিশেষ কোন অঙ্গের দিকে) ইঙ্গিত করে দেখাতে পারব না। রূহ একটি মাখলুক হওয়া

সত্ত্বেও যখন তার এ অবস্থা হয় যে, দেহের প্রতিটি কোষে তারই কর্মকাণ্ড, তারই কর্তৃত্ব। তো এই সমগ্র বিশ্বজগতে মহারূহ ও আল্লাহ তাআলার জালওয়াহ সর্বত্র বিস্তৃত রয়েছে। এখন যদি ইশারা করা না যায়, তিনি এখানে রয়েছেন কিংবা সেখানে রয়েছেন, তবে তাতে বিস্মিত হওয়ার কী আছে? এ হল আল্লাহ তাআলার শান যে, তিনি কোন দিক ও স্থানের সীমায় সীমাবদ্ধ নন। আঙুল দ্বারা তার প্রতি ইশারা করা যায় না। আল্লাহর ব্যাপারে একথা বলা যাবে না যে, তিনি কোনো স্থান বা দিকের সাথে সীমাবদ্ধ রয়েছেন। অসীম সত্তা তাঁর। কিন্তু রূহকে তিনি এমনভাবে নিজের নমুনারূপে তৈরি করেছেন যে, রূহকে আপনি কোন বিশেষ অঙ্গের সাথে সীমাবদ্ধ বলতে পারবেন না। তবে হ্যাঁ, এ কথা বলতে পারেন, কোন কোন অঙ্গের সাথে এর বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে। অস্তিত্বের বিচ্ছুরণ তো সর্বাঙ্গে কার্যকর রয়েছে কিন্তু সম্পর্ক পৃথক পৃথক রয়েছে। হৃৎপিণ্ডের সাথে রূহের যে সম্পর্ক রয়েছে মস্তিষ্কের সাথে সে সম্পর্ক নেই। মস্তিষ্কের সাথে যে সম্পর্ক রয়েছ উদরের সাথে সে সম্পর্ক নেই। এ কারণেই যদি হৃৎপিণ্ডে একটি সুঁইও ঢুকে যায় তবে মানুষ মরণাপন্ন হয়ে পড়ে, রূহ দৌড়াতে শুরু করে– আমি আর থাকতে পারছি না। মস্তিষ্ককে ফাটিয়ে দেয়া হলে রূহ আর থাকতে পারে না। হাত-পা কেটে ফেললে রূহ থাকতে পারে, যদিও মানুষটি ত্রুটিপূর্ণ ও অসম্পূর্ণ হয়ে যাবে। নখ-চুল কেটে ফেলুন, কোন কষ্টই হবে না। বোঝা গেল, রূহের যে সম্পর্ক হৃৎপিণ্ডের সাথে রয়েছে, অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাঙ্গে সে সম্পর্ক নেই। এভাবে এ বিশ্বজগতের সর্বত্রই আল্লাহ তাআলার জালওয়াহ রয়েছে, কিন্তু বাইতুল্লাহর সাথে যে সম্পর্ক রয়েছে, সে সম্পর্ক আপনাদের মসজিদগুলোর সাথে নেই। আপনাদের মসজিদগুলোর সাথে যে সম্পর্ক রয়েছে, তা আপনাদের বাসগৃহগুলোর সঙ্গে নেই। আপনাদের গৃহগুলোর সাথে যে সম্পর্ক রয়েছে তা আপনাদের অনাবাদি পতিত জমির সাথে নেই। সার কথা হল, জালওয়াহ তো সর্বত্র বিদ্যমান রয়েছে কিন্তু সম্পর্ক পৃথক পৃথক।

এ কারণেই বাইতুল্লাহ সম্পর্কে কেউ যদি কোন অশালীন মন্তব্য করে তবে সমগ্র বিশ্বে প্রতিবাদের ঝড় বয়ে যায়। মনে হয় যেন সমগ্র পৃথিবী ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয়ে পড়েছে। কোন মসজিদের উপর কেউ আক্রমণ করলে সে এলাকার মুসলমানদের মধ্যে অস্থিরতা ছড়িয়ে পড়ে। যদি আপনার ঘরে কেউ আক্রমণ করে তবে আপনি ও আপনার বংশের লোকজন পেরেশান হবেন, এমন নয় যে, সমস্ত শহরবাসী অস্থিতর হয়ে উঠবেন। বোঝা গেল বাইতুল্লাহর সাথে আল্লাহর যে সম্পর্ক তা এত বড় যে, সমগ্র বিশ্বজগতে তা বিস্তৃত রয়েছে; সকল মানুষ অস্থির হয়ে পড়বে। মসজিদ ও সাধারণ আবাসগৃহের সাথে আল্লাহ

তাআলার এরূপ বিশেষ সম্পর্ক নেই। কাজেই বোঝা গেল সম্পর্কের স্তর-বিভাগ রয়েছে, তবে জালওয়াহ বা দ্যুতি সর্বত্রই রয়েছে।

এ কারণেই আল্লাহ তাআলার জালওয়াহ ও তাজাল্লি সর্বত্র বিদ্যমান রয়েছে কিন্তু তার সম্পর্কের মধ্যে স্তরগত পার্থক্য রয়েছে। এর প্রমাণ আপনি আপনার মধ্যে পেয়ে যাবেন। বাইরে কোথাও যাওয়ার প্রয়োজন পড়বে না।

আপনি আরো চিন্তা করুন– আপনি রূহ দ্বারা জীবিত রয়েছেন, এ রূহ একটি না একাধিক? স্পষ্ট কথা, একটিই মাত্র রূহ। যদি দু'টি হত তবে শরীর ধ্বংস হয়ে যেত। একটি রূহ চাইবে আপনাকে ক্ষুধার্ত রাখতে আর অন্যটি বলত তা আমি কখনো করতে দেব না। একটি রূহ চাইবে ঠাণ্ডা, অন্যটি চাইবে গরম। এমতাবস্থায় রূহগুলোর দ্বন্দ্বই শেষ হবে না– শরীরের পুষ্টি রক্ষণাবেক্ষণ কে করবে? একটি আত্মাই রক্ষণাবেক্ষণ ও পুষ্টি সাধন পূর্ণভাবে করতে পারে, যদি দু'টি রূহ হয় তবে দেহের কারখানাটিতে চরম বিশৃঙ্খলা দেখা দেবে।

এ বিশ্বজগতের অবস্থাও অদ্রূপ। কুরআনে বলা হয়েছে–

لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا.

যদি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে একাধিক আল্লাহ থাকত তবে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হত, উভয়জগৎ ধ্বংস হয়ে যেত। [আম্বিয়া : ২২]

এক আল্লাহ বলবে আমি অমুককে ছেলে দিতে চাই, অন্যজন বলবে, আমি তাকে নিঃসন্তান রাখতে চাই। একজন বলবে, আমি অমুক জাতিকে সম্মানিত করব, অন্যজন বলবে আমি তাদের অপদস্থ করে দাসে পরিণত করব। দুই আল্লাহ পরস্পর কলহ-বিগ্রহ থেকে অবসর পাবে না, বিশ্ব পরিচালনা করবে কে? এটা অন্য কথা যে, দু'আল্লাহ হতে পারবে কিনা? তবে যদি (নাউযুবিল্লাহ) আমরা মেনেও নেই, তবে বিশ্ব টিকে থাকতে পারবে না। যেমন দেহে দু'রূহ হলে দেহ টিকে থাকতে পারে না, তেমনি বিশ্ব দেহটিও টিকে থাকতে পারবে না। ব্যাপারটি এমন হবে যেন এক কোষে দু'টি তরবারি রাখা হল। একটি শেরওয়ানীর ভিতর দুজন মানুষ ঢুকে পড়লে তখন শেরওয়ানী ফেটে যাবে– না ফেটে উপায়ান্তর থাকবে না। তাই এ বিশ্বের সমস্ত মাখলুক এক সৃষ্টিকর্তা দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে।

আর যদি এমন মেনে নেয়া যায় যে, উভয় আল্লাহ পরস্পর সন্ধি করে নিল। তবে বোঝা যাবে যে, কোন একজন হার মানছেন; আর পরাজিত সত্তা আল্লাহ হবে কেমন করে? আল্লাহ হবেন ঐ সত্তা, যাঁকে সবাই ভয় করবে, আর তিনি

হবেন সকল ভয়-ভীতির উর্ধ্বে। পরস্পর আপোষ করে অথবা যুদ্ধ-বিগ্রহ করে কোন অবস্থায়ই একাধিক আল্লাহ হতে পারে না। তাই বলছি, আল্লাহ তাআলার তাওহীদ-এর প্রমাণ আপনার নিজের ভিতরেই রয়েছে, আপনাকে অন্যত্র যাওয়ার প্রয়োজন নেই। স্বয়ং আপনার ভিতরে আল্লাহ তাআলার যাত, সিফাত, তাওহীদ এবং তাঁর সিফাতসমূহের নমুনা রয়েছে, আপনার থেকেই সব বের হয়ে আসবে এবং প্রমাণিত হয়ে যাবে যে, অবশ্যই এ বিশ্বের পরিচালনায় এক মহাজ্ঞানী শক্তি কার্যকরী রয়েছেন। আর এই ধারণা যে আল্লাহ নেই, বিশ্ব স্বয়ংক্রিয়ভাবে পরিচালিত হচ্ছে– এ কথাটি এমন হবে, যেমন কেউ বলে আমার ভিতর রূহ নেই, আমার দেহ ও শরীর স্বাভাবিকভাবেই চলাফেরা করছে বা চলমান রয়েছে। যদি কোন নাস্তিক এ বিশ্বে আল্লাহর অস্তিত্ব অস্বীকার করতে চায়, তবে প্রথমে তার রূহকে অস্বীকার করা উচিত এবং রূহবিহীন চলাফেরা করা উচিত।

আপনার রূহ শরীরের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, প্রতিটি কোষ-কলা সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত। আপনার মধ্যে অনুভূতি শক্তি কার্যকর রয়েছে, সে বুঝতে পারে যে এ হল আমার নখ, এ হল চুল, এ হল পেট ইত্যাদি। এছাড়া এও বুঝতে পারে যে, এখন আমার পেটে গণ্ডগোল হচ্ছে, এখন পেট সুস্থ আছে– এসব জ্ঞান তার রয়েছে। মাটকথা, শরীর নামক জগতের ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতম অংশ সম্পর্কে রূহ জ্ঞাত রয়েছে। যদি রূহ এসব সম্পর্কে ওয়াকিবহাল না থাকে তাহলে দেহের শৃঙ্খলা কিভাবে বজায় থাকবে? রূহ যদি অনুভবই করতে না পারে যে, জ্বর আসছে; তাহলে সে জ্বর থেকে সুস্থ হতে কিভাবে উদ্যোগী হবে? ঠিক এভাবে বিশ্বজগতের অণু-পরমাণু সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা জ্ঞাত, সবকিছুর ইলম তাঁর রয়েছে। এটা সম্ভব হতে পারে না যে, বিশ্বের কোথায় কী হচ্ছে আল্লাহ তাআলা তা জানেন না। اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ 'যিনি সৃষ্টি করেছেন তিনি কি জানবেন না?' কী করে তিনি অজ্ঞাত থাকতে পারেন? একমাত্র সৃষ্টিকর্তাই তাঁর সৃষ্টির মানসিকতা, গুণাবলি এবং সকল অবস্থা সম্পর্কে পরিজ্ঞাত থাকেন। সুতরাং আল্লাহ তাআলার অসীম ইলমের দৃষ্টান্ত আমাদের মধ্যেই বিদ্যমান রয়েছে।

আল্লাহ তাআলা মানুষকে এমন পরিপূর্ণতা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন যে, সে নিজের মধ্যে যদি আল্লাহর কামালাত দেখতে চায় তবে স্বীয় দর্পণে তা দেখতে পাবে। আল্লাহর সকল নমুনা তার দৃষ্টিতে পরিদৃষ্ট হবে। কুরআন শরীফে বলা হয়েছে–

سَنُرِيْهِمْ اٰيٰتِنَا فِى الْاٰفَاقِ وَ فِىْ اَنْفُسِهِمْ حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّهُ الْحَقُّ ؕ

আমি অতিসত্বর আমার কুদরতের নিদর্শনসমূহ মানব জাতিকে দেখাব, বিশ্বের সর্বত্র এবং তাদের নফসের ভেতরেও। যেন স্পষ্ট

হয়ে যায় যে, আল্লাহ তাআলার অস্তিত্ব সত্যই রয়েছে। (এবং তিনি সৃষ্টিজগৎকে পরিচালনা করছেন) [হা-মীম সিজদাহ : ৫৩]

মানতিক (যুক্তিসাস্ত্র)-এর প্রমাণাদি তো রয়েছেই; চাক্ষুষ প্রমাণ হল এই, মানুষ নিজের ভেতরে চিন্তাভাবনা করে আল্লাহর কামালাতের পরিচয় লাভ করে নেবে।

আমার আলোচনার ফলাফল এই দাঁড়াল যে, স্রষ্টা ও সৃষ্টির সকল নমুনা আমাদের মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে। সুতরাং মানুষ এমন এক বিস্ময়কর সৃষ্টি, তার মধ্যে উভয়ের নমুনা বিদ্যমান রয়েছে।

সৃষ্টিজগতের নমুনা হওয়ার কারণে মানুষের করণীয়

উপরোক্ত কারণে মানুষের উপর দু'টি কর্তব্য বর্তায়। একটি হল এমন কর্তব্য যা মাখলুক হিসেবে তার দায়িত্বে অর্পিত হয়, আরেকটি হল স্রষ্টার নমুনা হিসেবে তার উপর করণীয় হয়ে দাঁড়ায়।

সৃষ্টির নমুনা হিসেবে কর্তব্য কী? যে সৃষ্টিকে আল্লাহ তাআলা অস্তিত্বমান করেছেন সে তার জন্মের ব্যাপারে স্রষ্টার মুখাপেক্ষী এবং টিকে থাকার ব্যাপারেও মুখাপেক্ষী। সুতরাং প্রতিটি পদক্ষেপে আমরা আল্লাহর প্রতি মুখাপেক্ষী। অভাবমুক্তের সামনে অসহায় অভাবীর কী করণীয় কাজ হয়ে থাকে? তার করণীয় হল এই, অভাবমুক্তের সম্মুখে সে নত হবে এবং তাকে সিজদা করবে। কারণ আমাদের কাছে যদি সবকিছু থাকে তবে তার কাছে চাওয়ার কী প্রয়োজন? আমাদের কাছে কিছুই নেই বলে আমরা আমাদের প্রয়োজনের কথা তার কাছে উপস্থাপন করি।

একজন ভিক্ষুক তখনই আপনার কাছে হাত পাতে যখন তার কাছে কোন সম্পদ না থাকে। যদি তার নিকট সম্পদ থাকত তাহলে হাত পাতার কী প্রয়োজ ছিল? সুতরাং বোঝা গেল অভাবী ও পরমুখাপেক্ষী ব্যক্তিই অন্যের নিকট হাত পাতে, অভাবমুক্ত অমুখাপেক্ষী ব্যক্তি নয়। জীবন লাভ আমাদের শক্তি ও সামর্থ্যের ভিতর ছিল না, আমরা হাত পাতলাম– হে আল্লাহ! আমাদেরকে জীবন দান কর। তিনি দান করলেন।

জীবন লাভের পর একে টিকিয়ে রাখার সামর্থ্য আমাদের নেই, যদি আমাদের সে সামর্থ্য থাকত, তবে আমরা কখনো মৃত্যুমুখে পতিত হতাম না; কিন্তু আমাদেরকে মৃত্যুবরণ করতে হয়। বোঝা গেল জীবন আমাদের শক্তির ভেতর নয়। আমরা দুআ করতে থাকি, হে আল্লাহ, আমাদেরকে দীর্ঘায়ু করুন। কর্মের মাধ্যমেও আমরা দীর্ঘায়ুর প্রার্থনা করি। অর্থাৎ আমরা জীবনকে টিকিয়ে রাখার

মাধ্যম অবলম্বন করি। যেমন পানাহার করি, ওষুধ-পথ্য ব্যবহার করি প্রভৃতি। এগুলো হল কর্মের মাধ্যমে দুআ। এ ছাড়া মুখেও বলি– হে আল্লাহ্, আমাদেরকে জীবিত রাখুন। কেন এ প্রার্থনা করি? মুখাপেক্ষীতা প্রকাশ করার জন্যই করি। কারণ, তিনি হলেন অমুখাপেক্ষী আর আমরা মুখাপেক্ষী। যারা মুখাপেক্ষী তাদের কাজ হল নত হওয়া। সৃষ্টি সবসময় স্রষ্টার মুখাপেক্ষী হয়ে থাকে। তার কর্তব্য হল স্রষ্টার প্রতি নত হওয়া।

আর সে নত হওয়াও কোন সাধারণ নত হওয়া নয়; বরং সর্বোচ্চ পর্যায়ের নত হওয়া। অর্থাৎ এমন নীচতা প্রকাশ করতে হবে, আর কারো সামনে সে নীচতা প্রকাশ করা সম্ভব নয়। কারণ, স্রষ্টা হলেন এমন এক সত্তা, যার ইজ্জতের কোন সীমা-পরিসীমা নেই সুতরাং তার সামনে নিজেকেও সীমাহীন বেইজ্জতির সাথে পেশ করতে হবে। ইসলামী পরিভাষায় এই সীমাহীন বেইজ্জতি ও নীচতার নামই ইবাদত। সর্বোচ্চ হীনতাকে ইবাদত বলা হয়। আপনি যদি ভেবে দেখেন তবে দেখতে পাবেন যে, এই সর্বোচ্চ হীনতা মানুষ কেবল নামাযের মাধ্যমেই প্রকাশ করতে পারে, অন্য কোন ইবাদতের মাধ্যমে প্রকাশ করতে পারে না। কেননা সর্বোচ্চ অপদস্থতা ও নীচতার যতগুলো ধরণ রয়েছে তার সবই নামাযের মধ্যে বিদ্যমান। চাকরের মত হাত বেধে মাথা নত করে দাঁড়ানো, অতঃপর এ অপদস্থতায়ও সন্তুষ্ট না হয়ে রুকু করে মাথা ঝুঁকিয়ে দিয়ে আরো বেশি অপদস্থতা প্রকাশ করা। অতঃপর এতেও তুষ্ট নয়, মানুষের সবচেয়ে ইজ্জতের জিনিস নাক ও কপালকে সিজদায় গিয়ে জমিনের সথে ঘষতে থাকে। যেন বলতে থাকে– হে আল্লাহ! তোমার সীমাহীন ইজ্জতের সামনে আমি আমার সীমাহীন বেইজ্জতী পেশ করছি। এতেই শেষ নয়, সর্বশেষে গিয়ে ভিক্ষা চায়– হে আল্লাহ! আমাকে সাওয়াব দাও, রিজিক দাও ইত্যাদি ইত্যাদি। ভিক্ষা চাওয়ার চেয়ে বেশি বে ইজ্জাতি কিছুতে নেই। আর সিজদা শেষে দুআর মাধ্যমে তাই করা হয়। সুতরাং ইবাদাতের উদ্দেশ্যই এই দাঁড়াল যে, মাখলুক তার খালেকের সামনে নত হবে, সর্বোচ্চ অপদস্থতা প্রকাশ করবে। আর তা নামাযের মধ্যে হয়ে থাকে। এজন্যই নামাযের কর্তব্য আরোপিত হয়েছে, যার দ্বারা মানুষ ইবাদত করতে পারে। নামায ব্যতীত প্রকৃত ইবাদতের আর কোন জিনিস নেই যার দ্বারা মানুষ ইবাদত করতে পারে। কারণ ইবাদতের অর্থ হল সর্বোচ্চ হীনতা পেশ করা। আর তা কেবল নামাযের মধ্যেই রয়েছে, অন্য কোন ইবাদতের মধ্যে নেই। যেমন মনে করুন, আপনি যাকাত দিলেন, সদকা করলেন এগুলো প্রকৃত ইবাদত নয়, এতে তো কোন হীনতার প্রকাশ নেই; বরং এতে তো আল্লাহর সাথে সাদৃশ্য হয়, যেভাবে আল্লাহ তাআলা তাঁর মাখলুককে দান করেন, তদ্রূপ আপনিও দান করলেন। দান করা বা দয়া করা বেইজ্জতির কাজ

নয় বরং এগুলো চরম সম্মানের বস্তু। এ হল আল্লাহর কাজ। সুতরাং যাকাত ও সদকা দেয়া সত্তাগতভাবে ইবাদত নয়, এগুলোর মধ্যে ইবাদতের মৌলিক অর্থ পাওয়া যায় না। কিন্তু যেহেতু আল্লাহ তাআলা এগুলো করার জন্য আদেশ করেছেন, তাই তাঁর আদেশ পালন করার কারণে এতে ইবাদতের শান পয়দা হয়েছে, নতুবা মূল সত্তা হিসেবে ইবাদত নয়।

এভাবে আপনি রোযা রাখুন, রোযা তার সত্তাগতভাবে ইবাদত নয়, এজন্য যে, রোযার অর্থ হল পানাহার ও স্ত্রীসঙ্গম থেকে নিজেকে বিরত রাখা। এ সবের যেন কোন প্রয়োজন নেই, সব থেকে যেন অমুখাপেক্ষী। আর এ হল আল্লাহ তাআলার শান, তিনি পানাহার, স্ত্রী ইত্যাদি সব কিছু থেকে পাক-পবিত্র। আল্লাহ তাআলার সম্পৃক্তগ্রহণ কি অপদস্থতার বিষয় হতে পারে? সুতরাং রোযা হল একান্তই সম্মানের কাজ। তথাপি রোযা ইবাদত সাব্যস্ত হয়েছে, কারণ আদেশ করা হয়েছে যে তোমরা রোযা রাখ। আদেশ পালনের কারণে ইবাদত হয়েছে। আমরা সত্য কথা বলাকে ইবাদত বলি। কিন্তু সত্য বলা তার সত্তাগতভাবে ইবাদত নয়; কেননা সত্য বলা আল্লাহ তাআলার কাজ। আল্লাহ বলেছেন– وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللهِ قِيْلًا 'আল্লাহ তাআলার কথার চেয়ে কার কথা অধিক সত্য?' অন্যত্র বলেছেন– وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللهِ حَدِيْثًا 'আল্লাহ তাআলার চেয়ে অধিক সত্যবাদী আর কে হতে পারে?' কাজেই সত্য বলা বেইজ্জত ও অপমানের কাজ নয়। যে সত্য বলছে সে অপমানের কাজ করছে কি? বরং সে পরম সম্মানের কাজ করছেন, চরম মর্যাদাপূর্ণ স্থানে অবস্থান করছে। সত্য বলা ইবাদত হয়েছে এজন্য যে, আল্লাহ তাআলা আদেশ করেছেন যে, তোমরা সত্য কথা বল, মিথ্যা কথা বল না। আদেশ পালিত হচ্ছে বিধায় এতে ইবাদতের শান সৃষ্টি হয়েছে। এ সমস্ত জিনিসের মধ্যে কোন জিনিস সত্তাগত ইবাদত নয়। এগুলো নিয়ত ও উদ্দেশ্যের কারণে ইবাদত হয়ে যায়। কিন্তু নামাযে যেসব ক্রিয়াকর্ম রয়েছে এগুলোর মধ্যে তার সত্তাগত হীনতা প্রকাশ পায়। দাঁড়ানো, রুকু করা, সিজদা করা, দুআ ও প্রার্থনা করা– এসবই হীনতার প্রকাশ, অবমাননার দৃশ্য। এজন্যই যে জিনিসটি সত্তাগতভাবেই ইবাদত, তা হল একমাত্র নামায।

একারণেই আল্লাহ তাআলা কেবল মানুষের ওপরই নামাযকে ফরয করেননি বরং বিশ্বের প্রতিটি অণু-পরমাণুর উপর নামায ফরয করেছেন। কুরআন মাজিদে ইরশাদ করা হয়েছে–

كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيْحَهُ.

প্রতিটি বস্তু তার নামায ও তাসবীহ পাঠের পদ্ধতি জানে। [নূর : ৪১]

বোঝা গেল, গাছপালা, পাহাড়-পর্বত, জীবজন্তু সকলেই নামায আদায় করে, সবার ওপরে নামায ওয়াজিব। পর্থক্য শুধু এই যে, মানুষকে সম্বোধন করা হয়েছে। কেননা তার মধ্যে বিবেক-বুদ্ধি রয়েছে। অন্য সৃষ্টিকে সম্বোধন করা হয়নি, কিন্তু তাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে এমনভাবে, যেন তারা নামায পড়ছে। যেমন উলামায়ে কেরাম লিখেছেন, যত গাছপালা রয়েছে তাদের নামাযে শুধু কিয়াম রয়েছে, রুকু-সিজদা নেই। যেন এক পায়ে দাঁড়িয়ে নামাযে রত আছে। রুকু-সিজদা করার অনুমতি নেই। চতুষ্পদ জন্তুদের নামাযে কেবল রুকুই আছে। এদেরকে আল্লাহ তাআলা এমন আকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন যে, এরা যেন সর্বক্ষিণক রুকুতে রত আছে। সিজদা ও কিয়াম তাদের নামাযে নেই। মানুষ যেভাবে তাশাহহুদে বসে সেভাবে আল্লাহ পাহাড়কে সৃষ্টি করেছেন। পাহাড় যেন মাটিতে হাঁটু গেড়ে 'আত্তাহিয়্যাতে' রত আছে। এদের নামাযে 'কুউদ' বা বৈঠক আছে, কিয়াম, রুকু ও সিজদা নেই। সরিসৃপ জাতীয় প্রাণী যেমন সাপ, বিচ্ছু এদের নামাযে শুধু সিজদা রয়েছে, রুকু কিংবা কিয়াম নেই। সর্বদা যেন তারা নতমস্তকে আল্লাহর সম্মুখে সিজদায় পড়ে আছে। চন্দ্র, সূর্য কিংবা বৈজ্ঞানিকদের বর্তমান মতামত অনুযায়ী 'পৃথিবী'ও সর্বদা ঘূর্ণায়মান রয়েছে। এগুলো তাদের ঘূর্ণায়মানতার মাধ্যমে ইবাদত করছে। তাদের আহ্নিক গতিই তাদের নামায। এভাবে জান্নাত ও দোযখের নামায হল দুআ করা। হাদীসে বলা হয়েছে, জান্নাত এ দুআ করছে যে, হে আল্লাহ! কিয়ামত দিবসে আমাকে পূর্ণ করে দিও। আমার কোন মহল যেন খালি না থাকে। জাহান্নামও প্রার্থনা করছে যে, আমাকে পূর্ণ করে দিও। আল্লাহ তাআলার ওয়াদা রয়েছে, কিয়ামত দিবসে উভয়কে পূর্ণ করে দেয়া হবে। ওয়াদা রক্ষা করা হবে। যে পর্যন্ত ভর্তি হবে না, জাহান্নাম চিৎকার করতে থাকবেঃ هَلْ مِنْ مَزِيْد، هَلْ مِنْ مَزِيْد (আরো আছে কি?) চাঁদ, সূর্য, পাহাড়, সমুদ্র, মাটি সবকিছু তাতে নিক্ষেপ করা হবে। তথাপি সে বলতে থাকবে– هَلْ مِنْ مَزِيْد এসবেও যখন ভর্তি হবে না, তখন হাদীসের ভাষ্যমতে আল্লাহ তাআলা তাঁর পা তাতে রাখবেন; যেমন পা তাঁর শানের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। তখন জাহান্নাম বলবে– ব্যাস, ব্যাস! এখন আমি ভরে গিয়েছি এবং ওয়াদা পূর্ণ হয়েছে।

সকল জান্নাতী জান্নাতে প্রবেশ করবেন। তার পরও জান্নাতের শহর ও বসতিগুলো খালি থেকে যাবে। তখন স্বতন্ত্র এক মাখলুক সৃষ্টি করে জান্নাতকে আবাদ করা হবে। যাই হোক, জান্নাত ও জাহান্নামের নামায হল দুআ করা। ফেরেশতাদের নামায হল সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা। মানবজাতি, বিশেষ করে মুসলমানদের নামাযের ভিতর সমস্ত সৃষ্টিজগতের নামাযকে আল্লাহ তাআলা একত্র করে দিয়েছেন। গাছপালার মত কিয়াম, চতুষ্পদ প্রাণীদের মত রুকু, সরিসৃপের মত সিজদা, জান্নাত ও জাহান্নামের মত দুআ, পাহাড়-পর্বতের মত

তাশাহহুদ, ফেরেশতাদের মত কাতারবন্দি এবং চন্দ্র-সূর্য ও পৃথিবীর মত ঘূর্ণায়মানতাও নামাযে রয়েছে। একারণেই কোন নামাযই দুই রাকাতের কম নয়। দুই, তিন কিংবা চার রাকাত রয়েছে। আপনি এক রাকাত পড়ে কি করেন? প্রথম রাকাতে যেসব কাজ করেছেন সেসব কাজ দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ রাকাতেও করেন। সেই একই সূরা ফাতিহা পাঠ, অন্য সূরা মিলানো এবং তাসবীহসমূহ আদায় করা। এ কারণেই বলা যায় যে, ঘূর্ণায়মানতা ও প্রদক্ষিণ করণ নামাযের মধ্যে রয়েছে।

মানুষকে যেমন আল্লাহ তাআলা এক পূর্ণাঙ্গ সত্তা বানিয়েছেন, তদ্রূপ ইবাদতও দান করেছেন পূর্ণাঙ্গ। আপনার ইবাদতের ভিতর সমস্ত বিশ্বের ইবাদতকে একিভূত করে দেয়া হয়েছে। এ দ্বারা দীনের পূর্ণতাও স্পষ্ট হয়।

পূর্ববর্তী ধর্মগুলোর মধ্যে এ জাতীয় পূর্ণাঙ্গ নামায ছিল না। কোন কওমকে শুধু সিজদা, কাউকে শুধু কিয়াম এবং কাউকে শুধু রুকুর নামায দেয়া হয়েছিল। কিন্তু ইসলামের নামাযে সকল জাতির নামায কেন্দ্রীভূত রয়েছে। সকল কওমের, সকল সৃষ্টিজগতের নামায জমা হয়ে গেছে। যাই হোক, নামায হল একটি সর্বাঙ্গিন পরিপূণ ইবাদত; বরং নামাযই হল একমাত্র ইবাদত। অন্যান্যগুলো আল্লাহর নির্দেশ পালিত হওয়ার কারণে ইবাদত হয়ে থাকে। তাই মানুষের ওপর অর্পিত হওয়া একটি কর্তব্য হল নামায। এ জন্য যে, যখন সে সৃষ্টিজগতের সকল নমুনা নিজের ভেতর ধারণ করেছে তখন নমুনাসমূহের সকল অপদস্থতা ও ইবাদত আল্লাহর সামনে উপস্থাপন করা তার জন্য আবশ্যক। এ কারণেই মানব জীবনের একটি উদ্দেশ্য হল ইবাদত।

আল্লাহর পূর্ণতার নমুনা হিসেবে মানুষের করণীয়

এই একই মানুষ যেভাবে নিজের ভেতরে সৃষ্টির সকল নমুনা ধারণ করে আছে তদ্রূপ স্রষ্টার নমুনাও ধারণ করে রয়েছে। তাই তার ওপর এ দায়িত্বও অর্পিত হয়েছে যে, স্রষ্টা যেসব কাজ করেন, সেও তা করবে। স্রষ্টার কাজ কী? তার কাজ হল নিজ সৃষ্টিকে প্রতিপালন করা, তাদের তারবিয়াত করা, তাদের হিদায়াত করা। তিনি মাখলুককে লালন-পালনের জন্য রিজিক সৃষ্টি করেছেন। তিনি মাখলুককে তালিম দিয়েছেন যেন তারা তাদের ভাইদের প্রতি দয়া করে, যেমন আমি দয়া করছি। আমি যেভাবে তোমাদেরকে সৎপথ প্রদর্শন করছি, তোমারও তোমাদের ভাইদেরকে সেভাবে সৎপথ প্রদর্শন কর। যেভাবে আমি তোমাদের তারবিয়াত করছি তোমরাও সেভাবে তোমাদের সন্তান-সন্ততি ও পরিবার-পরিজনকে তারবিয়াত কর। অর্থাৎ আমার প্রতিনিধি হিসেবে সেসব

কাজ কর যেগুলো আমার কাজ। আমি যেমন মুদাব্বির বা কার্যপ্রণালী গ্রহণকারী তোমরাও সেভাবে কার্যপ্রণালী গ্রহণ কর। আমি মুজিদ বা আবিষ্কারক, তোমরাও তদ্রূপ পৃথিবীতে ইজাদ কর, আবিষ্কার কর। আমার কাজ হল হিদায়াত করা, তোমরাও বিশ্বের জন্য পথ প্রদর্শক হয়ে যাও। আদেশ-নির্দেশ প্রদান আমার কাজ, তোমরাও আমার প্রতিনিধি হিসেবে আদেশ-নিষেধ প্রদান কর, হুকুম জারী কর। সার কথা হল, মানুষের ওপর ইবাদতের একটি দায়িত্ব এবং খিলাফাতের একটি দায়িত্ব অর্পিত হয়। একদিকে মাথা নত করে আল্লাহ তাআলার ইবাদত করবে, অন্যদিকে খেলাফতের মসনদে বসে আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে তাঁর সৃষ্টির ওপর কর্তৃত্ব করবে। দেশ জয় করবে, পৃথিবীতে হিদায়াতের বিস্তার করবে, সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজে বাধা প্রদান করবে। এগুলো হল আল্লাহর কাজ, কিন্তু তাঁর প্রতিনিধি হয়ে মানুষও এ কাজ করবে। আম্বিয়ায়ে কেরাম আ. দুনিয়ায় আগমন করেছেন আল্লাহ তাআলার প্রতিনিধিরূপে এবং তারা হিদায়াতের দায়িত্ব পালন করেছেন এবং সৎপথ প্রদর্শন করেছেন। আল্লাহ তাআলা হলেন বিশ্বের মুরব্বী। আম্বিয়ায়ে কেরাম আ.ও রূহের তারবিয়াত ও উন্নতি সাধন করেন। আল্লাহ তাআলা মুয়াল্লিম, তিন নবীগণকে শিক্ষা দিয়েছেন। সে অনুযায়ী নবীগণও শিক্ষা দান করেন যেন পৃথিবীতে পবিত্র শিক্ষার আলো বিস্তার লাভ করতে পারে। আল্লাহ তাআলার আদেশ-নিষেধ প্রতিষ্ঠিত করেন, কিসাস গ্রহণ করেন, শরাব ও মাদকদ্রব্য সেবনকারীর ওপর বেত্রাঘাত করেন। সুতরাং নাবীগণ হলেন প্রথম কাতারের প্রতিনিধি। তারপর নবীগণের প্রতিনিধি হলেন তাঁদের সাহাবীগণ, তাপর সাহাবীগণের প্রতিনিধি হলেন তাবেঈগণ, তাবেঈগণের প্রতিনিধি হলেন তাবে তাবেঈগণ। এভাবে সিলসিলা এসে পৌঁছে উলামায়ে রব্বানী, মাশাইখে হাক্কানী, ওলী, সুফী, দরবেশগণের ওপর। যারা বিশ্বকে সৎপথ প্রদর্শন করেন, সত্যের প্রতি আহ্বান জানান, তারাও খেলাফত ও প্রতিনিধিত্বের কাজ করেছেন। খোলাফায়ে রাশেদীন রাজ্য পরিচালনা করে দেখিয়েছেন, খেলাফতের সিংহাসনে বসে দেশের পর দেশ জয় করেছেন। দেশ জয় এ জন্য করেননি যে, এ দ্বারা আরাম-আয়েশ করবেন, ইচ্ছাধীন পানাহার করবেন ও ভোগবিলাস করবেন। বরং জয় এ জন্য করেছিলেন যেন আল্লাহর মাখলুককে সৎপথে পরিচালিত করা যায়। আল্লাহর আইনানুযায়ী পরিচালিত করা যায়। তাঁরা আল্লাহ তাআলা এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতিনিধি হয়ে সেসব কাজই করেছেন, যা আল্লাহর ইচ্ছা ছিল। সারাদিন খেলাফতের দায়িত্ব আদায় করতেন। ইবাদতের সময় হলে মসজিদে গিয়ে সিজদা করতেন, ইবাদতের দায়িত্ব আদায় করতেন। তাঁরা একদিকে ইবাদত ও অন্যদিকে খেলাফতের দায়িত্ব আদয় করেছিলেন।

এ জন্য প্রকৃত অর্থে মানুষ ঐ ব্যক্তি, যে স্বীয় সত্তাকে আল্লাহ তাআলার সম্মুখে নত করে দেয় এবং ইবাদতের প্রতি অগ্রসর হয়। এভাবে তার নাসিকা, ললাট, হাত-পা, রূহ ও ধ্যান-ধারণা সবই আল্লাহ তাআলার সম্মুখে অবনত হয়ে ঝুঁকে যায়। এ কাজ স্বীয় সত্তার মঙ্গল ও উপকারের জন্যই করবে। এ হল ইবাদত। দ্বিতীয় দায়িত্ব হল খেলাফতের মসনদে বসে পৃথিবী থেকে অন্যায়-অত্যাচার ও অসৎ কর্মের মূলোৎপাটন করা। এজন্যই, শুধু ইবাদত কিংবা শুধু খেলাফত মানব জীবনের উদ্দেশ্য নয়; বরং দু'টোই উদ্দেশ্য।

আমাদের সকলের আদি পিতা হযরত আদম আ.কে আল্লাহ তাআলা সৃষ্টি করার ইচ্ছা করলেন। সর্বপ্রথম ফেরেশতাদের নিকট এ কথাটি বললেন–

إِنِّىْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً

আমি পৃথিবীতে আমার প্রতিনিধি বানাতে চাচ্ছি। [বাকারা : ৩০]

হযরত আদম আ. কোন্ বিষয়ের প্রতিনিধি ছিলেন? ইবাদতের প্রতিনিধি তো ছিলেন না। কেননা ইবাদত করা আল্লাহ তাআলার কাজ হতে পারে না। তিনি তো মাবুদ, ইবাদত করা থেকে তিনি পবিত্র। তিনি কোন আবেদ নন। কাজেই বিশ্বকে সঠিক পথে পরিচালনা করা, তাকে তারবিয়াত দান ও সংশোধন করার প্রতিনিধিত্ব অর্পণ করেছেন। কিন্তু এ খেলাফতের দায়িত্ব কেবল তিনিই আঞ্জাম দেবেন যিনি প্রথম ইবাদত করে নিজেকে সংশোধন করবেন। প্রথমে আল্লাহর সম্মুখে মাথা নত করে নিজের আখলাক শুদ্ধ করবেন, নিজের মধ্যে মুখাপেক্ষিতা ও বেন্দগীর শান সৃষ্টি করবেন। তার মধ্যে বিনয়, নম্রতা ও লিল্লাহিয়াত থাকবে। তার মধ্যে অহংকার-অহমিকা থাকতে পারবে না, লোভ-লালসা থাকতে পারবে না। বরং তার মধ্যে পরিতুষ্টতা ও পরহিতৈশিতা থাকবে। মাখলুকের খেদমত করার আবেগ ও মানসিকতা তার মধ্যে থাকবে। এ জযবা ও আবেগ ইবাদত দ্বারা তৈরি হয়। ইবাদত করার পর যখন এসব জযবা বা আবেগ তার মধ্যে এসে যাবে তখনই তিনি আল্লাহর প্রতিনিধি হয়ে উঠবেন। এখন তিনি অন্যের সংশোধন করবেন। সুতরাং জীবনের উদ্দেশ্য দু'টি জিনিস সাব্যস্ত হল– একটি ইবাদত, অপরটি খেলাফত।

ঈমানের পূর্ণতার জন্য ইবাদত ও খেলাফত উভয়ই আবশ্যক

এ জন্যই ঈমানের দু'টি ভিত্তির কথা বলা হয়েছে–

التعظيم لأمر الله والشفقة على خلق الله

আল্লাহর নির্দেশাবলির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা, তার প্রতি মাথা নত করা আর দ্বিতীয় হল তাঁর সৃষ্টির প্রতি দয়া করা ও তাদের খেদমত করা।

এ দু'টি বিষয়ের সমন্বয়ে ঈমান গঠিত হয়। কেউ যদি চব্বিশ ঘণ্টা মসজিদে পড়ে থাকে; কিন্তু আল্লাহর মাখলুক বেঁচে থাক বা ধ্বংস হয়ে যাক তার প্রতি সে কোন খেয়াল না করে তবে সে অর্ধেক ঈমানের অধিকারী। অপর দিকে কোন ব্যক্তি যদি দিবারাত্রি জনসেবায় নিজেকে নিয়োজিত রাখে কিন্তু মসজিদে যাওয়ার নামও নেয় না, তার ঈমান অর্ধেকের চেয়েও কম। এ জন্য যে, খেলাফতের দায়িত্ব সে আদায় করেছে কিন্তু ইবাদত ত্যাগ করেছে। মানুষ তখনই পূর্ণতা লাভে সক্ষম হবে যখন সে একদিকে হবে আবেদ ও জাহেদ অপর দিকে হবে আল্লাহর প্রতিনিধি। এক দিকে সেইসব কাজ করবে যা মাখলুকের করণীয়, আর তা হল ইবাদত। অন্যদিকে ঐ সকল কাজ করবে যেগুলো স্রষ্টার করণীয়। আর তা হল তারবিয়াত। এটাই ছিল নবী আ.গণের জীবন। রাত্রের জীবনের দিকে দৃষ্টি দিলে দেখতে পাই তাহাজ্জুদ পড়তে পড়তে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পা মোবারক ফুলে যেত। দিনের জীবনের প্রতি লক্ষ্য করলে দেখতে পাবেন সৃষ্টির সেবায় নিয়োজিত রয়েছেন। হিদায়াত ও তাবলীগের কাজ আঞ্জাম দিচ্ছেন, পৃথিবীর রাজা-বাদশাহদের নিকট পত্র প্রেরণ করছেন। যেগুলো দ্বারা ইসলামের দাওয়াত দেয়া হচ্ছে, ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণের আহ্বান জানানো হচ্ছে। সফর করে কখনো তায়েফ যাচ্ছেন, কখনো বা মদীনায় যাচ্ছেন, যেন আল্লাহর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানব জাতি সঠিক পথের ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। এগুলো হল খেলাফতের কাজ। মসজিদে নববীতে যেভাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায আদায় করতেন, সেভাবে তিনি মামলা-মোকদ্দমার ফয়সালাও দিতেন। মসজিদে যেভাবে ইবাদত-বন্দেগী হত তদ্রূপ দারস-তাদরিসের মাধ্যমে তালিমও দেয়া হত। এগুলো ছিল খেলাফতের কাজ। নামায পড়া, তিলাওয়াত করা, সিজদা করা এসব ছিল ইবাদতের কাজ।

সাহাবায়ে কেরাম রা.-এর অবস্থাও তদ্রূপ ছিল। একদিকে প্রশাসনের উচ্চ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হয়ে আল্লাহর সৃষ্টির সেবা ও সংশোধনের কাজ করছেন, অন্যদিকে চাঁটাই ও চটের উপর বসে বিনম্রভাবে আল্লাহর সামনে মাথা নত করে রাখছেন।

পারস্যে যখন যুদ্ধ হল তখন সাহাবায়ে কেরামের সংখ্যা ছিল সাকুল্যে ত্রিশ বা বত্রিশ হাজার আর পার্সিয়ানদের সৈন্য সংখ্যা ছিল তিন লক্ষ। তার ওপর পারস্য বাহিনী ছিল অস্ত্র-সস্ত্রে সুসজ্জিত, সামরিক পোশাক ও বর্ম পরিহিত। রসদ ও খাদ্যদ্রব্য ছিল প্রচুর পরিমাণে। এরূপ যখন তাদের অবস্থা তখন অন্যদিকে

সাহাবায়ে কেরাম ছিলেন দরবেশদের একটি জামায়াত। তাঁদের পোশাকের অবস্থা ছিল এমন যে, কারো নিকট জামা ছিল না, লুঙ্গি পরে আছেন। কারো মাথায় পাগড়ি নেই, রশি বেঁধে রাখছেন। কারো হাতে বর্শা, কারো হাতে তরবারি, কারো হাতে খঞ্জর। অস্ত্রশস্ত্র, পোশাক-পরিচ্ছদ, খাদ্যদ্রব্য, রসদ– কোনটাই যথারীতি নেই। দরবেশদের একটি দল। কিন্তু বাস্তবতা ছিল এই যে, যাখো পার্সিয়ান এগিয়ে আসত, সাহাবায়ে কেরাম ক্ষুধার্ত বাঘের ন্যায় তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তেন, আর তারা বিড়ালের মত পলায়ন করে আত্মরক্ষা করত। সাহাবীগণ তাদের উপর প্রবল ছিলেন, পুরো পারসে এক আতঙ্কাবস্থা তৈরি হয়ে গিয়েছিল। পারস্যের প্রধান সেনাপতি ছিল রুস্তম। আপনারা বীর রুস্তমের নাম শুনে থাকবেন। সে ছিল সর্বাধিনায়ক। সে তার সকল লেফটেনেন্ট ও জেনারেলদের একত্রিত করে বললো, এ অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, আমাদের সৈন্য সংখ্যা তিন লক্ষ, আর আরব গেঁয়োদের সংখ্যা সাকুল্যে ত্রিশ হাজার। অপরদিকে তাদের নিকট যথাযোগ্য উপকরণাদির কিছুই নেই অথচ আমাদের নিকট সবই রয়েছে। তাদের জন্য কোথাও হতে কোন সাহায্য আসছে না আর আমাদের পশ্চাতে আমাদের সম্পূর্ণ দেশ রয়েছে। এটা আমাদের দেশ আর তারা এসেছে আক্রমণ করতে, তাদের দেশ রয়েছে বহু দূরে। তারা আমাদের দেশে আমাদের ঘেরাও এর ভিতর রয়েছে। এতসব সত্ত্বেও তারা এমনভাবে আক্রমণ করছে, মনে হয় যেন ক্ষুধার্ত বাঘের দল। আর তোমরা পার্সিয়ানরা এভাবে পলায়ন কর যেমন শিয়ালের দল পলায়ন করে। এমনটি হওয়ার কী এমন কারণ থাকতে পারে? তোমাদের নিকট কী জিনিসের অভাব রয়েছে? প্রধানগণ বললো, হে রুস্তম! আপনি যদি সত্য কথা জানতে চান তবে আমরা বলতে পারি; কিন্তু আমাদের জীবনের নিরাপত্তার অঙ্গীকার করতে হবে, আমাদেরকে হত্যা করা হবে না। সে বললো, তোমাদের প্রাণের নিরাপত্তা দেয়া হল। তখন প্রধানগণ একমত হয়ে বললো, হে রুস্তম! এই নগণ্য সংখ্যক আরব তোমার দেশের উপর জয়ী হবেই। তাদের দখলে দেশ যাবে, এখানে তাদেরই হুকুমত প্রতিষ্ঠিত হবে। সম্পূর্ণ ইরান তাদের করতলগত হবে। তারা পরাজিত হবে না, তোমরাই পরাজয় বরণ করবে। রুস্তম জিজ্ঞেস করল, কেন? তারা বললো, এ করণে যে, তাদের অবস্থা হল এই–

هم بالليل رهبان وبالنهار فرسان

দিনভর তারা অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করে জিহাদে ব্যস্ত থাকে
আর রাত্রিকালে জায়নামাজের পিঠে আরোহণ করে।

আল্লাহর নিকট বিনীতভাবে কান্নাকাটি করে বলতে থাকে, হে মালিক, আমাদের

মধ্যে কোন শক্তি নেই, তুমিই শক্তিশালী। আমরা তোমার সৈনিক। তুমি যদি আমাদেরকে বিজয় দাও তবেই আমরা জয়ী হব। আর যদি পরাজিত কর তবে আমরা পরাজয় বরণ করব। আমাদের নিকট কোন শক্তি-সামর্থ্য নেই; শক্তি ও রাজত্ব একমাত্র তোমারই। এভাবে তারা সারারাত আল্লাহর সম্মুখে অনুনয়-বিনয় সহকারে কাঁদতে থাকে, নিয়াবনত হয়ে মস্তক মাটিতে রেখে দেয়, আর দিনের বেলায় অশ্বপৃষ্ঠে সওয়ার হয়ে যুদ্ধ করে।

আর তাদের অবস্থা হল এমন, তারা এমনই বুযর্গ ব্যক্তিবর্গ যে, তারা যে গ্রামে যায়, সে গ্রামের ফসল যদি ধ্বংসপ্রাপ্তও হয়ে থাকে তবে তা শস্য-শ্যামল হয়ে ওঠে। তারা অন্যদের নারীগণকে এভাবে হেফাযত করে, যেভাবে নিজের স্ত্রী-কন্যাগণকে করে থাকে। হে রুস্তম! তোমার এ বাহিনী মদ পান করে যে গ্রামে প্রবেশ করে সে গ্রামের বধূ-কন্যাদের ইজ্জত বরবাদ হয়ে যায়। যে খামারে ও বাগানে তারা পৌঁছে সেখানকার ফল ও ফসল উজার হয়ে যায়। এ হল তোমার বাহিনীর কার্যকলাপ, আর ঐ ছিল তাদের বাহিনীর অবস্থা। এমতাবস্থায় বিজয় তোমার হবে না তাদের হবে?

রাতে তারা জায়নামাযে দাঁড়িয়ে ইবাদতে ব্যস্ত আর দিনে ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হয়ে আল্লাহর প্রতিনিধিরূপে পৃথিবীর সংশোধনের কাজে মশগুল। তাই রুস্তম ও তার জেনারেলগণ প্রকৃতই বুঝতে পেরেছিল যে, এ বুযর্গদের মধ্যে এ দুটি জিনিসই রয়েছে– একদিকে তারা ইবাদতে কামিল, অন্যদিকে তারা খেলাফতে কামিল। একদিকে তাদের মাথা আল্লাহর দরবারে বিনয়াবনত, অন্যদিকে আল্লাহর সৃষ্টির সেবা-যত্নে তাদের ইসলাহ ও সংশোধনের জন্য আত্মোৎসর্গকৃত হয়ে পৃথিবীর এ প্রান্ত থেকে ঐ প্রান্তে সফর করে বেড়াচ্ছেন। পথে কোন বিশৃঙ্খলাকারী বাধার সৃষ্টি করলে তাকে হটিয়ে দিচ্ছেন, যেন দীন সবার নিকট পৌঁছতে পারে এবং লোকজন দীন সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করতে পারে।

যাই হোক, জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য যখন ইবাদত ও খেলাফত সাব্যস্ত হল; পৃথিবীর সর্বপ্রধান ইবাদতকারী ও আল্লাহর সর্বপ্রধান প্রতিনিধি যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন; তখন তাঁর উম্মতকেও সর্বোত্তম আবিদ ও সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি হতে হবে। এ উম্মতকে এজন্য দুনিয়াতে প্রেরণ করা হয়েছে, যেন তারা দিবারাত্রি ইবাদতে ব্যস্ত থাকে এবং সর্বদা আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে আল্লাহর মাখলুকের সংশোধন করে। এরা إعلاء كلمة الله তথা আল্লাহর দীনকে সমুন্নত রাখার জন্য চেষ্টা করবে, নিজের জীবনের এ উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য স্থির করে নিবে যে, আমি মরে যাই বা বেঁচে থাকি– যাই হই না কেন, আল্লাহর নাম সর্বোচ্চে থাকবে। তখন এ জাতিকে আল্লাহ তাআলা কখনো অপদস্ত

করবেন না, লাঞ্ছিত ও অপমানিত করবেন না। অপমান ও লাঞ্ছনা তখনই হয়, যখন মানুষ আল্লাহ তাআলার নাম ত্যাগ করে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করতে চায়, নিজের আরাম-আয়েশকে প্রাধান্য দেয়। তখন আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের কোন সাহায্য করা হয় না। তাদের উপর শত্রুদেরকে, অপরাপর জাতিগুলোকে শাসকরূপে প্রতিষ্ঠিত করে দেয়া হয়। তারা তাদেরকে পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ করে রাখে। কিন্তু যে ব্যক্তি বলবে আমার রাজ্য ও সম্পদের কোন প্রয়োজন নেই, এ সব আমার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নয়, আমার কাজ হল আল্লাহ তাআলার নামকে সর্বাধিক উঁচু করে রাখা, এর জন্য চেষ্টা করা। আমার প্রাণ, আমার সম্পদ, আমার পরিবার-পরিজন, জ্ঞাতি-গোষ্ঠী সবই এজন্য উৎসর্গীকৃত। এ আদর্শের উপর যার জীবন অতিবাহিত হবে, তার জীবনও হবে সম্মানজনক, যদি মৃত্যু হয় তাও হবে সম্মানজনক। মানুষকে সম্মানজনক জীবনযাপনের জন্য আল্লাহর প্রতিনিধি করে পৃথিবীতে প্রেরণ করা হয়েছে; অপদস্ত, লাঞ্ছিত হওয়ার জন্য প্রেরণ করা হয়নি। জনাব রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সবচেয়ে বড় ইবাদতকারী ও সবচেয়ে বড় প্রতিনিধি ছিলেন। তিনি যেমন নবীগণের সর্দার ছিলেন অদ্রূপ এ উম্মতকে সকল উম্মতের সর্দার বানানো হয়েছে। তাদেরকে 'সর্বোত্তম উম্মত' ও 'সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মত' বলা হয়েছে। কিন্তু এ শ্রেষ্ঠত্ব কিসের ভিত্তিতে? পানাহার ও ধন-দৌলতের ভিত্তিতে নয়। এজন্য তাকে 'শ্রেষ্ঠ উম্মত' উপাধিতে ভূষিত করা হয়েছে যে, এ উম্মত পৃথিবীর অন্যান্য জাতি ও সম্প্রদায়ের সংশোধন করবে, তাদরে ত্রুটিসমূহ দূর করবে। তারা যদি পৃথিবীর বিভিন্ন জাতির অনুসরণ-অনুকরণ করে, তাদের ত্রুটিগুলো নিজেদের মধ্যে প্রতিপালন করে, তবে তারা কিভাবে অন্যের সংশোধন করবে? এর ফলাফল তো এই দাঁড়াবে যে, অন্যান্য জাতি তাদের উপর প্রাধান্য বিস্তার করবে; মুসলমানগণ প্রভাবশালী হতে পারবে না। তারা মাত্র একটি জিনিস দ্বারা প্রাধান্য বিস্তার করতে সক্ষম হবে। আর তা হল এই– আল্লাহর কালিমাকে সমুন্নত রাখার জন্য তারা সর্বশক্তি উৎসর্গ করবে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেনঃ 'তোমরা অন্যান্য জাতির উপর সম্পদ দ্বারা বিজয়ী হতে পারবে না, সম্পদ অন্যদের নিকট অধিক রয়েছে। সংখ্যাধিক্যেও তোমরা বিজয়ী হতে পারবে না, বাতিলপন্থীদের সংখ্যা সর্বদাই অধিক ছিল। তোমারা যদি বিশ্বের বুকে বিজয়ী হও, তবে তা হতে পারবে একমাত্র মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আখলাকের মাধ্যমে, কর্মের মাধ্যমে। দীনকে উদ্দেশ্য করে অগ্রসর হলে বিজয়ী হতে পারবে। এজন্যই তোমাদের নিকট সর্ববৃহৎ সম্বল হল দীন, এর চেয়ে বড় কোন সম্বল নেই।' কারো সাথে বিতর্ক করতে গিয়ে আপনি যদি বলেন, আমার

বিবেক-বুদ্ধি বলছে এই, তবে অন্যজন বলবে আমার বিবেক-বুদ্ধি তোমার চেয়ে বেশি, আমার বিবেক-বুদ্ধি বলছে এই। আর যদি আপনি বলেন, আমি যা বলছি তা হল আল্লাহর হুকুম, আমরা হলাম তার গোলাম, আমাদেরকে এ নির্দেশ পালন করতেই হবে। তাহলে তার দ্বারা বিশ্বের সকল জাতি নীরব হয়ে যাবে। কেননা এর উপর আর কোন দলিল-প্রমাণ নেই। এরপর থাকে শক্তি সামর্থ্যের প্রশ্ন। সে ক্ষেত্রে জাতির হাতে আল্লাহর নাম রয়েছে এবং যারা পৃথিবীতে আগমনও করেছে আল্লাহর প্রতিনিধি হয়ে, সে জাতি দলিল-প্রমাণেও প্রবল হবে এবং পরিণামেও বিজয়ী হবে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নবুওয়াত লাভের পর খোদায়ে রব্বানী প্রতিষ্ঠার কাজ শুরু করলেন এবং ইসলামের দাওয়াত দিতে লাগলেন, তখন সমস্ত মক্কাবাসী, হিজায ও সমস্ত জাতি তার শত্রু হয়ে দাঁড়াল। প্রিয়জন ও নিকতাত্মীয়ের সকলেই শত্রু ছিল। মাত্র তিন ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করলেন- বয়স্কদের মধ্যে হযরত আবু বকর সিদ্দিক রা., মহিলাদের মধ্যে হযরত খাদীজাতুল কুবরা রা. এবং যুবকদের মধ্যে হযরত আলী রা.। এছাড়া সম্পূর্ণ খান্দান শত্রু। কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন পরোয়া করেনি। সম্পূর্ণ দৃঢ়তার সাথে এ কালিমাকে নিয়ে অগ্রসর হয়েছেন। তখন শক্তি-সামর্থ্য ছিল মক্কাবাসীদের নিকট। সংখ্যায় তারা ছিল অধিক। যখন মুসলমানের সংখ্যা তের জনে উন্নীত হল, তখন দারে আরকামে ভিতর দিয়ে দরজা বন্ধ করে নামায পড়া হত। ভয়ের কারণে তারা বাইরে বের হতে পারতেন না। নিঃস্বতা ও দারিদ্র্যের অবস্থা এমন ছিল যে, হযরত আম্মার বিন ইয়াসির রা. বলেন, আমরা দারে আরকামে অবরুদ্ধ ছিলাম। রাত বারটায় আমি প্রস্রাব করার জন্য বাইরে বের হলাম। সাফা পাহাড়ে বসে প্রস্রাব করলাম। প্রস্রাব পড়ে এমন একটি শব্দ হচ্ছিল, যেন কাগজের উপর পড়ছে। আমি প্রস্রাব করা শেষ করে দেখলাম একটি চামড়ার টুকরার ওপর প্রস্রাব পড়েছিল তাই অমন আওয়াজ হচ্ছিল। আমি চামড়ার টুকরা উঠিয়ে নিলাম এবং পানি দ্বারা ধুয়ে পাক করলাম। কয়েক বেলার অনাহারী ছিলাম তাই এ চামড়ার টুকরাটি মুখে পুরে নিলাম। এতে এতটুকু সান্ত্বনা জুটল যে, কিছু একটা খাচ্ছি। এ ছিল তাদের অভাব ও দারিদ্র্যের অবস্থা। তো মুসলমানদের সংখ্যা মাত্র তের আর মক্কার মুশরিকদের সংখ্যা বহুগুণ বেশি। অভাবের অবস্থা এমন চরমে যে, খাবারের জন্যও কিছু মিলছে না। সকল ধন-সম্পদ মক্কাবাসীদের হাতে। এতসব সত্ত্বেও জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য এই ছিল যে, আমরা চাই নিঃশেষ হয়ে যাই বা থাকি- এ কালিমাকে সমুন্নত করতেই হবে। তের বছর পর সম্পূর্ণ মক্কা ও পুরো হিজায ইসলামে প্রবেশ করল। যে জাতি সংখ্যালঘু ছিল তারা সংখ্যাগরিষ্ঠে পরিণত

হল। যে জাতি ছিল সম্পূর্ণ প্রভাব-প্রতিপত্তিহীন, সকল প্রভাব-প্রতিপত্তি তাদের হাতে এসে গেল। যে জাতি ছিল বাঘের মত, তারা এঁদের সামনে মাথা নত করে দিল। আল্লাহ তাআলার নাম নিয়ে যারা ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং তাদের মধ্যে যদি ধৈর্য ও দৃঢ়তা থাকে তাহলে দুনিয়ার অন্যান্য জাতি তাদের সামনে মাথা নত করে দেয়। অন্যান্য জাতির সম্পদ ও সম্মান ছিনিয়ে নেয়া আমাদের প্রয়োজন নেই বরং আল্লাহ তাআলার নাম সর্বত্র পৌঁছিয়ে দেয়া আমাদের কর্তব্য। চাই আমাদের মৃত্যু আসুক, তবু এ কালিমা কবুল করব। আমরা যদি এভাবে চলতে পারি তবে পৃথিবীর অন্যান্য জাতি আমাদের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকবে।

হাদীসে বলা হয়েছে– আল্লাহ বলেন, যখন কোন জাতি আমার বিধানকে অমান্য করে পাপ কাজে লিপ্ত হয়ে পড়ে তখন অন্যান্য জাতির অন্তরে তাদের প্রতি ঘৃণা ও শত্রুতা সৃষ্টি করে দেই, তারা তাদেরকে নির্যাতন করে। ঐ জাতিগুলো প্রকৃতপক্ষে আমার পক্ষ হতে জল্লাদের ভূমিকায় দাঁড়িয়ে যায়। আল্লাহ তাআলা বলেন, তোমরা যদি এ কথা পছন্দ না কর যে, অন্যান্য জাতি তোমাদের উপর প্রাধান্য লাভ করুক এবং তোমাদেরকে শাস্তি দিক তাহলে ঐ শাসকদেরকে মন্দ বল না; আমার সাথে সম্পর্ক ঠিক করে নাও। আমি তাদের অন্তরে শত্রুতার পরিবর্তে বন্ধুত্ব সৃষ্টি করে দেব। আজ যারা তোমাদেরকে ঘৃণা করে কাল তারা তোমাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়বে। শত্রুতার পরিবর্তে তোমাদের খাদেম হয়ে যাবে। কলব তো আল্লাহর হাতে রয়েছে। যখন মানুষ আল্লাহর প্রতিনিধি হয়ে তাঁর কাজ করার জন্য অগ্রসর হবে তখন বিশ্ববাসী তার শত্রুতায় লেগে থাকার কোন কারণ থাকতে পারে না। একদিন না একদিন শত্রুতা ত্যাগ করতে হবে। কিন্তু শর্ত হল একটি, কারো ক্ষমতা বা সম্পদ হরণ করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়, কোন সম্প্রদায়ের সাথে আমাদের হিংসা নেই, আমরা তো শুধু এই চাই– নেক্কার ও সালেহ হয়ে যাও। এ বিষয়ে আমরা প্রোগ্রাম পেশ করব, আর প্রোগ্রাম তখনই পেশ করতে পারব যখন নিজে সম্পূর্ণভাবে আমল করব। আমরা নমুনারূপে নিজেকে উপস্থাপন করব। যদি আমরা বলি একরকম আর কাজ করি অন্য রকম, তাহলে বিশ্ব কখনো আমাদের কথা মানবে না। বলার প্রয়োজন নেই, করে দেখানো প্রয়োজন। দুনিয়া মাথা নত করে দেবে।

চারিত্রিক শক্তিতেই মানুষ উন্নত হতে পারে

সাহাবায়ে কেরাম রা. যখন হিন্দুস্তানে আগমন করলেন, তখন সর্বপ্রথম সিন্ধু প্রদেশে প্রবেশ করলেন । ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন, যখন সাহাবীগণ সিন্ধুর বাজার দিয়ে হেঁটে যেতেন তখন তাঁদের চেহারা দেখে হাজারো মানুষ ইসলাম গ্রহণ করেছেন এবং বলেছেন, এসব চেহারা মিথ্যাবাদীদের হতে পারে না।

তাঁদের চেহারা হতে সততা বিচ্ছুরিত হচ্ছে। তাঁদের কার্যকলাপ, তাঁদের চেহারা-সুরত সবকিছু ছিল ইসলামের মুবাল্লিগ, ইসলামের প্রচারক। আর আমরা আমাদের কার্যকলাপ দ্বারা বিশ্বের বিভিন্ন জাতি-সম্প্রদায়ের অন্তরে ইসলামের প্রতি ঘৃণার সৃষ্টি করছি। তারা আমাদের আমল দেখে ইসলামকে বুঝতে চায়। তারা যখন আমাদের কার্যকলাপ দেখে তখন বলে, এমন ইসলামের প্রতি সালাম। একে গ্রহণ করার কী প্রয়োজন? তাহলে আমরা ইসলামের কেমন মুবাল্লিগ হলাম? আমরা তো বরং প্রচারে প্রতিবন্ধকতা আরোপ করছি। কাজেই আমাদের জন্য আবশ্যক হল, সর্বপ্রথম নিজেদের আমলী জিন্দেগীকে ঠিক করে নেব। ইলম, তালিম ও ইসলামী আমল সম্পর্কে অবগত হব। অজ্ঞতা দ্বারা কোন জাতি উন্নতি ও সমৃদ্ধি লাভ করতে পারে না। মানুষের উন্নতি ও সমৃদ্ধির প্রথম সোপান হল ইলম ও জ্ঞান। তাই শিক্ষা ও চরিত্র গঠন উভয়ই আবশ্যক। ধৈর্য, সহনশীলতা, গাম্ভীর্য, লজ্জা, আত্মাভিমান, ভ্রাতৃত্ববোধ ও খেদমতের আগ্রহ– এ জাতীয় গুণাবলি আমাদের মধ্যে থাকতে হবে। যখন আমলের সাথে সাথে এসব গুণাবলি বিদ্যমান থাকবে তখন সে জাতি অপদস্থ, লাঞ্ছিত ও পশ্চাদমুখি থাকতে পারে না। ইলম ও আখলাক, জ্ঞান ও চরিত্র এমনই একটি শক্তি যা মানুষকে নিম্নগামী হতে দেয় না, অপদস্থ হতে দেয় না বরং তাকে সম্মানের উচ্চ আসনে সমাসীন করে। যখন এ শক্তি লোপ পায় তখন কোন জিনিসই মানুষকে উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত রাখতে সক্ষম হয় না। যেমন ফুটবলের ভিতর বাতাস ভর্তি থাকে, একে যদি আপনি মাটির উপর সজোরে নিক্ষেপ করেন তবে তা ঊর্ধমুখি উঠবে। কারণ এই, এর ভিতর বাতাস ভর্তি রয়েছে। বাতাস নিচে থাকতে পারে না, বলকেও নিচে থাকতে দিবে না। কিন্তু যদি বাতাস বের করে দেয়া হয়, তবে বল নিষ্ক্রিয় ও স্থির হয়ে মাটিতে পড়ে থাকবে। একজন মুসলমানকেও ফুটবলের ন্যায় মনে করুন, যতক্ষণ তার ভিতর দীন, ইলম ও নৈতিকতার হাওয়া পূর্ণ থাকবে, যদি কেউ তাকে মাটিতে নিক্ষেপও করে তবু সে ঊর্ধ্বেই যাবে। আর যদি তার ভিতর থেকে এ শক্তি বেরিয়ে যায় তখন যার ইচ্ছা তাকে চপেটাঘাত করতে, অপমান-অপদস্থ করতে পারবে; নিম্নে নিক্ষেপ করতে পারবে। বাতাসের শক্তি তো তার ভিতর নেই। কাজেই ঐ বাতাসই ভিতরে সঞ্চয় উচিত যা দ্বারা দেহে শক্তি সৃষ্টি হয়। রূহ থেকে মানুষের মধ্যে শক্তি আসে। অপরদিকে রূহের মধ্যে শক্তি আসে ইলম ও আখলাকের মাধ্যমে। এ দ্বারাই মানুষের খেলাফতের উচ্চাসন অর্জিত হয় এবং এর দ্বারাই ইবাদতের আগ্রহ সৃষ্টি হয়। কোন জিনিস দ্বারা যদি তার উদ্দিষ্ট লক্ষ্য পূর্ণ না হয় তবে তার অস্তিত্বই অর্থহীন হয়ে যায়। যেমন মনে করুন মাদ্রাসা; মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য হল শিক্ষা। কোন মাদ্রাসায় যদি শিক্ষাই না থাকে তবে সে

মাদ্রাসাটি হবে অর্থহীন। বাড়ি তৈরির উদ্দেশ্য হল বসবাস করা, যদি বাড়িতে বসবাসই করা না যায়, তবে এ বাড়ি নির্মাণের উপকারিতা কোথায়? বাজার প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য হল এখানে প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রী পাওয়া যাবে, যদি তাই পাওয়া না যায় তবে বাজার প্রতিষ্ঠা করাই অনর্থক হল। মানব জাতি সৃষ্টির উদ্দেশ্য হল ইবাদত ও খেলাফত। যদি এ উদ্দেশ্য পূরণ না হয়, তবে এ মানুষ গুলি করে হত্যা করার যোগ্য। আর যদি উদ্দেশ্য পূর্ণ করতে থাকে তবে সে তার জীবনকে অর্থবহ করে তুলল।

আল্লাহর কালিমাকে সমুন্নত রাখাই মুসলিম জীবনের উদ্দেশ্য

পৃথিবীর বিভিন্ন জাতি-সম্প্রদায়ের জীবনের উদ্দেশ্য ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। কারো উদ্দেশ্য ধন-দৌলত, কারো পানাহার, কারো ক্ষমতা লাভ। ইসলাম ও মুসলমানের উদ্দেশ্য হল 'ইলায়ে কালিমাতুল্লাহ' অর্থাৎ আল্লাহর দীনকে সমুন্নত ও প্রতিষ্ঠিত করা। আমি থাকি বা না থাকি– আল্লাহর নাম থাকবে সর্বোচ্চ শিখরে। আমি তাঁর প্রতিনিধি হয়ে এসেছি। আমি তাঁর নামের প্রচারক মাত্র। যে পর্যন্ত আল্লাহর নাম প্রচার করতে থাকবেন, আল্লাহর হুকুমতের ছায়া আপনাকে ঘিরে রাখবে। যখন এ কাজ আপনি ত্যাগ করবেন, আপনারও শক্তি-সামর্থ্য নিঃশেষ হয়ে যাবে।

আপনারা দেখে থাকবেন, বাদশাহ যখন কোন আইন জারি করেন, তখন আইনটি প্রথমে গভর্ণরদের নিকট প্রেরণ করেন। গভর্ণর কমিশনারদের নিকট পাঠিয়ে দেন। কমিশনার ডিস্ট্রিক কমিশনারদের নিকট দিয়ে দেন। তিনি প্রতি থানায় তহশীলদারদের নিকট পৌছিয়ে দেন। তহশীলদার আইনটি বা বাদশাহর নির্দেশ পেয়ে ঢুলিকে তলব করেন, তার গলায় ঢোল ঝুলানো থাকে, তাকে বলা হয় এ আদেশটি ঘোষণা করে দাও। ঢুলির কী মূল্য, কী এমন মর্যাদা? তার বেতন খুব সাধারণ। কিন্তু যখন সরকারের আদেশ প্রচার করতে থাকে, তখন সরকারের সম্পূর্ণ শক্তি তার পেছনে থাকে। যদি আপনি জোরপূর্বক তার গলা থেকে ঢোলটি নিয়ে যান কিংবা তাকে প্রহার করেন, তখন আপনার বিরুদ্ধে সরকারবাদী মোকদ্দমা হবে। এ হল প্রকৃত পক্ষে সরকারের অবমাননা। কাজেই মামলা হবে সরকারবাদী। এখানে ঢুলির কোনও শক্তি নেই, শক্তি সরকারের। যখন একজন মুসলমান প্রচারক হয়ে যাবে, আল্লাহর দীনের ঢুলি হয়ে প্রচার কার্য চালাবে, তাঁর আইনকানুন ঘোষণা করতে থাকবে, এ অবস্থায় যদি কেউ তাকে অপমান করে, অপদস্থ করে, তখন সে যেন আল্লাহর রাজ্যকে, রাজশক্তিকে অপমান ও অপদস্থ করল। আল্লাহ তাআলার সাহায্য আমাদের সাথে থাকবে,

তারা আমাদেরকে অপমান-অপদস্থ করতে পারবে না, আমাদের দিকে চোখ তুলে তাকাতেও সাহস পাবে না। তবে আমরা যদি নিজেদেরকে উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত করতে পারি, তবেই কেবল আমরা মর্যাদাবান হব। আমাদেরকে যদি কেউ অপদস্থ করতে চায়, তবে যেহেতু আমাদের ভিতর আল্লাহ প্রদত্ত রূহ ও শক্তি রয়েছে, সেহেতু আমাদেরকে অপদস্থ করতে সক্ষম হবে না বরং আমরা আরো বেশি উর্ধ্বাগমনে সক্ষম হব এবং মর্যাদার উচ্চ শিখরে আরোহন করব। সুতরাং আমাদেরকে ঐ কাজ করতে হবে যা দ্বারা আমাদের ভিতরে শক্তি তৈরি হয়। দীন, ইসলাম, ঈমান, খেলাফত ও রূহানিয়াত দ্বারা আমাদের শক্তি অর্জিত হবে। অস্ত্রসস্ত্র, ধনসম্পদ ও দালান-কোঠা দ্বারা আমাদের শক্তি অর্জিত হবে না। আমাদের শক্তির উৎস তো আল্লাহর নাম, আল্লাহর কাজ। আমি যে আয়াত তিলাওয়াত করেছি তাতে জীবনের দু'টি উদ্দেশ্য ব্যক্ত হয়েছে– ইবাদত ও খেলাফত। ইবাদতের কথা বর্ণিত হয়েছে এভাবে– يٰبُنَيَّ أَقِمِ الصَّلٰوةَ হে বৎস! নামায কায়েম কর। [লোকমান : ১৭]

হযরত লোকমান আ. তাঁর সন্তানকে উদ্দেশ্য করে এ কথা বলেছেন। নামাযই হল প্রকৃত ইবাদত। এর অর্থ হল আল্লাহ তাআলার ইবাদতগুজার বান্দা হয়ে যাও। আল্লাহর সামনে নিজেকে হীন ও অপদস্থরূপে উপস্থাপন কর, এতেই রয়েছে তোমার জন্য ইজ্জত, মর্যদা ও উচ্চাসন। এ হল ইবাদতের কর্তব্য, যা সর্বাধিক প্রকাশ পায় নামায দ্বারা।

দ্বিতীয় পর্যায়ে বলা হয়েছে–

وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوْفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ

সৎ কাজের আদেশ কর এবং অসৎ বা গর্হিত কাজে নিষেধ কর।

অর্থাৎ পৃথিবীতে নেক কাজের বিস্তার কর এবং অন্যায়কে প্রতিহত কর। পৃথিবীবাসীর মধ্যে ভাল কাজের অভ্যাস গড়ে তোল এবং খারাপ কাজ থেকে ফিরিয়ে রাখ। অশ্লীলতা ও লজ্জাহীনতা নির্মূল কর। দুনিয়া হতে বেহায়াপনা ও নির্লজ্জতার অবসান ঘটাও। লাজ-লজ্জা, জনসেবা, দানশীলতা, ভদ্রতা, বীরত্ব ইত্যাদি গুণাবলির প্রচার-প্রসার কর, যেন আল্লাহর ইবাদত বিস্তার লাভ করে এবং খোদাদ্রোহিতা শেষ হয়ে যায়। একেই 'আমরু বিল মারুফ ও নাহী আনিল মুনকার' বলা হয়েছে। এর অর্থ হল সৎ ও নেক কাজের আদেশ করা, অসৎ ও মন্দ কাজে নিষেধ করা। প্রকৃতপক্ষে এগুলো হল স্বয়ং আল্লাহ তাআলার কাজ। তিনিই সৎ কাজের আদেশ প্রদানকারী ও অসৎ কাজে নিষেধ প্রদানকারী। কিন্তু তিনি মানব জাতিকে এ মর্মে তাঁর প্রতিনিধি সাব্যস্ত করেছেন যে, তোমরা আমার

পক্ষ থেকে 'আমরু বিল মারুফ ও নাহী আনিল মুনকার' কর। সুতরাং এ দ্বারা মানুষের খেলাফত বা প্রতিনিধিত্ব প্রমাণিত হল।

যেমনিভাবে কুরআনে বিবৃত হয়েছে–

اَلَّذِيْنَ إِنْ مَّكَّنّٰهُمْ فِى الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ وَأَمَرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ط وَ لِلّٰهِ عَاقِبَةُ الْأُمُوْرِ○

তারা এমন লোক যাদেরকে আমি পৃথিবীতে শক্তি-সামর্থ্য দান করলে তারা নামায কায়েম করবে, যাকাত দেবে এবং সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ করবে। প্রত্যেক কর্মের পরিণাম আল্লাহর এখতিয়ারভুক্ত। [হজ : ৪১]

অর্থাৎ যদি মুসলমানদেরকে শক্তি, রাজত্ব ও শাসন ক্ষমতা দান করি, তবে এর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হবে আল্লাহ ও তাঁর দীনের মুখপাত্ররূপে কাজ করবে, উপাদেয় খাদ্যে নিজের উদরপূর্তি ও স্বার্থসিদ্ধি উদ্দেশ্য হবে না। নামাযকে প্রতিষ্ঠিত করার ব্যবস্থা করবে। সদকা উসুল করে সুষ্ঠুভাবে বণ্টন করবে। সৎ কাজের আদেশ করবে, ন্যায় ও সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করবে এবং মন্দ ও খারাপ কাজকে প্রতিহত করবে।

বোঝা গেল রাজত্ব প্রদানের মূল উদ্দেশ্য হল 'আমরু বিল মারুফ'-এর ব্যবস্থা করা এবং মন্দ ও গর্হিত কাজকে পৃথিবী থেকে দূরিভূত করা। এরই নাম হল খেলাফত বা প্রতিনিধিত্ব।

ত্যাগের মাধ্যমে পৃথিবীতে মতাদর্শের বিস্তার ঘটে

এ কথা স্পষ্ট যে, মুসলিম জাতি যখন 'আমরু বিল মারুফ' ও সদোপদেশ দেয়ার আদর্শ নিয়ে অগ্রসর হবে তখন সকল বিশ্ববাসী তা গ্রহণ করে নেবে না। কেউ কেউ বন্ধু হয়ে এগিয়ে আসবে, কেউ কেউ শত্রুতে পরিণত হবে। মুবাল্লিগের বিরোধিতায়ও লিপ্ত হবে, ভালমন্দও বলবে। স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে কত বেয়াদবী ও অশালীন আচরণ করা হয়েছে। এ দায়িত্ব পালনে সবর, ধৈর্য, উন্নত মানসিকতা ও উত্তম আখলকের প্রয়োজন হয়। তাই আয়াতের পরবর্তী অংশে বলা হয়েছে–

وَاصْبِرْ عَلٰى مَا أَصَابَكَ

এ পথে যত মসিবত আসবে তা বরণ করে নেয়ার অভ্যাস করুন এবং নিজের মধ্যে সবর ও ধৈর্যের গুণ তৈরি করুন।

যে জাতির মধ্যে সবর ও সহ্যক্ষমতার গুণ সৃষ্টি হয়ে যায় সে জাতি সফলকাম হয়। যদিও প্রাথমিক অবস্থায় তাদের দুঃখ-কষ্ট হবে কিন্তু কিছুদিন পর বিজয় তাদেরই হবে। যাই হোক, আয়াতে তিনটি বিষয় বর্ণিত হয়েছে– ইবাদত, খেলাফত ও আখলাক। অর্থাৎ সহ্য ক্ষমতা, ধৈর্য ক্ষমতা ও সাহসের দৃঢ়তা থাকতে হবে। কোন ব্যক্তি যদি এমন হয় যে, সামান্য কথায় নিজের উপর নিজের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে লেফে, কেউ গালাগাল করলে তার সাথে লড়াই করতে প্রস্তুত হয়ে যায়, কেউ আঙ্গুল দিয়ে ইশারা করলেও তাকে ঘুষি দেখাতে প্রস্তুত হয়ে যায়– এমন ব্যক্তি কখনো কাজ করতে পারে না। কাজ করতে পারবে ঐ ব্যক্তি, যাকে হত্যার হুমকি দেয়া হয়েছে, ধন-সম্পদ ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে, গোলামীর ধমকী দেয়া হয়েছে কিন্তু সে এসবের কোন পরোয়া করে না। সে মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে, এসব কিছু আমার উদ্দেশ্য নয়, আমার উদ্দেশ্য হল আল্লাহর নামকে সমুন্নত করা। অনাহারে কষ্ট দাও আর যাই কর, আমাকে সামনে এগিয়ে যেতেই হবে। এমন ব্যক্তি কখনো অকৃতকার্য হতে পারে না।

এ জন্যই এ আয়াতের ব্যাখ্যায় আমি এ তিনটি কথা আরয করলাম– এক. ইবাদত শুদ্ধ ও সঠিক হতে হবে। দুই. প্রতিনিধিত্বের জযবা ও আবেগ থাকতে হবে। তিন. আখলাক ও কর্মকাণ্ড সঠিক হতে হবে। তখনই কেবল জাতির জীবন গঠিত হবে। যদি ইবাদত ও খেলাফতের জযবা না থাকে, নৈতিক চরিত্র উৎকর্ষিত না হয়, তবে এ জাতি কি করে টিকে থাকবে?

রুটি-রুজির নাম জীবন নয়, জীবন হল মানুষের নৈতিক উৎকর্ষ সাধনের নাম, উন্নত রীতিনীতি ও মঙ্গলময় কার্যক্রমের নাম। এসব যদি থাকে তবে বলা যাবে, এ জাতি সজীব রয়েছে, এদের মধ্যে প্রাণস্পন্দন ও কর্মতৎপরতা রয়েছে। বিশ্বে আজ যেসব জাতি অগ্রগতি ও সমৃদ্ধি অর্জন করছে, তা পানাহারের উন্নতি দ্বারা করছে না। এগুলো তো হল সমৃদ্ধির নিদর্শন মাত্র, যা এমনিতেই এসে যায়। মূল হল আদর্শ কর্মতৎপরতা। যে জাতি কোন আদর্শকে সামনে রেখে কর্মতৎপর হয় এবং এ আদর্শের জন্য সবকিছু উৎসর্গ করে তারাই সমৃদ্ধি লাভ করবে এবং উন্নতির উচ্চ শিখরে পৌছবে। যদি আমাদের কোন উদ্দেশ্য ও আদর্শ না থাকে, শুধু আহার-নিদ্রায় জীবন অতিবাহিত করি তবে এগুলো জীবনের উদ্দেশ্য হতে পারে না। যদি এই হয় জীবনের আদর্শ তবে এ উদ্দেশ্য ও আদর্শ সকল প্রাণীর মধ্যেই রয়েছে। তাহলে মানব সৃষ্টির আবশ্যকতা কী ছিল?

বিশেষ কামালিয়াত নিয়ে মানুষের আবির্ভাব হয়েছে। মানুষ পরিপূর্ণ ও স্বয়ংসম্পূর্ণ এ পরিমাণ যে, স্রষ্টা ও সৃষ্টির সকল গুণাগুণ ও কামালাতের নমুনা তার মধ্যে বিদ্যামান রয়েছে। কিন্তু মানুষ খাদ্যদ্রব্য ও পানাহারকে তার জীবনের

একমাত্র উদ্দেশ্য সাব্যস্ত করে নিয়েছে। এত উঁচু স্বভাব-প্রকৃতি নিয়ে আগমন করল অথচ জীবনের উদ্দেশ্য স্থির করল এত নিম্নমানের যা প্রতিটি পশুপক্ষি, গ্রামীজগতের সকলের জন্য উন্মুক্ত রয়েছে।

মানুষ যেমন স্বয়ংসম্পূর্ণ, পূর্ণাঙ্গ ও মহান জীব তদ্রূপ তার জীবনাদর্শ, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য উঁচু মানের ও উঁচু স্তরের হওয়া কর্তব্য। আর সে মহান উদ্দেশ্য হল আল্লাহর ইবাদত। অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার প্রকৃত বন্দেগী। আল্লাহর নামের উপর সর্বস্ব বিলিয়ে দেয়ার, উৎসর্গ করার মন-মানসিকতা এবং আবেগ ও স্পৃহা। অন্যদিকে তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে সম্পূর্ণ বিশ্বের সর্বত্র তাঁর পয়গাম পৌছিয়ে দেয়ার দায়িত্ব আদায় করা। এ উদ্দেশ্য সাধনে এত দৃঢ় ও অটল থাকা যে, পথিমধ্যে যতই কষ্ট ও শ্রম হোক না কেন, পথ যতই দুর্গম ও কণ্টকাকীর্ণ হোক না কেন, তা হাসিমুখে ও প্রশস্ত চিত্তে বরণ করে নেয়ার জন্যে সদা প্রস্তুত থাকা। এরূপ ব্যক্তি দ্বারা জাতি ও সমাজ সর্বদা মর্যাদার উন্নত শিখরে অবস্থান করে থাকে। চিন্তা করলে দেখা যাবে, আমি যে তিনটি জিনিসের কথা বলেছি এ তিনটিই হল জাতীয় উন্নতি ও সমৃদ্ধির মূলমন্ত্র ও চাবিকাঠি। ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ আর অনেক শিক্ষা ও গবেষণা দ্বারা এসব স্থিরিকৃত হবে, তবে নীতিগতভাবে এ তিনটিই হল মৌলিক বিষয়। যেগুলো দ্বারা বিশ্বের জাতিসমূহ উন্নতি ও সমৃদ্ধি লাভ করে। প্রথম নীতি হল সত্যিকারের কর্মীবাহিনী; দ্বিতীয় হল সৎ, কর্মক্ষম ও প্রাজ্ঞ খলীফা বা পরিচালক, তৃতীয় হল নীতি নৈতিকতা, চারিত্রিক উৎকর্বতা এবং উন্নত আদর্শ। এ তিনটি মৌলিক উন্নতি দ্বারা ইনশাআল্লাহ জাতীয় উন্নতি ও সমৃদ্ধি অর্জিত হবে।

এ আয়াতে যদিও শব্দ রয়েছে মাত্র দু'-তিনটি, কিন্তু এ আয়াত অত্যন্ত ব্যাপক বিস্তৃত প্রোগ্রাম প্রদান করেছে। আল্লাহর কালামেই রয়েছে এ বিশেষত্ব। এটা আমার আপনার কথা নয়, আল্লাহ তাআলার কথা। দু'টি শব্দ বলা হয় এবং তাতেই ইলম ও জ্ঞানের সাগর ভরে দেয়া হয়। সাধ্যানুযায়ী গভীরে যেতে থাক এবং জ্ঞানের মোতি-মণিমাণিক্য আহরণ করতে থাক। এ জন্যই কুরআনকে বুঝিবা বলা হয়েছে। সাগরে যেমন অসংখ্য মণি-মাণিক্য ও নানাবিধ মূল্যবান জহরত ছড়িয়ে রয়েছে, কিন্তু সেগুলো তুলতে হলে কোন ডুবুরী থাকতে হবে। যার শ্বাস দীর্ঘ রয়েছে, যে ব্যক্তি ডুব দিয়ে সমুদ্রের তলদেশে যেতে সক্ষম কেবল সে ভাগ্যবান ব্যক্তিই মণিমাণিক্য আহরণ করতে পারে। যার শ্বাস নিঃশেষ হয়ে যায় পথিমধ্যে, সে মণিমাণিক্য আহরণ করা তো দূরের কথা, পথিমধ্যে তার জীবন প্রদীপই নির্বাপিত হয়ে যাবে। যে ব্যক্তি সাঁতার কাটতে জানে না, সে যদি যায় তবে জীবন নিয়ে আর ফিরে আসতে পারবে না। সমুদ্রে ঝাঁপ দেয়ার পূর্বে

সাঁতার কাটা শিখতে হবে। সে তখনই কেবল মণিমাণিক্য আহরণে সমর্থ হবে। কুরআনও একটি সাগর-মহাসাগর। এতে সাঁতার কাটার পূর্বশর্ত হল শিক্ষা গ্রহণ করা। প্রয়োজনীয় জ্ঞানার্জনের পর মানুষ যখন এ সাগরে ঝাঁপ দিবে, ডুব দিবে এবং তলদেশে প্রবেশ করবে, তখন শতসহস্র জ্ঞান ও ইলমের মণিমাণিক্য আহরণ করে নিয়ে আসবেন।

কুরআনকে মুজিযা বলার সার হল এই– আল্লাহ তাআলা একটি শব্দ বলেন, আর এ শব্দের মধ্যে এত অধিক জ্ঞান থাকে, যেন বিন্দুর মধ্যে হাজারো জ্ঞান-সিন্ধু ভরে দেয়া হয়েছে। আমি যদি এগুলোর তাফসীর করি, তবে অনেক দিনের প্রয়োজন হবে, অনেক দিন পার হবে কিন্তু তাফসীর তখনও পরিপূর্ণ হবে না। এ কারণেই সংক্ষিপ্তভাবে এ তিনটি মূলনীতি ও উদ্দেশ্য বর্ণনা করে দিয়েছি। এগুলো ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের জন্য দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন। মোটামুটিভাবে এ উদ্দেশ্যকে স্মরণ রেখে নিজ নিজ জীবনের হিসাব নিকাশ নেয়া উচিত– আমরা উদ্দেশ্যের কতটুকু পূর্ণ করছি। অনুসন্ধানে যদি দেখা যায় সে উদ্দেশ্য পূর্ণ হচ্ছে না, তখন দেখতে হবে এর কারণ কী? এগুলো বের করে সংশোধন করা উচিত। এজন্যই আমি তিনটি জিনিস পেশ করেছি। আশা করি আপনারা সময় সময় এ নীতিগুলোর ব্যাপারে চিন্তাভাবনা করবেন এবং নিজ নিজ জীবনের সংশোধন করে নিবেন। আল্লাহ তাআলা আপনাদেরকে কামিয়াব করবেন। এতে রয়েছে শতসহস্র সমস্যার বাস্তব সমাধান। আল্লাহ তাআলা আমাদের তাওফীক দান করুন, আমরা যেন প্রতিপালকের কালাম অনুযায়ী জীবনযাপন করতে পরি। নিজ জীবনকে কুরআন-হাদীসের ছাঁচে সাজাতে পারি। হে আল্লাহ! আমাদেরকে আপনার সন্তুষ্টির অনুযায়ী পরিচালিত করুন এবং আপনার প্রিয় হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পরিপূর্ণ অনুসরণ নসীব করুন। আমীন!

اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وارنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين، برحمتك يا أرحم الراحمين.

বয়ান : ৫

ইখলাস ফিদ্দীন

দীনের প্রতি বিশুদ্ধ আন্তরিকতা

ইহকালীন ও পরকালীন সফলতার জন্য আবশ্যক হল পরিপূর্ণ ইখলাস ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পরিপূর্ণ আনুগত্য। এ দু'টি জিনিসই হল মুক্তির চাবিকাঠি ও সফলতার জিম্মাদার। যিনিই সফলতা লাভ করেছেন, এ পথে চলেই লাভ করেছেন। আর যে ব্যক্তি এ পথ হতে বিচ্যুত হয়েছে, সে গন্তব্যস্থলে পৌঁছতে ব্যর্থ হয়েছে এবং অযথাই জীবনের পুঁজি হারিয়ে ফেলেছে।

–হযরত হাকীমুল ইসলাম রহ.





اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُه وَنَسْتَعِيْنُه وَنَسْتَغْفِرُه وَنُؤْمِنُ بِه وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّاٰتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَّهْدِه اللّٰهُ فَلاَ مُضِلَّ لَه، وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلا هَادِىَ لَه، وَنَشْهَدُ أَنْ لاَّ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَه لاَ شَرِيْكَ لَه، وَنَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَمَوْلاَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُه وَرَسُوْلُه، أَرْسَلَهُ اللّٰهُ إِلىٰ كَافَّـــةً لِّلنَّاسِ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا وَّدَاعِيًا إِلَيْهِ بِإِذْنِه وَسِرَاجًا مُّنِـــيْرًا.

أَمَّـــابَعْدُ:

فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ○ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ○ قُلْ إِنَّنِىْ هَدٰنِىْ رَبِّىْ إِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ۚ دِيْنًا قِيَمًا مِّلَّةَ إِبْرٰهِيْمَ حَنِيْفًا ۚ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ○ قُلْ إِنَّ صَلاَتِىْ وَنُسُكِىْ وَ مَحْيَاىَ وَ مَمَا تِىْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ○ لاَ شَرِيْكَ لَه ۚ وَبِذٰلِكَ أُمِرْتُ وَ أَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ○ الأنعام : ١٦١-١٦٢

সুন্নত অনুযায়ী আমল করার দ্বারা স্বভাবগত কাজও ইবাদতে পরিণত হয়

বুযুর্গানে মুহতারাম!

আল্লাহ তাআলার শুকরিয়া এ কারণে আদায় করছি যে, তাঁর অনুগ্রহে আমরা মুসলমান হতে পেরেছি। এ জন্য আমরা গর্বিত। কিন্তু আমরা কখনো এ বিষয়ে চিন্তা করি না যে, ইসলামের অর্থ কী? তাই আমি স্বল্প সময়ে ইসলামের অর্থ ও সারমর্ম ব্যক্ত করতে চাচ্ছি।

আপনারা 'আদাত' ও 'ইবাদত' শব্দ দু'টি নিশ্চয়ই শুনে থাকবেন। 'আদত' বলা হয় ঐ সমস্ত কাজকর্মকে, যেগুলো আমরা দৈনন্দিন করে থাকি। যেমন– আহার করা, পান করা, বন্ধু-বান্ধবদের সাথে দেখাসাক্ষাৎ করা, পারিবারিক জীবন, সামাজিক জীবন এবং এ জাতীয় আরো যেসব স্বাভাবিক কাজকর্ম রয়েছে এগুলোকে 'আদত' তথা অভ্যাস বা স্বভাবজাত কাজ বলা হয়।

আর উপরোপক্ত কাজগুলোকে সুন্নাত অনুযায়ী সম্পাদন করার নাম হল 'ইবাদত'। আমরা ধারণা করে রেখেছি যে, মসজিদে যাওয়াই ইবাদত, ঘরে থাকা ইবাদত নয়। এ হল অত্যন্ত ভুল ও ভ্রান্ত একটি ধারণা। কেননা আমরা যদি পারিবারিক কাজকর্ম সুন্নাত অনুযায়ী সম্পাদন করি তবে এগুলোই ইবাদতে পরিণত হয়ে যাবে। প্রয়োজন শুধু শুদ্ধ-সঠিক নিয়তের। আমরা রোযা রাখি, যদি কোনো মানুষ নিয়তবিহীন অবস্থায় সম্পূর্ণ দিন উপবাস করে, তবে কোনো প্রকার সাওয়াবের ভাগী হবে না। কিন্তু যদি রোযার নিয়ত করে নেয় তবে সামান্য নিয়তের কারণে এ উপবাস ইবাদত হয়ে যাবে। সুতরাং আমরা যদি যাবতীয় পার্থিব কাজকে দীনি কাজে রূপান্তরিত করে নেই তবে কতই না উত্তম ব্যবসা হবে! আর যদি নিয়তের সামান্য পার্থক্য দ্বারা দীনকে দুনিয়া বানিয়ে ফেলি তবে এ ব্যবসাটি কতই না ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়াবে!

হাদীসে ইরশাদ করা হয়েছে, কেউ যদি বিসমিল্লাহ বলে খানা শুরু করে এবং 'আল হামদু লিল্লাহি কাসিরান' বলে শেষ করে তবে তার পূর্বাপর সকল গুনাহ মাফ হয়ে যায়। শুধু নিয়ত করার কারণে এত বিরাট প্রতিদানের অধিকারী হয়ে গেল যে, দুনিয়ার কাজ তো হলই, সাথে সাথে দীনি কাজও হয়ে গেল। ইসলাম চায় যে, সকল পার্থিব কাজকর্মকে দীনি কাজে রূপান্তর করা হোক। হাদীসে বলা হয়েছে–

السواك مطهرة للفم ومرضاة للرب

মিসওয়াক করা মুখ পরিষ্কার হওয়া এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের মাধ্যম।

সুতরাং মিসওয়াক করা একদিকে দুনিয়াবী কাজ (যখন শুধু দাঁত পরিষ্কার করা উদ্দেশ্য হয়), অপর দিকে আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যম বিধায় তা দ্বীনি কাজও বটে। বহু হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অধিক পরিমানে মিসওয়াক করতেন। নামাযের সময়গুলোতে, তাহাজ্জুদের সময়ে এবং অধিকাংশ সময় স্বীয় বন্ধু-বান্ধবের সাথে আলাপ-আলোচনা শেষে মিসওয়াক করতেন। এমনকি মৃত্যু পীড়ায় আক্রান্ত অবস্থায়ও মিসওয়াকের দিকে দেখছিলেন। হযরত আয়েশা রা. তখন বুঝতে পারলেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিসওয়াক করতে চাচ্ছেন। তিনি মিসওয়াক এনে দিলে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ অবস্থায় মিসওয়াক করলেন।

অতঃপর হযরত আয়েশা রা. নিজে ঐ মিসওয়াক দ্বারা মিসওয়াক করলেন। এরই ভিত্তিতে হযরত আয়েশা রা. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অন্যান্য পবিত্র সহ-ধর্মিনীগণের উপর গর্ব করতেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র লালা আমার গলদেশে প্রবেশ করেছে এবং তাঁর ইন্তেকাল এমনভাবে হয়েছে যে, তাঁর মাথা মোবারক আমার কোলের উপর ছিল।

ইসলামের প্রতিটি কাজ দুইভাবে ক্রিয়াশীল

হযরত আয়েশা রা. জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! কেন আপনি এত অধিক পরিমানে মিসওয়াক করে থাকেন? উত্তরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'ফেরেশতাদের সাথে আমার আলাপ আলোচনা হয়, তাঁরা দুর্গন্ধকে অত্যন্ত ঘৃণা করেন'। (কজেই অধিক পরিমানে মিসওয়াক করি)। এমনিভাবে ইসলামের প্রতিটি আমলের একটি পথ দুনিয়ামুখী ও একটি পথ দীনমুখী হয়ে থাকে।

একবার অসুস্থ উমর রা.কে দেখার জন্য একজন যুবক উপস্থিত হলেন। যখন যুবকটি ফিরে যাচ্ছিল তখন হযরত উমর রা. বললেন, তাকে ডেকে নিয়ে এস। তাকে যখন ডেকে আনা হল তখন তিনি বললেন–

يا أخى ارفع ثوبك فإنه انقى لثوبك وارضى لربك

হে ভাই! তুমি তোমার (পায়ের গোড়ালীর নিচে পরিহিত) পরিধেয় কাপড় উপরে উঠিয়ে নাও। কেননা, এতে কাপড়ও পরিষ্কার থাকে এবং আল্লাহ তাআলাও সন্তুষ্ট হন।

(অতএব, দেখা গেল কাপড়েরর পরিচ্ছন্নতা ও আল্লাহর সন্তুষ্টি উভয়টি এর মধ্যে রয়েছে। আমল একটি কিন্তু এর ভেতর উভয়দিক বিদ্যমান রয়েছে।

মুসলিম শরীফে একটি হাদীস রয়েছে যে, কিয়ামতের দিনে আল্লাহ তাআলা তিন ব্যক্তির দিকে রহমতের দৃষ্টিতে তাকাবেন না। তন্মধ্যে একব্যক্তি হল 'মুসবিল' অর্থাৎ গোড়ালীর নিচে কাপড় পরিধানকারী ব্যক্তি। (গোড়ালীর নিচ পর্যন্ত বস্ত্র পরিধান করা অহংকারের নিদর্শন হওয়ার কারণে তা আল্লাহ তাআলার অসন্তুষ্টির কারণ। এ জন্যই পাজামা, লুঙ্গি প্রভৃতি গোড়ালীর উপরে পরিধান করা আবশ্যক। তাতে কাপড়ও পরিষ্কার থাকে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টিও অর্জিত হয়।) সুতরাং প্রত্যেক আমালের দু'টি দিক রয়েছে। আপনি যে সাওয়াব লাভ করেন তা আপনার সঠিক দৃষ্টিভঙ্গির কারণে হয়ে থাকে। যেমনিভাবে এক হাদীসে বলা হয়েছে–

وفى بضع احدكم صدقة

তোমাদের লজ্জাস্থান ব্যবহারেও সদকার সাওয়াব রয়েছে।

সাহাবায়ে কেরাম আরয করলেন–

ايأتى احدنا شهوته وله فيها اجر؟

আমাদের কেউ যদি তার কাম-স্পৃহা পূরণ করে তাতেও কি সাওয়াব রয়েছে?

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যদি তা অবৈধভাবে করা হত তবে কি গুনাহ হত না? যখন সে হারাম থেকে নিজেকে রক্ষা করেছে, তখন ঐ কাজই তার জন্য ইবাদতে পরিণত হয়েছে। সুতরাং কাম উত্তেজনা দমনেরও দু'টি দিক রয়েছে– এক হল শুধু কাম উত্তেজনা দমন করা আর দ্বিতীয় হল হারাম কাজ থেকে রক্ষা পাওয়ার নিয়তে কাম-স্পৃহা চরিতার্থ করা। এ দিকটি নির্ধারণ করার কারণে তা ইবাদতে পরিণত হয়ে গিয়েছে।

নির্দেশ পালন করাই ইবাদত

মোটকথা হল, যে জিনিস আল্লাহ তাআলার জন্যে নির্দিষ্ট হয় তাই ইবাদত হয়ে যায়। এমনকি কোন কোন গুনাহের কাজও যদি শরীয়ত অনুমেরাদন করে তবে

ও ইবাদত হয়ে যায়। যেমন মিথ্যা বলা যদিও একটি জঘন্যতম গুনাহের কাজ, কিন্তু সন্ধি ও ফিতনা দমন কল্পে (প্রয়োজনে) মিথ্যা বলা ওয়াজিব। এ অবস্থায় একটি গুনাহের কাজ সাওয়াবের কাজের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল। বোঝা গেল কোন কাজ সম্পাদনের নাম ইবাদত নয় বরং আদেশ পালনের নাম হল ইবাদত। (এ কারণেই কোন কাজ সত্তাগতভাবে ইবাদত হওয়া সত্ত্বেও শরীয়তের নির্দেশ বিরুদ্ধ হওয়ার কারণে একে ভ্রান্ত সাব্যস্ত করা হয়। যেমন) যখন নামায পড়ার আদেশ করা হবে তখন পড়া ইবাদত, আর যদি নিষেধ করা হয় তখন নামায ইবাদত থাকে না। যেমন, তিনটি সময়ে নামায পড়া থেকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন, সুতরাং এ তিন সময়ে নামায পড়া হারাম। তদ্রূপ রোযা একটি ইবাদত, কিন্তু যদি রোযা রাখা থেকে নিষেধ করা হয় তখন ইবাদত থাকে না। যেমন ঈদের দিনে রোযা রাখা হারাম। কেননা, এ দিনে রোযা রাখাকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এভাবে সত্য কথা বলা একটি ইবাদত, কিন্তু যদি সত্য বলার কারণে ফিৎনা-ফাসাদ সৃষ্টি হয়ে যায়, তখন সত্য কথা বলাও নাজায়িয। যেমন গীবত করা, যা প্রকৃতপক্ষে সত্যই হয়ে থাকে (কেননা অবাস্তব মিথ্যা বলাকে হাদীসে বুহতান বা অপবাদ বলা হয়েছে)। কিন্তু শরীয়ত এরূপ সত্য বলাকে নিষিদ্ধ করেছে। বোঝা গেল, আদেশ পালন করার নাম হল ইবাদত (কোন বিশেষ কাজ বা কথার নাম নয়), আদেশ প্রদানকারী হয়ে থাকেন স্বয়ং আল্লাহ তাআলা, তিনিই জানেন কোন জায়গায় আদেশ করা উপযোগী। কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেছেন– 'ভূপৃষ্ঠে অহংকারসুলভ পদক্ষেপে চলাফেরা কর না, কেননা অহংকারের সাথে এভাবে চলাচল করে পৃথিবীকে দ্বিখণ্ডিতও করতে পারবে না এবং পর্বতের উচ্চশৃঙ্গেও পৌঁছতে পারবে না।'

এর কারণ হল এই যে, মানুষ হল বান্দা, বন্দেগীর জন্য তার আগমন। তার চালচলনে বন্দেগীই থাকা উচিত। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন–

وَعِبَادُ الرَّحْمٰنِ الَّذِيْنَ يَمْشُوْنَ عَلَى الْاَرْضِ هَوْنًا.

আল্লাহ তাআলার প্রকৃত বান্দা হল তারা, যারা ভূপৃষ্ঠের উপর বিনয়াবনত হয়ে চলাফেরা করে। [ফুরকান : ৬৩]

মোট কথা অহংকারের সাথে চলাফেরা করা থেকে নিষেধ করা হয়েছে। কেননা, এ হল মূর্খতার লক্ষণ। অহংকার সুলভ চালচলন ঐ ব্যক্তির হয়ে থকে, যে তার প্রকৃত অবস্থাকে ভুলে গিয়েছে। এক অহংকারী ব্যক্তি খুব গর্বের সাথে পথ চলছিল, এদিকে এক বুযর্গ ব্যক্তি আসছিলেন, যার পদচারণায় বিনয় ও নম্রতার

প্রকাশ ছিল। ঐ বুযর্গ ব্যক্তি অহংকারীকে বললেন, আরে ভাই! গর্বভরে চলাচল কর না। এ কথা শুনে সে রাগান্বিত হয়ে পড়ল এবং বলতে লাগল তুমি জানো না, আমি কে? সে ব্যক্তি তার ধনসম্পদের গর্বে আত্মহারা ছিল, আর ঐ বুযর্গ তার দরবেশীর উপর আত্মহারা ছিলেন। তিনি বললেন, আমি জানি তুমি কে, তোমার পরিচয় হল এই–

أوّلكَ قطرة وأخرك جيفة :: وانت تحمل بينهما قذرة.

তোমার সূচনা ও সৃষ্টি তো ঐ পানি দ্বারা হয়েছে যা শরীরে লেগে গেলে শরীর নাপাক হয়ে যায়। কাপড়ে লেগে গেলে কাপড় নাপাক হয়ে যায় এবং তা যখন শরীর থেকে নির্গত হয় তখন গোসল ওয়াজিব হয়ে যায়। আর তোমার সমাপ্তিতে গিয়ে তুমি একটি মৃত জীব। এ অবস্থাদ্বয়ের মধ্যবর্তী সময়ে তুমি মলমূত্র বহন করে বেড়াচ্ছ।

তখন সে ব্যক্তি তার প্রকৃত অবস্থা অনুধাবন করতে সক্ষম হল এবং তওবা করে বলল–

جزاکم اللہ کہ چشم باز کردی مرا با جان جاں ہمراز کردی

আল্লাহ তাআলা আপনাকে উত্তম প্রতিদানে ভূষিত করুন। আপনি আমার চক্ষু খুলে দিয়েছেন। আমাকে আমার প্রাণের সাথে মিলিয়ে দিয়েছেন।

মানব সত্তায় কোন উৎকর্ষতা নেই

কামাল বা উৎকর্ষতা যতটুকুই থাকনা কেন তা প্রকৃতপক্ষে একমাত্র আল্লাহ তাআলারই রয়েছে। মানুষের সত্তা তো অপবিত্রতায় পূর্ণ। মানুষ যখন জন্মগ্রহণ করে তখন তার মধ্যে জ্ঞান-বুদ্ধি পর্যন্ত থাকে না। মানুষ তখনই কেবল গর্ব করতে পারত যখন তার সত্তায় কোন কামাল বা গুণাগুণ থাকত। নতুবা গর্ব করা মূর্খতার পরিচায়ক।

মানুষের সর্বোত্তম উৎকর্ষতা হল ঈমান। কিন্তু ঈমানের উপরও গর্ব করা উচিত নয় বরং শোকর আদায় করা ওয়াজিব যে, আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে ঈমান নসীব করেছেন। নতুবা পৃথিবীতে যেমন কোটি কোটি কাফের-মুশরিক রয়েছে, আমাদেরকেও যদি তাদের অনুরূপ করে দিতেন তাহলে আমাদের কী করার ছিল? আল্লাহ তাআলা বলেন–

يَمُنُّوْنَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوْا ط قُلْ لَا تَمُنُّوْا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ ج بَلِ اللّٰهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدٰكُمْ لِلْإِيْمَانِ إِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ○

তারা মুসলমান হয়ে আপনাকে ধন্য করেছে মনে করে। বলুন, তোমরা মুসলমান হয়ে আমাকে ধন্য করেছ মনে করো না। বরং আল্লাহ ঈমানের পথে পরিচালিত করে তোমাদেরকে ধন্য করেছেন, যদি তোমরা সত্যনিষ্ঠ হয়ে থাক। [হুজুরাত : ১৭]

(কবি শেখসাদী বলেছেন) :

منت منہ کہ خدمت سلطاں ہمی کنی

منت شناس ازو کہ بخدمت بداشتت

বাদশাহর খেদমত করে খাদেমের একথা মনে করা উচিত নয় যে, সে বাদশাহর উপর অনুগ্রহ করছে বরং তাকে বাদশাহর অনুগ্রহ স্বীকার করা কর্তব্য যে, বাদশাহ তাকে খেদমত করা সুযোগ দান করেছেন। (অন্যথায় বাদশাহর খেদমত করতে আগ্রহী হাজারো লোক রয়েছে)।

যাই হোক, আমি বলছিলাম যে অহংকার ও গর্বের সাথে চলাফেরা না করা মানুষের জন্য কর্তব্য। কিন্তু যদি গর্বভরে অহংকারের সাথে চলার নির্দেশ দেয়া হয়, তখন এটা ইবাদত হয়ে যায়। যেমন– হজ সম্পাদনকালে তাওয়াফের প্রথম তিন চক্করে রমল (অহংকার ও গর্বের সাথে চলা) করা ওয়াজিব। কাজেই 'অহংকার' এখানে ইবাদতে পরিণত হয়ে গেল।

বোঝা গেল, যে কাজটি আল্লাহর জন্য নির্ধারিত হয়ে যায়, তা ইবাদতে পরিণত হয়। সুতরাং এই ইবাদতই 'আদত' বা অভ্যাস, আর এ আদতই নিয়তের কারণে ইবাদতে পরিণত হয়ে যায়।

ইসলামের সহজ পথ

মানুষ যদি নামায পড়ে তবে দিনে সর্বোচ্চ সোয়া ঘণ্টা সময় ব্যয় হয়। মাত্র সোয়া ঘণ্টা সময় যেন ইবাদত করা হল। কিন্তু ইসলাম এমনই একটি (সরল-সহজ) পথ নির্দেশ করেছে যে, প্রতিটি কাজ যেন ইবাদতে পরিণত হয়ে যায়। সে মতে আহার করা, পান করা, নিদ্রা যাওয়া সবই ইবাদতে পরিণত হতে পারে। উদাহরণত মানুষ এ নিয়তে নিদ্রা যাবে যে, আমি শেষ রাত্রে জেগে তাহাজ্জুদ পড়ব। অথবা টয়লেটে এ নিয়তে প্রবেশ করে যে, ময়লা বেরিয়ে

গেলে শরীরে স্ফূর্ততা আসবে আর তখন একাগ্রচিত্তে ইবাদত করতে পারব। এ নিয়তে আহার গ্রহণ করে যে, এ দ্বারা শক্তি সঞ্চয় হবে আর তা দ্বারা আল্লাহ তাআলার ইবাদত করতে পারব। তখন এ সমস্ত জিনিসই ইবাদতে পরিণত হয়ে যাবে। হাদীস শরীফে বলা হয়েছে–

من قاد اعمى غفرله ما تقدم من ذنبه

যে ব্যক্তি অন্ধজনকে পথ চলতে সহায়তা করে তার পূর্ববর্তী সকল সগীরা গুনাহ মাফ হয়ে যায়।

এমনিভাবে শবদেহ বহন একটি স্বাভাবিক মানবিক ব্যাপার। সাওয়াব যদি নাও হয় তবুও মানুষ এ কাজ করবে। কিন্তু হাদীসে বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি শবদেহ কাঁধে বহন করে নিয়ে যায়, তাকে চল্লিশটি নেকী প্রদান করা হয়। মৃতকে দাফন করা একটি স্বাভাবিক মানবিক বিষয়; কিন্তু যদি সুন্নাতের অনুসরণার্থে তা করা হয় তবে ইবাদত হয়ে যাবে। ইয়াতীমের প্রতি দয়া ও করুণা সবার অন্তরেই হয়; কিন্তু তা যদি আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার নিয়তে করা হয় তবে ইবাদত হয়ে যায়। যেমন হাদীসে বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি ইয়াতীমের মাথায় (স্নেহ-মমতার সাথে) হাত রাখে তার হাতের নিচে যে পরিমাণ চুল পড়বে সে পরিমাণ নেকী তাকে দেয়া হয়।

আমল একমাত্র আল্লাহর জন্য হওয়ার ব্যাপারে দু'টি জিনিস আবশ্যক

আমল আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের মাধ্যম হওয়ার জন্য দু'টি জিনিসের প্রতি লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। প্রথমতটি হল ইখলাস, অর্থাৎ আমল একমাত্র আল্লহর জন্য হবে। লোক দেখানো বা সুনাম লাভের জন্য হবে না। দ্বিতীয়টি হল আমল যেন প্রবৃত্তির দাসত্বের জন্য না হয়। ইবাদতে যদি ইখলাস না থাকে তবে তা কবুল হয় না। কাজেই প্রত্যেক ইবাদতে তাওহীদের রং থাকতে হবে। যদি নামায পড়া হয় তবে তা একমাত্র আল্লাহর জন্য হতে হবে। যদি রোযা রাখা হয়, তবে একমাত্র আল্লাহর জন্য হতে হবে, যদি মানত করা হয় তবে তাও করতে হবে একমাত্র আল্লাহর জন্য, অন্য কাউকে শরীক না করা কর্তব্য। মুশরিকদের সম্পর্কে কুরআনে বলা হয়েছে–

وَجَعَلُوْا لِلّٰهِ... إلى قوله: سَاءَ مَا يَحْكُمُوْنَ. (الأنعام : ١٣٦)

অর্থাৎ কাফিরগণ ফসল ও পশুগুলোকে এভাবে বণ্টন করে রেখেছিল যে, এক অংশ আল্লাহর জন্য এবং এক অংশ

তাদের অন্যান্য উপাস্যদের জন্য। সুতরাং এটা অংশীদারিত্বের ইবাদত হল। আর অংশীদারিত্বের ইবাদত আল্লাহ তাআলার নিকট গ্রহণীয় হয় না।

অন্য কাউকে ইবাদতে অংশীদার করে নিলে তখন আল্লাহ তাআলা বলেন– انا اغنى الشركاء من الشرك এ অংশও রেখে দাও, তোমার ইবাদতের কোন প্রয়োজন আমার নেই।

তদ্রূপ যদি দান-খয়রাত করা হয় তবে গোপনে করা উচিত। অবশ্য কোন দীনি কল্যাণের জন্য যদি প্রকাশ্যে দান করে তবে তাও উত্তম। যেমন এ উদ্দেশ্যে প্রকাশ্যে দান করল যে, অন্যরা তা দেখে উৎসাহিত হবে এবং দান করবে, তবে এটা ভাল। নতুবা প্রকৃতপক্ষে দান-সদকা করার সঠিক পদ্ধতি এই যে, এমনভাবে দিতে হবে যেন বাম হাতও বুঝতে না পারে যে ডান হাত দিয়ে দান করা হয়েছে। আর যা কিছু প্রার্থনা করা হয় তাও যেন আল্লাহর কাছে করা হয়। হাদীসে বলা হয়েছে, যদি জুতার ফিতা ছিঁড়ে যায় এবং একে ঠিক করার জন্য পয়সাও থাকে তবুও পকেটে হাত দেয়ার পূর্বে আল্লাহর নিকট দুআ ও প্রার্থনা করা উচিত। এতেও সাওয়াব পাওয়া যায়। কেননা উপকার করা একমাত্র আল্লাহর কাজ। এ জিনিসগুলো উপকারের উপকরণ মাত্র। আর উপকরণের ফললাভ আবশ্যকীয় নয়। উদাহরণ স্বরূপ মনে করুন, আগুন স্পর্শ করলেই জ্বালিয় পুড়িয়ে ভস্ম করে দেবে তা জরুরী নয়। যদি আল্লাহ তাআলা তার বিশেষত্বকে পরিবর্তন করে দেন তবে এ আগুনও পানির কাজ দিতে পারে। যেমন হযরত ইবরাহীম আ.কে যে আগুনে নিক্ষেপ করা হয়েছিল সে আগুন থেকে আল্লাহ তাআলা দগ্ধ করার গুণ রহিত করে দিলেন এবং তিনি আগুনের মধ্যে সুস্থ ও নিরাপদ থেকে গেলেন। এভাবে টাকাপয়সা লাভও উপকারের উপকরণ বটে, কিন্তু উপকার করার ক্ষমতা এর নেই। যদি আল্লাহ তাআলা এ গুণকে রহিত করে দেন তবে কর্মক্ষমতাহীন হয়ে যাবে। এভাবে তরবারি শিরোচ্ছেদের মাধ্যম বটে কিন্তু শিরোচ্ছেদের নিজস্ব ক্ষমতা তার নেই। যেমন হযরত ইবরাহীম আ. হযরত ইসমাঈল আ.-এর গলায় ছুরি চালালেন, কিন্তু ছুরি কাটতে পারল না।

এমনিভাবে পানির অপর নাম হল জীবন। আল্লাহ তাআলা বলেন–

وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ.

প্রাণবন্ত সবকিছু আমি পানি দ্বারা জীবিত করলাম। [আম্বিয়া : ৩০]

কিন্তু এই পানিই কিবতীদের জন্য মৃত্যুর মাধ্যম হয়ে দাঁড়াল। এপানির মধ্য দিয়ে বনী ইসরাঈলের জন্য বারোটি রাস্তা তৈরি হয়ে গেল এবং প্রতিটি গোত্র এক একটি রাস্তা ধরে পার হতে লাগল। কেননা, আল্লাহ তাআলা পানি থেকে নিমজ্জিত করার বিশেষত্ব ছিনিয়ে নিলেন এবং কিবতীদেরকে ঐ পানিতেই ডুবিয়ে দিলেন। মাতাপিতা সন্তানের স্রষ্টা নন, সৃষ্টির মাধ্যম মাত্র। আল্লাহ যদি ইচ্ছা করেন তবে এ মাধ্যম ব্যতীত সৃষ্টি করতে পারেন। যেমন হযরত আদম আ.কে মাতাপিতা বিহীন সৃষ্টি করেছেন। অবশ্য আল্লাহ তাআলার এ নিয়ম কার্যকর রয়েছে যে, স্বামী-স্ত্রীর মিলনে সন্তান জন্মগ্রহণ করবে। শতসহস্র কীটপতঙ্গ মাতাপিতা বিহীন অবস্থায় স্তূপিকৃত ময়লা-আবর্জনা থেকে জন্মগ্রহণ করে থাকে। এ জন্য আল্লাহ বলেন–

ءَاَنْتُمْ تَخْلُقُوْنَه اَمْ نَحْنُ الْخٰلِقُوْنَ○

সৃষ্টি কি তোমরা কর, নাকি আমি করি? [ওয়াকিয়া : ৫৯]

কৃষককে লক্ষ্য করে বলেন–

ءَاَنْتُمْ تَزْرَعُوْنَه اَمْ نَحْنُ الزّٰرِعُوْنَ.

ফসল কি তোমরা উৎপন্ন কর, নাকি আমি করি? [ওয়াকিয়া : ৬৪]

বাহ্যিক দৃষ্টিতে আমরা দেখি কৃষক জমিতে ফসল বোনে, কিন্তু বীজ বপণের জন্য অঙ্গপ্রতঙ্গ, উপকরণাদি ও বীজ; অতঃপর বীজ হতে অঙ্গুরোদগম ও চারা উৎপাদন সবই তো আল্লাহ তাআলার দান। সুতরাং বোঝা গেল যে, প্রকৃতপক্ষে আল্লাহই হলেন উপকার ও অপকারের মালিক।

কেন আল্লাহর ইবাদত করা হবে

ঐ সত্তারই ইবাদত করা হয়ে থাকে যার উপকার ও অপকার করার ক্ষমতা রয়েছে। উপকার ও অপকার সাধনের উপকরণসমূহের ইবাদত করা হয় না। অন্যান্য জাতি এখানেই ভ্রান্তির শিকার হয়ে কেউ সূর্যের ইবাদতে আত্মনিয়োগ করেছে, কেউ বৃক্ষকে পূজা আরম্ভ করেছে। কেননা কিছু না কিছু উপকার তো প্রত্যেক জিনিসেই রয়েছে। সুতরাং (দৈহিক ও আর্থিক) সর্বপ্রকার ইবাদত একমাত্র আল্লাহর জন্য হওয়া বাঞ্ছনীয়। গায়রুল্লাহর নামে মানত করা, সিজদা করা, রুকু করা ইত্যাদি কোন কিছুই না হওয়া উচিত। অবশ্য যে জিনিস জায়িয তার সম্মান করাও জায়িয। হযরত আম্বিয়া আ.ও এ শিক্ষা দিয়েছেন। বলেছেন–

أَنِ اعْبُدُوا اللهَ وَاتَّقُوْهُ وَأَطِيْعُوْنِ.

তোমরা আল্লাহ তাআলার ইবাদত কর, তাঁকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর। [নূহ : ৩]

আর আম্বিয়া আ.-এর অবস্থাও ছিল এই যে, কোন কষ্টে পতিত হলে আল্লাহর দরবারেই অভিযোগ করতেন । যখন হযরত ইউসুফ আ. হারিয়ে গেলেন, তখন হযরত ইয়াকুব আ. বললেন–

إِنَّمَا أَشْكُوْا بَثِّيْ وَحُزْنِيْ إِلَى اللهِ.

আমি আমার দুঃখ ও অস্থিরতার অভিযোগ আল্লাহর সমীপেই নিবেদন করছি। [ইউসুফ : ৮৬]

কেননা তিনি জানতেন যে, ইউসুফ আ. তাঁরই ইচ্ছানুযায়ী হারিয়ে গিয়েছেন এবং তাঁরই ইচ্ছায় তিনি পুনরায় ফিরে আসবেন।

হাদীসে বলা হয়েছে–

إذا استعذت فاستعذ بالله وإذا استعنت فاستعن بالله.

যখন তুমি আশ্রয় প্রার্থনা করবে তখন আল্লাহর নিকটই আশ্রয় প্রার্থনা কর, আর যখন সাহায্য চাইবে তখন আল্লাহর নিকটই সাহায্য চাও।

যেমন হযরত যাকারিয়া আ. যখন পুত্র সন্তানের দুআ করলেন তখন প্রথমে সন্ত ান লাভের সকল উপায়-উপকরণের অবর্তমানতার কথা বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, 'হে আল্লাহ! আমার হাড়গুলো দুর্বল হয়ে গিয়েছে।' দুর্বলতা যখন হাড়ে প্রবেশ করেছে তখন মাংসে দুর্বলতা প্রকাশ খুবই স্বাভাবিক, কেননা মাংস হাড়ের উপরিভাগে রয়েছে। এ ছিল অভ্যন্তরীণ অবস্থা; আর বাহ্যিক অবস্থা সম্পর্কে বলেন, 'আমার মাথার চুল বার্ধক্যজনিত কারণে সাদা হয়ে গিয়েছে, তথাপি হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট প্রার্থনা করে কখনো বিফল হইনি।' তারপর সন্তান চাওয়ার কারণ বর্ণনা করলেন– 'এরা আমার আত্মীয়স্বজন, এদের সম্বন্ধে আমার আশঙ্কা হয় যে এরা আমার মিশনকে এগিয়ে নিতে সক্ষম হবে না এবং তারবিয়াত ও হিদায়াত করতে পারবে না।' তারপর বললেন– 'আমার স্ত্রী বন্ধ্যা, সন্তান ধারণের যোগ্যতা তার নেই।' মোটকথা, সন্তান জন্মদানের যোগ্যতা স্বামী-স্ত্রী উভয়ের মধ্যেই নেই। আত্মীয়স্বজন দ্বারা তালিম ও তারবিয়াতের আশাও নেই, যারা আমার মিশনকে এগিয়ে নিয়ে যাবে।

অতঃপর আরয করেন– 'হে আল্লাহ! এমন একটি ছেলে দান করুন যে হবে আমার উত্তরাধিকারী।' হযরত আম্বিয়ায়ে কেরাম আ.-এর উত্তরাধিকার ধন-সম্পদে হয় না বরং তা হয় ইলমে এলাহী। হাদীসে বলা হয়েছে–

إن الأنبياء لم يورثوا دينارًا ولا درهمًا ولكن ورّثوا العلم.

দিনার কিংবা দিরহাম আম্বিয়ায়ে কেরাম আ.-এর পরিত্যক্ত সম্পত্তি নয়, রবং তাঁদের পরিত্যক্ত সম্পত্তি হল ইলম।

উল্লেখিত ঘটনায় এদিকে ইশারা করা হয়েছে যে, দুআ করার সময় মানুষ যেন দ্বিধা-সংশয়ের মধ্যে না থাকে বরং পূর্ণ দৃঢ়তার সাথে যেন দুআ করে।

দোয় করার পরে কখনো কখনো এমনও হয় যে, কাঙ্ক্ষিত জিনিসটিই দিয়ে দেয়া হয়। আর কখনো এর চেয়েও অধিক উত্তম জিনিস দান করা হয়, কখনো আবার বিলম্বে প্রদান করা হয়। যেমন, ছেলে পিতার নিকট টাকা পয়সা চায়, কিন্তু পিতা একটি পয়সাও দেয় না। বরং কিছুদিন অতিবাহিত হওয়ার পর একত্রে সব টাকা দিয়ে দেয়। তখন ছেলে বলে, আমি যখন টাকা চেয়েছিলাম, তখন আপনি দেননি কেন? পিতা বলে, বেটা! তখন তুমি অসুস্থ ছিলে। আমি টাকা দিলে তুমি এমন সব জিনিস খেয়ে ফেলতে যা দ্বারা তোমার স্বাস্থ্য নষ্ট হয়ে যেত।

এমনিভাবে যদি কেউ আল্লাহ তাআলার নিকট ধন-সম্পদ প্রার্থনা করে তবে সময় বিশেষ তাকে ধনসম্পদ দেয়া হয় না। কেননা আল্লাহ তাআলা জানেন যে, এ ব্যক্তি অপব্যয়ী। যদি একে মাল-সম্পদ দেয়া হয় তবে সে আরো অধিক গুনাহে লিপ্ত হয়ে পড়বে। কিন্তু যখন দরিদ্র হয়ে যায় এবং গুনাহ হতে তওবা করে, তখন আল্লাহ তাআলা তাকে ধনসম্পদ দান করেন। আবার কখনো এমনও হয় যে, ছেলে জীবন ভর টাকাপয়সা চাইতে থাকে, কিন্তু পিতা কিছুই দেয় না, কিন্তু যখন ছেলে বড় হয় তখন পিতা তাকে অনেক ধনসম্পদ দিয়ে দেয়। তখন ছেলে জিজ্ঞেস করে আপনি সারাটি জীবন আমাকে কোন কিছুই কেন দিলেন না? পিতা উত্তর দেয়, আমি যদি তোমার চাহিদানুযায়ী টাকা দিতে থাকতাম তবে তুমি সকল সম্পদ নিঃশেষ করে দিতে। তুমি আমার নিকট যা চইতে আমি তা সঞ্চয় করে রেখে দিতাম। তাই আজ এই সঞ্চিত ধনভাণ্ডার তোমাকে দান করলাম। এভাবে মানুষের দুআ কবুলের কোন কোন লক্ষণ সমস্ত জীবনে প্রকাশ পায় না, সঞ্চিত করে রেখে দেয়া হয়। কেয়ামতের কঠিন দিনে একত্রে এসবের প্রতিদান দেয়া হবে। তখন এ লোকটি বলবে, হে আল্লাহ! আমি তো এত বেশি নেকী করিনি। আল্লাহ বলবেন, তুমি দুনিয়াতে থাকা অবস্থায় আমার নিকট দুআ করতে, আর আমি সেগুলো তোমার পরকালের জন্য সঞ্চয়

করে রাখতাম। এ নেকীগুলো হল তোমার দোয়। এজন্যই দুআ থেকে কখনো মনক্ষুণ্ন না হওয়া আবশ্যক। আর আমি বলি, কোন প্রতিফল যদি নাও পাওয়া যায়, তথাপি দুআ ত্যাগ না করা উচিত। কারণ, হাদীসে বলা হয়েছে– الدعاء مخ العبادة 'দুআ হল সমস্তত ইবাদতের সার'। সারকে ত্যাগ করে শুধু বাকলের উপর সন্তুষ্ট থাকা কোন বুদ্ধিমানের কাজ কি হতে পারে?

গাইরুল্লাহর মধ্যে কার সম্মান করা কর্তব্য

দুআ ও প্রার্থনা একমাত্র আল্লাহ তাআলার নিকট হওয়া আবশ্যক। কিন্তু যা কিছু আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট হয়ে গিয়েছে তার সম্মান করাও কর্তব্য। যেমন হযরত নবী আ.গণ। আনুগত্যের মাধ্যমে তাঁদেরকে সম্মান প্রদর্শন করা কর্তব্য। কুরআনের সম্মান করা কর্তব্য, অজুবিহীন অবস্থায় স্পর্শ করা যাবে না। বাইতুল্লাহর শরীফের সম্মান করা আবশ্যক; মলমূত্র ত্যাগকালীন এর দিকে মুখ করে বা পিঠ করে বসা যাবে না। কেননা, বাইতুল্লাহ হল নামাযের কিবলা। কিন্তু তা মাবুদ বা উপাস্য নয়।

হযরত উমর রা. একবার হজ পালনের উদ্দেশ্যে মক্কায় আগমন করলেন। 'হাজরে আসওয়াদে' চুমু দেয়ার সুযোগ পেলেন না। আর তখন শাসন ব্যবস্থাও এমন ছিল না যে, পুলিশ দ্বারা সামনের সবাইকে সরিয়ে দেয়া হবে। তখন তিনি লাঠি দ্বারা হাজরে আসওয়াদকে স্পর্শ করে লাঠিকে চুম্বন করলেন এবং হাজরে আসওয়াদকে সম্বোধন করে কললেন–

إني أعلم أنك حجر لاتنفع و لاتضر، لولا إني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما أقبلك.

আমি ভালভাবেই জানি যে, তুমি একটি পথর মাত্র। কারো উপকার বা অপকার করার কোন ক্ষমতা তোমার নেই। যদি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক তোমাকে চুম্বন করতে না দেখতাম তবে আমি কখনো তোমাকে চুম্বন করতাম না।

হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, একজন সাহাবী রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে তাঁকে সিজদা করলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, তুমি এমন কেন করলে? তিনি বললেন, আমি কায়সার ও কিসরাকে দেখেছি, লোকজন তাদেরকে সিজদা করছে। আমি

মনে করলাম আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ ব্যাপারে সর্বাধিক যোগ্য যে, তাঁকে সিজদা করা হোক। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যদি আল্লাহ তাআলা ব্যতীত অন্য কাউকে সিজদা করা জায়িয হত, তবে আমি নারীদেরকে আদেশ করতাম যে, তারা যেন স্বীয় স্বামীকে সিজদা করে। ইবাদত ও সিজদা একান্তই আল্লাহর সমুন্নত সত্তার জন্য নির্দিষ্ট। অন্য কারো জন্য না আছে ইবাদত, না আছে সিজদা।

স্বয়ং আম্বিয়ায়ে কেরাম আ. এ শিক্ষাই দিয়েছেন যে, শুধু আল্লাহরই ইবাদত করতে হবে। আল্লাহ তাআলা কুরানে ইরশাদ করেন–

مَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُّؤْتِيَهُ اللّٰهُ الْكِتٰبَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُوْلَ لِلنَّاسِ كُوْنُوْا عِبَادًا لِّيْ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ.

এমন হতে পারে না যে, আল্লাহ তাআলা কোন মানুষকে কিতাব, হিকমাত ও নবুওয়াত দান করবেন, অতঃপর ঐ নবী জনগণকে বলতে শুরু করবেন যে, তোমরা আমার ইবাদত কর, আল্লাহর ইবাদত কর না। [আলে ইমরান : ৭৯]

সুতরাং ইখলাসের মূল কথা দাঁড়াল এই, সকল ইবাদত একমাত্র আল্লাহ তাআলার জন্যই করা কর্তব্য।

আমল কবুলের জন্য প্রয়োজন ইখলাস ও নবীর আনুগত্য

দ্বিতীয় মূলনীতি হল এই যে, আমলের মধ্যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আনুগত্য থাকতে হবে। যে ইবাদত হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ইবাদতের অনুরূপ হবে তাই গ্রহণ যোগ্য হবে, অন্যথায় হবে না। উদাহরণত যদি কেউ অত্যন্ত ইখলাসের সাথে যোহরের নামায ছয় রাকাত পড়ে তবে তা আল্লাহর দরবারে কবুল হবে না। কেননা এটা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নমুনার পরিপন্থী। এভাবে যদি কোন ব্যক্তি মনে করে, রোযা তো মাগরিব পর্যন্তই রাখা হয়, আজ আমি এশার সময় ইফতার করব, তবে এ রোযা মাকবুল হবে না। নতুন করে কোন নমুনা তৈরি করার প্রয়োজন নেই, তৈরিকৃত নমুনা বিদ্যমান রয়েছে। কেননা দীন পূর্ণাঙ্গ ও পরিপূর্ণ হয়ে গিয়েছে। এতে সর্বপ্রকার হিদায়াত বিদ্যমান রয়েছে। একবার কিছু সংখ্যক মুশরিক হযরত সালমান ফারসী রা.কে (তাচ্ছিল্য সহকারে) বলতে লাগল, তোমাদের নবী তোমাদেরকে সর্ববিষয়ে শিক্ষা দিয়ে থাকেন, এমন কি মলমূত্র ত্যাগের পদ্ধতিও বলে দিয়েছেন। উত্তরে তিনি (গর্ব ও দৃঢ়তার সাথে) বললেন,

হ্যাঁ তিনি আমাদেরকে সর্ব বিষয়ে শিক্ষা দেন, এমনকি মলমূত্র ত্যাগের নিয়ম ও পদ্ধতিও তিনি আমাদেরকে জানিয়ে দেন। তিনি আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন, মলমূত্র ত্যাগকালে আমরা যেন কিবলার দিকে মুখ অথবা পিঠ না করি। চিন্তা করুন, হাদীসেই যখন এমনসব বিষয় বিদ্যমান রয়েছে তখন কিসের আর কমতি থাকতে পারে?

এ জন্যই ইখলাস যত হ্রাস পেতে থাকবে শিরকও সে অনুপাতে বৃদ্ধি পেতে থাকবে; এবং রাসূলের আনুগত্যে যত ঘাটতি হবে, ইবাদতেও সে অনুপাতে বিদয়াত প্রবেশ করতে থাকবে। নমুনার জন্য রাসূলে কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সমগ্র জীবন আমাদের সম্মুখে বিদ্যমান রয়েছে।

নবীগণের মধ্যে একমাত্র মুহাম্মাদ সা.-এর সীরাতই সংরক্ষিত

এটা একমাত্র ইসলামেরই বিশেষত্ব যে, জনাব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পূর্ণ সীরাত সংরক্ষিত রয়েছে। বিশ্বের অন্য কোন জাতি বিশ্ববাসীর সামনে তাদের অনুসৃত ব্যক্তিবর্গের সীরাত ও আদর্শ উপস্থাপন করতে পারবে না। হযরত মুসা আ.-এর পারিবারিক জীবন সম্পর্কে আমরা কিছুই জানি না। হযরত ঈসা আ.-এর আমলী জিন্দেগী সম্পর্কে আমাদের কিছুই জানা নেই। শুধু মুসলামনগণ এ দাবি করতে পারেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পুরো জীবন আমাদের সম্মুখে রয়েছে এবং সুস্পষ্ট ও উজ্জ্বলভাবে রয়েছে। খাওয়া-দাওয়া, নিদ্রা যাওয়া, জাগ্রত হওয়া– মোটকথা জীবনের সকল কাজের ব্যাপারে তাঁর হিদায়াত বিদ্যমান রয়েছে।

আটজন সাহাবী চীন দেশে তাশরিফ নিয়ে গেলেন। তারা সেখানে গিয়ে ব্যবসা-বাণিজ্য শুরু করলেন। সাহাবায়ে কেরাম যেহেতু অত্যন্ত দিয়ানতদার ও বিশ্বস্ত ছিলেন; আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আকীদা হল الصحابة كلهم عدول 'সমস্ত সাহাবায়ে কেরাম আদিল বা ন্যায়পরায়ন'; সুতরাং তাঁরা সেখানে ন্যায়ানুগতা ও বিশ্বস্ততার সাথে ব্যবসা শুরু করলেন। তাঁদের দিয়ানতদারিতার কারণে বাজারের অন্যান্যদের ব্যবসায়ে অচলাবস্থা দেখা দিল। স্থানীয় ব্যবসায়ীগণ সরকারের নিকট অভিযোগ উত্থাপন করল যে, আরব ব্যবসায়ীগণ আমাদের সম্পদ লুণ্ঠন করার জন্য এসেছে। যদি তাদেরকে স্বাধীনভাবে ছেড়ে দেয়া হয় তবে তারা দেশের সকল সম্পদ দেশের বাইরে আরবে নিয়ে যাবে। এ অভিযোগের প্রতিক্রিয়া দাঁড়াল এই, শুধু এ উদ্দেশ্যেই একটি তদন্ত কমিশন গঠন করা হল এবং স্বয়ং প্রধান উজির এ কমিশনের নেতৃত্বে রইল। তারা এসে সাহাবীদেরকে বলতে লাগল, 'তোমরা আমাদের দেশকে ধ্বংস করে দিচ্ছ,

তোমরা এখান থেকে বেরিয়ে যাও।' সাহাবীগণ বললেন, আপনাদের ব্যবসায়ীগণ অসহায় দরিদ্রদের সম্পদ লুণ্ঠন করছে। আমরা বিশ্বস্ততা ও দিয়ানতদারীর সাথে কারবার শুরু করেছি, এ কারণেই তারা এ অভিযোগ উত্থাপন করেছে। আমরা আপনাদের দেশকে আবাদ ও সমৃদ্ধশালী করতে এসেছি– ধ্বংস করতে নয়। প্রধান উজির বলল, আমাদের নিকট আপনাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ রয়েছে, সুতরাং আপনারা এখান থেকে চলে যান।

সাহাবীগণ বললেন, আমাদের যদি কোন ত্রুটি থেকে থাকে তবে আমরা তা মেনে নিতে প্রস্তুত রয়েছি। আর বিনা অপরাধে যদি আমাদেরকে বের করে দিতে চান তবে আমরা যুদ্ধের ঘোষণা করছি। এ কথা শুনে জনসাধারণ বলল, আমরাও আপনাদের সাথে রয়েছি। অবস্থা দেখে সরকার দমে গেল। সেই আটজন সাহাবীর বরকতে চীনে আজ আট কোটি মুসলমান রয়েছেন। (তাই সঠিক নিয়ত ও দিয়ানতদারীর কারণে আটজনের ছোট্ট এই পবিত্র দলটি, যাদের জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল নবীর সুন্নাতের অনুকরণ, বিশাল এই সাম্রাজ্যের উপর প্রাধান্য বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছিলেন এবং পৃথিবী যতদিন টিকে থাকবে তত দিনের জন্য নিজেদের কীর্তি ও নিদর্শন চীনদেশে রেখে গিয়েছেন। এখনও চীনের প্রাচীরগুলোতে তাওহীদের ধ্বনি উচ্চারিত হচ্ছে।)

তাওহীদের শক্তি এবং শিরকের অসহায়ত্ব

মুসলিম সেনাদল যখন ইরান আক্রমণের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হল তখন পথিমধ্যে একটি নদী বাধা হয়ে। সেনানায়ক হযরত সাদ রা. তাঁর বাহিনীকে উদ্দেশ্য করে বললেন, আপনারা যে আল্লাহর বান্দা, এ দনীও সে আল্লাহর অধীন। সুতরাং নিজ নিজ ঘোড়া নিয়ে নদীতে নেমে পড়ুন। নির্দেশ মাত্রই সকলেই ঘোড়াসহ নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। ঘোড়গুলো সাঁতার কেটে নদী পার হয়ে গেল। একজন সাহাবীর একটি পেয়ালা নদীতে পড়ে গেল। অন্যরা বললেন, পেয়ালাটি উঠিয়ে নিন, তিনি বললেন পেয়ালাটি আমার হলে ডুববে না (আল্লাহই এর হিফযত করবেন)। পরে দেখা গেল নদীর উত্তাল তরঙ্গ পেয়ালাটিকে নদীর অপর তীরে পৌছিয়ে দিয়েছে। ঐ সাহাবী যখন সেখানে পৌছলেন, তখন দেখতে পেলেন পেয়ালা অনেক পূর্বেই পৌছে গিয়েছে। এসবকিছু কলবের শক্তি দ্বারা হয়ে থাকে, আর কলবের শক্তি তাওহীদ দ্বারা সৃষ্টি হয়। শিরক দ্বারা অন্তরে অনিশ্চয়তা আসে। সাহাবাদের অন্তরে না ছিল শিরকের কোন আভাস, না ছিল বিদআতের কোন অনুপ্রবেশ।

হযরত খালিদ ইবনে ওয়ালিদ রা. আটশত সাহাবীর একটি বাহিনী নিয়ে খ্রিষ্টান মাহান আরমানী'র সঙ্গে যুদ্ধের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন। মাহান আরমানী হযরত খালিদ রা.কে বলল, আমি মনে করেছিলাম মুসলমানগণ বুদ্ধিমান ও দূরদর্শী জাতি, কিন্তু এরা বোকার দল। আটশত সৈন্য নিয়ে হাজার হাজার সংখ্যক সৈন্য বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে এসেছে। হযরত খালিদ রা. বললেন, হে মাহান! তুমি প্রধান নায়ক হিসেবে এসেছ নাকি উপদেশ দেয়ার জন্য এসেছ? তুমি যদি যুদ্ধ করতে প্রস্তুত না হও তবে পরিষ্কার বলে দাও– 'আমি যুদ্ধ করতে চাই না।' মাহান তাঁর কথা শুনে রাগান্বিত হয়ে যুদ্ধের জন্য আদেশ করল।

হযরত খালিদ রা.-ও তার সঙ্গী-সাথীদেরকে কাফেরদের ভীড়ের মধ্যে ঢুকে পড়ার জন্য আদেশ করলেন। বর্ণনাকারী (রাবী) বলেন, একটানা সাত ঘন্টা যুদ্ধ চললো। অবশেষে কাফের বাহিনী পরাজয়ের গ্লানি নিয়ে পলায়ন করল। সাতজন মাত্র মুসলমান শাহাদাত লাভে ধন্য হলেন এবং খ্রিষ্টান বাহিনীর তের হাজার সৈন্য নিহত হল।

এর কারণ এই ছিল যে, মানুষ যখন দীনের জন্য লড়াই করে তখন আল্লাহ তাআলা সাহায্য করে থাকেন। আর হিম্মত তো কেবল তাওহীদ দ্বারাই সৃষ্টি হয়। মুসলমানদের মত এমন জীবনী শক্তি মুশরিকদের নেই।

মোটকথা হল, একদিকে পরিপূর্ণ ইখলাস এবং অন্যদিকে পরিপূর্ণ আনুগত্যের আবশ্যকতা রয়েছে। আজ মুসলমানদের মধ্যে শিরক ও বিদআত অনুপ্রবেশ করছে। এ জন্যই আজ তাদের এমন অধঃপতন। আল্লাহ হেফাযত করুন।

মুসলমানগণ বিশ্ব সম্প্রদায়ের সংশোধনের জিম্মাদার

বিশ্ব সম্প্রদায়ের সংশোধনের দায়িত্ব মুসলমানগণের উপর অর্পিত হয়েছে। তাদের সংশোধনের পদ্ধতি হল এই, পরস্পরের প্রতি সুধারণা পোষণ করা এবং খারাপ ধারণা থেকে বিরত থাকা আবশ্যক। সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজের নিষেধও আবশ্যক। কিন্তু কাউকে অপমানিত না করা উচিত। হাদীসে বর্ণিত আছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ দুআ করতেনঃ হে আল্লাহ! আমি ঐ প্রতারক বন্ধুর থেকে তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি, যে বন্ধুত্বের দাবি করে, কিন্তু আমার ভাল কাজ দেখলে তা গোপন রাখে, আর আমার কোন মন্দ কাজ দেখলে তা প্রচার করে বেড়ায়।

হযরত ইমাম মালিক রহ. বলেন–

لن يصلح اخر هذه الأمة بما صلح به اولها

এ উম্মতের শেষ যুগে বিশৃঙ্খলা ও ফিৎনা ফাসাদ দেখা দিলে এর সংশোধন সম্ভব হবে না, যতক্ষণ তারা ঐ পথের অনুসরণ না করবে যে পথের উপর উম্মতের পূর্ববর্তীগণ প্রতিষ্ঠিত ছিলেন।

বর্তমানের মুসলমানগণ অভিযোগ করে থাকেন– আমাকে অমুক শিখ ব্যক্তি কষ্ট দিয়েছে, অমুক হিন্দু, অমুক খ্রিষ্টান কষ্ট দিয়েছে। আমি বলি, প্রকৃতপক্ষে বিশ্বের সকল জাতি, সকল সম্প্রদায়ের নৈতিক অধঃপতনের জন্য মুসলমানগণই দায়ী। কারণ, তারা ছিলেন বিশ্ববাসীর জন্য শিক্ষক। শিক্ষক যদি ঠিক হয়ে যান তখন অন্যরাও আপনা আপনি ঠিক হয়ে যায়। হাদীসে বলা হয়েছে–

الإسلام يعلوا ولا يعلى

ইসলাম বিজয়ী হয়ে থাকে বিজিত হয় না।

কিন্তু আমরা যদি ইসলামের গণ্ডির ভিতর প্রবেশই না করি তবে আমরা অপদস্থ ও লাঞ্ছিত হব। নতুবা ইসলামে তো নীচতা নেই।

বান্দাকে স্বীয় ইচ্ছা বিসর্জন দেয়া উচিত

আমি এ কথা আলোচনা করছিলাম যে, নিয়ত পরিবর্তনের দ্বারা 'আদত (অভ্যাস) ইবাদতে পরিণত হয়ে যায়।' এক ব্যক্তি একটি ভবন নির্মাণ করল। যথারীতি এতে জানালাও রাখা হল। নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হওয়ার পর সে তার শায়খকে দাওয়াত করল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এ জানালা কেন দিয়েছ? সে বলল, আলো বাতাসের জন্য দিয়েছি। শায়খ বললেন, আল্লাহর বান্দা! তুমি যদি এ নিয়ত করে নিতে যে, আযানের আওয়াজ এদিক দিয়ে ঘরে প্রবেশ করবে। তাহলে সাওয়াবও পেয়ে যেতে আর আলো বাতাস প্রবেশেও কোন বাধা-বিঘ্ন সৃষ্টি হত না। নিয়ত করা ঐ সকল কাজের জন্য আবশ্যক যেগুলো নিয়তের উপর নির্ভরশীল। 'সাওয়াব' নিয়তের উপর নির্ভরশীল। আলো বাতাস প্রবেশ করা নিয়ত নির্ভর নয়। সুতরাং প্রতিটি কাজে সাওয়াব লাভের চিন্তাভাবনা করা উচিত। আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি লাভের জন্য সচেষ্ট থাকা কর্তব্য। আবদুল্লাহ (আল্লাহর বান্দা)-এর অর্থই হল এই যে, আল্লাহর সন্তুষ্টি মোতাবেক আমল কারী।

জনৈক ব্যক্তি একজন ক্রিতদাসকে জিজ্ঞেস করল, তুমি খাবে কী? সে উত্তরে বলল, মনিব যা দিবেন, সে জিজ্ঞেস করল, পান করবে কী? ক্রীতদাস উত্তর দিল, মনিব যা পান করাবেন তাই। জিজ্ঞেস করল, তুমি কী পরিধান করবে? সে বলল, আমার মনিব যা পরিধান করাবেন তাই পরিধান করব। ঐ ব্যক্তি বলল,

আরে আল্লাহর বন্দা! তোমার নিজের কোন ইচ্ছাই কি নেই? গোলাম উত্তর দিল, নিজের কোন ইচ্ছা যদি থাকত তবে তো গোলাম হতাম না।

তিলাওয়াতকৃত আয়াত প্রসঙ্গে আলোচনা

এখনে আমি যে আয়াত তিলাওয়াত করেছিলাম তাতে এই ইখলাস ও আনুগত্যের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। ইরশাদ করা হয়েছে– 'হে ইবরাহীম! বলে দাও, আমার নামায, আমার কুরবানী, আমার জীবন, আমার মরণ সবই আল্লাহ তাআলার জন্য উৎসর্গীকৃত।' এই ইবরাহীমি মিল্লাতের পূর্ণতার জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রেরণ করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন–

مِلَّةَ اَبِيْكُمْ اِبْرٰهِيْمَ.

স্বীয় জাতির পিতা ইবরাহীম আ.-এর মিল্লাতের অনুকরণ কর। [হজ : ৭৮]

ইবরাহীম আ. নিজেই এ উম্মতকে 'মুসলিম' নামে নামকরণ করেছেন। বর্ণিত হয়েছে–

هُوَ سَمّٰكُمُ الْمُسْلِمِيْنَ.

তিনি তোমাদেরকে মুসলিম নামে ভূষিত করেছেন। [হজ : ৭৮]

আর ইসলাম শব্দের অর্থ হল আনুগত্য করা, সমর্পণ করা। ইসলামে দীক্ষিত হওয়ার পর আল্লাহর নিকট নিজেকে সম্পূর্ণ সমর্পণ না করা বিশ্বাসঘাতকতা ও গাদ্দারীর শামিল। গ্রহণ ও বর্জন বিপরীতমুখী দু'টি জিনিস, যা একত্রিত হওয়া গ্রহণযোগ্য নয়।

নামের এবং কাজের মুসলমান

পাঞ্জাবের বুযর্গ শাহ দৌলা যমুনার প্লাবণ থেকে গ্রাম রক্ষা করার জন্য বাধ দেয়ার পরিবর্তে বাধ ভেঙ্গে দিতে উদ্যত হয়েছিলেন, যাতে করে আল্লাহর বিরুদ্ধাচারণ করা না হয়। 'কেমন আছেন' প্রশ্নের উত্তরে জনৈক বুযর্গ বলেছিলেন– ঐ ব্যক্তির অবস্থা কি জিজ্ঞেস করছ, যার মর্জি মাফিক উভয় জাহান পরিচালিত হচ্ছে। অর্থাৎ তিনি আল্লাহর মর্জিকে নিজের মর্জি বানিয়ে নিয়েছিলেন। জমি চাষরত অবস্থায় একজন সাধারণ সাহাবী রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওফাতের সংবাদ শুনে আল্লাহর কাছে দুআ করেছিলেন– হে আল্লাহ! আমার নিকট চক্ষু এ জন্য প্রিয় ছিল যে, এর দ্বারা

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চেহারা মোবারক অবলোকন করতাম। তিনি যখন নেই, তখন এ চোখ দিয়ে অন্য কিছু আমি দেখতে চাই না। সাথে সাথে তিনি অন্ধ হয়ে গেলেন। তিনি ছিলেন সাহাবী। তাঁদের তো মর্যাদাগত ঊর্ধ্ব অবস্থান রয়েছেই। তাঁরা ছাড়াও আউলিয়াদের মধ্যে এমন বুযর্গ রয়েছেন। ইমাম তিরমিযী রহ., যার কিতাব সকল মাদ্রাসায় পাঠ্য; তাঁর শায়খদের মধ্যে একজন শায়খ এমন ছিলেন যে, যখন বাজারে যেতেন তখন কানে তুলা দিয়ে বন্ধ করে দিতেন। মানুষ তাঁর নিকট এর কারণ জানতে চাইলে তিনি বললেন, আল্লাহ তাআলা আমাকে অত্যন্ত প্রখর স্মরণশক্তি দান করেছেন। যা শুনি তাই মুখস্থ হয়ে যায়। আমি চাই, যে কান দ্বারা রাসূলের হাদীস শুনছি, সে কান দ্বারা অন্য কিছু যেন না শুনি।

এঁরা সবাই ছিলেন কাজের মুসলমান, আর আমরা হলাম নামের মুসলমান। আজ যদিও আমরা তাঁদের মত হতে পারব না, আমাদের নিকটবর্তী যুগে যেসব বুযর্গ ছিলেন তাঁদের স্তরেও পৌছতে পারব না। যেমন, জুনায়েদ বাগদাদী রহ.-এর মত বুযর্গের নিকটেও পৌছতে পারব না। কিন্তু আমরা অন্তত তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে তো চলব। তাঁরা দৌড়ে যাচ্ছেন, আমরা অন্তত হেঁটে চলব, তা হলে কোন না কোন দিন গন্তব্যস্থলে পৌছে যাব। পূর্বসুরী বুযর্গদের অনুসরণ ব্যতীত দীন-দুনিয়ার কিছুই অর্জিত হয় না।

যাই হোক, ইহকালীন ও পরকালীন সফলতার জন্য আবশ্যক হল পরিপূর্ণ ইখলাস ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পরিপূর্ণ আনুগত্য। এ দু'টি জিনিসই হল মুক্তির চাবিকাঠি ও সফলতার জিম্মাদার। যিনিই সফলতা লাভ করেছেন, এ পথে চলেই লাভ করেছেন। আর যে ব্যক্তি এ পথ হতে বিচ্যুত হয়েছে, সে গন্তব্যস্থলে পৌছতে ব্যর্থ হয়েছে এবং অযথাই জীবনের পুঁজি হারিয়ে ফেলেছে।

এ কয়েকটি কথা আমি আলোচনা করলাম। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন!

اللهم ربنا تقبل منا إنك انت السميع العليم

وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك انت التواب الرحيم.

বয়ান : ৬

সুহবাতে সালিহ

পুণ্যাত্মাদের সাহচর্য

রাষ্ট্রীয় বিধিবিধান অপরাধমূলক কার্যকলাপকে হয়ত প্রতিরোধ করতে পারে, কিন্তু অন্তরে অপরাধের প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি করতে পারে না। চোর চুরি হতে, ব্যভিচারী ব্যভিচার হতে আইনের ভয়ে বিরত থাকতে পারে, কিন্তু চুরি ও ব্যভিচারের প্রতি তার অন্তরে ঘৃণা আইনের দ্বারা সৃষ্টি হতে পারে না। অপরাধের প্রতি ঘৃণা এবং গুনাহের প্রতি অসন্তুষ্টি একমাত্র আল্লাহওয়ালাদের সাহচর্য ও সান্নিধ্যের মাধ্যমেই লাভ হয়ে থাকে।

– হযরত হাকীমুল ইসলাম রহ.





اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُه وَنَسْتَعِيْنُه وَنَسْتَغْفِرُه وَنُؤْمِنُ بِه وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّاٰتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَّهْدِه اللّٰهُ فَلاَ مُضِلَّ لَه، وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلا هَادِىَ لَه، وَنَشْهَدُ أَنْ لاَّ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَه لاَ شَرِيْكَ لَه، وَنَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَمَوْلاَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُه وَرَسُوْلُه، أَرْسَلَهُ اللّٰهُ إِلىٰ كَافَّـــةً لِّلنَّاسِ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا وَّدَاعِيًا إِلَيْهِ بِإِذْنِه وَسِرَاجًا مُّنِـــيْرًا.

أَمَّـــابَعْدُ:

فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ○ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ○ يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَكُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ○

التوبه : ١١٩

ইলমের প্রাচুর্য সত্ত্বেও আমলহীনতার আধিক্য

বুযুর্গানে মুহতারাম!

আমি যে আয়াত তিলাওয়াত করলাম তাতে আল্লাহ তাআলা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় বর্ণনা করেছেন। যার উপর মানুষের দীনদারী নির্ভরশীল। কেউ যদি দীনদার হতে চায় তবে তার জন্য উক্ত আয়াতের উপর আমল করা

আবশ্যক। এ কথাটি সর্বস্বীকৃত যে, আজকাল ওয়াজ-নসীহত, সভা-মাহফিল ও লিটারেচারের কোন অভাব নেই। কিন্তু এসব সত্ত্বেও মুসলমানদের দীনি অবস্থা অবনতির দিকেই রয়েছে। দীনি অবস্থায়ই কেবল নয়, পার্থিব দিক বিবেচনাও তারা অধঃতনের শিকার। কিন্তু এমনটি হওয়ার কারণ কী? এ বিষয়ে চিন্তাভাবনা করা আবশ্যক। কেননা যতক্ষণ পর্যন্ত রোগের কারণ নির্ণয় করা না যায় ততক্ষণ পর্যন্ত রুগির চিকিৎসা করা সম্ভব হয় না। দীনি এই অবনতি ইলমের কমতির করণে নয়। কেননা বর্তমান যুগে ইলমের প্রচার ও প্রসারের যেসব উপায়-উপকরণ রয়েছে তা পূর্বে কখনোই ছিল না। এমনিভাবে আজকাল যেসব ধর্মীয় সভা-সমাবেশ হয়ে থাকে তাও এমন হয় যে, তাতে এক দু'হাজার শ্রোতার সমাবেশ তো সাধারণ ব্যাপার, কোথাও কোথাও লক্ষ লক্ষ লোকের সমাগম হয়ে থাকে। উপরন্তু বর্তমান যুগে সমগ্র বিশ্বই যেন একটি সভাস্থলে পরিণত হয়ে গেছে। রেডিওতে কেউ কিছু বললে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সর্বত্র তার আওয়াজ পৌছে যায়। আর রেডিওতে শুধু পার্থিব বিষয়াদিই প্রচার করা হয় না, বরং কুরআনের তরজমা ও তাফসীরও প্রচারিত হয় এবং বিশ্বের বিভিন্ন দেশে তা শোনাও যায়। আপনাদের 'রেডিও পাকিস্তান' প্রত্যহ কুরআনের তরজমা ও তাফসীর প্রচার করছে। আর মাসআলা মাসাইল তো শিশুরা পর্যন্ত জানে। কিন্তু এতসব সত্ত্বেও দীনের মধ্যে সেই পরিপক্কতা ও মজবুতি নেই যা পূর্ব যুগে ছিল। ইলম প্রচারের দ্বিতীয় মাধ্যম হল কলম বা লিখনী শক্তি। বর্তমান যুগে এতেও কোন কমতি নেই। উলামায়ে কেরাম দশ প্রকার কলমের কথা বর্ণনা করেছন: প্রথমত মাওহে মাহফুযের কলম, যার সম্পর্কে হাদীসে বলা হয়েছে–

خلق الله القلم فقال له اكتب، فقال ما اكتب، قال اكتب ما كان وما يكون.

> আল্লাহ তাআলা কলমকে সৃষ্টি করে তাকে বললেন 'লিখ', কলম আরয করল 'কী লিখব'? আল্লাহ তাআলা বললেন, যা কিছু হয়েছে এবং ভবিষ্যতে যা হবে তাই লিখ।

দ্বিতীয় প্রকার কলম হল ঐ কলম যা দ্বারা প্রাত্যহিক বিষয়াদি লিপিবদ্ধ করা হয়। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, মিরাজের রাত্রে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন আরশের নিকবর্তী হলেন, তখন কলম চালনার আওয়াজ শুনতে পেলেন। তখন তিনি জিবরাঈল আ.-কে জিজ্ঞেস করলেন, 'এ কিসের আওয়াজ?' উত্তরে তিনি বললেন, 'এটি একটি কার্যালয়, যেখানে সৃষ্টি জগতের ঘটনাবলি লিপিবদ্ধ

করে রাখা হয়।' এক একজন মানুষ দৈনিক লাখো রকমের হরকত ও কর্মকাণ্ড সম্পাদন করে থাকে। জানা নেই এ কার্যালয়টি কত বিশাল হবে!

তৃতীয় প্রকার হল ওহীর কলম। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট যখন ওহী অবতীর্ণ হত তখন যায়িদ বিন হারিসা অথবা অন্য কোন সাহাবীকে ডেকে তা লিখিয়ে রাখতেন। এ কলমের উপর আমাদের দীনের স্থায়িত্ব নির্ভরশীল। এভাবে যদি হাদীসও লিপিবদ্ধ করা না হত তবে আজ এত অধিক পরিমানে হাদীসের কিতাব আমাদের হস্তগত হত না। সুতরাং হাদীসের এই ভাণ্ডার এবং কুরআনুল কারীম কলমের মাধ্যমেই সংরক্ষিত করা হয়েছে। যার কারণে আজ আমরা নামায, রোযা, হজ প্রভৃতির আহকাম প্রচারপত্রে প্রকাশ করে থাকি।

চতুর্থ হল তাসাউফের কলম। যা দ্বারা তাসাউফের জরুরী মাসাইল এবং আত্মশুদ্ধির পদ্ধতি সংরক্ষণ করে রাখা হয়।

পঞ্চম প্রকারের কলম হল সিয়াসাত বা রাজনীতির কলম। এ দ্বারা রাজনৈতিক বিষয়াদি সংরক্ষণ করা হয়। কলমের মাধ্যমে বর্তমান যুগে দীনের যে খেদমত করা হচ্ছে, পূর্বের কোন যুগে তা ছিল না। ইমাম আওযায়ী রহ. বলেন, লেখনী ও রচনাবলীতে বিশ্বের কোন জাতি মুসলমানদের সমকক্ষ হতে পারবে না। হিজাযের লাইব্রেরীগুলোতে কোটি কোটি কিতাব সংরক্ষিত রয়েছে। স্পেনের লাইব্রেরী সম্পর্কে একজন খ্রিস্টান মহিলা তার حاضر الأندلس وغاربها গ্রন্থে লিখেছেন: হীন মানসিকতা ও শত্রুতার কারণে খ্রিস্টানগণ সিদ্ধান্ত নিল যে, মুসলমানদের সকল লিটারেচার, সকল রচনাবলী ও গ্রন্থাগার ধ্বংস করে দেয়া হবে। সেমতে সরকারের পক্ষ থেকে এ কাজের জন্য একটি কমিশন গঠন করা হল। যার কাজ ছিল গ্রন্থাবলীকে জ্বালিয়ে দিয়ে অথবা সাগরে ডুবিয়ে দিয়ে ধ্বংস করে দেয়া। উক্ত মহিলা লিখেছেন, এ কর্মজ্ঞ পঞ্চাশ বছর পর্যন্ত চলমান ছিল।

তাতারীগণ বাগদাদের কিতাবগুলো নদী বক্ষে নিক্ষেপ করেছিল, এর দ্বারা নদীতে বড় একটি সেতু তৈরি হয়ে গিয়েছিল। ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন, এক মাস পর্যন্ত ঐ নদীর পানি কালো ছিল (সে যুগে কিতাবপত্র কালির কলম দিয়ে হাতে লিখিত হত বিধায় পানির সংস্পর্শে এলে সে কালি পানিতে মিশে যেত)। যখন একটি লাইব্রেরীর কিতাব দ্বারা এ অবস্থা হয়েছিল, তখন অন্যান্য লাইব্রেরীগুলোর কী অবস্থা ছিল তা সহজেই অনুমান করা যায়।

ইঞ্জিলের যৌবনকালেও খ্রিস্টানগণ নিজেদের লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হয়নি। ইহুদীগণও তাওরাতের যৌবনকালে এরূপ লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি।

বর্তমান যুগেও তাদের যেসব রচনাবলি রয়েছে তাও মুসলমানদের বরকতে হয়েছে। মুসলমানগণ স্পেনে যে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন ইউরোপের বর্তমান উন্নতি ও সমৃদ্ধি তারই ফল। ইউরোপবাসী সে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাগ্রহণ করে নিজ নিজ দেশে শিক্ষার আলো বিস্তার করছে। খ্রিস্টানগণ আজ যে গ্রন্থ রচনার যোগ্যতা অর্জন করেছে তা এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অবদানেই সম্ভব হয়েছে। তারা এ কথা স্বীকারও করে যে, এগুলো মুসলমানদেরই কৃপা, মুসলমানদেরই ফয়েজ।

পরিবেশের প্রভাব

মোটকথা, মাসাইলের প্রচুর প্রচার হয়েছে কিন্তু তা সত্ত্বেও মুসলমানদের মধ্যে না দীনের বিস্তার ঘটছে, না সলফে সালেহীনের মত তাদের ঈমানের দৃঢ়তা আছে, আর না আমাদের অন্তরের অবস্থা এমন হচ্ছে যে, সৎকর্ম সম্পাদন তার দ্বিতীয় স্বভাবে পরিণত হতে পারছে। এর কারণ হল আমাদের সমাজও ইসলামী সমাজ নয় এবং পরিবেশও হয়ে গেছে অনৈসলামিক পরিবেশ। দারুল উলুম দেওবন্দে প্রায় দু'হাজার কর্মচারী রয়েছেন, সেখানে বেনামাযী থাকা কারো পক্ষে সম্ভব নয়। আযান হওয়ার সাথে সাথে চতুর্দিক থেকে সবাই মসজিদের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়। এ হল পরিবেশের প্রভাব। নতুবা সেখানে নামায সম্পর্কে তাকীদ করার কেউ নেই।

ইমাম গাযালী রহ. বলেন, প্রত্যেকটি কাজে প্রথম অবস্থায় রিয়া (লোক দেখানো মনোভাব) থাকে। তারপর তা অভ্যাসে পরিণত হয়, তারপর ইবাদত হয়ে যায়। হাদীসে বলা হয়েছে–

> مروا صبيانكم بالصلوة إذا بلغوا سبعا، واضربوهم عليها إذا بلغوا عشرا.
>
> তোমাদের সন্তানদের বয়স যখন সাত বছর হবে তখন তাদেরকে নামাজের জন্য আদেশ কর। আর যখন তাদের বয়স দশ বছর হয়ে যাবে তখন প্রয়োজনে প্রহার করে হলেও নামায পড়াও।

প্রহার করে যে নামায পড়ানো হবে তা প্রকৃত নামায হবে না। তা হবে ভয়ভীতির নামায। এমনকি সিজদায় গিয়েও চোখ বাঁকিয়ে পিতার দিকে লক্ষ্য রাখবে। যখন দেখবে যে পিতা হাজির নেই তখন ভেগে যাবে। কিন্তু যখন

অভ্যাস হয়ে যাবে এবং কিছু ইলমও তার ভেতর আসবে, তখন বুঝতে পারবে যে নামায হল অত্যন্ত প্রয়োজনীয় জিনিস। তখন এ নামায ইবাদতে পরিণত হবে। মাওলানা রুমী রহ. বলেন–

بہر دنیا بہر دین و بہر نام اللہ اللہ کردہ باید وسلام

দীনের স্বার্থে হোক, দুনিয়ার স্বার্থে হোক, সুনাম-সুখ্যাতি লাভের উদ্দেশ্যে হোক– যেভাবেই হোক, নিশ্চিন্তে আল্লাহ আল্লাহ যিকির করতে থাক।

এজন্যই রিয়া হয়ে যেতে পারে এমন আশংকায় নামাযীকে নামায হতে বাধা প্রদান করা উচিত নয়।

বাইরের প্রভাব অন্তরের মধ্যে

হযরত সুফিয়ান সাওরী রহ. ফিকাহ শাস্ত্রের একজন বিশিষ্ট ইমাম ছিলেন। কিন্তু তাঁর মাযহাব লিপিবদ্ধ হয়নি। তিনি বলেন–

طلبنا العلم لغير الله فابى ان يكون إلا الله.

আমরা গাইরুল্লাহর জন্য ইলম অন্বেষণ করেছিলাম কিন্তু ইলম একমাত্র আল্লাহর জন্য হয়ে গেল।

এর কারণ হল এই যে, বাহিরের প্রভাব অন্তরকেও প্রভাবান্বিত করে। উদাহরণত মনে করুন, কোন পুরুষ যদি মহিলাদের পোশাক পরিধান করতে শুরু করে তবে কিছুদিন পর তার মন চাইবে কথাবার্তাও মহিলাদের মত বলতে। এমনকি এক পর্যায়ে সকল কাজকর্ম ও কথাবার্তা মহিলাদের অনুরূপ করতে থাকবে। এমনিভাবে কেউ যদি লৌকিকতাবশত উলামায়ে কেরামের পোশাক পরিধান করে তবে লোকলজ্জার কারণে বহু গুনাহ থেকে সে বেঁচে যাবে। তদ্রূপ কেউ যদি দরবেশদের অনুরূপ পোশাক পরিধান করে তবে সে পোশাকের প্রভাবও তার অন্তরে ভাস্বর হয়ে উঠবে। যদি কেউ কাফেরদের মত পোশাক পরা শুরু করে দেয় তবে কিছুদিনের মধ্যে অন্যান্য কাজকর্মও কাফেরদের মতই করতে শুরু করবে।

এ কারণেই হাদীস শরীফে বলা হয়েছে– فان لم تبكوا فتباكوا 'আল্লাহর দরবারে কান্নাকাটি করা যদি তোমাদের পক্ষে সম্ভব না হয় তবে অন্তত কান্নার ভান কর'। উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ তাআলার দরবারেও বাহ্যিক আমলের ক্রিয়া

প্রকৃত আমলের অনুরূপ হয়ে থাকে। কান্নার ভান করার দ্বারাও সেই সাওয়াব ও প্রতিদান পাওয়া যাবে, যা প্রকৃত ও বাস্তব কান্না দ্বারা পাওয়া যায়। মোটকথা, বাহ্যিক অবস্থার প্রভাব অন্তরকেও শুধু প্রভাবিত করে না; বরং আল্লাহর দরবারেও সাওয়াব ও প্রতিদানের জন্য তা গ্রহণীয় হয়ে যায়।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হুনাইন যুদ্ধ থেকে যখন প্রত্যাবর্তন করছিলেন তখন পথিমধ্যে এক স্থানে যাত্রা বিরতি করলেন। কাফের-মুশরিকদের অনেক ছেলেমেয়ে তাদের আশপাশে জড় হল। এদের মধ্যে হযরত আবু মাহযুরা রা.ও ছিলেন। মুয়াজ্জিন যখন আযান দিতে শুরু করল তখন ঐ ছেলেরাও উক্ত আযানের অনুকরণ করতে লাগল।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্দেশ দিলেন যে, ছেলেদেরকে ধরে নিয়ে এসো। সাহাবায়ে কেরাম এগিয়ে গেলে ছেলেরা দৌড়ে পালায়। কিন্তু হযরত আবু মাহযুরা রা. তাদের মধ্যে তুলনামূলক বড় ছিলেন বিধায় পালিয়ে যেতে লজ্জাবোধ করলেন। তাকে ধরে এনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সম্মুখে দাঁড় করানো হল। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, যেভাবে অনুকরণ করছিলেন এখন সেভাবে আযান দাও। বল– 'আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার।'

আবু মাহযুরা রা. সাথে সাথে বললেন। এরপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, বল– 'আশহাদু আল লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এখন আবু মাহযুরা রা. চিন্তায় পড়ে গেলেন, যেহেতু এ বাক্যে তাওহীদ ও একত্ববাদের স্বীকৃতি ছিল আর তিনি একত্ববাদে বিশ্বাসী ছিলেন না। তাই নিজেকে অপারগ মনে করে ক্ষীণ স্বরে বললেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, পুনরায় উচ্চৈঃস্বরে বল, এবার উচ্চৈঃস্বরে বললেন। তারপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, বল– 'আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রসূলুল্লাহ' এবার আরো অধিক চিন্তিত হয়ে পড়লেন, কেননা মক্কায় কাফের মুশরিকগণ কোন এক ধরণের তাওহীদে তো বিশ্বাসী ছিল, তারা বলত–

لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك الا شريكا هو لك.

কুরআনে বলা হয়েছে–

قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ○ سَيَقُوْلُوْنَ لِلّٰهِ.

যদি তাদেরকে আপনি জিজ্ঞেস করেন সপ্ত আকাশ ও আরশে আজিমকে কে সৃষ্টি করেছেন? তখন তারা অবশ্যই স্বীকার করবে, আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন। [মুমিনুন : ৮৬-৮৭]

সুতরাং তারাও তাওহীদের কোন কোন স্তরে বিশ্বাসী ছিল। তাই তাওহীদ সংক্রান্ত শব্দাবলী উচ্চারণ করতে বেশি চিন্তার প্রয়োজন হয়নি। কিন্তু তারা ছিল রিসালাতের বিরোধী এবং তাঁর সাথে তাদের সকল দ্বন্দ্ব-কলহ এ রিসালাতকে কেন্দ্র করেই। এ করণেই আবু মাহযুরা রা. প্রথমে নিরবে দাঁড়িয়ে রইলেন, অতঃপর ক্ষীণ স্বরে বললেন, 'আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রসূলুল্লাহ'। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, উচ্চস্বরে বলো, তখন আবু মুহযুরা রা. উচ্চস্বরে দ্বিতীয়বার বললেন।

আবু মাহযুরা রা. এ আযান মুসলমান অবস্থায় দেননি। বরং তা ছিল অনুকরণ মাত্র। কিন্তু হৃদয়ে এরও প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হল। বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! এখন তো আমি আপনার হয়ে গিয়েছি। দেখা যাচ্ছে, হযরত আবু মাহযুরা রা. যখন আযানের শব্দগুলো মৌখিক উচ্চারণ করলেন মাত্র কিন্তু এতেই তাঁর অন্তরে প্রভাব সৃষ্টি হল এবং ইসলাম কবুল করলেন। এজন্যই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যদি কান্না নাও আসে তবু কান্নার ভান কর। নামাযও তদ্রূপ, মন যদি নাও চায় তবুও নামায ত্যাগ কর না, নামায পড়তে থাক। তবে পরিবেশ নামাযী হলে সহজে নামায আদায় হবে। পরিবেশের ওপরই এসব নির্ভর করে। যদি পরিবেশ ভাল ও নামাযী হয় তখন ছেলেরাও নামাযী হয়ে পড়ে। আপনাদের স্মরণ থাকার কথা, যখন পাকিস্তান আন্দোলন জোরেশোরে চলছিল, তখন সভা সমিতি, মিছিল, বিক্ষোভ, আন্দোলন ছেলে খেলার বস্তুতে পরিণত হয়েছিল। কেননা তখন পরিবেশটাই ছিল এমন।

হযরত মাওলানা আনওয়ার শাহ কাশ্মিরী রহ.-এর সম্মুখে একজন অল্প বয়স্ক ছাত্র তাড়াহুড়া করে নামায আদায় ফিরে যাচ্ছিল। হযরত শাহ সাহেব তাকে বললেন, সুন্দর করে নামায পড়লে না কেন? ছাত্রটির মুখ দিয়ে এ কথাটি বেরিয়ে পড়ল যে, যহরত ! আমি ছোট ছোট কিতাব পড়ি। এ কথা শুনে মাওলানা কাশ্মিরী রহ. রাগান্বিত হয়ে বললেন, এসব আমল তো মাতাপিতার কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ হয়, এতে কিতাবের প্রয়োজন পড়ে না। কিন্তু এসব তখনই সম্ভব যখন পিতামাতাও তদ্রূপ হবেন। আর যদি পরিবেশ হয় ব্রিস্টীয় মানসিকতার তবে অন্তর সেদিকে ধাবিত হতে শুরু করবে।

চরিত্র গঠনের ক্ষেত্রে পরিবেশের প্রভাব

একবার হযরত মাওলানা রশীদ আহমাদ গাংগুহী রহ. কোন এক বিবাহ উপলক্ষে থানাভবন গিয়েছিলেন। সেখানে গিয়ে তাঁর খেয়াল হল, এই সুযোগে হাজী সাহেবের (হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজেরে মাক্কী রহ.) সাথেও সাক্ষাৎ করে যাই। সেমতে তিনি গিয়ে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করলেন।

হযরত হাজী সাহেব বুঝতে পেরেছিলেন যে, তিনি একজন সুস্থ মানসিকতার অধিকারী ব্যক্তি। তাই তিনি জানতে চাইলেন, আপনি কারো নিকট বাইআত গ্রহণ করেছেন কি? তিনি উত্তর দিলেন 'না'। হাজী সাহেব বললেন, তাহলে আমার নিকট বায়আত গ্রহণ করে নিন। হযরত গাংগুহী রহ. বললেন, আমি এ শর্তে বায়আত গ্রহণ করতে পারি যে, আপনি আমাকে কোন প্রকার যিকির ও শোগল এর আদেশ করবেন না। হাজী সাহেব বললেন, আমি বায়আতের কথা বলেছি, যিকির ও শোগলের কথা তো বলিইনি; এবং ওয়াদাও করলেন, ভবিষ্যতেও বলব না। তারপর হাজী সাহেব বায়আত করে নিলেন এবং বললেন, দু'-তিন দিন এখানে থেকে যান। তিনি থানাভবন তিনদিন অবস্থান করলেন। রাত যখন আড়াই-তিনটা হল তখন দেখতে পেলেন, সকলেই উঠে তাহাজ্জুদ পড়ছেন।

হযরত গাংগুহী রহ. লজ্জা অনুভব করলেন, তিনিও উঠে গিয়ে তাহাজ্জুদ পড়ে নিলেন। অতঃপর যখন লোকজনকে যিকির ও শোগলে রত হতে দেখলেন তখন তিনিও জিকিরে মশগুল হয়ে পড়লেন। দ্বিতীয় দিনও একই অবস্থা হল। তৃতীয় দিন নিজে নিজেই আনন্দ চিত্তে তাহাজ্জুদ পড়লেন এবং যিকির ও শোগলে মুশগুল হয়ে পড়লেন। তৃতীয় দিন হাজী সাহেবের কাছে গিয়ে বললেন, হযরত! আপনি তো সবকিছুই করালেন। হযরত হাজী সাহেব রহ. বলেন, 'আমি তো আপনাকে কিছু করতে বলিনি, আমি ওয়াদা ভঙ্গ করিনি। এখন আপনি চলে যেতে পারেন।' হযরত গাংগুহী রহ. বললেন, এখন তো আমি যাচ্ছি না। চল্লিশ দিন তিনি সেখানে অবস্থান করলেন এবং এ স্বল্প সময়ের মধ্যে খেলাফত নিয়ে ফিরে এলেন। দেখুন, এ ইবাদত প্রথমে রিয়া ছিল, অতঃপর আদত বা অভ্যাসে পরিণত হল, তারপর ইবাদতে পরিণত হল এবং সাথে সাথে খেলাফতও জুটল।

আমার নিজেরও একটি প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা রয়েছে। যখন আমার বয়স আট বছর ছিল তখন একবার গাংগুহ যাওয়ার সুযোগ হয়েছিল। সেখানে ছিল যিকির ও শোগলের পরিবেশ। গাংগুহের মসজিদ এলাকায় অনেক ধোপা কাপড় ধুত। তারা যখন কাপড় কাঁচত তখন কাপড়ে আঘাত করার সাথে সাথে মুখ থেকে

ইল্লাল্লাহ'র ধ্বনিও নির্গত হত। এ ছিল পরিবেশের প্রভাব, নতুবা তাদেরকে যিকির করার জন্য আদেশ করা হয়নি।

ফার্সিতে একটি প্রসিদ্ধ প্রবাদ রয়েছে– যা কিছু লবণের খণিতে যাবে তা লবণে পরিণত হবে। এই হল পরিবেশের প্রভাব। উত্তম পরিবেশের প্রভাব অবশ্যই উত্তম হবে। সাহাবায়ে কেরাম রা.-এর এমন একটি পরিবেশ ছিল যে, যিনিই সেই পরিবেশে আসতেন তিনি প্রভাবান্বিত না হয়ে পারতেন না। আর তাঁদের পরিবেশও ছিল অত্যন্ত শক্তিশালী। এমনকি যহরত আম্বিয়ায়ে কেরাম আ.-এর পরেই রয়েছে তাঁদের স্থান। এ কথার উপর সকল উম্মত একমত যে, الصحابة كلهم عدول 'সাহাবায়ে কেরাম রা. সকলেই ছিলেন ন্যায়নিষ্ঠ ও বিশ্বস্ত।' যদিও তাঁরা মাসুম নন কিন্তু মাহফুয তো অবশ্যই ছিলেন (বিশেষভাবে আল্লাহ তাঁদেরকে হেফাযত করতেন)। এ কথার উপর উম্মত একমত যে, কোন ব্যক্তি যত বড় গাউস, কুতুব, আবদাল হোক না কেন, অতি সাধারণ একজন সাহাবীর মর্যাদায়ও সে পৌঁছতে পারবেন না। এজন্য যে, যে পরিবেশ তাঁরা পেয়েছিলেন তা অন্য কারো ভাগ্যে জোটেনি। এমন পরিবেশ থেকে আবু জাহলের মত হতভাগারাই কেবল প্রভাবান্বিত না হয়ে থাকতে পারে। আর বাধ্যতামূলকভাবে সেও কিন্তু অন্তরে অন্তরে মুমিন ছিল। যেমন সে তার পারিবারিক পরিবেশে বলত, সে তো সঠিক কথাই বলছে, কিন্তু আমরা যদি তাকে রাসূল বলে মেনে নেই তবে তার গোলামী করতে হবে। এটা মেনে নেয়াকে সে লজ্জাজনক মনে করত।

মোট কথা, কোন পরিবার যদি এ ওয়াদা করে যে আমরা সকল গুনাহ বর্জন করে চলব, তাহলে তাদের পরিবেশে যে ব্যক্তি প্রবেশ করবে সেও তদ্রূপ হয়ে যাবে।

কথা ও কাজে সামঞ্জস্যতার প্রভাব

হযরত মাওলানা উবায়দুল্লাহ সিন্ধি রহ. ছিলেন একজন রাজনৈতিক চিন্তাবিদ। রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সময় তিনি সেখানে ছিলেন। তিনি বলেন, আমি স্টালিনের সাথে সাক্ষাৎ করেছি এবং ইসলামী শাসন ব্যবস্থা ও তার মূলনীতিগুলো প্রমাণসহকারে তার নিকট উপস্থাপন করেছি। স্টালিন বললেন, এ শাসন ব্যবস্থা স্পূর্ণ সঠিক একটি শাসন ব্যবস্থা। যদি বিশ্বে কোন সমাজ ব্যবস্থ প্রতিষ্ঠিত হয়, তবে ইসলামেই হবে। তবে আপনি আমাকে একথা বলুন যে, পৃথিবীর কোথাও কি এ ব্যবস্থা চালু আছে? একথা শুনে মাওলানা নিরব হয়ে

গেলেন। বর্তমান পৃথিবী কথায় সন্তুষ্ট হতে হয় না, কাজ দেখতে চায়। ইমাম মালেক রহ. বলেন–

فمن وافق قوله فعله فنجا ومن لم يوافق قوله فعله فقد هلك.

যে ব্যক্তির কথা তার কাজের সাথে সংগতিপূর্ণ হয়েছে সে মুক্তি পেয়েছে এবং যার কথা তার কাজের সাথে সংগতিপূর্ণ হয়নি সে ধ্বংস হয়ে গেছে।

আজ ইসলামী জুমহুরিয়া (ইসলামী গণতন্ত্র) ঘোষিত হয়েছে, কিন্তু বিশ্ববাসী কথা শুনবে না, তারা কাজ দেখতে চায়। তাই আমাদের জন্য আবশ্যক হল বিশ্বের সামনে একটি আমলী নকশা বা বাস্তব প্রয়োগের নমুনা উপস্থাপন করা। এক ব্যক্তি যত বড় আলেমই হোন না কেন, যে পর্যন্ত সে তার কথা অনুযায়ী আমল না করবে, বেঝা যাবে যে, সে তার নিজের কথার উপর নিজেই আস্থা রাখতে পারছে না।

পরিবেশের প্রভাব রাষ্ট্রীয় আইনেরও উর্ধ্বে

হযরত মাওলানা থানভী রহ.-এর কাছে আগত ব্যক্তিদের মধ্যে নামায, রোযা প্রভৃতির প্রতি সর্বোচ্চ গুরুত্ব তো ছিলই তবে হযরতের ওখানে একটি বিধান এও ছিল যে, অন্যের কষ্ট হয় এমন কোন কাজ কেউ করবে না। একবার খানা ভবনের খানকায় কারো একটি রুমাল পড়ে গিয়েছিল, কিন্তু কেউ রুমালটি সেখান থেকে উঠায়নি। তিনদিন পর্যন্ত রুমালটি এভাবে পড়ে থাকল। পরিবেশের কারণেই রুমালটি চুর করে নেয়ার সাহস কারো হয়নি। এ কারণেই সেখানকার কামরাগুলোর দরজায় তালা লাগানোর প্রচলনই ছিল না।

হিজাযের বাদশাহ ইসলামী আইন-কানুন প্রতিষ্ঠা করতে আগ্রহী। এখন সেখানে একজন নারী যদি স্বর্ণালঙ্কার পরে একাকী সফর করে, তবুও তার কোন প্রকারের ভয়-ভীতি থাকে না। বন্দুক ও তরবারি দ্বারা অন্তরের ভেতর ভয় সৃষ্টি হয় না। পুলিশ ও অস্ত্রের কোন অভাব নেই কিন্তু পৃথিবীতে অন্যায়-অবিচার উত্তরোত্তর কেবল বৃদ্ধিই পাচ্ছে।

আমরা হজ করতে গিয়ে দেখলাম, মাল ভর্তি কয়েকটি বস্তা রাস্তার পাশে পড়ে রয়েছে। এক ব্যক্তি গিয়ে পুলিশকে সংবাদ দিল, অমুক স্থানে খেজুর ভর্তি বস্তা পড়ে রয়েছে। পুলিশ বলল, সংবাদ ঠিক আছে, কিন্তু তুমি কিভাবে জানলে যে, বস্তার ভিতর খেজুর রয়েছে? নিশ্চই তুমি অন্ধকারে অনুসন্ধান করে দেখেছ এবং

চুরি করার জন্য সুযোগ খুঁজেছ কিন্তু পাওনি। এ অপরাধের জন্যও তাকে সাজা দেয়া হল।

ভারতে বিভিন্ন রকমের মেলা অনুষ্ঠিত হয়। মুসলমানরাও হিন্দুদের দেখাদেখি মেলা করতে শুরু করেছে। এগুলোতে সর্বপ্রকার খারাবী ও পাপাচার সংগঠিত হয় এবং অসংখ্য চুরির ঘটনা ঘটে। কিন্তু মক্কা মুকাররমায় লক্ষ লক্ষ লোকের সমাগম হয় কিন্তু কখনো চুরির ঘটনা ঘটে না। মক্কাবাসী কখনো চুরি করে না। আমি এ কথা বলছি না যে, তাদের ভুল-ভ্রান্তি হয় না, কিন্তু তাদের মধ্যে অবশ্যই দীন ও দিয়ানতের প্রাধান্য রয়েছে। চোরের হাত একবার কেটে দিলে কয়েক বছরের জন্য দেশ নিরাপদ হয়ে যায়।

ইসলামী শাস্তি বিধান 'রজম' (প্রস্তর নিক্ষেপে হত্যা করা) ও হাত কাটাকে অমানবিক সাজা বলে কেবল তারাই আখ্যায়িত কতে পারে, যাদের নিকট চুরি, ব্যভিচার ইত্যাদি মানবীয় কাজ বলে স্বীকৃত। আল্লাহর দীনসমূহে ব্যভিচারের চেয়ে জঘন্য কোন অপরাধ ছিল না। কোন একজন মহিলা এই অপকর্মে লিপ্ত হলে সম্পূর্ণ খান্দানের দুর্নাম হয়, নাম ও ঐতিহ্যে কলংকের দাগ অংকিত হয়, বংশে দেখা দেয় বিরোধ ও দ্বন্দ্ব। এ কাজটি হল অত্যন্ত পাশবিক, কাজেই পাশবিক পাপ কর্মের উপর যদি পাশবিক সাজা প্রদান করা হয় তবে এতে আপত্তি করার কী আছে?

আশ্চর্যের বিষয়, বর্তমান কালের আইনে একে বৈধ করা হয়েছে যে, যদি উভয়ের সম্মতিতে হয় তবে কোন অপরাধই হয় না; শুধু জোরপূর্বক ব্যভিচারই আইনের দৃষ্টিতে দণ্ডনীয় অপরাধ। উভয় পক্ষের সম্মতি যদি থাকে তবে তা কোন অপরাধ নয়। যাই হোক, পরিবেশের সাথে এসব বিষয়গুলোর গভীর সম্পর্ক রয়েছে।

রাষ্ট্রীয় বিধিবিধান অপরাধমূলক কার্যকলাপকে হয়ত প্রতিরোধ করতে পারে, কিন্তু অন্তরে অপরাধের প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি করতে পারে না। চোর চুরি হতে, ব্যভিচারী ব্যভিচার হতে আইনের ভয়ে বিরত থাকতে পারে, কিন্তু চুরি ও ব্যভিচারের প্রতি তার অন্তরে ঘৃণা আইনের দ্বারা সৃষ্টি হতে পারে না। অপরাধের প্রতি ঘৃণা এবং গুনাহের প্রতি অসন্তুষ্টি একমাত্র আল্লাহওয়ালাদের সাহচর্য ও সান্নিধ্যের মাধ্যমেই লাভ হয়ে থাকে।

গীবত (পরনিন্দা) সম্পর্কে আল্লাহ বলেন–

أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَّأْكُلَ لَحْمَ أَخِيْهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوْهُ.

তোমাদের কেউ কি পছন্দ করে যে, সে তার মৃত ভাইয়ের গোশত ভক্ষণ করবে? নিশ্চয়ই তোমরা একে ঘৃণা করবে। [হুজুরাত : ১২]

গীবতকে মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়ার সাথে তুলনা করা হয়েছে, যা অপবিত্র জিনিস, কিন্তু মানুষ গীবত থেকে কখন বেঁচে থাকবে? যখন অন্তরে গুনাহের প্রতি ঘৃণার সৃষ্টি হবে। অন্যথায় রাষ্ট্রীয় আইন তো এখানে সম্পূর্ণ অচল।

মিথ্যা কথা বলা সম্পর্কে হাদীসে বলা হয়েছে যে, মানুষ যখন মিথ্যা বলে তখন তার মুখে এক ধরণের দুর্গন্ধের সৃষ্টি হয়। এ দুর্গন্ধের কারণে ফেরেশতাগণ তার কাছ থেকে দূরে চলে যান। যখন সে মিথ্যা বলা বন্ধ করে তখন তারা পুনরায় ফিরে আসেন। গুনাহের প্রতি ফেরেশতাদের ঘৃণা রয়েছে। এমনিভাবে মানুষের মধ্যে যখন ফেরেশতাসুলভ গুণাগুণের সমাবেশ ঘটে তখন সেও গুনাহকে ঘৃণা করে এবং গুনাহের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়। এখানে সরকারের পক্ষ থেকে এমন কোন জবাবদিহিতা নেই যে, এ কারণে মানুষ মিথ্যা বলা থেকে বিরত থাকবে। কিন্তু অন্তরে গুনাহের প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি হয়ে গেলে মিথ্যা থেকেও বেঁচে থাকবে এবং অন্যান্য গুনাহ হতেও বেঁচে থাকবে।

মুশরিকদের সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা কুরআনে ইরশাদ করেন–

إِنَّمَا الْمُشْرِكُوْنَ نَجَسٌ.

মুশরিকগণ (বিশ্বাসের ভিত্তিতে) নাপাক ও অপবিত্র। [তাওবা : ২৮]

বোঝা গেল, শিরক এবং অন্যান্য বিশ্বাসজনিত গুনাহ অপবিত্র। মানুষ যেভাবে বাহ্যিক নাপাকি শরীরে মাখা হতে বেঁচে থাকে এবং তা থেকে দূরে সরে থাকে তদ্রূপ যাদের অন্তরের অনুভূতি জাগ্রত রয়েছে তারা বিশ্বাসগত অপবিত্রতা থেকে নিজেকে রক্ষা করে এবং সে অনুভূতি দ্বারা এ নাপাকীগুলোকে চিনতেও পারে।

যহরত উসমান রা.-এর যুগে এক ব্যক্তি তাঁর নিকট আগমন করার সময় পথে এক মহিলার প্রতি হঠাৎ দৃষ্টি পড়ল। এ দৃষ্টি গুনাহ ছিল না। কেননা, হাদীসে বলা হয়েছে–

النظرة الأولى لك والثانية عليك.

অনিচ্ছায় পতিত হওয়া প্রথম দৃষ্টিতে গুনাহ নেই, পরবর্তী দৃষ্টি যা স্বেচ্ছায় পতিত হয় তাতে গুনাহ রয়েছে।

কিন্তু ঐ ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে দ্বিতীয়বার দৃষ্টিপাত করেছিল। যখন হযরত উসমান রা.-এর নিকট উপস্থিত হল তখন তিনি বললেন–

ما للرجال يأتوننا وفى قلوبهم أثر الزنا

মানুষের একি হল! তারা আমার নিকট আগমন করে অথচ তাদের অন্তরে ব্যভিচারের চিহ্ন রয়েছে।

তার কারণ ছিল এই, হযরত উসমানের রূহ ও আত্মার অনুভব ক্ষমতা ছিল অত্যন্ত প্রখর, যার দ্বারা তিনি গুনাহের চিহ্ন দেখতে পেয়েছিলেন। এ শক্তি এত প্রখর কেন ছিল? এজন্য যে, তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহচর্য লাভ করেছিলেন। তার প্রভাবেই গুনাহরাজি দেখতে পেতেন।

ইমাম আবু হানিফা রহ. যখন মসজিদে আগমন করতেন এবং লোকজনকে ওযু করতে দেখতেন তখন তিনি তার চক্ষুদ্বয় নিম্নমুখী করে নিতেন। মানুষ এর কারণ জানতে চাইলে তিনি বললেন, হাদীস শরীফে বলা হয়েছে, মানুষ যখন ওযু করতে শুরু করে তখন তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সকল গুনাহ ওযুর পানির সাথে ঝরে যায়। যখন কুলি করে, তখন মুখের সকল গুনাহ ঝরে যায়, যখন মাথা মাসেহ করে তখন মাথার গুনাহসমূহ ঝরে যায়, যখন পা ধৌত করে তখন পা দ্বারা কৃত সকল গুনাহ ঝরে যায় ইত্যাদি। ইমাম সাহেব রহ. বলেন, যখন গুনাহগুলো ঝরতে থাকে তখন অনুভব করতে পারি যে, কোন ব্যক্তি কোন গুনাহে লিপ্ত রয়েছে। এ দ্বারা তার প্রতি হীন ধারণা সৃষ্টি হয়। তাই আমি চক্ষু বন্ধ করে বা নিম্নমুখী করে রাখি যেন গুনাহগুলো দৃষ্টিগোচর না হয় এবং কারো প্রতি হীনতা ও কুধারণার সৃষ্টি হতে না পারে। যাদের রূহানী শক্তি প্রখর থাকে তারা গুনাহসমূহ দেখতে পান।

পরকালীন হিসাব-নিকাশের পার্থিব চিত্র

ইহকালীন আমলসমূহ পরকালে সকলের চোখের সামনে দৃশ্যমান হবে। হাদীসে বলা হয়েছে, কিয়ামতের দিন মানুষের সম্মুখে দু'টি জিনিস থাকবে। একটি হল জান্নাত-জাহান্নাম, অপরটি হল আমলের বাস্তব আকৃতি। আমলের বাস্তব আকৃতির উদাহরণ হল এই– কবি গালিবের 'দিওয়ানে গালিব' গ্রন্থখানা সম্প্রতি নতুনভাবে ছাপা হয়েছে। কবি গালিব এক একটি কবিতার মধ্যে যে ভাব প্রকাশ করেছেন তার একটি দৃশ্যচিত্র কবিতার নিচে অঙ্কন করে সে ভাবটি প্রকাশ করা হয়েছে।

হাদীসে 'ইলম'-এর বাস্তব আকৃতি দুধ, নামাযের বাস্তব আকৃতি লাবণ্যময়ী নারী এবং দানশীলতার বাস্তব আকৃতি এক বিরাটকায় গাছের কথা বর্ণিত হয়েছে। এ বৃক্ষের ছায়ায় দানশীল ব্যক্তি বসবেন এবং প্রশান্তি লাভ করবেন, যেভাবে তার দান দ্বারা দুনিয়াতে দরিদ্রশ্রেণী উপকৃত হত। এগুলো হল নেক আমলের 'সুরাতে মিসালী' বা বাস্তব আকৃতি। এমনিভাবে গুনাহ ও মন্দ আমল সম্পর্কে হাদীসে বলা হয়েছে যে, যে ব্যক্তি বিত্তশালী কিন্তু যাকাত আদায় করেনি, কিয়ামতের ময়দানে তার ধন-দৌলত সাপের আকৃতি ধারণ করবে এবং বিত্তশালীর গলায় জড়িয়ে থাকবে। সে সাপ তাকে দংশন করবে আর বলতে থাকবে– আমি তোমার ধন-দৌলত। কেননা ধন-সম্পদের বাহ্যিক আকৃতি খুব চাকচিক্যময় হয়ে থাকে এবং এর কল্পনাও মনকে আনন্দিত করে। যেমন কোন ব্যক্তির নিকট যদি সম্পদ থাকে এবং সে তা ব্যয়ও করছে না, তথাপি যদি তা চুরি হয়ে যায় তবে সে অন্তরে অত্যন্ত দুঃখ অনুভব করবে। আর যদি এমন মাল হয় যা নাজায়িয পন্থায় উপার্জন করা হয়েছে, যেমন চুরি করে সংগ্রহ করা হয়েছে। এ জাতীয় সম্পদে এক প্রকার বিষ থাকে। যেহেতু এ অপকর্মটি সাজার যোগ্য, তাই যাকাত প্রদান না করার মত জঘন্য অপরাধের সাজার আকার দেয়া হয়েছে বিষধর সাপের। যেমন কর্ম তেমন প্রতিদান।

মোটকথা, প্রতিটি আমলকেই তার গুণাগুণের প্রতি লক্ষ রেখে আকৃতি দেয়া হবে। আর যদি এসব অসৎ মন্দ ও গর্হিত অভ্যাসগুলো মনুষের মধ্যে মজবুত ও দৃঢ় হয়ে যায়, তবে পরকালের পূর্বে ইহকালেই কিছু সাজা প্রকাশ পেতে শুরু করে দেয়। আকার আকৃতি হিসাবে এরা যদিও মানবীয় কাঠামো নিয়ে চলাফেরা করছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মানবতাহীন জীব বিশেষ। যাদেরকে আল্লাহ তাআলা অন্তর্দৃষ্টি দান করেছেন, তারা চর্মচক্ষু দিয়েও এসব কীর্তি দেখতে পান।

শায়খ তাকিউদ্দিন ইবনে দাকীকুল ঈদ রহ. ছিলেন উঁচু মাপের একজন আরিফবিল্লাহ। কাশফ ও কারামাতের অধিকারী ওলী ছিলেন তিনি। যখন বাগদাদের মসজিদে প্রবেশ করতেন তখন চেহারার উপর ঘোমটা দিয়ে রাখতেন। মানুষ এর কারণ জানতে চাইলে তিনি বললেন, আমি যখন মসজিদে গমন করি তখন পথিমধ্যে কাউকে কুকুর, কাউকে শুকর, কাউকে অন্যান্য আকার-আকৃতিতে দেখতে পাই। তাই মুখমণ্ডল ঢেকে রাখি যেন মুসলমানদের সম্পর্কে হীন ধারণা সৃষ্টি না হয়। এ হল এক ভিন্ন জগৎ, যে জগৎ আল্লাহওয়ালাদের নিকট গোপন নয়, তারা সম্যক অবগত। আল্লামা ইকবাল বলেন–

ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں

مقامات آہ و فغاں اور بھی ہیں

নক্ষত্ররাজির ওপরে আরো জগৎ রয়েছে, আল্লাহ-প্রেমে ক্রন্দন ও আহাজারির স্তর এখনো অনেক রয়েছে।

বর্তমান পৃথিবীর বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারাদি আমলের 'বাস্তব আকৃতি' বা সুরতে মিসালীকে বোঝা তো আরো সহজ করে দিয়েছে। যেমন সি.আই.ডি (CID) বিভাগের নিকট এমনসব যন্ত্রপাতি রয়েছে যার দ্বারা তারা সকল প্রকার গোপন কর্তাবার্তা সম্পর্কে অবগত হতে পারে এবং ঘটনার গভীরে পৌঁছে যেতে সক্ষম হয়। অপরাধীর অস্বীকার করার অবকাশ থাকে না।

আল্লাহ তাআলাও ততক্ষণ পর্যন্ত কাউকে সাস্তি দিবেন না, যতক্ষণ পর্যন্ত জীবনের সকল রেকর্ড তার সম্মুখে উপস্থাপন না করবেন। অতঃপর সকল আমলের সুরতে মিসালী সারিবদ্ধভাবে তার সম্মুখে পেশ করা হবে। (যেমন বর্তমানে ভিডিওতে কাজকর্ম ও নড়চড়া স্ব-আকৃতিতে থেকে যায়)।

হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, পৃথিবীর যে স্থানে বসে কোন নেক আমল করা হবে, নামায পড়া হবে– কিয়ামতের দিন সেই স্থানটি সাক্ষ্য প্রদান করবে। এভাবে পৃথিবীর যে স্থানে বসে কোন পাপকর্ম করা হবে, কিয়ামতের দিন ঐ স্থানটিও সাক্ষ্য প্রদান করবে যে, সে অমুক গুনাহ আমার উপরে বসে সম্পাদন করেছিল। এখানেই শেষ নয়, ফেরেশতাগণও সাক্ষ্য প্রদান করবেন। অধিকন্তু আমাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলোকে কথা বলার শক্তি প্রদান করা হবে এবং মুখের কাছ থেকে কথা বলার শক্তি হরণ করা হবে। তখন যে অঙ্গ দ্বারা যে কাজ করেছে, সে অঙ্গ স্বয়ং তা প্রকাশ করে দেবে যে, আমার দ্বারা অমুক কাজ করেছ। এসব দলীল প্রমাণের পর তার অস্বীকার করার সাহস হবে না; এবং নিজেই স্বীকার করে নেবে যে, আমি এ শাস্তির যোগ্য। অতঃপর আল্লাহ তাআলা ইচ্ছা করলে শাস্তিও দিতে পারেন, আবার ক্ষমাও করে দিতে পারেন, কিন্তু ক্ষমা করা হলে তা হবে গুনাহের স্বীকৃতির পরে।

সংশোধনের পদ্ধতি

অন্তরকে মুত্তাকী বানানো দীনের কাজ, মানুষের কাজ নয়। আর এ কাজ পরিবেশ উত্তম হওয়ার মাধ্যমে হয়ে থাকে। আর পরিবেশ উত্তম করণের সূচনা

নিজ ঘর থেকেই করা উচিত। যেমন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে প্রথমে বলা হয়েছে–

قُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَ اَهْلِيْكُمْ نَارًا

নিজেকে ও নিজের পরিবারবর্গকে দোযখের লেলিহান আগুন থেকে রক্ষা করুন। [তাহরীম : ৬]

পরিবারবর্গ যখন নেক কাজের নমুনায় পরিণত হলেন তখন আদেশ দেয়া হল–

وَاَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْاَقْرَبِيْنَ.

আপনি নিকটতম আত্মীয়দেরকে (আল্লাহর আযাব ও শাস্তি হতে) সতর্ক করে দিন। [শুআরা : ২১৪]

তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর আত্মীয়-স্বজনকে ঈমান গ্রহণের জন্য আহ্বান জানালেন। যাদের মধ্যে সৌভাগ্যের ছাপ ছিল তারা আকৃষ্ট হল এবং ঈমান কবুল করলেন। অতঃপর আদেশ দেয়া হল–

وَلِتُنْذِرَ اُمَّ الْقُرٰى وَمَنْ حَوْلَهَا.

আপনার নিকট ওহী প্রেরণ করা হয়েছে যেন আপনি মক্কাবাসী ও মক্কার আশেপাশে বসবাসকারীদেরকে সাবধান-সতর্ক করে দিতে পারেন। [আনআম : ৯২]

তারপর বলা হল–

تَبٰرَكَ الَّذِيْ نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلٰى عَبْدِهٖ لِيَكُوْنَ لِلْعٰلَمِيْنَ نَذِيْرًا○

পরম কল্যাণময় তিনি যিনি তাঁর বন্দার প্রতি ফয়সালার গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছেন, যাতে সে বিশ্বজগতের জন্যে সকর্তকারী হয়। [ফুরকান : ১]

সর্বশেষে জনাব রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট সমগ্র বিশ্বের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। সেমতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সমসাময়িক রাজা-বাদশাহদের নিকট দূত মারফত পত্র প্রেরণ করলেন, সকলকে ঈমান গ্রহণের দাওয়াত দিলেন।

ইসলাহ ও সংশোধনের পদ্ধতি হল এই– ইসলাহের সূচনা নিজের ঘর ও পরিবার থেকে কর। নেক কাজ ও গুনাহের কাজ– উভয় ক্ষেত্রে মানুষের অবস্থা মেষ

পালের মত। আমার অনেকবারের অভিজ্ঞতা যে, কোন মসলিসে একজন মুসাফাহা করলে সকলেই মুসাফাহা করার জন্য ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েন। এমনিভাবে যদি একজনে সূচনা করে তবে অন্যদের থেকেও সকল খারাপ অভ্যাস দূর হতে থাকে। আর ধারাবাহিকতাও এমন হওয়া উচিত যে, প্রথমে গুনাহ বর্জন করতে হবে, তারপর নেক ও সৎকাজ গ্রহণ করতে হবে। আর গুনাহর মধ্য হতে প্রথমে কবিরা গুনাহকে অতঃপর সগিরাহ গুনাহকে বর্জন করতে হবে।

হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, এক ব্যক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকটে উপস্থিত হয়ে আরয করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি ঈমান গ্রহণ করতে চাই কিন্তু যেসব খারাপ কাজ করছি তা ত্যাগ করতে পারছি না।

হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, শুধু মিথ্যা বলা ছেড়ে দেয়ার অঙ্গীকার করতে পারো? সে বলল, জি হ্যাঁ, তা পারি। এ অঙ্গীকার করে খুশিমনে বাড়ি চলে গেল। অতঃপর যখনই অন্তরে গুনাহের খেয়াল হত, সাথে সাথে জবাবদিহিতার কথাও স্মরণ হত। যখন শরাব পান করার খেয়াল হল, তখন এ খেয়াল অন্তরে উদিত হল যে, এ কাজ গোপন থাকবে না, তারপর হয়ত মিথ্যা বলতে হবে, নতুবা সাজা-শাস্তি গ্রহণ করতে হবে। এতে অপমান হবে, কলংক হবে। যখন চুরি করার খেয়াল হল তখন এ ধারণা হল যে, এ কুকর্মও গোপন থাকবে না। তখন সমাজে লজ্জিত ও অপমানিত হতে হবে। তাই চুরি করা হতে বিরত থাকল। সর্বশেষে যিনায় লিপ্ত হয়ে পড়ার জন্য চরম উত্তেজনা দেখা দিল। তখনও একথা স্মরণ হল যে, যদি এ অপকর্ম প্রকাশ হয়ে পড়ে তবে চরম লজ্জিত ও লাঞ্ছিত হতে হবে।

এদিকে মিথ্যা কথা না বলার পূর্ণ অঙ্গীকার করে ঈমান গ্রহণ করেছি, কাজেই এ অঙ্গীকার রক্ষা করতে হবে। তো এ অঙ্গীকারের কারণে সকল গুনাহ নিজ থেকেই দূর হয়ে গেল। ভোরবেলায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমতে হাজির হয়ে আরয করল, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি একটি মন্দ কাজ ত্যাগ করার জন্য বলেছিলেন, কিন্তু তার বদৌলতে এখন সকল মন্দ কাজ ত্যাগ করা হয়ে গিয়েছে। বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক সংক্ষিপ্ত ব্যবস্থাপত্র দিয়ে থাকেন আর তাতেই সকল রোগের চিকিৎসা হয়ে যায়।

এক গ্রাম্য ব্যক্তি এসে হযরত মাওলানা গাংগুহী রহ.-এর নিকট বায়আত গ্রহণ করল। বায়আত গ্রহণের পর সে বলতে লাগল, মৌলভী জী! আপনি তো কোন কিছু জিজ্ঞেসও করলেন না, আমি তো আফিম খেয়ে অভ্যস্ত। হযরত বললেন না যে, আফিম খাওয়া হারাম, তুমি এখনি তা সম্পূর্ণ ত্যাগ কর; বরং বললেন,

দৈনিক যে পরিমাণ গ্রহণ কর আগামী বিশ দিন পর্যন্ত দৈনিক তার অর্ধেক পরিমাণ গ্রহণ করবে। এর পরবর্তী বিশ দিন তারও অর্ধেক গ্রহণ করবে। ক্রমান্বয়ে এ অভ্যাস দূর হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ।

কিন্তু সে লোকটি ছিল দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। যখন শুনল আফিম হারাম, সাথে সাথে সম্পূর্ণ ত্যাগ করল। তারপর খানকাহ হতে নিজ বাড়িতে চলে গেল এবং অসুস্থ হয়ে পড়ল। মারাত্মক আকারে ডায়রিয়া দেখা দিল। এ রোগ ছয় মাস পর্যন্ত স্থায়ী হল। এরপর সুস্থ হয়ে হযরত গাংগুহী রহ.-এর খেদমতে হাজির হল এবং পাঁচ টাকা হাদিয় স্বরূপ পেশ করল। হযরত গাংগুহী রহ. দরিদ্র ব্যক্তিদের নিকট থেকে হাদিয়া গ্রহণ করতেন না, তাই ফেরত দিয়ে দিলেন। তখন সে বলল, হযরত! আমি ছয় মাসে পাঁচ টাকার আফিম খেতাম কিন্তু তা না খাওয়াতে আমার নফস খুশি হয়ে বলল, ভালই হল, পাঁচটি টাকা তো বেঁচে গেল। তাই আমি সিদ্ধান্ত নিলাম, এ পাঁচ টাকা নফসকে ভোগ করতে দেব না বরং যার কারণে আফিম ত্যাগ করেছি তাঁকেই দিয়ে দেব। তারপর হযরত তা থেকে অল্প কিছু নিলেন।

সংশোধনের দৃঢ় সংকল্প

বর্তমানে প্রধানতম মুসিবত হল এই, ইসলাহ বা সংশোধনের দৃঢ় সংকল্পই গ্রহণ করা হচ্ছে না। মানুষ অভিযোগ করে বলে যে, পরিবেশ ভাল নয়। পরিবেশ তো এমন কোন বৃষ্টিধারা নয় যে আকাশ হতে বর্ষিত হবে। পরিবেশ উন্নত করণও দৃঢ় সংকল্প দ্বারাই হয়ে থাকে।

تو ہی اگر نہ چاہے تو بہانے ہزار ہیں

তুমি যদি ইচ্ছাই না কর তবে হাজারো বাহানা রয়েছে।
প্রত্যেকেই অপরের জন্য উপদেশদাতা, নিজের জন্য নয়।

শরীয়ত এ শিক্ষাই দিয়েছে যে, নিজের নফসের প্রতি সর্বদা খারাপ ধারণা পোষণ করবে আর অন্যদের বেলায় সুধারণা পোপষণ করবে। কিন্তু পৃথিবীর অবস্থা তার সম্পূর্ণ বিপরীত।

দিল্লীর শেষ সম্রাট জফর শাহ, যার থেকে রাজত্ব ছিনিয়ে নেয়া হয়েছিল; শেষ জীবনে তিনি সুফী হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি বলেন–

نہ تھی حال کی جب ہمیں اپنی خبر

رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر

پڑی جب اپنی برائیوں پہ نظر

تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا

নিজেদের অবস্থার খবর যখন আমাদের ছিল না, তখন সর্বদা অন্যদের দোষ-ত্রুটি খুঁজে বেড়াতাম। যখন নিজের দোষগুলো দেখতে শুরু করলাম তখন খারাপ কাউকে আর খুঁজে পেলাম না।

আমি আরয করছিলাম যে, দীনের প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া এজন্য কম হচ্ছে না যে, ইলম ও জ্ঞানের স্বল্পতা রয়েছে; বরং আমাদের সমাজ ব্যবস্থা ভাল নয়। তাই সর্বাগ্রে পরিবশ ও সমাজ ব্যবস্থাকে সংশোধন করা আবশ্যক।

বর্তমানে সুশীল ও কল্যাণকামীদের পক্ষ থেকে ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করার দাবি উঠছে এবং সরকারও হয়ত মহৎ উদ্দেশ্যে তা বাস্তবায়নে আগ্রহী হবে। কিন্তু সকল কাজ তো আইন দ্বারা হয় না। ব্যভিচারের প্রচার তো সরকারিভাবে করা হচ্ছে না, তথাপি যে যেনা-ব্যভিচার হচ্ছে তা মন্দ পরিবেশের কারণে হচ্ছে।

এভাবে চুরির ব্যাপারটি দেখুন। আজও চুরি, ব্যভিচার আইনত অপরাধ। ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত না হলেও আংশিকভাবে তো আজও প্রচলিত রয়েছে। এতদসত্ত্বেও চুরি ও ব্যভিচার সংঘটিত হচ্ছে। যদি পূর্ণাঙ্গ ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার প্রচলন করা হয় অথচ পরিবেশ এমনই থেকে যায় তাহলেও চুরি ব্যভিচার হতে থাকবে। এজন্য সকল দায়-দায়িত্বই সরকারের উপর ছেড়ে দেয়া উচিত নয়। ইসলামের যে সকল আইন প্রচলিত রয়েছে অন্তত তার উপর তো আমল করা উচিত। সেগুলোর উপরও আজ আমল নেই।

আমি যে আয়াত তিলাওয়াত করেছি তাতে শুধু তাকওয়ার কথাই বলা হয়নি, বরং সৎকর্মশীলদের সাহচর্য গ্রহণের নির্দেশও রয়েছে। এজন্য ইলমের অধিকারী ব্যক্তিবর্গ এবং সুফী-দরবেশদের সাহচর্য গ্রহণ করা উচিত।

হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুগন্ধি বিক্রেতার দোকানের সাথে উত্তম সাহচর্যের তুলনা করেছেন। মানুষ যদি সেখানে যায় তবে আতর ক্রয় না করলেও সুগন্ধি সাথে নিয়ে ফিরে আসে। অপরদিকে অসৎ সাহচর্যকে কর্মকারের দোকানের সাথে তুলনা করেছেন। মানুষ যদি সেখানে যায় তবে কাপড় পুড়ে না

গেলেও অন্তত ধোঁয়া তাকে আচ্ছন্ন করে নিবে। মোটকথা, উত্তম সাহচর্য ও সালিহীনদের সান্নিধ্য গ্রহণ করার আবশ্যকতা রয়েছে।

প্রয়োজন অনুযায়ী আয়াতের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা হয়ে গেছে, সময়ও যথেষ্ট হয়েছে। এখন আমি শেষ করতে চাচ্ছি। আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে খাতেমা বিল খায়র নসীব করুন এবং তাঁর পছন্দনীয় পথে চলার তাওফীক দান করুন। আমীন!

اللهم ربنا تقبل منا إنك انت السميع العليم

وأخر دعوانا ان الحمد لله رب العٰـلمين.

বয়ান : ৭

মুক্তির পথ

নাজাতের জন্য চারটি মূলনীতি বর্ণিত হয়েছে– ইলম, আমল, ইখলাস ও পরকাল চিন্তা। এ হল চারটি ভিত্তি, যার দ্বারা মানবতা গঠিত হয়, মানুষের মনুষ্যত্ব উন্নত হয়। মানুষের মধ্যে যদি ইলম না থাকে তবে তা হল নিকষ অন্ধকারাচ্ছতা। জাহালাত বা মূর্খতা দ্বারা মুক্তি পাওয়া সম্ভব নয়। যদি ইলম এসে যায় তবে ঔজ্জ্বল্য আসবে, কিন্তু যদি আমল না থাকে তবে শুধু ইলম কাউকে নাজাত দিবে না, বরং বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। যদি ইলমের সাথে আমলও থাকে কিন্তু সে আমলে ইখলাস না থাকে, বরং মুনাফেকী বা কপটতা থাকে, তবে সে আমলও বেকার– নাজাত দিতে পারবে না। যদি ইলম, আমল, ইখলাস সবই থাকে কিন্তু অন্তরে গর্ব-গরিমা থাকে যে, আমিই শ্রেষ্ঠ ইবাদতকারী; পরকালের ভয়ভীতি অন্তরে না থাকে, তবে সে ইখলাসও মূল্যহীন। এ চারটি জিনিসের সমন্বয়ের মাধ্যমেই মানুষের মানবতা গঠিত হবে, উন্নতি ও সমৃদ্ধি লাভ হবে।

–হযরত হাকীমুল ইসলাম রহ.





اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُه وَنَسْتَعِيْنُه وَنَسْتَغْفِرُه وَنُؤْمِنُ بِه وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّاٰتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَّهْدِه اللّٰهُ فَلاَ مُضِلَّ لَه، وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلا هَادِىَ لَه، وَنَشْهَدُ أَنْ لاَّ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَه لاَ شَرِيْكَ لَه، وَنَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَمَوْلاَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُه وَرَسُوْلُه، أَرْسَلَهُ اللّٰهُ إِلىٰ كَافَّــةً لِّلنَّاسِ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا وَّدَاعِيًا إِلَيْهِ بِإِذْنِه وَسِرَاجًا مُّنِيْرًا.

أَمَّــا بَعْدُ:

فَقَدْ قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: النَّاسُ كُلُّهُمْ هَالِكُوْنَ إِلاَّ الْعَالِمُوْنَ، وَالْعَالِمُوْنَ كُلُّهُمْ هَالِكُوْنَ إِلاَّ الْعَامِلُوْنَ، وَالْعَامِلُوْنَ كُلُّهُمْ هَالِكُوْنَ إِلاَّ الْمُخْلِصُوْنَ، وَالْمُخْلِصُوْنَ عَلى خَطَرٍ عَظِيْمٍ.

আমার সম্মানিত ভাই ও বোনেরা!

আমি এখন আপনাদের সামনে যা পাঠ করলাম তা হল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর একটি হাদীস। এতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন কিছু মৌলিক কথা বর্ণনা করেছেন, যার মধ্যে মানুষের ইহকালীন ও পরকালীন মুক্তি সীমাবদ্ধ রয়েছে। এখন আমি এ মূলনীতিগুলোর

ব্যাখ্যা উপস্থাপন করতে চাচ্ছি। স্বল্প সময়ের মধ্যে এগুলোর কিছু প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা আপনাদের সামনে উপস্থাপন করার চেষ্টা করব।

অভ্যন্তরীণ গুণের ভেতর মানুষের মুক্তি নিহিত

প্রথমে এই মূলনীতিটি বুঝে নিন– যে কোন ধরনের উপকার মানুষের তখনই সাধিত হয় যখন কোন গুণাগুণ ও কল্যাণময়তা তার নফসের ভেতর এসে যায়, নফসের সাথে সংযুক্ত হয়ে যায়। বাইরে যত গুণাবলিই বিস্তৃত থাক না কেন, সে যদি এগুলোকে নিজের ভেতর সঞ্চয় করতে না পারে তবে তার জন্য উপকৃত হওয়ার কোনই পদ্ধতি সৃষ্টি হয় না। মনে করুন একটি ফুলবাগিচায় নানা প্রকারের ফুল প্রস্ফুটিত হয়ে রয়েছে, ফুলের সুগন্ধে চারদিক মোহিত হয়ে রয়েছে। কিন্তু কেউ যদি নাক বন্ধ করে বসে থাকে এবং ঘ্রাণকে ভিতরে প্রবেশ করতে না দেয়, তবে তার কোনই উপকার অর্জিত হবে না। উপকার তখনই হবে যখন ঘ্রাণ ভিতরে প্রবেশ করতে পারবে এবং মস্তিষ্ক তা দ্বারা উপকৃত হতে পারবে। পৃথিবীতে যদি হাজারো সুশ্রী ও রূপবতী যুবতীগণ ঘুরে বেড়ায়, উহা থেকে উন্নততর শোভা-সৌন্দর্য যদি সামনে থাকে, কিন্তু এক ব্যক্তি চোখ বন্ধ করে বসে রইল, তবে সে অনুভব করতে পারবে না কে সুন্দর সুশ্রী আর কে অসুন্দর। তখন তার অন্তর না কামনায় বিভোর হবে, না ভালবাসায় আপ্লুত হবে। প্রেমের কি স্বাদ তা সে অনুভবও করতে পাবে না। তার কোন উপকারও হবে না। পৃথিবীর শূন্যমণ্ডলে যত সুমধুর সুর থাকুক না কেন, যত উন্নততর সুরলহরী পরিবেশকে মুগ্ধ করুক না কেন– যার কানে শ্রবণ শক্তি নেই কিংবা যে তুলা দিয়ে কান বন্ধ করে রেখেছে তার কানে কোন সুর পৌঁছতে পারবে না। এ সুর দ্বারা তার কোন উপকার সাধিত হবে না। কিতাবপত্রে হাজারো মাসাইল লিপিবদ্ধ রয়েছে, ইলম বিস্তৃত হয়ে রয়েছে, কিন্তু যার হৃদয় কপাট তালাবদ্ধ, ইলম ভিতরে প্রবেশ করতে পারছে না, তবে তার কোন লাভ হবে না, উপকার হবে না। দুনিয়া ঈমানে পরিপূর্ণ রয়েছে, লক্ষ লক্ষ মুমিন বিদ্যমান রয়েছেন, লক্ষ লক্ষ আওলিয়া রয়েছেন, নবী আ.গণের যুগে নবীও ছিলেন, কিন্তু যে ব্যক্তি তার অন্তরের দরজা বন্ধ করে রেখেছে, না ঈমানকে প্রবেশাধিকার দিচ্ছে, না ইলম ও মারিফাতকে প্রবেশাধিকার দিচ্ছে, সে উপকৃত হতে পারবে না। আম্বিয়া ও আউলিয়ার বিদ্যমানতা তার কোন উপকারে আসবে না।

আশা করি আপনারা এ কথাটুকু বুঝতে পেরেছেন যে, মানুষের মুক্তি ও উপকার সাধন তার অভ্যন্তরীণ শক্তি দ্বারাই অর্জিত হয়। বাইরের জিনিসকে যে পর্যন্ত

প্রবেশ না করাবে সে পর্যন্ত তার কোন উপকার সাধন সম্ভব হবে না, তার জন্য সম্মান লাভের কোন অবলম্বনও থাকবে না।

প্রকাশ্য উৎকর্ষতাই মানুষের প্রকৃত উৎকর্ষতা

গ্রীসের সক্রেটিসের নাম শুনে থাকবেন। তিনি একজন নামকরা গ্রিক দার্শনিক ও হাকিম। তিনি ছিলেন চিকিৎসা বিজ্ঞানের জনক। এ বিজ্ঞানকে তিনি সুবিন্যস্ত করেছেন। মোটকথা, তিনি অত্যন্ত উঁচু স্তরের চিকিৎসক, হাকিম, বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক ও জ্ঞানী ছিলেন। তাঁর অবস্থা এমন ছিল যে, পাহাড়, জঙ্গল ও উদ্যানে নানা তৃণলতা ও গাছগাছড়া পরীক্ষা নিরীক্ষা করার জন্য রাত দিন ঘুরে বেড়াতেন। কোন ফুল, কোন লতাপাতা, কোন চারা, কোন ছাল-বাকলের কী গুণাগুণ ও কী বৈশিষ্ট্য তা খুঁজে বেড়াতেন। কোনটি মুখে নিয়ে, কোনটি ঘ্রাণ নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করতেন। মোটকথা সারাদিন এ নিয়েই গবেষণা করতে থাকতেন।

একবার তিনি দিনভর ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে শহরে এলেন। শহরের কোন একটি দোকানে এসে বসার পর তার চোখ বুজে এল। বসে বসেই ঘুমিয়ে পড়লেন। ঐ পথ দিয়ে তৎকালীন বাদশাহর গাড়িবহর যাচ্ছিল। বাদশাহ হাতির পিঠে আরোহন করেছিলেন। তার সম্মুখ দিয়ে লোকলশকর, বাদকদল, সৈন্যবাহিনী, পেয়াদা, পুলিশ সবাই যাচ্ছিল। সরো, রাস্তা ছাড়ো– এসব আওয়াজ বেশ শ্রুত হচ্ছিল। কিন্তু বেচারা সক্রেটিস এত গভীর নিদ্রায় নিমগ্ন ছিলেন যে, আল্লাহ জানেন কতদিনের নিদ্রা পুঞ্জিভূত ছিল আর কত বিনিদ্র রজনী কেটেছে তার, তিনি চেতনাই পেলেন না। শেষ পর্যন্ত বাদশাহর বাহন নিকটে এসে পড়ল। তাকে এ অবস্থায় দেখে বাদশাহ অত্যন্ত রেগে গেলেন। কেমন অভদ্র-অসভ্য যে আমি এ দেশের রাজাধিরাজ, আমার বাহন আসছে, আর পা সটান করে সে নির্বিঘ্নে ঘুমাচ্ছে! তার মধ্যে কোন আদব তামিজ নেই, শ্রদ্ধা ও সম্মান করতে জানে না। বাদশাহ রাগান্বিত হয়ে তার হাতি হতে নেমে পড়লেন এবং তার কাছে গিয়ে ধাক্কা মারলেন এবং বললেন, হে বেআদব বদতমিজ, জানো না আমি কে? তিনি চক্ষু রগড়াতে রগড়াতে উঠে বসলেন, নিদ্রা হতে জাগ্রত হওয়া ব্যক্তি যেমন করে থাকে। বাদশাহ ধমক দিয়ে বললেন, হে হতভাগা! তুই জানিস না আমি কে? সে চক্ষু ডলতে ডলতে অত্যন্ত ধীরস্থিরভাবে উত্তর দিল, জ্বি হ্যাঁ, এ কথা জানার চেষ্টা করছি যে, আপনি কে? তাইতো চক্ষুগুলো ডলছি। এ পর্যন্ত আমি যা জানতে সক্ষম হয়েছি, তাতে মনে হয় আপনি কোন হিংস্র

বন্যপ্রাণী হবেন। যেহেতু হিংস্র প্রাণীকুল মাটিতে পা দাপিয়ে দাপিয়ে চলাচল করে থাকে, এ হল তাদের অভ্যাস। তারা গায়ে ধাক্কা মেরে মেরে এগিয়ে যায়। যেহেতু আপনি আমাকে ধাক্কা মেরেছেন, তাই আমি মনে করলাম হয়তো কোন বাঘ বা সিংহ এসে গড়েছে; জঙ্গলের কোন হিংস্র জন্তু বুঝি এসে পড়েছে।

বাদশাহ আরো রাগান্বিত ও উত্তেজিত হল– এতক্ষণ সে মাটির উপর পা লম্বা করে শুয়েছিল, এখন তার জিহ্বাও দেখছি আমার সামনে লম্বা হয়ে গিয়েছে, এমন অভদ্র কথাবার্তা!

বাদশাহ ধমক দিয়ে বললেন, হে আহম্মক, মূর্খ! তুই জানিস না আমি এখানকার বাদশাহ। এতটি সেনানিবাস আমার রয়েছে, এতটি সুরক্ষিত দূর্গ রয়েছে, এতটি ধনাগার ও কোষাগার আমার রয়েছে, বাদশাহী মুকুট আমার মাথায় শোভা পাচ্ছে, আমার পরিধানে রয়েছে শাহী পোশাক পরিচ্ছদ। এত সংখ্যক সেনা দাঁড়িয়ে রয়েছে, এত বর্গমাইল ব্যাপী রয়েছে আমার রাজত্ব। আর আমার সাথে বেয়াদবী, অভদ্র ব্যবহার করছিস!

সক্রেটিস অত্যন্ত শান্তভাবে উত্তর দিলেন, তুমি তোমার বড়ত্ব বর্ণনা করার জন্য বাদশাহী মুকুট, পোশাক-পরিচ্ছদ, দূর্গ, সেনাবাহিনী, সেনানিবাস এবং রাজত্ব পেশ করেছ, এগুলোর মধ্যে একটি জিনিসও তোমার ভিতর নেই। এসব বাইরের জিনিস। এতে তোমার কামালাত ও বাহাদুরী কী? যদি চারপাশে সোনা-রূপা ছড়িয়ে থাকে, আর তোমার অন্তর মূর্খতার আবর্জনায় পরিপূর্ণ থাকে, তবে এতে তোমার কী কামাল বা গুণ হল? তুমি উত্তম পোশাক পরিধান করেছে, কিন্তু অন্তর মূর্খতা ও দুশ্চরিত্রের কালিমায় ভর্তি রয়েছে। এ পোশাক দিয়ে তোমার কী উপকার হল? এগুলো তো হল বাইরের বস্তু। তুমি যে সকল জিনিসের নাম পেশ করেছ– দূর্গ, সেনাবাহিনী; এগুলো দ্বারা তুমি গর্ব করেছ, এগুলো বাইরের জিনিস। তোমার ভিতরের কোন জিনিস পেশ কর, তোমার নিজস্ব এমন কী গুণাবলি রয়েছে যেগুলো দ্বারা তুমি শ্রেষ্ঠত্বের দাবি করতে পার? তোমার সম্মান যদি টাকাপয়সার কারণে হয়, তবে এর অর্থ দাঁড়াবে এই, যদি কেউ টাকাপয়সা ছিনিয়ে নিয়ে যায় তবে তুমি সম্মানহীন হয়ে পড়বে, তোমার সম্মান খতম হয়ে যাবে। তোমার সম্মান যদি রাজ মুকুটের কারণে হয়ে থাকে তবে কেউ যদি মুকুটটি খুলে ফেলে, অথবা রাত্রে টেবিলের উপর রেখে নিদ্রা গেলে, তবে সম্মানহীন হয়ে পড়লে, কারণ মুকুট তো মাথায় নেই। পোশাক খুলে ফেললে সম্মানহীন হয়ে পড়বে, কেননা সম্মান তো খুঁটির সাথে ঝুলে রয়েছে। তোমার মান-মর্যাদা যদি এ সকল জিনিসের কারণে হয়, তবে এ সবই বাইরের জিনিস, এর কোনটি তোমার ভেতরের মূলবান গুণ? তিনি আরো

থাকেনি, এভাবে যদি মানুষের ভিতরে কোন গুণ না থাকে, কোন কামালাত না থাকে তবে তা কুকুর নিয়ে যাবে, বাঘ নিয়ে যাবে, চিতাও নিয়ে যাবে। শত্রুও নিয়ে যেতে সক্ষম হবে। এ কেমন গুণ হল যা অন্যে লুট করে নিয়ে যেতে সক্ষম হয় আর সে অকর্মণ্য হয়ে পড়ে থাকে। প্রকৃত গুণ হল এই যা মানুষের মধ্যে হবে, শত-সহস্র বিপদ এলেও সে গুণবান থাকবে, হাজারো মুসিবত এবং শত্রুর আক্রমণ হোক, কিন্তু সে গুণবান থাকবে। যে গুণ মানুষের সাথে সংযুক্ত থাকবে, তাই প্রকৃত গুণ।

অন্তর এক আশ্চর্য অপরূপ বস্তু

আপনারা মাওলানা রূমী রহ.-এর নাম শুনে থাকবেন। শীর্ষস্থানীয় একজন কামিল আরিফ ছিলেন। মসনবী শরীফ রচনা করেছেন। যার সম্পর্কে বলা হয়:

ہست قرآن در زبان پہلوی

আল্লাহ তাআলা যেন ফার্সি ভাষায় তাঁকে দিয়ে কুরআন রচনা করিয়েছেন।

যাই হোক, তিনি তাসাউফের একজন বিশিষ্ট ইমাম ছিলেন। তিনি একটি আশ্চর্যজনক ঘটনা লিখেছেন। এ দ্বারা উপদেশ দেয়া উদ্দেশ্য। ঘটনাটি মনোযোগসহকারে শ্রবণ করা ও তা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা কর্তব্য। এ ঘটনাটি দ্বারা বিরাট শিক্ষা ও উপদেশ অর্জিত হবে। মাওলানা লিখেছেন, একবার রোমান ও চীনাদের মধ্যে ঝগড়া বেধে গেল। রোমানদের দাবি হল, হস্তশিল্পে কলাকৌশলে এবং কারুকার্যে আমরা অত্যন্ত উন্নত ও অগ্রগামী রয়েছি; আমাদের হাতে রয়েছে জ্ঞান-বিজ্ঞান। অত্যন্ত উন্নত ও আধুনিক রুচিসম্মত ইমারাত তৈরিতে আমরা সক্ষম। আমরা উন্নত মানের কাপড় বানাতে পারি, যাবতীয় আসবাবপত্র উন্নত মানের তৈরি করতে পারি। চীনাগণ বললো আমরা সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বোত্তম শিল্পী। আমাদের চেয়ে বিজ্ঞ ও উন্নত কোন শিল্পী নেই। উভয় দলের মধ্যে তর্ক হল, লড়াই হল। উভয়ের দাবি– আমরাই সর্বাধিক বিজ্ঞ। এ পরিমাণ ঝগড়া হল যে, শেষ পর্যন্ত মোকাদ্দামা বাদশাহর নিকট উত্থাপন করা হল। বাদশাহ জিজ্ঞেস করলেন, ঝগড়া ফাসাদের মূল বিষয়বস্তু কী?

রোমানগণ বলল, আমরা সর্বোত্তম শিল্পী, কারুকার্যে আমারাই সর্বাধিক বিজ্ঞ। চীনাগণ বলল, তারা নয় আমরাই সর্বাধিক বিজ্ঞ।

বাদশাহ বললেন, কেবল দাবি করলেই হবে না, নিজ নিজ শিল্প ও কারুকার্য প্রদর্শন কর। আমরা তুলনা করে শ্রেষ্ঠত্ব নিরূপণ করব। বাদশাহ বিরাট একটি হল রুম তৈরি করলেন এবং মধ্যভাগে একটি পার্টিশন দাঁড় করিয়ে দিলেন। তারপর রোমানগণকে বললেন, অর্ধেক হলে তোমাদের শিল্প ও কারুকার্য প্রস্তুত কর। চীনাদেরকে বললেন, অর্ধেক হলে তোমাদের কাজকর্ম প্রদর্শন কর। তারপর আমরা উভয় দলের কাজকর্মকে তুলনামূলক বিচার করে দেখব। যার কাজ উন্নত হবে, তার পক্ষে রায় হবে। কথা অনুযায়ী হলের একপ্রান্তে রোমানগণ তাদের শিল্প ও কারুকার্য তৈরি করতে শুরু করল এবং অন্য প্রান্তে চীনাগণ কাজ আরম্ভ করল। চীনাগণ দেয়ালের উপর প্লাস্টার করে এতে নানা রঙের ফুল ও লতাপাতা এভাবে তৈরি করল, দেখলে মনে হয় যেন সদা বসন্তময় একটি বাগান। সারাবিশ্বের সকল বাগান, সকল পুষ্পোদ্যান যেন এ দেয়ালে এসে পড়েছে।

রোমানগণ কী করল, তারা ফুল তৈরি করেনি, লতাপাতা পুষ্পোদ্যান তৈরি করেনি বরং দেয়ালের উপর প্লাস্টার করে ঘষে ঘষে একে শাণিত করে তুলল। ঘষা মাজার কারণে দেয়াল এমন পরিষ্কার হয়ে পড়ল যে, দেয়ালটি যেন একটি উন্নত আয়নার রূপ ধারণ করল।

যখন উভয়পক্ষ কাজ শেষ করল, তখন বাদশাহকে জানানো হল যে, আমরা আমাদের শিল্পকার্য শেষ করেছি, চেষ্টা পরিশ্রম করে নিজেদের শিল্পের নমুনা তৈরি করেছি। আপনি উভয়ের কাজ দেখে ফায়সালা করুন যে, কার শিল্পকার্য উত্তম ও উন্নত হয়েছে।

বাদশাহ আদেশ দিলেন মধ্যখানের পর্দাটা সরিয়ে দাও, যা পার্টিশন হিসেবে দেয়া হয়েছিল। পার্টিশন সরিয়ে দেয়ার সাথে সাথে চীনাদের সকল কারুকার্য রোমানদের দেয়ালে ভেসে উঠল। কেননা দেয়ালকে ঘষেমেজে আয়নার ন্যায় পরিষ্কার করা হয়েছিল। বাদশাহ হতবুদ্ধি হয়ে পড়লেন যে, ফুল লতাপাতা এদিকে তৈরি করা হয়েছে না ঐ দিকে করা হয়েছে। এ দিকে যে রং দেয়া হয়েছে তা ঐদিকে দেখা যাচ্ছে, অধিকন্তু ঐদিকে অধিক উজ্জ্বল মনে হচ্ছে। কারণ দেয়ালে চমক ছিল বলে দেয়ালের লতাপাতার প্রতিচ্ছবিও চমকাচ্ছিল। বাদশাহ রায় প্রদান করলেন, রোমানগণ তাদের নিজেদের শিল্পকার্যও দেখালো এবং চীনাদের শিল্পকার্য ছিনিয়ে নিজেদের করে নিল। তাদের শিল্প দ্বিগুণ হয়ে গেল। তাই রোমানগণ জিতে গেল। চীনাগণ হল ব্যর্থ ও পরাজিত। তাদের শিল্প কোন উন্নত শিল্প ছিল না।

মাওলানা রূমী রহ. এ উদাহরণ দিয়ে বলেছেন যে, হে প্রিয়! তুমিও রোমানদের মত কর, চীনাদের মত করো না। তোমার আত্মাকে ঘষেমেজে এমন আয়নায় রূপান্তর কর যেন বিশ্বের সকল শিল্প-কারুকাজ ঘরে বসে নিজ হৃদয়ে অবলোকন করতে পার।

ستم است اگر ہوست کشد کہ بسیر سرد و چمن درآ
تو ز غنچہ کم نہ دمیدۂ ای در دل کشا بچمن درآ

অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় এই যে, দুনিয়ার বাহারী রঙ-রূপের প্রতি আসক্ত হয়ে কখনো তুমি এ বাগানে, কখনো ঐ উদ্যানে, কখনো এ মঞ্জরীতে, কখনো ঐ কুঞ্জবনে ঘুরে বেড়াচ্ছ। তুমি যদি রোমানদের শিল্প-কৌশল গ্রহণ করে অন্তরকে ঘষেমেজে পরিষ্কার করে নাও তাহলে এ সকল ফুল, লতাপাতা ঘরে বসে তোমার হৃদয়ের আয়নায় পরিদৃষ্ট হবে এবং সমগ্র পৃথিবী তোমার অন্তরে জ্যোতির্ময় হয়ে উঠবে। রোমানদের মত হৃদয়কে পরিষ্কার কর, তাহলে আল্লাহ্ তাআলার নিকট তুমিও উত্তীর্ণ হয়ে যাবে।

মূল কথা হল, এ হৃদয়কে আল্লাহ তাআলা অত্যন্ত আশ্চর্য এক পরশমণিরূপে সৃষ্টি করেছেন। বাইরের জিনিসগুলো যদি মানুষ ভিতরে নিয়ে আসে তবে তার গুণাবলি প্রকাশ লাভ করে। আর যদি বাইরে সুসজ্জিত উদ্যান বিদ্যমান থাকে আর অন্তর থাকে শূন্য ও বিরান ভূমি, তবে তার জন্য না আছে উপকারের কোন পথ, না আছে মুক্তির কোন ব্যবস্থা। সুতরাং প্রকৃত করণীয় হল এই, মানুষ স্বীয় আত্মাকে ঘষেমেজে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করবে, মরিচা মুক্ত করবে, আয়না সদৃশ করে তুলবে।

হৃদয়ের দু'টি দরজা রয়েছে

আল্লাহ তাআলা মানুষের হৃদয়ে দু'টি দরজা রেখেছেন। একটি দরজা উন্মুক্ত হলে আরশের জিনিসগুলো তার চোখে পরিদৃষ্ট হয়। আর অন্য একটি দরজা উন্মুক্ত হলে পার্থিব জিনিসগুলো তার চোখে ভাস্বর হয়ে ওঠে। মানুষ যখন বাহ্যিক চোখ, কান, নাক দিয়ে কোন কিছু দেখবে ও অনুধাবন করবে তখন বাহ্যিক চাকচিক্য, লতাপাতা, পুষ্প-মঞ্জরী এসব দেখতে পাবে। আর যদি এ চোখ, নাক ও কানের দরজা বন্ধ করে দিয়ে হৃদয় অভ্যন্তরের দরজা খুলে দেয় তবে আরশের জিনিসগুলো দেখতে পাবে, সেখানকার জ্ঞানরাজি ও কামালাত অবতরণ হতে শুরু করবে। কথা হল, হৃদয়াভ্যন্তরে দু'টি দরজাই রয়েছে। যদি

উপরের দরজা বন্ধ করে দাও তবে বিভিন্ন আকৃতি ও সুরত পরিদৃষ্ট হবে। আর যদি নিচের দরজা বন্ধ করে দাও তবে নানা হাকিকত ও রহস্যাবলি উদঘাটিত হতে শুরু করবে। হৃদয়ে উভয় প্রকার যোগ্যতাই রয়েছে। সর্বোত্তম যোগ্যতা হল এই, মানুষ উর্ধ্ব জগতের জিনিসগুলোকে অনুধাবন করতে সক্ষম হবে। যথা- আল্লাহর ইলম, কামালাত, মারেফাত ও আখলাককে অনুধাবন করতে সক্ষম হবে, ফেরেশতাদের সিফাত ও গুণাবলিকে অনুধাবন করতে সামর্থ্য হবে। তবেই কেবল যথার্থ পূর্ণাঙ্গ মানুষ হয়ে উঠবে।

মাওলানা রূমী রহ.-এর বলার উদ্দেশ্য হল, অভ্যন্তরীণ গুনাবলির উৎকর্ষ সাধন কর, বাইরের চাকচিক্যে বিভোর হয়ে যাওয়াকে আত্মস্থ কর না। বাইরের জিনিসগুলো যদি গ্রহণ কর তবে এগুলো দ্বারা উপকৃত কেবল তখনই হতে পাবে, যখন তোমার ভিতরে কিছু গুণ বিদ্যমান থাকবে। আর যদি ভিতর থাকে শূন্য তবে বাইরের জিনিস কোন উপকারই করতে পারবে না। কাজেই আত্মাকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে সফলতার পথে আসতে হবে।

জ্যোতির্ময়তা ও সফলতার মাধ্যম হল ইলম

আমার তিলাওয়াতকৃত হাদীসটিতে জনাব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন কিছু মৌলিক জিনিস সম্পর্কে আলোচনা করেছেন যার দ্বারা মানুষের মধ্যে জ্যোতির্ময়তা তৈরি হয়, অন্তরের দীপ্তি ও শুদ্ধি অর্জিত হয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইশরাদ করেন-

النَّاسُ كُلُّهُمْ هَالِكُوْنَ إِلاَّ الْعَالِمُوْنَ.

সকল মানুষই ধ্বংসশীল, কেউ রক্ষা পেলে কেবল আলেমগণই পেতে পারেন।

অর্থাৎ জাহালাত বা মূর্খতার মধ্যে মানবজাতির মুক্ত নেই, মানবজাতির মুক্তি রয়েছে ইলমের মধ্যে। পার্থিব ইলম হোক বা দীনি ইলম হোক, ইলম দ্বারাই পথ দৃষ্টিগোচর হয়। মূর্খতা দ্বারা পথ দেখা যায় না। প্রকৃতপক্ষে মূর্খতা হল অন্ধকার আর ইলম হল জ্যোতির্ময়তা। আলোতেই রাস্তা দেখা যায়, অন্ধকারে রাস্তা দেখা যায় না। মূর্খতা দ্বারা যেমন পার্থিব উপকার ও কল্যাণ সাধিত হতে পারে না তেমনি পারকালীন কল্যাণ ও নাজাত লাভ হয় না।

আজকের পৃথিবী যেভাবে সাজানো গোছানো রয়েছে, উন্নতি ও সমৃদ্ধি লাভ করেছে, তা মানুষের ইলম ও জ্ঞানের কারণেই হয়েছে। পরকালও যদি সুন্দর ও সুখময় হয় তবে মানুষের ইলম দ্বারাই হবে। আজ আপনাদের এ শহর ঝলমল

করছে, লক্ষ লক্ষ বৈদ্যুতিক বাতি আলো ছড়াচ্ছে। শহর আলোকিত রয়েছে, বাড়িঘর আলোয় আলোকিত হয়ে আছে। এসব আলো আপনাদের ইলম ও জ্ঞানের আলো; বিদ্যুতের নয়। আপনার যদি জ্ঞান-বিজ্ঞানের শক্তিকে কাজে প্রয়োগ না করতেন তবে বিদ্যুৎও আবিস্কৃত হত না, বাল্বও তৈরি হত না, বিদ্যুৎ ও বাল্ব না হলে ভবনগুলো, শহর-বন্দর আলোকিত হত না। ইলমই বিদ্যুৎ আবিষ্কার করেছে, বাল্ব তৈরি করেছে। ইলমের এসব কলাকৌশল দ্বারাই আলো হয়েছে। কাজেই প্রকৃতপক্ষে এ আলো হল ইলম ও জ্ঞানের আলো। যদি মনুষের মধ্যে মূর্খতাই বিরাজ করত, বিজ্ঞান শাস্ত্র তারা না জানত তবে আমাদের সামনে এ আলো হত না। এ ছাদে আপনি যে উজ্জ্বলতা দেখছেন তা আপনার ইলমের ঔজ্জ্বল্য, বিদ্যুতের নয়; বিদ্যুৎ তো স্বয়ং আপনার ইলম দ্বারাই এসেছে।

মূর্খতা পরাজয়ের মাধ্যম

এই ইলমের শক্তিই মানুষকে উচ্চ স্থানে অধিষ্ঠিত করেছে, বিশ্বের বুকে বিজয়ী করেছে। যদি জাহালত ও মূর্খতা থাকে তবে মানুষ পরাভূত হয়ে থাকে। বেচারা মাটির ইলম নেই, রাতদিন জুতা দ্বারা দলিত হচ্ছে। জীবজন্তুর ইলম নেই, রাতদিন আপনার দাসত্বে রত আছে। কোন জন্তুর কাঁধে আপনি হালের জোয়াল রাখছেন, তা দ্বারা চাষাবাদ করছেন, কোন জন্তুর পিঠে গদি বসিয়ে আরোহন করছেন, যথেচ্ছ ঘুরে বেড়াচ্ছেন। শক্তির দিক দিয়ে ঘোড়া মানুষের চারগুণ শক্তির অধিক, কিন্তু মানুষের কাছে অপারগ হয়ে রয়েছে। এ কারণে যে, এ দীন-হীনের কাছে ইলমের শক্তি নেই।

এও আল্লাহ তাআলার দয়া ও অনুগ্রহ যে, তিনি জীবজন্তুকে ইলম দান করেননি, বিবেক বুদ্ধি দান করেনি। যদি গরু-মহিষ ও ঘোড়ার ভিতর বিবেক বুদ্ধি দিয়ে দেয়া হত এবং তার পিঠে গদি বসাতে চেষ্টা করতেন, তখন ঘোড়া বলত থামুন, প্রথম একথা প্রমাণিত হোক যে, আমার ফিঠে আরোহন করার বৈধ অধিকার আপনার রয়েছে। আমি কেন আপনার বাহন হতে যাব? আমি আপনার উপর গদি লাগাবো না কেন? এভাবে দু'ঘণ্টা তর্ক-বিতর্ক হত, তাপর একজন বিজয়ী ও একজন পরাজিত হত। বাহনের কাজ হত না, চাষাবাদের কাজও হত না। আল্লাহর শোকর আদায় করুন, তিনি জীবজন্তুকে মূর্খ করে তৈরি করেছেন এবং এদেরকে বিবেক বুদ্ধি দেননি।

এ দ্বারা এ কথা বোঝা গেল যে, কখনো কখনো মূর্খতাও উপকারী হয়, শুধু ইলমই উপকার সাধন করে না। পৃথিবীতে যদি মূর্খ মানুষ না থাকত তাহলে গোলামী করার কেউ থাকত না। আর যদি গোলাম বা কর্মচারী না থাকে তাহলে

মনিষের মনিবত্ব কিভাবে সচল থাকবে? লিডারের লিডারি তখনই সচল থাকে যখন পাবলিক থাকে মূর্খ। সবাই যদি পড়ালেখা করে জ্ঞানী হয়ে যায় তবে লিডার কাজ করতে পারবে না। বেচারা লিডারদের সম্মান কেবল তখনই হয় যখন পাবলিক হয় মূর্খ। জীবজন্তু থেকে উপকৃত তখনই হতে পারেন যখন তাদের মধ্যে বিবেকবুদ্ধি অনুভূতি না থাকে। যদি এদের মধ্যে অনুভূতি থাকত, তবে চাষাবাদের কাজ হত না, সওয়ারীর কাজ হত না। মোটকথা, এসবের উপর মানুষ প্রাধান্য বিস্তার করে রেখেছে, কিন্তু এ প্রাধান্য দৈহিক শক্তিতে হয়নি। দৈহিক শক্তি তো ঘোড়া-গরুর দেহে আমাদের তুলনায় অনেক বেশি রয়েছে। এ প্রাধান্য জ্ঞান ও বিবেক-বুদ্ধির শক্তিতে অর্জিত হয়েছে।

ছেলেবেলায় মহিলাদের কাছ থেকে একটি কাহিনী শুনেছিলাম, আল্লাহ জানেন ঘটনা বাস্তব নাকি কাল্পনিক। কাল্পনিক হলেও উদাহরণ দেয়া ও উপদেশ গ্রহণের জন্য বলা যেতে পারে। আমরা এ ঘটনা শুনে ছিলাম মা বোনদের নিকট, তারা উপদেশ গ্রহণের জন্য বলেছিলেন। ঘটনাটি এই, একটি বাঘের মৃত্যুকাল ঘনিয়ে এল, সে তার ছেলেকে উপদেশমূলক বলল, বাবা! প্রত্যেকের সাথে মিলিত হবে, সকলের কাছে যাতায়াত করবে, কিন্তু মানুষের নিকট যাবে না, এরা বড় জালিম, বড় অত্যাচারী; যদি তুমি এদের নিকট যাও, তবে ভুল করবে, বিপদে পতিত হবে। তারপর বাঘটি মারা গেল, সে ছিল নিজ জঙ্গলের রাজা। রাজার মৃত্যুর পর তার ছেলেকে সিংহাসনে বসানো হল।

বাঘের বাচ্চার বাস্তব কোন অভিজ্ঞতা ছিল না, জওয়ান হয়েছিল বটে, কিন্তু জ্ঞান-বুদ্ধি একদিনে হয় না, তা দীর্ঘদিনেই লাভ হয়, তা মানুষেরই হোক অথবা জীবজন্তুর হোক। বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে তা হয়। প্রত্যেকের বাচ্চাই অনভিজ্ঞ থাকে, মানুষের হোক আর জীবজন্তুর হোক। বাঘের বাচ্চা অল্প বয়সী ছিল, বাঘ তো মারা গিয়েছে। বাচ্চা চিন্তা করল আমার পিতা বলেছেন যে, তুমি মানুষের কাছে যেও না, মানুষ বড় জালিম, বড় অত্যাচারী। কিন্তু একে দেখা কর্তব্য, এ জিনিস কী ও কেমন? আমার পিতা কেন এত ভয় পাচ্ছিলেন, আমার পিতা তো সম্পূর্ণ জঙ্গলের বাদশাহ ছিলেন। এত শক্তিশালী ছিলেন তথাপি ভয় পাচ্ছিলেন, মনে হয় মানুষ অত্যন্ত শক্তিশালী কোন জন্তু হবে। বাঘ তো দু'গজ দীর্ঘ হয়, মানুষ মনে হয় দশ গজের কম হবে না, হয়ত বিশ গজও হতে পারে। মানুষ বস্তুটি কী তা দেখা কর্তব্য, তার আশপাশের মুসাহেবগণ তাকে বলল, বড়দের কথা মান্য করা কর্তব্য। অমান্য করা উচিত হবে না। তোমার বাবা বলেছিলেন মানুষের ধারেকাছে যেও না, এরা অত্যন্ত অত্যাচারী। তুমি এ ইচ্ছা কর না, হয়ত কোন বিপদেও পতিত হতে পার। সে বলল, না ভাই, অন্তত একবার

মানুষ নামীয় বস্তুটি দেখা উচিত, বস্তুটি কী এবং কেমন? সে পিতার উপদেশ পালন করল না, মানুষ দেখার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ল। ঘটনাক্রমে সর্বপ্রথম একটি ঘোড়াকে লাফিয়ে লাফিয়ে দৌড়ে যেতে দেখল। বাঘের বাচ্চার ধারণ হল– এ বুঝি মানুষ, কেননা বাবা তো দেড়গজ লম্বা ছিল, এতো অনেক সুন্দর আকার আকৃতি বিশিষ্ট। আমার পিতা এজন্য ভয় করতেন যেহেতু এ জীবটি তার চেয়ে দ্বিগুণ হবে, কাজেই তার ভয়ভীতি ঠিকই ছিল। ভয়ে ভয়ে নিকটে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, জনাব! আপনার নাম কি মানুষ? ঘোড়া বলল, কোন্ অত্যাচারী জালিমের নাম উচ্চারণ করছেন? আমার সম্মুখে মানুষের নাম উচ্চারণ করবেন না। এরা তো অত্যন্ত জালিম। আমরা কত সুন্দর আকৃতি ও শক্তিশালী দেহের অধিকারী, কিন্তু মানুষ আমার পিঠে গদি বেঁধে তার উপর আরোহন করে। তার হাতে বেত থাকে, আমাকে প্রহারের পর প্রহার করতে থাকে। আমি দৌড়ে দৌড়ে ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে পড়ি, কিন্তু মানুষ প্রহার করা থেকে বিরত হয় না। সকল জিনিসের আলোচনা করুন, আপত্তি নেই, কিন্তু এ জালিমের নাম মুখে নিবেন না, অত্যন্ত বিপজ্জনক প্রাণী। বাঘের বাচ্চা বলতে লাগল, হে আল্লাহ, মানুষ তাহলে কত বিরাট, কত শক্তিশালী! এ ঘোড়াটি এত দীর্ঘ ও প্রশস্ত দেহের অধিকারী হয়েও আতঙ্কিত হয়ে আছে। আমার পিতাও ভয় করে করে ইহলোক ত্যাগ করেছেন, কেমন জিনিস হবে মানুষ? বাঘের বাচ্চাটি সামনে এগিয়ে যেতে লাগল। হঠাৎ দেখতে পেল একটি উট এগিয়ে যাচ্ছে। মনে মনে ভাবল, এই হবে মানুষ। এর একটি অঙ্গও সরল-সোজা নয়, ঘাড় এদিকে, কোমর ওদিকে, পাগুলো সেদিকে, এ-ই হবে মানুষ। এ তো ঘোড়ার চেয়ে আরো কয়েক হাত আরো উঁচু। কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, আপনার নাম কি মানুষ?

সে বলল– 'লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা' কী অত্যাচারী জিনিসের নাম উচ্চারণ করলে, এ অত্যন্ত জালিম এক প্রাণী, এর নাম আমার সামনে উচ্চারণ কর না। এ জন্য যে, এখন আমি একা রয়েছি, আমি ব্যতীত আমার শত শত স্বজাতি এদের হাতে বন্দী, নাকে নকীল লাগিয়ে রেখেছে, সর্বাগ্রে যে রয়েছে তার লেজের সাথে পরের উটটির নকীল বাঁধা রয়েছে, এভাবে শত শত উটের সারি থাকে, আর মানুষের একটি ছেলে আমাদেরকে তাড়িয়ে নিয়ে যায়, আমরা আহাজারি করি, কান্নাকাটি করি, কিন্তু ছেলেটি তাড়িয়ে নিয়েই যায়, শত শত উট একটি মানব সন্তানের সাথে কিছু করতে পারে না। এ অত্যন্ত অত্যাচারী এক প্রাণী, আমার সামনে এর নাম উচ্চারণ করবে না। বাঘের বাচ্চা বলতে লাগল, ইয়া আল্লাহ! মানুষ তাহলে কত বিরাট জিনিস? এ উট এত বিরাট, এত শক্তিশালী হওয়া সত্ত্বেও মহা আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে রয়েছে। ঘোড়া তার নিজের

বিপদের কথা বলেছিল, এ তো তার ভাই-বেরাদার সফলের বিপদের কথা বর্ণনা করল। একশত উট মিলিত হয়েও একজন মানব শিশুর কিছুই করতে পারে না। বাঘের বাচ্চাটি ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে সম্মুখে অগ্রসর হল। ঘটনাচক্রে চোখ পড়ল একটি হাতির উপর। তখন সে বলল, এই হবে মানুষ। এতো চারটি স্তম্ভের উপর একটি দালান, যার উপরে রয়েছে ছাদ, (যেহেতু এর পিঠের উপর একটি হাওদা রাখা ছিল)। এই মানুষ হবে। ভয়ে ভয়ে হাতির নিকট গিয়ে জিজ্ঞেস করল, জনাবের নামই কি মানুষ? আপনাকেই মানুষ বলা হয়?

হাতি বলল– 'আসতাগফিরুল্লাহ' কী মহামুসীবতের নাম বলে দিলেন, আমার সম্মুখে এ নাম উচ্চারণ করবেন না, এ অত্যন্ত অত্যাচারী প্রাণী। আমার আকার-আকৃতিকে দেখবেন না। আমার দৈহিক আকৃতি উঁচু দেখাচ্ছে, মনে হয় যেন একটি বিল্ডিং, কিন্তু মানব সন্তান আমার পিঠে আরোহণ করে। তার হাতে থাকে লোহার তৈরি হান্টার। আমি একটু এদিক সেদিক হলাম কি অমনি সে আমার মাথার উপর হান্টার দিয়ে প্রহার করতে শুরু করে। আমি আর্তনাদ করা ব্যতীত অন্য কিছুই করতে পারি না। ঘোড়ার মুখে লাগাম লাগানো থাকে, আমার পিঠে লাগামবিহীন অবস্থায় মানুষ আরোহণ করে। লাগাম-নকলী কিছুই নেই, তথাপি মানুষের সামনে আমি অপারগ। বাঘের বাচ্চা বলতে লাগল, ইয়া আল্লাহ! মানুষ কেমন জিনিস হবে? যাকেই পাই, সেই ভীত সন্ত্রস্ত। মানুষ নিশ্চয়ই অত্যন্ত জালিম হবে।

বাঘের বাচ্চা সামনে এগিয়ে চলল। হঠাৎ একজন কাঠমিস্ত্রির আট-দশ বছরের একটি ছেলেকে দেখতে পেল। ছেলেটি করাত দিয়ে বড় একটি গাছ চিড়ছিল। যে পর্যন্ত চেড়া হয়েছে, তার মধ্যে একটি খুঁটি ঢুকিয়ে রেখেছিল যাতে উভয় পাট মিলে না যায় এবং চিড়তে সুবিধা হয়। বাঘের এ কল্পনাও হয়নি যে এ বস্তুটি মানুষ হতে পারে। যেহেতু আট-দশ বছরের ছেলে, আকৃতিতে অনেক ছোট। এ যে মানুষ হতে পারে সে ধারণা তার না হওয়ারই কথা। সে তো উট, ঘোড়া, হাতি দেখে এসেছে এবং সবাইকে দেখেছে মানুষের ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত। কাজেই সে এ ছেলেকে ভয় করবে কেন? এ যে মানুষ হতে পারে সে ধারণাও তার হয়নি। কিন্তু জানার জন্য এ ছেলেকে জিজ্ঞেস করল, মানুষ কোথায় পাওয়া যাবে? মিস্ত্রির ছেলে বলল, আমাকেই তো মানুষ বলা হয়। সে বলল, আচ্ছা, তুমিই তাহলে মানুষ। অর্ধগজের এতটুকু বাচ্চা? সে বলল, জ্বি হ্যাঁ, মানুষ তো আমাকেই বলা হয়। সে বলল, 'লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা'। আমার পিতা অত্যন্ত বোকা ছিল। সে তোমাকে ভয় করত। আমি এক থাপ্পড়ে তোমাকে শেষ করে দেব, এ বলে বাঘ তার পাঞ্জা উত্তোলন করল।

মিস্ত্রির ছেলেটি বুঝতে পারল যে, এ তো বাঘ, মৃত্যু অনিবার্য। যদি একটি থাপ্পড়ও মারে তবে আমি শেষ হয়ে যাব। সুতরাং কোন পন্থা অবলম্বন করতে হবে। ছেলেটি বলল, আপনি জঙ্গলের রাজা, আপনার সামনে আমি কিছুই না। আপনি অত্যন্ত শক্তিধর। কিন্তু আমার একটি কাজ রয়েছে যা আমি শক্তির অভাবে করতে পারিনি। আপনার মত শক্তিশালীরাই করতে পারে। আপনি যদি এ কাজটি করে দিতেন।

বাঘ বলল, বল কী কাজ? ছেলেটি বলল, আমি এ কাঠটি অনেক কষ্টে এ পর্যন্ত চিড়েছি, উপরে একটি খুঁটি দিয়ে রেখেছিলাম, এখন এ খুঁটিটি আমি খুলতে পারছি না, আপনি যদি এ খুঁটিটি খুলে দেন তবে বিরাট কাজ হবে। সে বলল, এ কোন বিরাট কাজ নয়, আমি এখনই বের করে দিচ্ছি। বাঘ উপরে বসে দু'হাত দিয়ে খুঁটিটি ধরল, ছেলেটি তার অজান্তে খুঁটি খুলে নিল, কাঠের দু'অংশ সমান হয়ে গেল এবং বাঘ মহাশয় আটকে পড়ল। এখন চিৎকার দিতে লাগল, কিন্তু বের হওয়া সম্ভব হচ্ছিল না। মিস্ত্রির ছেলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসছিল আর বলছিল, দেখেছ মানুষ কেমন? বাঘ ফাঁদে পড়েছে। বেরুতে পারছে না, যেতেও পারছে না। খুঁটি বের হয়ে যাওয়ার কারণে তার হাত পা গাছের দু'পার্টের মধ্যে আটকে গেছে। ছেলেটি হাসছে খিল খিল করে। তখন বাঘের বাচ্চা বলতে লাগল, যে বাপের উপদেশ পালন করে না, সে এরূপ অবমাননাকর পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়, বিপদগ্রস্ত ও অপদস্থ হয়। মহিলাগণ আমাদেরকে উপদেশ দেয়ার জন্য এ ঘটনা বলেছিলেন। বড়দের উপদেশ পালন করা কর্তব্য, যে পালন করে না বরং বিরুদ্ধাচারণ করে সে এ জাতীয় বিপদে পতিত হয়, অপদস্থ ও অপমানের গ্লানি বহন করতে হয় তাকে।

এ ঘটনা দ্বারা আমার এ কথা শুনানো উদ্দেশ্য যে, কাঠ মিস্ত্রীর এতটুকু একটি ছেলে বাঘকে কাবু করল, মানুষ হাতি, ঘোড়া ও উটকে অধীন করল, তা দেহবলে নয়। দৈহিক শক্তি মানুষের চেয়ে উটের অনেক বেশি, উট যদি অনিচ্ছায়ও মানুষের উপর পতিত হয়, তবে মানুষ পিষে যাবে, ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে। হাতি যদি মানুষের উপর পড়ে যায় তবে মানুষ পিষে যাবে। মানুষের কোনই শক্তিনেই। দেহবলে মানুষ প্রাধান্য লাভ করেনি, জ্ঞান ও বিবেক-বুদ্ধি দ্বারা প্রাধান্য বিস্তার করে রেখেছে। সে শক্তি চোখে দেখা যায় না, অন্তরে নিহিত থাকে। মানুষের মনুষ্যত্ব ঐ শক্তিতেই নিহিত রয়েছে। আমাদের দেহ যদি অনেক বড় হয়ে যায়, আমরা পাহলোয়ান হয়ে উঠি, আর ভিতরে যদি বিবেক-বুদ্ধি না থাকে তবে আমরা প্রাধান্য লাভে সমর্থ হব না। মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব তার ইলম, বিবেক-বুদ্ধি এবং জ্ঞান ও কামালাতের ভিত্তিতে।

মানবীয় জ্ঞান ও প্রজ্ঞার শক্তি

বিশ্বের সবকিছুই মানুষের সামনে এই যে অক্ষম অপারগ হয়ে রয়েছে, বাঘও বলেছিল মানুষের নাম উচ্চারণ করো না; ঘোড়া, উট, হাতিও তাই বলেছিল। এরা মানুষের বুদ্ধিকে ভয় করছিল; শরীরকে ভয় করছিল না। বর্তমানে কত শক্তিশালী মেশিন তৈরি হয়েছে, মেশিন লাগিয়ে পাহাড়ের বড় বড় পাথরকে পিষে চুনা তৈরি করা হচ্ছে। পাহাড় ও গাছপালার কোন শক্তি নেই, কোন কর্তৃত্ব নেই। কর্তৃত্ব চলছে শুধু মানুষের। সকলেই মানুষের সামনে অসহায়-দুর্বল। মানুষ মেশিন তৈরি করছে, চরকা তৈরি করছে, ভূ-গর্ভস্থ খণিজ দ্রব্যাদি আহরণ করে ব্যবহার করছে। বেচারা পৃথিবীকে নীরব নিশ্চুপ থাকতে হচ্ছে, টু শব্দটি করার ক্ষমতাও তার নেই। আফ্রিকার স্থানে স্থানে স্বর্ণের খনি রয়েছে। হাজার হাজার ফুট গভীরে গর্ত খনন করে মানুষ পৃথিবীর কলিজা বের করে নিয়ে আসছে। পৃথিবী কিন্তু কিছুই বলতে পারছে না, তার স্বর্ণ বের করছে, রূপা বের করছে, তার মণিমুক্তা বের করছে– মানুষের সামনে সবকিছুই অসহায়।। মানুষ সবকিছুকে নিজ কাজে ব্যবহার করছে, সর্বত্র হস্তক্ষেপ করছে। এ হস্তক্ষেপ দৈহিক কারণে নয়, জ্ঞান ও বুদ্ধির কারণে। মানুষের দেহ দ্বারা বিজ্ঞানের সৃষ্টি হয়নি, মস্তিষ্ক দ্বারা হয়েছে। বিজ্ঞান হল বুদ্ধিপ্রসূত। পৃথিবীতে যত সাজ-সজ্জা রয়েছে, যত রূপ-জৌলুস রয়েছে সবই মানুষের জ্ঞানপ্রসূত। পরকালও যতটা আলোকময় হবে তাও মানুষের ইলম দ্বারা হবে, মানুষের আমল দ্বারা হবে। দৈহিক গঠন ও আকৃতি দ্বারা আলোকিত হবে না।

উম্মতে মুহাম্মাদীর নামে হযরত ইবরাহীম আ.-এর পয়গাম

হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, মিরাজ রজনীতে যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সপ্তম আকাশে পৌঁছলেন, তখন দেখলেন সপ্তম আকাশে ফেরেশতাদের জন্য একটি কিবলা রয়েছে, যাকে 'বাইতুল মামুর' বলা হয়। যেমন মুসলমানদের কিবলা মক্কায় অবস্থিত, যাকে 'বাইতুল্লাহ' বলা হয়। একে আপনারা তাওয়াফ করেন, সিজদা করেন, নামায পড়াকালীন সেদিকে মুখ করে দাঁড়ান এবং এভাবে দাঁড়ানোকে জরুরী মনে করেন। সপ্তম আকাশে রয়েছে ফেরেশতাদের কিবলা। তারা সেখানে তাওয়াফ করেন। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, প্রতিদিন সত্তর হাজার ফেরেশতা তাওয়াফ করেন। আজ যারা তাওয়াফ করছেন, তাদের পুনর্বার তাওয়াফ করার সুযোগ আর হবে না। আগামীদিন নতুন সত্তর হাজার আসবেন। তার পরের দিন আরো সত্তর হাজার। কিয়ামত পর্যন্ত এভাবে প্রতিদিন নতুন নতুন সত্তর হাজার করে আসতে থাকবেন এবং

তাওয়াফ করবেন। তদ্রূপ ষষ্ঠ আকাশে বাইতুল মামুরের বরাবর তাদের আরেকটি কিবলা রয়েছে। ষষ্ঠ আকাশের ফেরেশতাগণ এর তাওয়াফ করেন। পঞ্চম আকাশেও ঐ বরাবর কিবলা রয়েছে। সেখানকার ফেরেশতাগণ এ কিবলার তাওয়াফ করেন। মোটকথা, সাত আকাশে একই বরাবর কিবলা রয়েছে এবং পৃথিবীতে এর বরাবর কাবা শরীফ রয়েছে, যাকে বাইতুল্লাহ বলা হয়।

হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, যদি বাইতুল মামুর থেকে কোন পাথর ছেড়ে দেয়া হয় তবে তা বায়তুল্লাহর ছাদের উপর এসে পতিত হবে, এরূপ বরাবর রেখায় রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এই স্থান ও জায়গাটি হল কিবলা, ইমারতটি নয়। যদি এ ইমারতটি নাও থাকে, (মাআযাল্লাহ) যদি কেউ ধ্বংস করে দেয়, তবুও সেদিকে মুখ করেই নামায আদায় করতে হবে। কেননা, পাথর ও দেয়ালের নাম কিবলা নয়; বরং ঐ স্থান ও জায়গার নাম হল কিবলা, যেখানে দালান নির্মিত হয়েছে। সাত যমীন থেকে নিয়ে সাত আসমান পার্যন্ত এই এলাকাটি হল কিবলা। একে কেন্দ্র করে সপ্ত আকাশ ও জমিন আবর্তিত হচ্ছে।

এজন্যই আপনি যদি শূন্যে আরোহন করেন, পঞ্চাশ হাজার নয়, পঞ্চাশ লক্ষ ফুট উর্ধ্বেও যদি আরোহণ করেন তবুও নামাযে সেদিকেই মুখ করতে হবে। কেননা, এখান থেকে মহাশূন্যসহ আকাশ পর্যন্ত একই কিবলা রয়েছে। এমন নয় যে, একলক্ষ মাইল উপরে গিয়ে আপনি নিম্নমুখী হয়ে নামায পড়বেন। বরং সামনের দিকে মুখ করে দাঁড়াবেন। কেননা, নিচ থেকে উপর পর্যন্ত এটি যেন একটি পেরেক। এটিই হল কাবা এবং কিবলা।

যাই হোক, মিরাজ রজনীতে সপ্তম আকাশে হযরত ইবরাহীম আ.-এর সাথে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাক্ষাৎ হল। তিনি বাইতুল মামুরের দেয়ালে হেলান দিয়ে বসেছিলেন। এ স্থানটি তাঁকে হয়ত এজন্য দেয়া হয়েছে যে, দুনিয়াতে তিনি বাইতুল্লাহ নির্মাণ করেছিলেন। যেমন আমল ছিল, তেমন প্রতিদান সামনে এসেছে, সপ্তম আকাশেও বসার জন্য তাঁকে বাইতুল্লাহ দান করা হয়েছে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে সাক্ষাতে হযরত ইবরাহীম আ. বললেন, "হে মুহাম্মাদ! (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আপনার উম্মতকে আমার সালাম পৌঁছে দেবেন এবং তাদেরকে জানিয়ে দেবেন– الجنة قيعان 'তোমাদের জন্য জান্নাত হল জনমানবশূন্য বিরান প্রান্তর'। সেখানে প্রস্তুতকৃত কোন কিছু নেই। যে সকল প্রাসাদ, বাগ-বাগিচা রয়েছে তার কিছুই তোমাদের

জন্য নয়। তোমরা যখন আমল করবে তখনই কেবল এগুলোতে তোমাদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে। তোমরা নিজেরা নিজেদের জান্নাত তৈরি করবে, তোমাদের জন্য প্রস্তুতকৃত কোন জান্নাত নেই। তোমাদের নিজ হাতে তৈরি করে নিতে হবে। যেমন আমল করবে, তেমন ফলাফল সেখানে তৈরি হয়ে যাবে। যে ধরনের নেকী প্রেরণ করবে, সেখানে সে অনুযায়ী প্রতিদান তৈরি হয়ে যাবে। তোমরা এখানে বসে বসে জান্নাত তৈরি কর, তবেই জান্নাতে তোমাদের স্থান হবে। তুমি কোন আমল করনি, অথচ এ আশা করে বসে আছ যে, জান্নাতে প্রাসাদ ও অট্টালিকা লাভ করবে। তুমি নির্মাণই করনি, তাহলে পাবে কেমন করে? তুমি নিজে যখন নির্মাণ করবে তখনই কেবল পাবে।"

বিশ্বর সকল মানুষ স্থপতি

আমাদের দারুল উলুম দেওবন্দের প্রথম সদরে মুদাররিস ছিলেন হযরত মাওলানা ইয়াকুব সাহেব রহ.। তিনি ছিলেন কাশফ ও কারামতের অধিকারী বুযর্গ এবং কামিল ওলীদের অন্তর্ভুক্ত। মাওলানার মধ্যে কিছুটা 'মাজযুবিয়াতের শান' (ধ্যানে আত্মহারা অবস্থা) ছিল। মাজযুবগণ যেমন হয়ে থাকেন– কোন কিছু মনে ধরল কিংবা কোন কথা মনে উদয় হল, ব্যাস সেটি নিয়ে বিভোর হয়ে রইলেন।

একরাতে বসে আছেন, হঠাৎ একটি কথা অন্তরে উদয় হল। সাথে সাথে দুআ করতে আরম্ভ করে দিলেন, হে আল্লাহ! আমাকে তিন লাখ টাকা দিয়ে দাও। তিন লাখ টাকা কেন দিবেন, এ টাকা দিয়ে কী করবেন– এসবের কোন কিছুই নেই। দুআরত অবস্থায় রাতের অর্ধেক অতিবাহিত হয়ে গেল। হে আল্লাহ! আমাকে তিন লাখ টাকা দিয়ে দাও– এ দুআই করতে রইলেন। মাজযুব অবস্থার শিকার হয়ে দুআ করতে রইলেন। তিন চার ঘণ্টা সময় অতিবাহিত হল, রাত দুইটা বেজে গেল। একই দুআরত অবস্থায় বসে বসে মাওলানা ঘুমিয়ে পড়লেন। স্বপ্নে দেখলেন, বিরাটকায় সাদা রঙের একটি প্রাসাদ, কয়েক মাইল ব্যাপী বিস্তৃত, একেবারে ডিমের মত সাদা। যেন উন্নত ধরনের এক হোয়াইট হাউস তৈরি হয়ে রয়েছে। এর উপরের দেয়ালের গায়ে বিরাট বিরাট মোতি বসান রয়েছে, যা সূর্যের চেয়েও অধিক উজ্জ্বল। প্রাসাদটির আশেপাশে আলোকসজ্জা করা হয়েছে। যেন হাজারো সূর্য জুড়ে দেয়া হয়েছে। প্রাসাদটি মাওলানার অত্যন্ত পছন্দ হল। শতসহস্র মানুষ সেখানে ঘুরে বেড়াচ্ছে। মাওলানা তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন এ প্রাসাদটি কার? তারা বলল, মাওলানা মুহাম্মাদ ইয়াকুব সাহেবের। এ হল জান্নাত, জান্নাতে আল্লাহ তাআলা তার জন্য

এ প্রাসাদ নির্মাণ করেছেন। মাওলানা অত্যন্ত আনন্দিত হলেন, ভিতরে প্রবেশ করতে চাইলেন কিন্তু দারোয়ানগণ বাধা প্রদান করল– এখনও প্রবেশ করার সময় হয়নি। সময় হলেই কেবল প্রবেশ করতে পারবেন, এর পূর্বে প্রবেশ করার অনুমতি নেই। এখন মাওলানা প্রাসাদের চতুষ্পার্শ্বে ঘুরতে লাগলেন, অত্যন্ত পছন্দ হয়েছে তাঁর। সুবহানাল্লাহ! কী বিস্ময়কর প্রাসা! যার বহিরাংশে এত চমক, এত চাকচিক্য– না জানি এর অভ্যন্তরে কত মূল্যবান জিনিসপত্র ও শোভা-সৌন্দর্য রয়েছে। ঘুরে ঘুরে এক কোনায় গিয়ে দেখতে পেলেন একটি মোতি খসে পড়েছে এবং এখানে অন্ধকার বিরাজ করছে। সমগ্র প্রাসাদ ও তার আশপাশ আলোকময় আর কোনায় একটি মোতি নেই। সেখানে অন্ধকার। মাওলানা লোকজনকে জিজ্ঞেস করলেন– ভাই, এখানে কি মোতি লাগানোই হয়নি, নাকি ছিল কিন্তু থাকেনি? তারা বললেন, ছিল কিন্তু এখন নেই। মাওলানা পুনরায় জানতে চাইলেন, কেন কেই? তারা উত্তর দিলেন, মাওলানা ইয়াকুব সাহেব আল্লাহ তাআলার দরবারে তিন লক্ষ টাকা চাচ্ছিলেন, তাই একটি মোতি খুলে তাকে দিয়ে দেয়ার আদেশ করা হয়েছে। এর মূল্য তিন লাখের অনেক বেশি। নির্দেশমত মোতিটি খুলে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে।

এসম মাওলানার চোখ খুলে গেল, মাওলানা জেগে উঠলেন এবং এ দুআ করতে আরম্ভ করলেন, হে আল্লাহ! আমার তিন লাখ টাকার প্রয়োজন নেই, তিন হাজারেরও প্রয়োজন নেই, তিন শতেরও কোন প্রয়োজন নেই। যদি আমার জান্নাতের ইটগুলো খুলে খুলে পৃথিবীর প্রাসাদ নির্মিত হয়, তবে আমার জান্নাত বিরান হয়ে যাবে, ধ্বংস হয়ে যাবে। আমি দুনিয়াতে কিছুই চাই না, আমি জান্নাতেই নেব। এখন শুরু করলেন এই দুআ এবং কয়েক ঘণ্টা দুআ করতে থাকলেন– আমার তিন লাখের প্রয়োজন নেই, আমি এখানে নেব না। পুনরায় চক্ষু বন্ধ হয়ে এল, মাওলানা ঘুমিয়ে পড়লেন, স্বপ্নে দেখলেন সেই প্রাসাদ, এবার কোনায় গিয়ে দেখলেন মোতিটি লাগানো হয়েছে। উপস্থিত মানুষ বলল, মাওলানা তিন লাখ টাকা চেয়েছিলেন, এখন বলছেন তিন লাখের প্রয়োজন নেই, তাই মোতিটি পুনরায় লাগিয়ে দেয়া হয়েছে।

এ কথাটি আমার এজন্য স্মরণ হয়েছিল যে, জান্নাত তো আমরাই নির্মাণ করছি। যদি আমরা নির্মাণ না করি তবে সেখানে অন্ধকার থেকে যাবে। আল্লাহ তাআলা জান্নাতে অনেক নেয়ামত সৃষ্টি করেছেন নিশ্চয়ই, কিন্তু এসব আমাদের কোন কাজে আসবে না যতক্ষণ না আমরা আমল করব।

এর উদাহরণ হল ঠিক এমন, যেমন ভূগর্ভে স্বর্ণ রয়েছে, রৌপ্য রয়েছে, কিন্তু এতে আপনার কোন উপকার হচ্ছে না। আপনি যতক্ষণ পরিশ্রম না করবেন,

মেশিন দিয়ে এগুলো আহরণ না করবেন, আপনার কোন উপকারে আসবে না। মেশিন লাগান, তারপর সোনা সংগ্রহ করুন। কেউ যদি ঘরে বসে থাকে আর সমগ্র পৃথিবীও যদি স্বর্ণে পরিপূর্ণ হয়ে থাকে তাতে তার কোন উপকার হবে না। এ কথা বলা যাবে যে, আফ্রিকা মহাদেশ স্বর্ণে ভর্তি রয়েছে কিন্তু উপকৃত হবে সে ব্যক্তি যে পরিশ্রম করবে। একথা বলা যাবে না যে, আফ্রিকায় স্বর্ণ নেই। তদ্রূপ জান্নাতে স্বর্ণ রৌপ্যের প্রাসাদ রয়েছে, কিন্তু তা কেবল আপনি তখনই পাবেন যখন এখানে পরিশ্রম করবেন।

হাদীসে বর্ণিত রয়েছে, কখনো এমন হয় যে, জান্নাতে একটি প্রাসাদের নির্মাণ কাজ শুরু হয়। ফেরেশতাগণ নির্মাণ করতে থাকেন, কাজ এগিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ বন্ধ হয়ে যায়। তখন অন্যান ফেরেশতাগণ জিজ্ঞেস করেন, তোমারা তো প্রাসাদটি নির্মাণ করছিলে, হঠাৎ কাজ ছেড়ে দিলে কেন? তখন তারা বলেন, অমুক ব্যক্তি অমুক আমল করছিল, আমরা তার জন্য প্রাসাদ নির্মাণ করছিলাম। এখন সে আমল করা ত্যাগ করেছে, সরঞ্জাম পাঠানো বন্ধ করে দিয়েছে, তাই আমরাও নির্মাণ কাজ বন্ধ করে দিয়েছি।

সুতরাং প্রকৃতপক্ষে জান্নাতের প্রাসাদ নির্মাণ আপনি এখানে বসেই করছেন। প্রত্যেক ব্যক্তিই স্থপতি। পৃথিবীতে বসে কেউ জাহান্নাম তৈরি করছে, আর কেউ জান্নাত নির্মাণ করছেন। সবাই নিজ নিজ পরিশ্রম করে চলছেন। যে যা করবে তারই ফলাফল তার সামনে আসবে। যাই হোক, মাওলানা ইয়াকুব রহ. সে দুআ ত্যাগ করলেন এবং বললেন, সে মোতি আমার চাই না। কারণ, যদি পরকালের সবকিছু দুনিয়াতে দিয়ে দেয়া হয় তাহলে পরকালে কিছুই আমার থাকবে না। সুতরাং প্রকৃত জিনিস হল মেহনত ও কামালাত। এগুলো থাকলে সেখানে কিছু পাওয়া যাবে, অন্যথায় যাবে না।

যাই হোক, মানুষ কেবল তাই লাভ করে যা সে পরিশ্রম করে উপার্জন করে। আশা দ্বারা কিছুই লাভ হয় না। দুনিয়াকে উপার্জনের ক্ষেত্র বানানো হয়েছে। যে পরিশ্রম করবে সে পাবে। যদি আপনি সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত দোকানে বসে মেহনত না করেন তবে টাকা-পয়সা নিয়ে বাড়ি ফিরতে পারবেন না। কৃষক যদি ক্ষেতে গিয়ে পরিশ্রম না করে তাহলে চারটি দানা নিয়ে ঘরে ফিরতে পারবে না। কোন কারিগর যদি পরিশ্রম না করে, পাত্র না বানায়, তাহলে বাজারে তার কোন চাহিদ ও মূল্য থকবে না। কেননা পৃথিবী হল পরিশ্রমের ক্ষেত্র। যে পরিশ্রম করবে সে পাবে, যে করবে না সে কিছুই পাবে না।

সর্বাধিক শ্রমসাধ্য হল ঈমানী ইলমের অন্বেষণ

যে জিনিসটি মানুষের সর্বোচ্চ শ্রম কামনা করে তা হল ইলম। ইলম দ্বারাই দুনিয়া ও আখিরাতকে আলোকিত করা যায়। বিজ্ঞানের ইলম থাকলে পৃথিবী সুসজ্জিত হবে, ঈমানের ইলম থাকলে পরকাল সুসজ্জিত হবে। দুনিয়াকেও একটি সীমা পর্যন্ত সজ্জিত করা ঠিক আছে। কিন্তু ভাই! আপনি যদি একে সজ্জিতও করেন তবে একদিন তা শেষ হয়ে যাবে। একদিন যা হাতছাড়া হয়ে যাবে তার পেছনে সমস্ত পুঁজি ব্যয় না করে এমন জিনিসের প্রতি কেন ব্যয় করবেন না যা হবে চিরস্থায়ী। প্রয়োজনমাফিক এখানেও ব্যয় করুন এবং অবশিষ্ট মূলধনকে এ খাতে নিয়োগ করুন, যে খাত চিরস্থায়ী, যেখানকার প্রয়োজনও হবে চিরস্থায়ী।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কী জ্ঞানগর্ভ কথাই না বলেছেন–

إعمل للدنيا بمقدار بقائك فيها، واعمل لأخرتك بمقدار بقائك فيها.

> পৃথিবীর জন্য এ পরিমাণ পরিশ্রম কর, যে পরিমাণ তুমি এখানে অবস্থান করবে। আর পরকালের জন্য এ পরিমাণ পরিশ্রম কর যে পরিমাণ তোমাকে সেখানে থাকতে হবে।

পৃথিবীতে অবস্থান করতে হবে পঞ্চাশ, চল্লিশ, বা দশ বছর আর পরকালে থাকতে হবে অনন্তকাল। কাজেই, সেখানকার জন্য পরিশ্রম অত্যন্ত অধিক হওয়াই বাঞ্ছনীয়। এ কথা আমরা বলছি না যে, আপনি এখানের জন্য কিছুই করবেন না। আপনি এখানের জন্য সবকিছু করুন। বসবাসের জন্য গৃহ নির্মাণ করুন, পরিধানের জন্য বস্ত্র তৈরি করুন, পানাহার করুন, কিন্তু সম্পূর্ণ মূলধন এখানে ব্যয় করবেন না। পরকালের জন্য কিছু সঞ্চিত রাখুন। কাজকর্ম তো প্রকৃতপক্ষে সবকিছু ওখানেই হবে। সুতরাং ওখানের জন্য কোন বস্তু যে পর্যন্ত হাসিল করতে সক্ষম না হবেন, ওখানের কোন কাজ সমাধা হবে না। আর ওখানের সর্বাধিক প্রয়োজনীয় ও মৌলিক জিনিস হল ইলম। যে পর্যন্ত অন্তরে ইলম না থাকবে, অন্তরে আলো ও জ্যোতি হতে পারবে না। তাই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন–

النَّاسُ كُلُّهُمْ هَالِكُوْنَ إِلاَّ الْعَالِمُوْنَ.

> সকল মানুষই ধ্বংসশীল, কেউ রক্ষা পেলে কেবল আলেমগণই পেতে পারেন।

জাহলে ইলম বা জ্ঞানের অধিকারী যারা রয়েছেন মুক্তি শুধু তাদের জন্য। জাহালত ও মূর্খতার সাথে নাজাত নেই, মুক্তি নেই। মূর্খ লোক যদি নাজাত পায় তবে তা পাবে কোন আলেমের সাথে সম্পৃক্ততার কারণে। শ্রমিক যদি কিছু লাভ করে তবে তা করবে পুঁজিপতির মাধ্যমে। তখনই সে মুক্তি পাবে। পুঁজিপতি হলেন ঐ ব্যক্তি যিনি নিজ ইলম ও যোগ্যতার দোকানে বসে লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জন করছেন, সে তার ইলম ও জ্ঞানের শক্তিতে পালিত হচ্ছে, যেসব অসহায় দরিদ্রদের ইলম নেই, তারা আলেমদের সাথে যৌথভাবে কাজ করছেন এবং হাজার পাঁচশ টাকা তারাও রোজগার করছেন। কিন্তু ফলকথা একটি, তাদের জ্ঞান-বুদ্ধি ও যোগ্যতায় সম্পদ সৃষ্টি হয়েছে, মূর্খতা দ্বারা সম্পদ সৃষ্টি হয়নি। পার্থিব বিষয় হোক অথবা পরকালীন বিষয় হোক, দু'টোই ইলমের সাথে সম্পর্কিত। তাই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

النَّاسُ كُلُّهُمْ هَالِكُوْنَ إِلاَّ الْعَالِمُوْنَ.

সকল মানুষ ধ্বংস হবে, রক্ষা পাবেন কেবল আলেমগণ।

শুধু ইলম উপকারী নয়

ইলমওয়ালাগণও যেন অহংকার না করে, গর্ব করবেন না যে, আমরা তো নাজাত পেয়ে গেলাম। না, এরপর দ্বিতীয় বাক্যও বলেছেন–

وَالْعَالِمُوْنَ كُلُّهُمْ هَالِكُوْنَ إِلاَّ الْعَامِلُوْنَ.

আলেমগণও ধ্বংস হয়ে যাবেন, রক্ষা পাবেন শুধু তারাই যাদের ইলম অনুযায়ী আমল রয়েছে।

যদি আমল না থাকে তবে শুধু ইলম কোন উপকারী জিনিস নয়; বরং তা অত্যন্ত বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। ইলম তখনই উপকারী হয়, যখন তার প্রতি আমল করা হয়, বাস্তবে প্রয়োগ করা হয়। ইলম হিফাযতে থাকে তখনই যখন ইলম অনুযায়ী আমল করা হয়। ইলমের উন্নতি তখনই হয়, যখন ইলমের চাহিদামাফিক আমল করা হয়। আপনি যদি কোন বিষয়ে ইলম হাসিল করেন, কিন্তু ব্যবহার না করেন তবে কিছুদিনের মধ্যে তা ভুলে যাবেন। কাজে ব্যবহার করতে থাকুন তখন আপনার স্মৃতিপটে ইলম সর্বদা হাজির থাকবে। আমি আমার অভিজ্ঞতা আপনাদের নিকট আরয করছি, আমার ধারণা, প্রত্যেক তালিবে ইলমের এ অভিজ্ঞতা থাকবে। যেসব মাসাইলের প্রতি আমাদের আমল রয়েছে, সেগুলো অধিক স্মরণ রয়েছে। যে সকল মাসাইলের উপর আমল করার

সুযোগ হয় না, সেগুলো স্মরণও থাকে না। যেমন নামাযের মাসাইল আপনি যদি আমাকে জিজ্ঞেস করেন, আমি সাথে সাথে বলে দিব। কিন্তু যদি হজ্জের মাসাইল জিজ্ঞেস করেন তবে কিতাব দেখে নিতে হবে। এজন্য যে, প্রত্যহ এ আমল করা হয় না। হয়ত জীবনে একবার হজ করা হল, তাই স্মরণ থাকে না। যদি ক্রয় বিক্রয়ের মাসআলা জিজ্ঞেস করেন তবে মনে হয় কিতাব না দেখে একটি মাসআলাও বর্ণনা করা সম্ভব হবে না। এজন্য যে, ক্রয়-বিক্রয়ের সুযোগ কখনো হয়নি, যাতে স্মরণ থাকবে যে, এ বিক্রি বাতিল, এ হল ফাসিদ, এ বিক্রি উত্তম, এ বিক্রি মাকরূহ। এজন্য যে, এসব মাসাইলের উপর আমাদের আমল নেই। আপনারা যদি এসব মাসআলা শিখে নেন তবে আলেমদের তুলনায় আপনাদের স্মরণ থাকবে অধিক, যেহেতু দিবারাত্র আপনারা এসব কারবার করছেন। যেসব মসাইলের উপর আমল হতে থাকে, সেগুলো অধিক স্মরণ থাকে, আর যে মাসআলাগুলোর উপর আমল হয় না, সেগুলো স্মরণও থাকে না। তাই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, শুধু ইলম কোন কাজে আসে না যে পর্যন্ত তাকে বাস্তবে প্রয়োগ করা না হয়, তার উপর আমল করা না হয়। এ ধরনের ইলম অর্থহীন। বরং এ ইলম বান্দার বিপক্ষে আল্লাহর দলীল হয়ে দাঁড়ায়।

হাদীসে বলা হয়েছে, কিয়ামতের দিন আলেমদের একটি জামায়াতকে ডাকা হবে। আল্লাহ তাআলা বলবেন, আমি তোমাদেরকে ইলম দান করেছিলাম এবং অনেক মহান ইলম দান করেছিলাম। অনেক প্রকারের ইলম আমি তোমাদেরকে দান করেছিলাম। তোমরা আমার জন্য কী করেছে? তারা আরয করবেন, আমরা মাসাইল বর্ণনা করেছি, নসীহত করেছি, কিতাবাদি প্রণয়ন করেছি। আল্লাহ বলবেন, করেছ তা ঠিক, কিন্তু কেন করেছ? এজন্য যে, বড় আলেম হিসেবে বিশ্বে খ্যাতিমান হয়ে যাবে, তা তো হয়েছ। সে সুখ্যাতি লাভ করেছ, যে উদ্দেশ্যে তোমরা কষ্ট-পরিশ্রম করেছিলে। আমার নিকট এখন কী চাও? এ জাতীয় আলেমগণকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে নিম্নমুখী করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। ইলম তাদের কোন উপকারে আসবে না। যেহেতু ইলম অনুযায়ী আমল করেনি তাই ইলম তাদের কোন উপকারে আসবে না। বরং হাদীস দ্বারা বোঝা যায়, যারা লেখাপড়া শিখেনি অথচ কিছু কিছু নেক আমল করতে থাকে, তাদের মুক্তি ও নাজাত তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে এবং আলেমদের হবে বিলম্বে। যেহেতু আলেমকে বলা হবে আপনি একথা জানতেন, তার প্রতি আমল করলেন না কেন? ঐ মাসআলা জানতেন, আমল করেননি কেন? যে সকল মানুষ নিরক্ষর ছিল, লেখাপড়া করেনি, তাদেরকে সংক্ষেপে প্রশ্ন করা হবে, নামায পড়েছিলে?

সে বলবে হ্যাঁ পড়েছিলাম। যাকাত দিয়েছিলে? জী হ্যাঁ, দিয়েছিলাম। আচ্ছা যাও, জান্নাতে চলে যাও। ইলমও অধিক ছিল না আমলও অধিক নেই। এজন্যই অধিক ইলম বিপদ ও মুসীবতের জিনিস, জবাবদিহিতা বেড়ে যায়। (অবশ্য ইলম অনুযায়ী আমল থাকলে জান্নাতে তাদের মর্যাদা অতি উচ্চে থাকবে। ইলম হীন ব্যক্তি সে মর্যাদায় কখনোই অধিষ্ঠিত হতে পারবে না)।

পরীক্ষক যখন পরীক্ষা নিতে বসেন তখন কোন ছাত্র যদি সরল-সোজা ও বোকা প্রকৃতির হয়, তবে দু'একটি মোটা প্রশ্ন করে নম্বর দিয়ে দেন, যাও তুমি পাস করেছ। আর যদি কোন মেধাবী ছাত্র হয়, কথা অধিক বলে, পরীক্ষকও তাকে অধিক প্রশ্ন করেন, তুমি একথা কেন বললে? ঐ কথা কেন বললে? তাকে নম্বর পেতে হয় অনেক কষ্টে, প্রশ্নবানে জর্জরিত হয়ে।

এজন্যই হাদীসে বলা হয়েছে– عليكم بدين العجائز 'বৃদ্ধদের দীন গ্রহণ কর।'

পূর্বকালের বয়স্ক বৃদ্ধ যারা রয়েছেন তারা তাদের দীনের উপর চলেছেন, তাদের অন্তরে সন্দেহ নেই, দ্বিধা-সংশয় নেই, তাদের অন্তরে কোন প্রশ্ন উদিত হয় না, তাদের দীন, তাদের বিশ্বাস অত্যন্ত পাকা-পোক্ত, অটল-অচল সুদৃঢ়। ধর্ম এভাবে গ্রহণ কর, যাতে থাকবে না কোন প্রশ্ন, কোন দ্বিধা-সংশয়, অতি অল্প সময়ে নাজাত পেয়ে যাবে। অধিক ইলম জানার জন্য 'ওবাল' বা বিপদ হয়ে যাবে– যদি ইলম অনুযায়ী আমল না হয়। আর যদি ইলম অনুযায়ী আমল হয় তবে উন্নতিও হবে অনেক, সম্মান ও মর্যাদা রয়েছে অনেক উচ্চে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, শুধু ইলমের উপর গর্ব কর না, অহংকার কর না। আমল না হওয়া পর্যন্ত ইলম কোন কাজে আসবে না, ইলমকে কাজেকর্মে ব্যবহার করতে হয়। সুতরাং দুটি জিনিস বলা হয়েছে, মূর্খতায় মানুষের মুক্তি নেই, মুক্তি রয়েছে ইলম ও জ্ঞানে, আর শুধু ইলমেও নাজাত হবে না বরং সাথে আমলও থাকতে হবে।

আন্তরিকতাহীন বড় আমলও গ্রহণযোগ্য নয়

অতঃপর আকেটি কথা ইরশাদ করা হয়েছে–

وَالْعَامِلُوْنَ كُلُّهُمْ هَالِكُوْنَ إِلاَّ الْمُخْلِصُوْنَ.

আমলকারীগণও ধ্বংসশীল, রক্ষা পাবেন কেবল মুখলিসগণ।

আমলকারীগণের আমল কাজে আসবে না, এরাও সাবাই ধ্বংস হবেন; তবে রক্ষা পাবেন কারা? রক্ষা পাবেন মুখলিসীনগণ– যাদের আমলে খুলুস বা আন্ত

রিকতা ছিল, লিল্লাহিয়াত ছিল। লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে আমল করে থাকলে তা হবে বিপদের কারণ। খ্যাতি লাভের উদ্দেশ্যে আমল করলে নেহায়েত ধ্বংসাত্মক ব্যাপার হবে। আমল হতে হবে নির্ভেজাল ও আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে । তখনই কেবল লাভজনক হবে এবং এ দ্বারা মানুষের নাজাত হবে।

ইরশাদ করা হল, নাজাত ও মুক্তি আকার-আকৃতি দেখে দেয়া হবে না, হবে কেবল ইলম দ্বারা। তারপর শুধু ইলম দ্বারাও হবে না, হবে কেবল আমল দ্বারা। অতঃপর শুধু আমল দ্বারাও হবে না, হবে ইখলাস ও লিল্লাহিয়াত দ্বারা। যদি কেউ দ্বিমুখী আমল করে যে, আল্লাহকেও রাজি করব, আল্লাহর বান্দাদেরকেও কিছুটা খুশি করব– এরূপ আমল গ্রহণযোগ্য হবে না। যে আমল একমাত্র আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে হবে কেবল সে আমলই গ্রহণযোগ্য হবে, নতুবা হবে না। তাই বলা হয়েছে–

وَالْعَامِلُوْنَ كُلُّهُمْ هَالِكُوْنَ إِلاَّ الْمُخْلِصُوْنَ.

আমলকারীগণও ধ্বংস হয়ে যাবেন, রক্ষা পাবেন কেবল খালিস ও নির্ভেজাল আমলকারীগণ।

যদি কোন আমলের আকার আকৃতি মহানও হয়, কিন্তু এতে ইখলাস ও আন্ত রিকতা না থাকে, তবে এ আমলও ধ্বংসের কারণ হবে। আর আমল যদি ছোটও হয়, সাধারণ হয়, কিন্তু ইখলাস ও লিল্লাহিয়াত থাকে, তবে এ আমল নাজাতের কারণ হবে। হাদীসে খুলুসের তিনটি উদাহরণ বর্ণনা করা হয়েছে, এবং খুলুসবিহীন আমলেরও তিনটি উদাহরণ বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু ফলাফল পৃথক পৃথক।

কিছুক্ষণ পূর্বে আমি হাদীসের একটি অংশ বর্ণনা করেছি যে, কিয়ামতের দিন আলেমদের এক জামায়াতকে ডাকা হবে এবং আল্লাহ তাআলা তাদের উপর তার দান ও ইহ্সানগুলো বর্ণনা করে শোনাবেন। আমি তোমাদের বিভিন্নমুখী ইলম ও জ্ঞান দান করেছি এ দ্বারা তোমরা কী করেছ? তারা বলবেন, আমরা মানুষকে নসীহত করেছি, শিক্ষা দিয়েছি। আমরা তাবলীগ করেছি, গ্রন্থাদি রচনা ও প্রণয়ন করেছি। আল্লাহ বলবেন, করেছ ঠিকই কিন্তু কেন করেছ? এজন্য করেছ যে, বিশ্বে সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়বে– তুমি মহাজ্ঞানী আলেম। তা তোমার অর্জিত হয়েছে, প্রসিদ্ধি লাভ করেছ, তোমার উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়েছে, এখন আমার নিকট কী চাও? এখানে তোমাদের জন্য কী রয়েছে? কিছুই নেই। তখন তাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

হাদীসে বলা হয়েছে, বিত্তশালীদের এক দলকে ডাকা হবে, যাদেরকে আল্লাহ তাআলা লক্ষ লক্ষ টাকা দান করেছিলেন। আল্লাহ তাঁর দানসমূহ বর্ণনা করেন, আমি তোমাদেরকে লক্ষপতি, কোটিপতি বানিয়েছিলাম, লক্ষ লক্ষ টাকার সম্পদ দিয়েছিলাম, আর শুধু একপ্রকারই দেইনি, বরং নগদ টাকাপয়সা দিয়ে ছিলাম, কারখানা দিয়েছিলাম, বিল্ডিং দিয়েছিলাম ইত্যাদি। তোমরা আমার জন্য কী করেছ? তারা বলবে, আমরা সদকা করেছি, খয়রাত দিয়েছি, ইয়াতীম-বিধবাদেরকে দান করছি। আল্লাহ বলবেন দিয়েছ তা ঠিক কিন্তু কেন? এজন্য যে, সুখ্যাতি লাভ করবে, তুমি একজন অত্যন্ত দানশীল ব্যক্তি হিসেবে পরিচিতি পাবে; তা তো হয়ে গিয়েছ। আমার কাছে এখন কী চাও? এ দলকেও নিম্নমুখী করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

হাদীসে বলা হয়েছে, শহীদদের এক জামায়াতকে ডাকা হবে, আল্লাহ তাআলা বলবেন, আমি তোমাদের দেহে শক্তি দিয়েছিলাম, বীরত্বপূর্ণ দেহ দিয়েছিলাম, তোমরা আমার জন্য কী করেছ? তারা আরয করবে, আমরা তোমার রাস্তায় জিহাদ করেছি, আমাদের প্রাণকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিয়েছি, রক্ত প্রবাহিত করেছি, তোমার রাস্তায় আমাদের শিরোচ্ছেদও করা হয়েছে। আল্লাহ বলবেন, এসব করেছ ঠিকই কিন্তু কেন করেছ? এজন্য করেছ যে, তোমাদের খ্যাতি লাভ হবে, তোমরা বীর মহাবীর উপাধি লাভ করবে; তা তো হয়েছ,। প্রসিদ্ধি-খ্যাতি লাভ করেছ, শহীদ উপাধিতে ভূষিত করা হয়েছে, এখন আমার কাছে কী চাও? আমার নিকট তোমাদের জন্য কিছুই নেই। এ দলকেও নতশির করে জাহান্নামের অতলে নিক্ষেপ করা হবে।

আপনি দেখলেন যে, ইলম দ্বারা তাবলীগ করা কত মহান আমল। এ হল নবীগণের কাজ। কিন্তু সর্বনাশ হয়ে গেল এজন্যে যে, এতে ইখলাস ছিল না। দানশীলতা কত বিরাট আমল, লক্ষ কোটি টাকা সদকা দিয়েছে। এত বিরাট আমল ধ্বংস হয়ে গেল একটি মাত্র মারণে যে, তাতে ইখলাস ছিল না। জিহাদ একটি বিরাট আমল, মহাসাওয়াবের কাজ, মানুষ তার প্রাণকে বিলিয়ে দেয়া সত্ত্বেও তার আমল মকবুল হয়নি কারণ এতে ইখলাস ছিল না– খ্যাতি ও প্রসিদ্ধি লাভের আকাঙ্ক্ষা নিহিত ছিল। সুতরাং আমলের আকৃতি যত মহানই হোক না কেন যে পর্যন্ত তাতে রূহ না থাকবে ততক্ষণ তা কোন কাজেই আসবে না। আর রূহ হল ইখলাস ও লিল্লাহিয়াত। এ দ্বারা আমলে প্রাণের সঞ্চার হয়। যদি প্রাণ না থাকে তবে মৃতদেহ যতই মোটাতাজা হোক না কেন, পাহলোয়ানদের হোক না কেন তা দাফন করার যোগ্য, অন্য কোন কাজের যোগ্য থাকে না। কার্যক্ষম তখনই থাকে যখন প্রাণ থাকে।

বড় আমলের তিনটি উদাহরণ আপনারা শুনলেন, যেগুলো ইখলাস না থাকার কারণে নিষ্ফল হয়ে গেল।

ক্ষুদ্র আমলও ইখলাসের কারণে নাজাতের মাধ্যম হয়

হাদীসে ছোট ছোট আমলের তিনটি উদাহরণ বর্ণনা করা হয়েছে, যেগুলো কোন বড় আমল ছিল না, কিন্তু ইখলাসের কারণে নাজাতের উপায় হয়ে গেল। হাদীসে বলা হয়েছে, তিন ব্যক্তি ভ্রমণে বের হয়েছিল, কায়েক মাইল যাওয়ার পর প্রবল ঝড় বৃষ্টি শুরু হল। আত্মরক্ষার কোন উপকরণ সাথে ছিল না বিধায় একে অন্যকে বলল, ভাই! প্রবল ঝড়-বৃষ্টি শুরু হয়েছে, কাছেই পাহাড়ের একটি গুহা দেখা যাচ্ছে, এতে আত্মগোপন করে বৃষ্টি থেকে আত্মরক্ষা কর। ঝড় বৃষ্টি বন্ধ হলে গুহা থেকে বের হয়ে যাত্রা আরম্ভ করব। তিনজনই এ গুহায় প্রবেশ করলেন। গুহাটি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ছিল, ভিতরে গিয়ে সবাই বসে পড়লেন। হাদীসে রয়েছে, যখন বৃষ্টি আরো প্রবল আকার ধারণ করল, তখন কয়েক মণ ওজনের একটি বিরাট পাথর স্থানচ্যুত হয়ে গড়িয়ে পড়ল, এবং ঠিক গুহার মুখে এসে থেমে গেল। গুহার মুখ সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে গেল, বের হওয়ার কোন উপায় রইল না। দেখে শুনে তিনজনই বুঝতে পারলেন, এ বিরাটকায় পাথরকে সরানো সম্ভব নয়, মৃত্যুকাল ঘনিয়ে এসেছে। মাত্র দু'বেলার আহার্য আমাদের সাথে রয়েছে, দু'বেলা পানাহার করব তারপর ধুকে ধুকে মারা যাব। কাজেই তারা মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হয়ে বসে রইল। অন্তর চিন্তায় মগ্ন, চোখ দিয়ে অবিরাম অশ্রু গড়াচ্ছে, কিছুই করতে পারছেন না। যখন একদিন অতিবাহিত হয়ে গেল এবং খাবার নিঃশেষ প্রায়, অন্তরে দৃঢ় বিশ্বাস হয়ে গেল যে, এখন অবশ্যই মরতে হবে। একে অন্যকে বলতে লাগলেন– ভাই, মরতে তো হবেই, কিছু একটা ব্যবস্থা করা উচিত। একজন বলল, কী উপায় অবলম্বন করতে পারি? এ তো কয়ে মণ ওজনের পাথর, একে সরাতেও পারবে না, ভাঙতেও পাবে না। মরে যাওয়া ব্যতীত অন্য কোন করণীয় কাজ নেই। তিনি বললেন, না আমার মনে একটি উপায় জাগ্রত হয়েছে, অন্তত এ উপায় অবলম্বন করে দেখুন। অপর দু'ব্যক্তি বললেন, কী সে উপায়? তিনি বললেন, জড়বাদী কোন উপায় নয় যে, কুঠার দিয়ে কুপিয়ে পাথরটি চূর্ণবিচূর্ণ করে দিবে, সে উপায় হল আধ্যাত্মিক। আর তা হল আমরা তিনজন বসে আমাদের সম্পূর্ণ জীবনের হিসাব-নিকাশ করব, পর্যালোচনা করে দেখব। যদি কারো জীবনে কোন নেক আমল এমন পাওয়া যায়, যাতে পরিপূর্ণ ইখলাস ও লিল্লাহিয়াত বিদ্যামন ছিল, তবে ঐ আমলের ওসিলা নিয়ে আল্লাহর নিকট দুআ করি। এ কাজ তো আমরা করতে

করি। সবাই বললেন, যথার্থ কথা। এখন পর্যায়ক্রমে প্রত্যেকে নিজের আমল পেশ করতে লাগলেন।

একজন দাঁড়িয়ে বললেন, হে আল্লাহ! তুমি সর্বজ্ঞ, তুমি সবই দেখ, সবই জানো, তুমি জানো আমি একজন অসহায় দরিদ্র ব্যক্তি ছিলাম, আমার হাতে কোন টাকা পয়সা ধন দৌলত ছিল না, আমার নিকট ছিল একটি বকরী, এর দুধ দ্বারা আমার জীবিকা নির্বাহ হত। আমার মাতাপিতা ছিলেন এবং স্ত্রী ও কয়েকজন ছেলেমেয়েও ছিল। আমি বকরীর দুধ দোহন করতাম এবং সন্ধ্যাবেলায় সর্বপ্রথম এ দুধ আমার মা-বাবার নিকট পেশ করতাম। কারণ তাদের অগ্রাধিকার পাওয়ার অধিকার রয়েছে। তারা অধিক বয়স্ক, তাদের মাধ্যমেই আমরা দুনিয়ায় এসেছি। কাজেই সর্বপ্রথম তাদের হক আদায় করা উচিত। তাই আমি দুধ দোহন করে তাদের খেদমতে পেশ করতাম। দুধ পানে তারা পরিতৃপ্ত হয়ে যাওয়ার পর যে দুধ অবশিষ্ট থাকত তা থেকে সন্তানদেরকে পান করাতাম। তারপর অবশিষ্ট থাকলে স্ত্রীকে পান করাতাম, তারপরও কিছু বেঁচে থাকলে সর্বশেষে আমি পান করতাম। যেদিন অবশিষ্ট না থাকত, আমি সেদিন উপবাস করতাম, কিন্তু মাতাপিতাকে সর্বপ্রথম পান করাতাম।

একদা দুধ নিয়ে উপস্থিত হতে কিছুটা দেরি হয়ে গেল। এসে দেখি তারা ঘুমিয়ে পড়েছেন। আমি দুধের পাত্র হাতে নিয়ে মাতাপিতার পায়ের নিকট দাঁড়িয়ে রইলাম, যখন তাঁরা চেতনা পাবেন আমি দুধের পাত্র পেশ করব। আমার সন্তানগণ ক্ষুধায় আর্তনাদ করছিল কিন্তু তাদের অগ্রাধিকার ছিল না, পিতামাতার হক ছিল সর্বাগ্রে। আমি দুধের পেয়ালা হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম, অর্ধরাত্রি অতিবাহিত হওয়ার পর তাঁরা জাগ্রত হলেন, তখন আমার বাচ্চারা ঘুমিয়ে পড়েছে। (বুখারী শরীফের বর্ণনা অনুযায়ী রাত্রি শেষ হয়ে গিয়েছিল)।

তাঁরা ক্ষুধায় ব্যাকুল হয়ে বললেন দুধ; আমি তৎক্ষণাৎ দুধের পাত্র বাড়িয়ে দিলাম, তারা দুধ পান করলেন এবং আমার জন্য অনেক অনেক দুআ করলেন। যা অবশিষ্ট থাকল তা আমি আমার স্ত্রী-সন্তানগণকে পান করালাম। অল্প যা বেঁচে রইল তা আমি পান করলাম। হে আল্লাহ! আমি যে আমল করেছি এতে কোন দ্বিধা-সংশয় ছিল না, অন্য উদ্দেশ্য ছিল না। লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে ছিল না। একমাত্র তোমার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যই আমি এ কাজ করেছিলাম। যদি প্রকৃতই আমার আন্তরিকতার কারণে এ আমল তোমার দরবারে কবুল হয়ে থাকে, তবে হে আল্লাহ! এ বিপদ থেকে আমাদেরকে নাজাত দাও। আমাদেরকে উদ্ধার কর। হাদীসে রয়েছে, এ দুআর পর পাথরটি এক তৃতীয়াংশ পরিমাণ সরে গেল এবং গুহার মুখ কিছুটা খুলে গেল।

এখন দাঁড়ালেন দ্বিতীয়জন। তিনি বললেন, হে আল্লাহ! তুমি জানো, তুমি সর্বজ্ঞ। আমি একজন শ্রমজীবি মানুষ ছিলাম। আমার কাছে কোন প্রকার টাকা-পয়সা, ধন-দৌলত ছিল না। আমার একজন চাচাতো বোন ছিল। সে ছিল অত্যন্ত সুশ্রী, সুন্দরী ও লাবণ্যময়ী যুবতী। তার প্রেমে আমি আসক্ত হয়ে পড়লাম। আমি বিবাহের প্রস্তাব দিতে সক্ষম ছিলাম না, যেহেতু আমার হাতে টাকা পয়সা ছিল না। সে ছিল বিত্তশালী পরিবারে মেয়ে। আমি গোপনে তার নিকট হাজির হয়ে আমার মনের আকাঙ্ক্ষা ও উদ্দেশ্য ব্যক্ত করলাম। উদ্দেশ্য ছিল অপকর্মে লিপ্ত হওয়া।

সে বলল, আমার একটি শর্ত রয়েছে, তা হল একশত স্বর্ণ মুদ্রা ভর্তি ব্যাগ যখন আমার হাতে অর্পণ করতে পারবে, তখনই কেবল এ অপকর্মে অগ্রসর হতে পারবে, নতুবা হবে না। আমি গিয়ে চেষ্টা-পরিশ্রম ও মজদুরী করে প্রায় বছরকাল পর একশত স্বর্ণমুদ্রা সংগ্রহ করলাম এবং ব্যাগ ভর্তি করে এ মুদ্রাগুলো সাথে নিয়ে তার নিকট গমন করলাম এবং তাকে নির্জন স্থানে যাওয়ার জন্য বললাম। আমি এও বললাম, আমি তোমার শর্ত পূরণ করেছি, এই লও একশত স্বর্ণ মুদ্রা। এখন তুমি অস্বীকার করতে পারবে না। সে বলল, নিশ্চয়ই আমি অস্বীকার করতে পারব না।

শর্ত পূরণ হয়েছে, সে তৈরি হল। আমিও বদকারী ও অপকর্মে লিপ্ত হয়ে যাওয়ার জন্য দৃঢ় সংকল্প করে নিলাম। যখন পূর্ণ মাত্রায় অগ্রসর হলাম, তখন সেই রমণী বলল, হে বক্তি! আল্লাহকে ভয় কর। যে অপকর্ম করতে তুমি উদ্যত হয়েছ, কিয়ামতের ময়দানে তা প্রকাশ হয়ে পড়বে। আমাকে এবং তোমাকে আল্লাহর সম্মুখে জাবাবদিহি করতে হবে। আল্লাহকে ভয় কর, তাকওয়া গ্রহণ কর।

তার কথা শুনে আমার অন্তর কেঁপে উঠল। আমি তৎক্ষণাৎ দাঁড়িয়ে পড়লাম এবং বললাম, আমি এ স্বর্ণমুদ্রা ত্যাগ করলাম এবং জীবনের জন্য তওবা করলাম, কখনো কারো শালীনতা হানির ইচ্ছাও করব না। হে আল্লাহ! তোমার ভয়ে ভীত হয়ে আমি চলে এসেছিলাম, বিরত থেকেছিলাম। অপকর্ম থেকে রক্ষা পেয়েছিলাম এবং স্বর্ণমুদ্রাগুলোও ত্যাগ করেছিলাম। এতে আমার কোন ব্যক্তিস্বার্থ ছিল না, শুধু তোমার ভয় ও সন্তুষ্টি লাভের আশায় করেছিলাম। আমার এ আমল যদি তোমার দরবারে গ্রহণ করা হয়ে থাকে, তবে আমাদেরকে নাজাত দাও। হাদীসে রয়েছে, এ দুআর পর পাথরটি আরেক তৃতীয়াংশ সরে পড়ল এবং গুহার মুখ দুই-তৃতীয়াংশ খুলে গেল।

এবার তৃতীয়জন দাঁড়াল এবং সে বলল, হে আল্লাহ! তুমি জানো আমি একজন দরিদ্র লোক ছিলাম। পানাহার করার মত সম্বল আমার কাছে ছিল না। আমার এক বন্ধু দেশ ভ্রমণের ইচ্ছা করল। একশত টাকা আমার নিকট আমানত রেখে বলল, আমি যখন সফর থেকে ফিরে আসব, তখন আমার আমানত ফেরত দিয়ে দিও। আমার অবর্তমানে তুমি তোমার প্রয়োজনে এ টাকা ব্যয় করতে পার, যখন আমি ফিরে আসব তখন দিয়ে দিবে। আমানতের মাসয়ালা হল, যদি কারো নিকট টাকা আমানতস্বরূপ রাখা হয় তবে হুবহু সেই টাকা ফেরত দিতে হবে, এ টাকা ব্যয় করে অন্য টাকা দিতে পারবে না। একশত টাকার নোট যদি রাখে তবে অবিকল ঐ নোটই ফেরত দিতে হবে। এ নোট পরিবর্তন করে অন্য নোট প্রদান করা বৈধ হবে না। তবে আমানতকারী যদি অনুমতি দেন যে, আপনি ব্যয় করতে পারেন, তখনই কেবল খরচ করা, টাকা পরিবর্তন করে অন্য নোট প্রদান করা বৈধ হবে। সে যদি অনুমতি না দেয়, তবে তাতে হস্তক্ষেপ করা জায়িয হবে না, গচ্ছিত সেই টাকাই ফেরত দিতে হবে। সেই ব্যক্তি একশত টাকা আমানত রেখেছিল এবং অনুমতি দিয়েছিল যে, প্রয়োজনে তুমি খরচ করতে পার। হে আল্লাহ! আমি এ টাকা খরচ করি নাই বরং ঐ একশত টাকা দিয়ে কয়েকটি বকরী ক্রয় করেছিলাম এবং বকরীর দুধ বিক্রি করতে লাগলাম। এদে আমদানি হতে লাগল। এর আয় হতে আরো কয়েকটি বকরী খরিদ করলাম, এতে নগদ টাকাপয়সা সঞ্চিত হল, বকরীর সংখ্যাও বৃদ্ধি পেল। নগদ টাকাগুলো দিয়ে আমি গাভী খরিদ করলাম। এক সময় গাভীর সংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়ে অনেক হয়ে গেল। তারপ আমি উট খরিদ করলাম। মোটকথা, বকরী, গাভী, উট এবং অন্যান্য বহু সামগ্রী ক্রয় করলাম। তারপর আমি কিছু সম্পত্তি খরিদ করলাম। কয়েকটি বাগানও খরিদ করা হল। এসব দ্বারা লাখ লাখ টাকা মুনাফা হতে লাগল। যখন দশ-পনের বছর অতিবাহিত হয়ে গেল এবং লাখ লাখ টাকা আমার নিকট জমা হয়ে গেল, তখন আমার সেই বন্ধু এসে আমাকে বলল, আমার আমানতের একশত টাকা ফেরত দাও। তখন আমি একশত টাকা না দিয়ে তাকে সকল টাকাপয়সা, বিষয়-সম্পত্তি, বাগান ও জন্তুগুলো পেশ করলাম এবং বললাম এ সবই তোমার আমানত। সে বলল, আমার আমানত তো ছিল একশত টাকা মাত্র। লাখ লাখ টাকা তো রাখিনি। আমি বললাম, ঐ একশত টাকা দিয়েই এ লাখ লাখ টাকা হয়েছে। এ টাকা তোমারই, যেহেতু ঐ একশত টাকা তোমার ছিল। সে বলল, না, আমার দরকার নেই। আমি সেই একশত টাকাই নেব, লাখ লাখ নেব না। আমার উপর্যুপরি অনুরোধে শেষ পর্যন্ত সে সবই গ্রহণ করে নিয়ে গেল। সকল দালানকোঠা, বাগ-বাগিচা, চতুষ্পদ

জন্তু– সবই তাকে বুঝিয়ে দিলাম আর আমি যেমন দরিদ্র ভিখারী ছিলাম তেমনই হয়ে গেলাম। উপবাস করতে লাগলাম, অনাহার অর্ধাহারে আমার দিন কাটতে লাগল। একটি কড়িও আমার হাতে থাকেনি। হে আল্লাহ! আমি এ কাজ তোমার সন্তুষ্টির জন্য করেছিলাম, আমার ব্যক্তিগত কোন স্বার্থ ছিল না। যদি এ আমল তোমার দরবারে কবুল হয়ে থাকে তবে এর ওসিলায় আমাদেরকে নাজাত দান কর। হাদীসে বলা হয়েছে, যে এক-তৃতীয়াংশ অবশিষ্ট ছিল, তাও সরে গেল। গুহার মুখ পরিষ্কার হয়ে গেল এবং তারাও মহাবিপদ থেকে নাজাত পেল। অনিবার্য মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেল। তারা বেরিয়ে এল এবং আল্লাহ্ তাআলার অসংখ্য শুকরিয়া আদায় করল। (বুখারী শরীফের বর্ণনা অনুযায়ী– আমি একজন দীনমজুরকে কাজে লাগিয়েছিলাম, কাজ শেষ করে সে তার পারিশ্রমিক না নিয়ে চলে গেল, আমি তার ঐ পারিশ্রমিকের টাকা দিয়ে এসব করলাম)।

দেখুন, দানশীলতা, তাবলীগে দীন, আল্লাহর রাহে শাহাদাত এবং ইলম শিক্ষা দেয়ার মত পবিত্র আমলও বিফল হয়ে গেল, জাহান্নাম থেকে রক্ষা করতে পারেনি। কারণ এগুলোতে ইখলাস ও লিল্লাহিয়াত ছিল না। অথচ এগুলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আমল। মালের হক আদায় করেছে, যা তার উপর ফরয ছিল। এভাবে যিনা-ব্যভিচার থেকে আত্মরক্ষা করল, এ থেকে আত্মরক্ষা করা তার উপর ফরয ছিল। সে কোন বিরাট কাজ করেনি। এভাবে অন্যের আমানত রক্ষা করেছে, শ্রমিকের পারিশ্রমিক দিয়েছে। আমানত ফিরিয়ে দেয়া তার দায়িত্ব, এতে কোন মহা আমল করা হয়নি বরং এগুলো ছোট ছোট আমল। কিন্তু ইখলাসের সাথে করেছিল, আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভই একমাত্র কাম্য ছিল। তাই পৃথিবীতে নাজাত ও মুক্তিলাভের কারণ হল এবং আল্লাহ তাআলার দরবারেও মাকবুল হওয়ার মাধ্যম হয়ে গেল। যদি আল্লাহর দরবারে আমলগুলো মাকবুল না হত, তবে তাদের মুক্তি লাভ হত না, এ বিরাটকায় পাথর সরে যেত না। এতে বোঝা গেল আল্লাহর দরবারে তাদের আমল মাকবুল হয়েছিল। তাই দুনিয়াতে নাজাত লাভ হল। অথচ আমলগুলো ছোটই ছিল কিন্তু এতে ইখলাসের রূহ নিহিত ছিল। আর ওখানে আলেম, শহীদ ও দানশীলদের ছিল বিরাট বিরাট তিনটি আমল, কিন্তু জাহান্নাম থেকে উদ্ধার করতে পারেনি, নাজাত দিতে পারে নি। যেহেতু তাদের আমলে ইখলাস ছিল না, তাদের অন্তর ভেজাল মুক্ত ছিল না। কাজেই মূল বুনিয়াদি জিনিস হল ইখলাস। ইখলাস ও আন্তরিকতার সাথে যে আমল করা হবে, তাই আল্লাহ তাআলার দরবারে গ্রহণযোগ্যতার মর্যাদা লাভ করবে। কারণ, ইখলাস হল আমলের প্রাণ। কোন জিনিসের কাঠামোর কোন মূল্য হয়

এর মূল্য হয় তার প্রাণ ও রূহের। লাশের কোন মূল্য নেই, প্রাণীদের মধ্যে প্রাণেরই মূল্য হয়। এভাবে আমলের কাঠামো মাকবুল হয় না। আপনি যতই সুন্দরভাবে নামায পড়ুন না কেন যদি নিয়ত এই থাকে যে, মানুষ আমাকে নামাযী বলবে, তবে তা মাকবুল হবে না, বরং তা আপনার মুখের উপর ছুঁড়ে মারা হবে।

মানুষের জন্য মৌলিক ও বুনিয়াদি জিনিস হল খুলুস, লিল্লাহিয়াত ও ইখলাস। আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির জন্য আমল করবে, লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে কৃত আমল আল্লাহর দরবারে মাকবুল হয় না। তাই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন–

وَالْعَامِلُوْنَ كُلُّهُمْ هَالِكُوْنَ إِلا الْمُخْلِصُوْنَ.

আমলকারীগণও ধ্বংস হবেন, রক্ষা পাবেন শুধু মুখলিসগণ,
যারা সততা ও আন্তরিকতার সাথে আমল করেছেন।

এ হাদীসে তিনটি মৌলিক জিনিস বর্ণনা করা হয়েছে– সকল মানুষ ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে, আলেম-উলামাগণ ব্যতীত অন্য কেউ রক্ষা পাবে না। আবার শুধু ইলমই নয় বরং ইলম ও আমল মিলেও নাজাতের কারণ হবে না, খুলুস ও লিল্লাহিয়াত নাজাতের কারণ হবে। নাজাতের জন্য থাকতে হবে ইলম, আমল ও ইখলাস। তবেই কেবল নাজাত ফলপ্রসু হবে।

অহংকার ইখলাসকে ধ্বংস করে

জনাব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইখলাসের পর আরো একটি বিষয়ের কথা ইরশাদ করেছেন–

وَالْمُخْلِصُوْنَ عَلَى خَطَرٍ عَظِيْمٍ.

এবং মুখলিসগণও ভীষণ সংকটময় অবস্থায় রয়েছেন।

খুলুসিয়াত থাকলে মানুষ অহংকার করবে না, গর্বভরে বলবে না যে, আমি অত্যন্ত ইখলাসের সাথে আমল করেছি। শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত আশংকা রয়েছে। যখন ইখলাসের সাথে খাতেমা হয়ে যাবে তখনই কেবল প্রশান্তি লাভ করতে পারে যে, এখন নাজাত হবে। নতুবা খাতেমার পূর্বে যদি অন্তরে গর্ব-গরিমা এসে যায় যে, আমি অত্যন্ত মুখলিস, তাহলে সমস্ত আমল ধ্বংস হয়ে যাবে, কিছুই কবুল করা হবে না। যাই হোক, ততক্ষণ পর্যন্ত ইখলাস নির্ভরযোগ্য নয়

যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষের মধ্যে আল্লাহর উপর ভরসা করার মানসিকতা ও আবেগ সৃষ্টি না হবে। গর্ব ও অহংকার যেন না থাকে যে, আমি একটা কিছু হয়ে পড়েছি, আমি আমল করেছি।

একমাত্র আল্লাহর অনুগ্রহের উপর নাজাত নির্ভরশীল

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন, হাদীসে এসেছেঃ নবী ইসরাঈলে এক আবিদ ব্যক্তি ছিল, রাতদিন আল্লাহ তাআলার ইবাদতে ব্যস্ত থাকত। তার অন্তরে এ ধারণা উদিত হল যে, আমি ইবাদত করছি, বেশ পরিশ্রমও করছি। কিন্তু আমার স্ত্রী-পুত্র ও পরিবার-পরিজন রয়েছে বিধায় উপার্জনও করতে হচ্ছে। এতেও কিছু সময় ব্যয় হচ্ছে। যদি এমন কোন ব্যবস্থা হয়ে যেত যে, এসব ঝামেলা আর করতে হত না, চব্বিশ ঘণ্টা আল্লাহর ইবাদতে ব্যস্ত হয়ে থাকতাম। তৎকালীন শরীয়তে এভাবে সংসার ত্যাগী হয়ে ইবাদতে মনোনিবেশ করা জায়িয ছিল। বর্তমান শরীয়তে এরূপ করা জায়িয নয়। সে যুগে এটা জায়িয ছিল যে, মানুষ সবকিছু ত্যাগ করে পাহাড়ের গুহায় বা গভীর জঙ্গলে চলে যাবে। যাই হোক, ঐ ব্যক্তি রূহবানিয়াত (বৈরাগ্য) গ্রহণ করল, স্ত্রী-পুত্র, মাল-সম্পদ সব ত্যাগ করে সমুদ্রের মধ্যে একটি ছোট টিলা ছিল, সেখানে গিয়ে আস্তানা স্থাপন করল। মনে মনে স্থির করল, এখানে বসেই আল্লাহর ইবাদত করব, এখানে স্ত্রীও সামনে থাকবে না, সন্তানগণও থাকবে না, ব্যবসা-বাণিজ্য, দোকানপাট কিছুই থাকবে না। আমি শুধু একাগ্রচিত্তে আল্লাহর ইবাদতে ব্যস্ত থাকব। এই বলে সেখানে অবস্থান নিল।

এখন পানাহারের তো প্রয়োজন রয়েছে। আল্লাহ তাআলা তার জন্য এ ব্যবস্থা করে দিলেন যে, ঐ লবণাক্ত সাগরের মাঝে অবস্থিত পাহাড়ের মধ্যে অত্যন্ত মিষ্ট পানির একটি ঝরণার সৃষ্টি হল এবং তা থেকে ঠাণ্ডা পানি প্রবাহিত হতে লাগল। এছাড়া সেই টিলাটির উপর উৎপন্ন করে দিলেন একটি ডালিমের গাছ, সে গাছে বিরাট বিরাট ডালিম ধরতে লাগল। এগুলো ছিল অত্যন্ত মিষ্টি ও উপাদেয়। এ আবিদের কাজ ছিল এতটুকু মাত্র যে, প্রত্যহ একটি ডালিম খেয়ে নিবে এবং এক পেয়ালা পানি পান করবে, আর সকাল বিকাল আল্লাহ তাআলার ইবাদতে ব্যস্ত থাকবে। না ছিল রাত্রি কালে নিদ্রা বা দিবাকালে বিশ্রাম। ব্যাস, শুধু একই কাজ, দিবারাত্র আল্লাহর ইবাদতে ব্যস্ত থাকা। এ আবিদ এভাবে পাঁচশত বছর অতিবাহিত করল যে, দৈনিক একটি ডালিম, এক পেয়ালা পানি, আর চব্বিশ ঘণ্টা আল্লাহর যিকির ও ইবাদত। মৃত্যুকালে সে আল্লাহর দরবারে দুআ করল,

হে আল্লাহ! তুমি যখন সারাটি জীবন ইবাদত করার তাওফীক আমাকে দান করেছ, পাঁচশত বছর তোমার ইবাদত করিয়েছ, আমার মৃত্যু যেন সিজদারত অবস্থায় হয় এবং আমার শবদেহকে এ অবস্থায় কিয়ামত পর্যন্ত অক্ষত রেখ; যেন কিয়ামত পর্যন্ত আমি তোমার সিজদারত বান্দা বলে পরিগণিত হতে থাকি। মৃত্যুর পরবর্তী সময়েও যেন আমি নামাযরত অবস্থায় থাকি। যখন আমার শবদেহ কিয়ামত পর্যন্ত সিজদায় পড়ে থাকবে, তখন অবস্থা হবে এমন, যেন আমি কিয়ামত পর্যন্ত নামাযই পড়তে থাকলাম। তার এ দুআ কবুল হল, সিজদারত অবস্থায় তার ইন্তিকাল হল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আজ পর্যন্ত ঐ টিলায় তার শবদেহটি সুরক্ষিত রয়েছে। আল্লাহ তাআলা তার আশেপাশে বিরাট বিরাট গাছপালা ও গহীন জঙ্গল সৃষ্টি করে দিয়েছেন। সেখানে যেতে মানুষ ভয় পায়। আল্লাহ তাআলা ভীতির সঞ্চার করে রেখেছেন। কেননা, মানুষ যদি সেখানে যেত এবং দেখতে পেত, একজন মৃত ব্যক্তি সিজদায় রত রয়েছে, তবে মারাত্মক ফিৎনা দেখা দিত, মানুষ তার পূজা শুরু করে দিত। আল্লাহ মানুষকে গোমরাহী থেকে রক্ষা করার জন্য সেখানে বিরাট বিরাট গাছপালা সৃষ্টি করে দিয়েছেন। প্রকাণ্ড বৃক্ষরাজির কারণে সর্বদা সেখানে গভীর অন্ধকার বিরাজ করছে। অন্ধকারের কারণে ভয়-ভীতির সঞ্চার হয়েছে বিধায় মানুষ সেখানে যেতে ভয় পায়। এ কারণে ঘটনাটি মানব দৃষ্টির অন্তরালে রয়ে গেছে। যাই হোক, এভাবে ঐ আবিদ ব্যক্তি পাঁচশত বছর অতিবাহিত করেছ।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, মৃত্যুর পর তাকে আল্লাহর দরবারে নিয়ে হাজির করা হল, আল্লাহ বললেন, হে বান্দা! আমি তোমাকে আমার অনুগ্রহ, দয়া ও মেহেরবানী দ্বারা মাফ করে দিলাম এবং ফেরেশতাদের বললেন, জান্নাতের উচ্চস্থানে তার নাম লিখে রাখ। তাকে জান্নাতের প্রবেশাধিকার দেয়া হল এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেয়া হল।

ঐ আবিদের অন্তরে এ খটকা উদিত হল যে, আমি তো পাঁচশত বছর পরিশ্রম করেছি। স্ত্রী-পুত্র ত্যাগ করেছি, জনবসতি ত্যাগ করেছি। এরপরও আল্লাহ বলছেন তাঁর অনুগ্রহ দ্বারা আমাকে মাফ করে দিয়েছেন। আর না হোক, অন্তত আমার সান্ত্বনার জন্যও যদি বলে দিতেন যে, তোমার নামাযের কারণে তোমাকে মাফ করে দিলাম। তুমি পাঁচশত বছর সিজদা করেছ, এর বিনিময়ে আমি তোমাকে জান্নাত দিলাম। এতসবের পরও স্বীয় অনুগ্রহ ও দয়ার দ্বারা ক্ষমা করলেন; আমি যেন তাঁর সামনে কিছুই করিনি। এ ছিল তার অন্তরে উদিত হওয়া একটি ওয়াসওয়াসা। আকিদাগতভাবে এটি একটি কুফরী আকিদা। এমন

আকীদা থেকে সে পবিত্র ছিল, এমন আকিদা তার ছিল না, অন্তরে একটি ধারণা জন্মেছিল মাত্র। اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ 'আল্লাহ অন্তরের বিষয়াদি সম্পর্কেও সম্যক অবগত রয়েছেন।' যখন তার অন্তরে এ খটকা উদিত হয়েছে, আল্লাহ তাআলা ফেরেশতাদেরকে আদেশ দিলেন, জান্নাতের পরিবর্তে একে জাহান্নামে নিয়ে যাও। জাহান্নামে নিক্ষেপ করো না, কিন্তু এতটুকু দূরে দাঁড় করিয়ে রাখ যে, সেখান থেকে জাহান্নাম পাঁচশত বছরের পথ দূরে থাকবে। সেখানে নিয়ে যাওয়া হল, জাহান্নামের দিক থেকে উত্তপ্ত বাতাস ও আগুনের তাপ এসে তার শরীরে রাগল, সমস্ত শরীরে ফোসকা পড়ে গেল, পিপাসায় কাতর হয়ে চিৎকার করতে লাগল। মনে হচ্ছিল যেন তার অন্তর শুকিয়ে গিয়েছে। আর্দ্রতাও অবশিষ্ট নেই। জাহান্নামে দগ্ধ হলে কী অবস্থা হবে? এত দূরে রয়েছে, শরীরে জাহান্নামের তাপ লেগেছে মাত্র, তাতেই পুরো শরীর কাঠের মত শুষ্ক হয়ে গিয়েছে।

হাদীসে বলা হয়েছে, তখন একটি হাত প্রকাশ পেল, ঐ হাতে এক পেয়ালা ঠাণ্ডা পানি রয়েছে। এ আবিদ সেদিকে দৌড়ে অগ্রসর হল এবং বলল, হে আল্লাহর বান্দা! এ পানিটুকু আমাকে দান কর। হাতটি পিছনে সরে পড়ল এবং এ আওয়াজ এল– 'পানি দেয়া হবে, কিন্তু মূল্য দিতে হবে, বিনামূল্যে দেয়া হবে না'। সে জিজ্ঞেস করল, দাম কত? উত্তর এল, 'যে ব্যক্তি পাঁচশত বছর খালেস ইবাদত করেছে, তা যদি দিয়ে দেয় তবে এর বিনিময়ে এক পেয়ালা পানি দেয়া যেতে পারে, নতুবা দেয়া যাবে না'। সে বলল, আমার নিকট পাঁচশত বছরের ইবাদত রয়েছে, যা অত্যন্ত খালেস ইবাদত। এতে কোন প্রকার কপটতা নেই, সে পাঁচশত বছরের ইবাদত পেশ করল এবং বিনিময়ে পানির পেয়ালাটি পেল। এ পানিটুকু পান করে তার ভিতরে প্রাণ ফিরে এল।

আল্লাহ তাআলা ফেরেশতাদেরকে তাকে ফিরিয়ে আনার নির্দেশ দিলেন। ফিরিয়ে আনা হল এবং পুনর্বার আল্লাহর দরবারে পেশ করা হল। আল্লাহ তাআলা বললেন, হে বান্দা! তোমার পাঁচশত বছরের ইবাদতের মূল্য তো সাব্যস্ত হয়ে গিয়েছে। আর এ মূল্য তুমি নিজেই সাব্যস্ত করেছ যে, পাঁচশত বছরের ইবাদতের মূল্য এক পেয়ালা পানি। তা আমি আদায় করে দিয়েছি, লেনদেন সমান সমান হয়ে গিয়েছে। তুমি পাঁচশত বছরের ইবাদত দিয়েছ, আর আমি এক পেয়ালা ঠাণ্ডা পানি দিয়েছি। আর এ মূল্য তুমি নিজেই সাব্যস্ত করেছ, আমি বলিনি। সুতরাং তোমার ইবাদতের দায় থেকে আমি মুক্ত হয়ে গিয়েছি। এখন হিসাব দাও, পৃথিবীতে বসে পাঁচশত বছরে তুমি যে লাখো পেয়ালা পানি পান করেছ তার বিনিময়ে কী ইবাদত নিয়ে এসেছ? আর তুমি যে লাখ লাখ

ডালিম খেয়েছ, এ ডালিমের এক একটি দানার পরিবর্তে কি পরিমাণ সিজদা নিয়ে এসেছ? এতো ছিল দানা পানি। আর আমার বাতাসের মাধ্যমে তুমি যে কোটি কোটিবার শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করেছ, যার দ্বারা তোমার জীবন টিকিয়ে রেখেছ, এখন এক একটি শ্বাস-প্রশ্বাসের হিসাব দাও, এগুলোর পরিবর্তে কী পরিমাণ ইবাদত নিয়ে এসেছ? আর আমি তোমার চোখে যে জ্যোতি দান করেছিলাম, যার মাধ্যমে তুমি দেখতে পেতে। এক একবারের দৃষ্টির পরিবর্তে কতটি সিজদা নিয়ে এসেছ? কী পরিমাণ ইবাদত নিয়ে এসেছ? তোমার দেহে আমি যে শক্তি দান করেছিলাম, এর হিসাব দাও, এ শক্তির বিনিময়ে কী পরিমাণ ইবাদত করেছ? আমি তোমার অন্তরে ইচ্ছা, তাওফীক দান করেছি, এর বিনিময়ে কী নিয়ে হাজির হয়েছ? শক্তি আমি দান করেছি, তোমার অন্তরে ইচ্ছা আমি সৃষ্টি করেছি, তাওফীক আমি দয়িেছি, দানা-পানি আমি দান করেছি, তোমার দেহে প্রাণ ও সাহস আমি সৃষ্টি করেছি, এতসবের পরও তুমি দাবি করছ যে, আমি কিছু করেছি এবং আমার কৃতকর্মের প্রতিদান পাওয়া উচিত। আরে, এসব তো আমিই করিয়েছি। তুমি কী করেছ যার প্রতিদান চাও, বিনিময় চাও? আর যদি কিছু করে থাক তবে এখন হিসাব দাও। এ আবিদের প্রাণ ভয়ে কাঁপতে লাগল এবং বলল:

'হে আল্লাহ! নিঃসন্দেহে নাজাত আপনার অনুগ্রহে হয়ে থাকে, কারো আমল দ্বারা হয় না। আমলের তো মূল্য হল এই, পাঁচশত বছর যদি ইবাদত করে তবে তা এক পেয়ালা পানিরও সমপরিমাণ হয় না।'

আর এ ইবাদতও আল্লাহরই অনুগ্রহ, তিনি যদি তাওফীক না দেন, মানুষ ইবাদত করতে পারে না। দেহে যদি প্রাণ থাকে, ইবাদতের আনুসঙ্গিক সকল কিছুই থাকে কিন্তু অন্তরে ইবাদতের ইচ্ছা সৃষ্টি না হয় তবে ইবাদত করা সম্ভব হয় না। কিংবা ইচ্ছাও যদি হয় কিন্তু হিম্মত যদি না থাকে, অলসতা বেড়ে যায়, তবুও ইবাদত করা যায় না। আল্লাহই তাওফীক দান করেন, তিনিই সাহস যোগান, তবেই আপনি সিজদা করতে সক্ষম হন। তিনি হিম্মত দান না করলে আপনি কিভাবে সিজদা করবেন? এমতাবস্থায় গর্ব ও অহংকারের অর্থ কী? সবকিছুই তো আল্লাহর নিকট থেকে প্রাপ্ত।

রূপক ইবাদত নিয়ে কিভাবে আমরা গর্ব করতে পারি

আমাদেরকে এ শিক্ষা দেয়া হয়েছে যে, যত আমলই কর না কেন, তা নিয়ে অহংকার কর না। গর্ব কর না যে, আমি করেছি। শোকর আদায় করব যে,

আল্লাহ আমাকে তাওফীক দান করেছেন, কিছু করার শক্তি আমার ছিল না। ফেরেশতা আ.গণ কেয়ামতের দিন বলতে থাকবেন–

ما عبدناك حق عبادتك وما عرفناك حق معرفتك.

হে আল্লাহ! তোমার ইবাদতের হক আমরা আদায় করতে পারিনি, আমরা তোমার পরিচয়ও লাভ করতে পারিনি, যেভাবে পরিচয় লাভ করা কর্তব্য ছিল।

এখন পর্যন্ত আমরা মূর্খ ও অজ্ঞ। তোমার কামালাত সম্পর্ক এখনো আমরা সঠিক ধারণা লাভ করতে পারিনি। তোমার সত্তা অত্যন্ত মহান। তো যে ফেরেশতাগণ লাখো বছর ধরে ইবাদত করছেন তারাও বলবেন যে, আমরা কিছুই করতে পরিনি। আর আমরা মাত্র পঞ্চাশ-ষাট বছরের আয়ু নিয়ে আসি, এ থেকে বাল্যকালের চৌদ্দ বছর বিয়োগ করুন, এ সময়ে ইবাদত ফরয করা হয় না। শেষের দিকের দশ বারো বছর বার্ধেক্যের জন্যে ছেড়ে দিন, ঐ সময়ে মানুষ নিষ্কর্ম হয়ে পড়ে। এসব বাদে বড় জোর ত্রিশ-বত্রিশ বছর অবশিষ্ট থাকে। এর মধ্যেও পুরোটা সময় নামাযে ব্যয়িত হয় না। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে বিশ ঘণ্টা আয়েশ-আরাম, বিশ্রাম, সম্পদ আহরণ, টাকাপয়সা উপার্জনে ব্যয় করি। হয়ত এক ঘণ্টা, সোয়া ঘণ্টা নামায, তিলাওয়াত ইত্যাদিতে ব্যয় করি। এরপরও গর্ব-গরিমা করি– আমরা কিছু করছি। এ হবে অত্যন্ত বোকামী ও নির্বুদ্ধিতা। আমরা তো কিছুই করতে পারিনি। লক্ষ লক্ষ বছর ইবাদতকারী ফেরেশতাগণ যাদের খাওয়া-পরা, নিদ্রা-অলসতা কিছুই নেই, তারা বলছেন আমরা কিছুই করতে পারিনি। আর আমাদের মাত্র কয়েক মিনিটের ইবাদত। তাও আবার প্রকৃত ইবাদত নয়, বরং ইবাদতের আকৃতি গ্রহণ করছি মাত্র। আমরা আল্লাহর সম্মুখে দাঁড়াই, কিন্তু অন্তর থাকে অজস্র ওয়াসওয়াসায় পূর্ণ। কখনো এ চিন্তা-তাড়াতাড়ি দু'রাকাত শেষ করে দোকানে যাব, বেচা-বিক্রির ক্ষতি হচ্ছে। তাড়াতাড়ি যেতে হবে, আজ শনিবার, ক্রেতার আগমন হবে অধিক, নামায অতি তাড়াতাড়ি শেষ করতে হবে, আজ মুনাফা লাভের দিন। আমরা এই যা করছি তা ইবাদতের সুরত বা আকৃতি মাত্র, ইবাদত নয়। এ তো আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহ ও পুরস্কার যে, তিনি একে ইবাদত বলে মেনে নিয়েছেন। অন্যথায় এ ইবাদত কবুল হওয়ার সৌভাগ্য লাভের যোগ্য নয়। এ হল নিতান্তই আল্লাহর অনুগ্রহ ও মেহেরবানী। মুফতীগণ মাত্র এ ফাতওয়া দিতে পারবেন যে, নামায শুদ্ধ হয়েছে, এর বেশি নয়। এ জাতীয় বিষয়ে অহংকার বা গর্ব-গরিমা করার কোনই যৌক্তিকতা নেই। বরং নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী শোকর আদায় করা কর্তব্য

যে, আমার প্রভু আমাকে তাওফীক দান করেছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা করেছেনঃ لن ينجى احدكم عمله তোমাদের কাউকেই তার আমল নাজাত দিতে পারবে না। নাজাত দিবে আল্লাহর দয়া ও মেহেরবানী। হযরত আয়েশা রা. জিজ্ঞেস করলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! আপনার আমলও কি আপনাকে নাজাত দিতে পারবে না?' রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ لا، إلا ان يتغمّدنى الله না, আমাকেও আমার আমল নাজাত দিতে পারবে না যে পর্যন্ত আল্লাহর দয়া ও মেহেরবানী না হবে, আমাকে সাহায্য করা না হবে, তাঁর দয়া দ্বারা আমাকে আবৃত না করবেন, আমার আমল আমাকে নাজাত দিতে পারবে না। আল্লাহর মেহেরবানী ও দয়াই আমাকে নাজাত দিবে।

আল্লাহর কাছে ত্রুটি স্বীকার করাই শোকর

যখন নবী আ.গণ, এমনকি নবীগণের সরদার– সৃষ্টি জগতে যার চেয়ে উত্তম ও মহান অন্য কেউ নেই, তিনিই বলেছেন, 'আমাকেও আমার আমল নাজাত দিতে পারবে না, আল্লাহর দয়াই আমাকে নাজাত দিবে', তখন আমার-আপনার কী মূল্য থাকতে পারে যে, আমাদের কোন আমলের উপর গর্ব-গৌরব করব, অহংকার করব যে, আমরা বিরাট কিছু করে ফেলেছি। বান্দার কাজই হল এই যে, সবকিছু করেও বলবে, আমি কিছুই করতে পারিনি। আল্লাহর হামদ ও সানা হল এই– আমাদের দ্বারা কোন হামদ ও সানা আদায় করা সম্ভব নয়। আমরা না পারি আল্লাহ তাআলার পূর্ণাঙ্গ প্রশংসা করতে, না পারি পূর্ণাঙ্গ ইবাদত করতে। আর না পারি শোকর আদায় করতে। আমরা শুধু নিজেদের অসামর্থ্য ও অপারগতা প্রকাশ করতে সক্ষম।

হযরত দাউদ আ.কে আল্লাহ তাআলা আদেশ করলেন–

إِعْمَلُوْا اٰلَ دَاوٗدَ شُكْرًا.

হে দাউদ! আমার শোকর আদায় কর।

প্রকৃতপক্ষে আম্বিয়ায়ে কেরামই আল্লাহর কালামকে যথাযথভাবে বুঝতে পারেন। হযরত দাউদ আ. আরয করলেন, হে আল্লাহ! আপনি যখন বলছেন, অবশ্যই আমি শোকর আদায় করব। কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না যে, শোকর কিভাবে আদায় করব? এজন্য যে, যখন আমি শোকর আদায় করতে আরম্ভ করব, তখন শোকর আদায় করার তাওফীক আপনিই দান করবেন। তখন তাওফীকও হবে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ নেয়ামত। ঐ নেয়ামতের উপর আবার আমাকে শোকর

করতে হবে। যখন এর শোকর করব তখন আরেক নেয়ামত হবে, তখন আবার শোকর আদায় করতে হবে। কিভাবে শোকর আদায় করব? শোকর-এর সূচনাই করতে পারছি না। আমি তোমার শোকর আদায় করতে অক্ষম।

আল্লাহর পক্ষ থেকে জবাব এল– হে দাউদ! যদি তুমি বুঝতে পার যে, আমার শোকর আদায় করা থেকে তুমি অপারগ তবে এই হল আমার শোকর। কারণ প্রকৃতপক্ষে আমার শোকর কেউ আদায় করতে পারবে না। আমার নেয়ামতের বিপরীতে শোকর আদায় করতে হয়। আর আমার নেয়ামত হল অগণিত, এর কোন সীমা-পরিসীমা নেই। সীমাহীনের শোকর সসীম মানুষ কেমন করে আদায় করবে? আমাদের মস্তিষ্ক, চিন্তাশক্তি, আমাদের শক্তি-সামর্থ্য, কথাবার্তা সবই সীমাবদ্ধ। আমরা শোকর আদায় করলে তা একটা সীমার মধ্যে থাকবে, সীমিত হবে। সুতরাং সীমাহীনের শোকর সসীম দ্বারা কিভাবে করা যাবে? নিজের অক্ষমতা, অপারগতা প্রকাশ করা ব্যতীত কোন পথ নেই। এই হল প্রকৃত শোকর আদায় যে, মানুষ তার অক্ষমতা প্রকাশ করে দিবে। স্বীকার করে নিবে যে, আমি সম্পূর্ণ অক্ষম-অপারগ। আল্লাহর নিকট নিজ অক্ষমতা স্বীকার করাই সর্ববৃহৎ ইবাদত। এমন ব্যক্তি কে আছে যে আল্লাহর ইবাদতের হক আদায় করতে পারে? লাখ লাখ বছর ইবাদত করে যখন ফেরেশতাগণ বলবেন, আমরা কিছুই করতে পারিনি। আমাদের কী অস্তিত্ব যে, আমরা দাবি করব ইবাদত করেছি। আমাদের ইবাদত হল এই: আমাদেরকে যে আদেশ দেয়া হয়েছে, তা পূর্ণাঙ্গরূপে পালন করে একথা বলব, হে আল্লাহ! ত্রুটি হয়েছে, পূর্ণভাবে করতে পারিনি, আপনি মাফ করে দিন, ক্ষমা করে দিন। এই হল আমাদের প্রকৃত ইবাদত। কিন্তু তা তখনই হবে, যখন পরকালের চিন্তা থাকবে। তাই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, সকল মানুষ ধ্বংস ও বরবাদ হয়ে যাবে, রক্ষা পাবে শুধু আলেমগণ, আলেমগণও সব ধ্বংস হবে, রক্ষা পাবে শুধু আমলকারীগণ, আমলকারীগণও সব ধ্বংস হবে, রক্ষা পাবে শুধু মুখলিসগণ, আর মুখলিসগণও সংকটজনক অবস্থায় রয়েছেন। কারণ যে পর্যন্ত খুলুসিয়াতের উপর মৃত্যু না হয় সে পর্যন্ত তার নিশ্চয়তা কী? ঈমানের উপর মৃত্যু হয়ে যাওয়ার পর শান্তি ও সান্ত্বনা লাভ করা যায় যে, এখন নাজাত হবে। নতুবা সম্ভাবনা আছে যে মৃত্যুর পূর্বক্ষণ পর্যন্ত এমন কোন অবস্থা (আল্লাহ না করুন) হতে পারে যে, অন্তর থেকে ঈমান বিদায় নিয়ে যাবে, অথবা অন্তরই ঈমান থেকে সরে যাবে। আমলের তাওফীক ছিনিয়ে নেয়া হবে। এমন অনেক মানুষ রয়েছে যারা জীবনভর নেক কাজ করেছে আর মৃত্যুকালে অসৎকাজে লিপ্ত হয়ে পড়েছে। আর এমনও অনেকে আছেন, যারা সারা জীবন অসৎ ও মন্দ কাজ

করেছেন, কিন্তু মৃত্যুর পূর্বে এত ভাল ও উন্নত জীবনযাপন করেছেন যে, সারাদিন ইবাদতে ব্যস্ত রয়েছেন এবং ইন্তেকালও হয়েছে নেক ও উত্তমভাবে। কাজেই মানুষের জন্য কর্তব্য হল গর্ব-গরিমা না করা। কারণ তার খাতেমা কেমন হবে তা জানা নেই। বলা হয়েছে, وَالْمُخْلِصُوْنَ عَلٰى خَطَرٍ عَظِيْمٍ. 'মুখলিসগণ সংকটজনক অবস্থায় রয়েছে'। সংকট ও আশঙ্কা তখনই নিরসন হবে যখন ঈমানের সাথে মৃত্যু হবে। এ অবস্থায় নিশ্চিত হওয়া যায় যে, এখন নাজাত হবে।

আধ্যাত্মিক জীবনের চার উপাদান

নাজাতের জন্য চারটি মূলনীতি বর্ণিত হয়েছে– ইলম, আমল, ইখলাস ও পরকাল চিন্তা। এ হল চারটি ভিত্তি, যার দ্বারা মানবতা গঠিত হয়, মানুষের মনুষ্যত্ব উন্নত হয়। মানুষের মধ্যে যদি ইলম না থাকে তবে তা হল নিকষ অন্ধকারাচ্ছন্নতা। জাহালাত বা মূর্খতা দ্বারা মুক্তি পাওয়া সম্ভব নয়। যদি ইলম এসে যায় তবে ঔজ্জ্বল্য আসবে, কিন্তু যদি আমল না থাকে তবে শুধু ইলম কাউকে নাজাত দিবে না, বরং বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। যদি ইলমের সাথে আমলও থাকে কিন্তু সে আমলে ইখলাস না থাকে, বরং মুনাফেকী বা কপটতা থাকে, তবে সে আমলও বেকার– নাজাত দিতে পারবে না। যদি ইলম, আমল, ইখলাস সবই থাকে কিন্তু অন্তরে গর্ব-গরিমা থাকে যে, আমিই শ্রেষ্ঠ ইবাদতকারী; পরকালের ভয়ভীতি অন্তরে না থাকে, তবে সে ইখলাসও মূল্যহীন। এ চারটি জিনিসের সমন্বয়ের মাধ্যমেই মানুষের মানবতা গঠিত হবে, উন্নতি ও সমৃদ্ধি লাভ হবে। ইলম, আমল, ইখলাস, ফিকরে আখিরা– এর মধ্যে তিনটি জিনিস হল অভ্যন্তরীণ বা হৃদয়ের সাথে সম্পর্কিত, আর একটি হল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাথে জড়িত। ইলম অন্তরে হয়, হাতে পায়ে হয় না। ইখলাস ও লিল্লাহিয়াত হৃদয়াভ্যন্তরেই থাকে, হাত-পা ও অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গে থাকে না। পরকালের চিন্তা, ভয়ভীতি অন্তরেই হয়, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে নয়। অঙ্গগুলো শুধু আমল করে। কলবের আমল হল ইলম, ইখলাস ও পরকাল চিন্তা। এ তিনটি যদি ভিতরে থাকে আর বাইরে একটি (আমল) থাকে, তখন মানুষ প্রকৃত মানুষ হবে। তার নাজাতের ব্যবস্থা হবে।

এ হল এমন যেন আপনার দেহকে চারটি উপদান দ্বারা বানানো হয়েছে, আগুন, পানি, মাটি এবং বাতাস। তদ্রূপ আপনার রূহও চারটি জিনিস দ্বারা তৈরি হয়েছে– ইলম, আমল, ইখলাস এবং পরকালের চিন্তা। এ আগুন, পানি, মাটি,

বাতাস যদি না থাকে তবে দেহটি শেষ হয়ে যাবে। এভাবে এ চারটি জিনিস যদি না থাকে তাহলে রূহ খতম হয়ে যাবে।

মূল বুনিয়াদী জিনিস হল সান্নিধ্য ও সাহচর্য

ইলম, আমল, ইখলাস ও পরকাল চিন্তা– এই চারটি জিনিসের মধ্যেই মানুষের প্রকৃত জীবন নিহিত। 'ইলম' মাদ্রাসা ও দরসগাহে, কিতাবপত্রে ও ওলামাদের কাছ থেকে মিলবে। আমলকারীদের অবস্থা দেখে 'আমল' মিলবে। মুখলিসীনদের জামায়াতের সাথে বসে 'ইখলাস' অর্জিত হবে। আর পরকাল চিন্তায় যারা বিভোর তাদের সান্নিধ্য দ্বারা 'পরকাল চিন্তা' অর্জিত হবে। গাফেলদের সঙ্গে থেকে ফিকির তৈরি হবে না, তারা তো আরো গাফিলতির মধ্যে ফেলে দেবে। বদ আমলকারীদের সান্নিধ্য দ্বারা বদ আমল তৈরি হবে, আমল কিভাবে আসবে। জাহেলদের সান্নিধ্যে থাকলে 'জাহালাত' ও অজ্ঞতা মিলবে, ইলম কোথেকে আসবে?

সুতরাং সবচেয়ে বড় জিনিস হল সাহচর্য ও সান্নিধ্য, যার দ্বারা ইলম, আমল, ইখলাস ও ফিকির তৈরি হয়।

صحبت صالح ترا صالح کند صحبت طالح ترا طالح کند

সৎকর্মশীলগণের সাহচর্য তোমাকেও সৎকর্মশীলে পরিণত করবে এবং দুর্জনের সান্নিধ্য তোমাকে দুর্জনে রূপান্তর করবে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নেককারদের সাহচর্যকে আতর বিক্রেতার দোকানের সাথে তুলনা করেছেন। তার দোকানে গিয়ে আপনি আতর না কিনলেও সুগন্ধি পাবেন, আপনার মস্তিষ্ক সুগন্ধিময় হবে, আপনি প্রফুল্লতা অনুভব করবেন। অসৎসঙ্গের দৃষ্টান্ত যেন কামারের দোকান। সেখানে গেলে কিছু ছাইকালি আপনার গায়ে লেগে যাবে, ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হবেন, দুর্গন্ধের সৃষ্টি হবে। সুতরাং নোংরা ও অপরিচ্ছন্নতা নিয়ে ফিরে আসবেন। তদ্রূপ নেককারদের কাছে যখন যাবেন তখন অন্য কিছু না হলেও অন্তত তার ঈমানের উষ্ণতা কলবের মধ্যে কিছু ইষ্ণতার সৃষ্টি করবে, আল্লাহর প্রতি মনোযোগ বেড়ে যাবে, পরকালের খেয়াল বেড়ে যাবে। তার মুখ থেকে কোন কথা বের হলে তার দ্বারা মনের গ্রন্থিগুলো খুলে যাবে, আমলের পথ পরিষ্কার হয়ে যাবে। নেককারদের সান্নিধ্যে বসলে কোন না কোন উপকার হবেই। আর বদকারদের সান্নিধ্যে বসলে স্বভাব খারাপের দিকে ধাবিত হবে।

পৃথিবীতে খারাবী ও অন্যায় দ্রুত প্রভাব বিস্তার করে, নেক সান্নিধ্যের প্রভাব দেরীতে হয়ে থাকে। খারাপদের কাছে বসে পরের দিনই খারাপ হয়ে যায়; কিন্তু নেককারদের কাছে বসে কয়েক মাসে নেক কাজের যোগ্যতা তৈরি হয়। এজন্যই নেক সান্নিধ্য মানুষের বেশি আবশ্যক; এবং খারাপ সান্নিধ্য থেকে অধিক পরহেজ করা আবশ্যক। মূল বুনিয়াদী জিনিস হল সান্নিধ্য ও সাহচর্য। তাই মানুষের আবশ্যক হল উত্তম পরিবেশ তালাশ করা এবং নেককারদের সাথে থাকার আগ্রহ তৈরি করা।

এ ক্ষেত্রে এটা আবশ্যক নয় যে, সে নেককার ব্যক্তি ওলামাদের মধ্য থেকেই হতে হবে। নেককার ঐ ব্যক্তি যে আল্লাহর রাস্তায় পড়ে রয়েছেন। চাই তিনি বড় আলেম না হতে পারেন, সামান্য মাসয়ালা মাসায়িল জানেন, কিন্তু তার মধ্যে খুলুসিয়াত আছে, লিল্লাহিয়াত আছে। এমন বহু ব্যক্তিদেরকে দেখা গেছে যাদের মধ্যে ইলম নেই কিন্তু নেকী ও তাকওয়া এমন উঁচু পর্যায়ের যে, বড় বড় আলেমের সে সৌভাগ্য নসীব হয়নি। সুতরাং কখনো কখনো আমলের দৌলত সন্নিধ্যের মাধ্যমে নসিব হয়ে থাকে। সাহচর্যপ্রাপ্ত লোক অত্যন্ত মজবুত হয়ে থাকেন। কিছু কিছু ওলামার মধ্যেও সেই দীনদারী নেই যা তাদের মধ্যে রয়েছে। তাদের দীন মজবুত হয়ে থাকে। এ জন্যই সৎ লোকদের সান্নিধ্য লাভের জন্য তাকিদ করা হয়েছে।

সাহচর্য ও সান্নিধ্যের সুফল

হাদীস শরীফে বলা হয়েছে–

سبعة يظلهم الله فى ظله يوم لا ظل إلا ظله

> সাত প্রকারের মানুষ এমন হবেন যে, কিয়ামতের কঠিন দিনে আরশের ছায়ায় তাদেরকে স্থান দেয়া হবে, যেদিন তাঁর ছায়া ব্যতীত অন্য কোন ছায়া থাকবে না।

সাত প্রকারের মধ্যে এক প্রকারের প্রকৃতি কেমন হবে তা ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেছেন: رجلان تحابا فى الله অর্থাৎ এমন দুই ব্যক্তি যাদের পারস্পরিক ভালবাসা একমাত্র আল্লাহর জন্য।

উভয়ে এ চুক্তি করল– আমরা বন্ধুত্ব করেছি এ জন্য যে, একে অপরের দীনের হিফাযতে সহায়তা করব, আমি যদি নামাযে অলসতা করি, তবে তুমি আমাকে জবরদস্তিমূলক হলেও নিয়ে যাবে, সাজা-শাস্তি প্রদান করবে, সাবধান করবে।

আর তুমি যদি নামাযে অলসতা কর, যদি তুমি নামাযে অমনোযোগী হয়ে পড়, তিলাওয়াতে ত্রুটি কর তবে আমি তোমার মাথার উপর পাহারায় রত আছি, তোমাকে তিলাওয়াত করাব, নামায পড়াব। আর যদি আমার কোন ত্রুটি হয় তবে তুমি আমাকে শাসন করবে। আমরা একে অন্যের দীনের কাজে সাহায্য-সহায়তা করার জন্য বন্ধুত্ব করছি। হাদীসে বলা হয়েছে, যখন এদের মধ্য হতে কোন একজনের ইন্তেকাল হবে এবং সে আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির মাকামে কারীমে প্রবেশ করবে, তখন দুআ করবে, হে আল্লাহ! আমি আমার অমুক বন্ধুর বন্ধুত্বের কারণে এ উঁচু মর্যাদা লাভ করেছি, তারও খাতেমা ঈমানের উপর কর। তখন তার দুআ কবুল করা হবে। উভয়ে জান্নাতী হবেন। বন্ধুত্ব ও সাহচর্যের কারণেই তো এ নেয়ামত লাভ হল। সৎ ও নেক মানুষের সংশ্রব গ্রহণ করেছে তাই উভয়ের নাজাতের কারণ হয়ে গেছে। এর বিপরীতে হুবহু এ জিনিসটি বুঝে নিন, যদি দু ব্যক্তি বন্ধুত্ব স্থাপন করে এজন্য যে, একত্রে সিনেমায় যাব, থিয়েটারে যাব, অমুক মন্দ কাজে এক সাথে যাব। অথবা চার ব্যক্তি একত্রিত হয়ে চুরি করার উদ্দেশ্যে বন্ধুত্ব স্থাপন করল, পকেট মারার জন্য দোস্তী করল। এও এক প্রকার সাহচর্য। কিন্তু এ হল অসৎ ও মন্দ কাজ। এজন্য একজন যখন জাহান্নামে যাবে তখন সে বলবে, আল্লাহ! আমার ঐ বন্ধুও যেন দোজখে আসে। তার কারণে আমি আজ এখানে পৌছেছি, এ কঠিন বিপদে পতিত হয়েছি। সৎ ও অসৎ বন্ধুত্ব তার ক্রিয়া করেই ক্ষান্ত হবে। ইলম অন্তরে সে পরিমাণ প্রভাব বিস্তার করতে পারে না, যে পরিমাণ প্রভাব বিস্তার করতে পারে সাহচর্য। কাজেই প্রধান ও প্রথম কাজ হল মানুষ উন্নত ও পবিত্র পরিবেশ অন্বেষণ করবে, ভাল লোকের সাথে চলাফেরা করবে। আজ না হোক কাল এর ক্রিয়া প্রকশ পাবেই, অন্তরে প্রভাব বিস্তার করবেই। যাই হোক, উক্ত হাদীসে চারটি জিনিস বলা হয়েছে– ইলম, আমল, ইখলাস এবং ফিকরে আখিরাত। এগুলো ব্যতীত মানুষ পূর্ণ মানুষ হতে পারে না, তার মধ্যে প্রকৃত গুণাবলি সৃষ্টি হয় না। সে যেন পানাহারকারী এক জন্তু। সে অন্যান্য জন্তুদের তুলনায় অধিক সুন্দর, অধিক সুশ্রী; কিন্তু জন্তুই। যখন ইলম ও আমল অর্জন করবে, তখন বলা হবে সে জন্তু নয়, এখন তার অন্তরে মানবতা প্রবেশ করেছে। মানুষ ও জীব-জন্তুর মধ্যে এই হল পার্থক্য। এজন্য মুসলিম জাতিকে তালিমের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিতে হবে। যেন তাদের মধ্যে প্রকৃত ইলমের আলো ও গুণাবলি সৃষ্টি হয়ে যায়। জাহালত ও মূর্খতার দ্বারা আজ পর্যন্ত বিশ্বের কোন জাতি উন্নতি ও সমৃদ্ধি লাভ করতে সক্ষম হয়নি। একথা জরুরী নয় যে, সম্পূর্ণ জাতিকে মৌলভী হতে হবে, সকলকেই আলেম হতে হবে। এ কোন ফরযও নয়, ওয়াজিবও নয় এবং আবশ্যকীয় কিছুও নয়। কিন্তু প্রত্যেকের উপর ফরজ হল এই যে, এ পর্যন্ত

জ্ঞান গ্রহণ করবে যা দ্বারা সে তার দীনের উপর চলতে পারে। তাকে জানতে হবে যে, আমি মুসলমান এবং এও তাকে জানতে হবে যে, মুসলমান কাকে বলে, এর অর্থ কী? তার করণীয় ও বর্জনীয় কী? ইসলামের আরকান (মৌলিক বিষয়) কী কী যেগুলো করার মাধ্যমে মানুষ পূর্ণাঙ্গ মুসলমান হয়। এ পর্যন্ত শিক্ষা করা ওয়াজিব বা বাধ্যতামূলক। এ পরিমাণ শিক্ষা ব্যতীত নাজাতের কোন উপায় নেই। এদিকে বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে যে, শিক্ষা ব্যাপক হোক, সার্বজনীন হোক। দীনের প্রসার হোক, প্রচার হোক, সর্বত্র দীনের আলোচনা হোক, চর্চা হোক, সার্বজনীন শিক্ষা ব্যতীত দীনের ব্যাপক প্রসার ও চর্চা হতে পারে না। আমাদের মাদ্রাসাগুলোতে, যেমন আমার পূর্বের বক্তা দারুল উলুম দেওবন্দের ইতিহাস পর্যালোচনা করেছিলেন যে, দারুল উলুমের ফাযিলগণ বিভিন্ন স্থানে মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেছেন। দেশে হাজার হাজার মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কোন শহর বা উপশহর মাদ্রাসাবিহীন নেই। আর দেশ বিভাগের পর উত্তর প্রদেশের কোন বড় গ্রামও খালি নেই যেখানে মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করা হয়নি। গ্রামেও হাজার হাজার মাদ্রাসা রয়েছে। এসবের কারণে ইলমে দীন ও মাসআলাসমূহের আলোচনা ব্যাপকভাবে হচ্ছে। গ্রামীণ জনগণ সাধারণত সরল প্রকৃতির থাকেন। তাদের মধ্যে প্রতারণা, প্রবঞ্চনা বা নির্লজ্জতা নেই। কাজেই তাদের মধ্যে যখন ইলমের বীজ বপণ করা হয় তখন সাথে সাথে রিয়া মুক্ত আমল শুরু করে দেয়। ইলমের ফল প্রকাশ লাভ করে। তাদরে মধ্যে কোন প্রকার প্রতারণা বা কপটতা থাকে না। যেহেতু তাদের অন্তর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, সেহেতু ইলম তার পূর্ণ প্রভাব বিস্তারে সক্ষম হয়। এখানকার (উত্তর প্রদেশের) গ্রামীণ লোকেরাও এত অধিক পরিমাণ মাসাইল জানেন যে, সাধারণ মৌলভীকে তাদের সামনে হিমশিম খেতে হয়। মাসআলা বর্ণনায় সামান্য ভুল হলেই তারা বলবে, মাওলানা সাহেব, আপনার কথা শিরোধার্য, কিন্তু মাসআলা বলেছেন ভুল। মাসআলা এমন হবে। আমি অমুক বড় মাওলানার নিকট শুনেছিলাম। সাথে সাথে গ্রাম্য লোক আপনার ভুল-ভ্রান্তি ধরে দিবেন এবং মৌলভী সাহেব তা মেনে নিতে বাধ্য হবেন। তারা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন অন্তর ও উত্তম সাহচর্যের বদৌলতে অনেক মাসাইল জানতে ও শিখতে পেরেছেন। এসব হয়েছে দীনি শিক্ষার ব্যাপক প্রসারের কারণে। তালিমের চর্চার কারণে গ্রাম-গঞ্জ ও শহর-বন্দরে দীন বিস্তার লাভ করেছে।

গুনাহ জমা হয়ে যাওয়া অত্যন্ত ক্ষতিকর

প্রত্যেকের মধ্যেই কিছু না কিছু আমলের ত্রুটি-বিচ্যুতি রয়েছে। আমার মধ্যে কিছু ত্রুটি রয়েছে, আপনার মধ্যে কিছু ভ্রান্তি রয়েছে– প্রত্যেকেই অল্প-বিস্তর

ত্রুটি বা ভ্রান্তিতে লিপ্ত রয়েছি। কিন্তু ইলম ও পরকাল ভাবনা সঠিক রাখা কর্তব্য। যাতে করে যখন আমল করার তাওফীক হবে তখন যেন সঠিকভাবে আমল করতে পারি। ইলম যদি বিশুদ্ধ না হয় তবে মন আমল করতে আগ্রহী হলেও সঠিক পথ ও পদ্ধতির সন্ধান পাওয়া যাবে না। এজন্য অন্তরে ইলম থাকা আবশ্যক। ত্রুটি-বিচ্যুতি আল্লাহ ক্ষমা করে দেবেন। আমরা তো মানুষ, আর ভুল-ভ্রান্তি হল মানুষের মজ্জাগত। মানুষের ভুল হয়েই যায়। তার মধ্যে রয়েছে নফস ও প্রবৃত্তির কামনা-বাসনা। ভুলও হয়ে যায়, গুনাহও হয়ে যায়। গুনাহের চিকিৎসা স্বরূপ আল্লাহ তাআলা তাওবার ব্যবস্থা রেখেছেন। যখন তোমরা গুনাহ করে ফেলবে, সাথে সাথে তওবা করে নাও। বলা হয়েছে–

التائب من الذنب كمن لا ذنب له.

গুনাহ হতে তওবাকারী এমন যেন সে গুনাহ করেইনি।

গুনাহ হয়ে যাওয়া অপরাধ নয়, তা তো মানুষের স্বভাবজাত ব্যাপার। গুনাহগুলোকে পুঞ্জীভূত করে জমিয়ে রাখাই হল খারাপ। গুনাহ করল, কিন্তু তওবা করল না। যদি তওবা করে নিত তবে তার আমলনামা প্রতিদিন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন এবং নিত্য নতুন হয়ে যেত। দৈনিক নিজ আমলনামাকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে নেয়া উচিত। যখন আল্লাহর পক্ষ থেকে কোন হিসাবরক্ষক হিসাব পরীক্ষা করতে আসবে তখন আপনার খাতাপত্রকে শুদ্ধ-সঠিক পাবে, হিসাব-নিকাশ পরিষ্কার পাবে। আপনি নির্দ্বিধায় বলতে পারবেন, পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে নিন। অডিট করে নিন। আর যদি কোন ক্লার্ক এত অলস হয় যে, তার হিসাবের খাতায় ভুল রয়েছে, আর সে নিশ্চিন্ত মনে বসে আছে যে, মাস শেষে যখন এ অডিট আগমনের সময় হবে তখন এক রাত্রে সব ঠিক করে নেবে। এখন মাস শেষের পরিবর্তে হিসাব নিরীক্ষক বিশ তারিখ হিসাবের খাতা নিরীক্ষা করতে এসে হাজির হল, আর হিসাবপত্রে রয়েছে ভুল-ভ্রান্তি। নিরীক্ষক তখনই নির্দেশ দিবে, আপনি বরখাস্ত, আপনার বেতন বন্ধ। ঐ সময় দিশেহারা হয়ে অপলকনেত্রে দেখতে থাকবেন, কিন্তু কোন কাজ হবে না, কোন ফল হবে না।

মৃত্যুর নির্ধারিত সময় কারো জানা নেই

মানুষের আমলের খাতা উন্মুক্ত রয়েছে। যখন মৃত্যুর সময় আসবে তখন সব গুছিয়ে নেব– এ হল শয়তানী কুমন্ত্রণা। মৃত্যুর জন্য বার্ধক্যও শর্ত নয়, অসুস্থ হওয়াও শর্ত নয়, হাজারো মানুষ হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মারা যাচ্ছে। রোগ-ব্যাধি কিছুই নেই। অহরহ আমরা স্বচক্ষে দেখতে পাচ্ছি– এক ব্যক্তি আজ

ভাইদের সাথে সাক্ষাৎ করল, কাল শুনবেন সে ইনতেকাল করেছে। মৃত্যুর জন্য বৃদ্ধ হওয়া আবশ্যক নয়, দুর্বল হওয়া আবশ্যক নয়। প্রবল শক্তিশালী ব্যক্তিও মরে যায়। প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়া আবশ্যক নয়, শিশুরাও মারা যায়। বাল্যকালেও মৃত্যু হয়, যৌবনকালেও হয়, বৃদ্ধকালেও হয়। রোগ-ব্যাধিতেও হয়, বিনা রোগেও হয়। এ ধারণা করা যে, মৃত্যুকাল ঘনিয়ে এলে তওবা করে নেব– এ হল নিতান্তই শয়তানের একটি ধোকা। কারো কি জানা আছে যে, মৃত্যু কখন আসবে? সকল মানুষই বার্ধক্যে পৌঁছবে, এমন হওয়া আবশ্যক নয়। বরং আমি তো বলি যে যৌবনকালেই মৃত্যু হয় অধিক, বৃদ্ধকালে মৃত্যু হয় কম। যুবকরাই অধিক হারে মৃত্যুবরণ করে। তার প্রমাণ হল এই, আপনি সভা-সমাবেশ, জলসা, মাহফিল ইত্যাদিতে দেখবেন বৃদ্ধদের সংখ্যা অল্প, যুবকরাই বেশি। সকল মানুষ যদি বার্ধক্যে পৌঁছত, তবে বৃদ্ধদের সংখ্যা অধিক হত, সাদা দাড়ি অধিক দেখা যেত। যখন বার্ধক্যে না পৌঁছে মৃত্যু হত না– তখন তাদের সংখ্যাধিক্য হত। কিন্তু বার্ধক্যে পৌঁছার পূর্বেই মারা যান, এজন্যই বৃদ্ধদের সংখ্যা অল্প, তারা সংখ্যালঘু। যুবকদের সংখ্যাই অধিক দেখা যায়।

তো এভাবে ধোকায় পতিত হওয়া যে, যখন বার্ধক্য আসবে তখন তওবা করে নেব, অথবা রোগের কারণে যৌবনকালেই বিদায় নিতে হবে বলে বিশ্বাস হয়ে গেলে তখন তওবা করে নেব। এটা ভুল। রোগ-ব্যাধি হবে কি হবে না তা কে জানে? দৈনিক নিজের হিসাব-নিকাশের খাতা পরিষ্কার করে নেয়া কর্তব্য। এ কথা মনে করা মারাত্মক ভ্রান্তি যে, শেষ বয়সে তওবা করে নেব। যে ব্যক্তি বলে আগামীকাল করব, সম্ভাবনা আছে সে পরের দিনও বলবে কাল করব। তৃতীয় 'কাল' এলেও বলবে, না থাক, আগামীকাল করব। এভাবে আগামীকাল আগামীকাল করতে করতে পুরো জীবন অতিবাহিত হয়ে যাবে। মৃত্যুর ফেরেশতা সামনে এসে হাজির হবে, তখন আর তওবা করার কোন সুযোগ থাকবে না।

হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, কোন কোন মানুষ মালাকুল মউত বা মৃত্যুদূতকে দেখে বলবে, হে মৃত্যুদূত! আমাকে সামান্য সময় দান কর, আমি তওবা করে নেই। মৃত্যুদূত বলবেন, আমার বহু সংখ্যক বার্তাবাহক তোমার কাছে এসেছেন কিন্তু তুমি তো তখন তওবা করনি। এখন আমি যখন সর্বশেষে এসেছি তখন তোমার তওবার চিন্তা হয়েছে। সে বলবে আমার নিকট তো কোন বার্তাবাহক আসেনি! মালাকুল মউত বলবেন, এক-দুজন নয়, অনেক বার্তাবহক তোমার নিকট পাঠিয়েছি, তারা তোমাকে সতর্ক করেনি? সে বলবে, আমার নিকট কেউ আসেনি। মালাকুল মউত বলবেন, তোমার উপর বার্ধক্য আসেনি? এ বার্ধক্যই

আমার বার্তাবহক। বার্ধক্যই তো সংবাদ নিয়ে এসেছিল, মৃত্যু নিকটে। তোমার মুখের দাড়ি, মাথার কেশরাশি শুভ্র হয়নি? এ সাদা চুলগুলো আমারই বর্তাবাহক ছিল এবং সর্বক্ষণ তোমাকে সতর্ক করছিল– মৃত্যুর সময় নিকটবর্তী। তোমার নাতি-নাতনী হয়নি? এ নাতি-নাতনীর আগমন আমারই বার্তাবাহকস্বরূপ, তারাই তোমাকে সতর্ক করেছে যে, কবরে যাওয়ার সময় নিকটে। এতসব বার্তাবাহক আসার পরও যখন তোমার বোধোদয় হল না এবং তওবা করলে না, তখন আমিই সর্বশেষ দূত, আমার পরে আর কোন দূতের আগমন ঘটবে না। এখন কি আর তওবার সুযোগ আছে? এখন তো সময় অতিবাহিত হয়ে গিয়েছে, যা হবার তা হয়ে গেছে।

উপদেশ গ্রহণের ক্ষেত্র

এজন্যই আমি বলছি, যা করার তা তাড়াতাড়ি করে নিন, সময় খুব কম, নিজ জীবনের পরিধি কারো জানা নেই। এক বছর পূর্বে যারা আমাদের মধ্যে ছিলেন, আজ তারা আমাদের মাঝে নেই। আজ যারা আছেন, তাদের মধ্যে আগামী বছর পর্যন্ত কে বেঁচে থাকবে আর কে থাকবে না, এ সংবাদ কারো জানা নেই। মৃত্যুর বাজার সর্বদা গরম। আগন্তুকগণ আসছেন, প্রত্যাগমণকারীগণ যাচ্ছেন। আর এ অবস্থায় মানুষ চক্ষু বন্ধ করে বেখবর পড়ে আছে। এ কাজ বুদ্ধি-বিবেচনার পরিপন্থী। প্রত্যহ চোখের সামনে কত ঘটনা ঘটে যাচ্ছে।

من نمی گویم زباں کن یا بند سود باش اے زفرصت در ہر چہ باشی زود باش

আমি এ কথা বলছি না যে, এইটা কর বা ঐটা কর, আমি বলছি যা করার তাড়াতাড়ি কর। এজন্য যে, সময় অতি অল্প রয়েছে।

আমাদের মধ্যে অনেকের অর্ধেক জীবন অতিবাহিত হয়ে গিয়েছে, কারো অর্ধেকের চেয়েও অধিক। কেউ কেউ মৃত্যুর নিকটবর্তী হয়ে পড়েছেন, কারো পা কবরে ঝুলন্ত রয়েছে। পৃথিবীতে আমন নির্গমনের ধারাবাহিকতা সদা চলমান রয়েছে। এতসব দেখেও যদি মানুষ সাবধান না হয়, তবে কখন সাবধান হবে? তবে কি মৃত্যুদূতকে দেখার পর মৃত্যু যখন মাথার উপর এসে পড়বে তখন? এখন থেকেই সতর্ক হওয়া উচিত, শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। এবং এ কথা বুঝে নেয়া উচিত যে, সময় এগিয়ে আসছে, তার জন্য আমাদের কিছু করা উচিত।

পরকালীন জীবিকাও সংগ্রহ করা উচিত

পরকালের জন্য সব কিছুই করা উচিত তবে সর্বপ্রথম আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির ইলম এবং তার মারিফাত লাভ করতে হবে। জানতে হবে যে, কোন জিনিসে তিনি সন্তুষ্ট হন এবং কিসে অসন্তুষ্ট হন; কোন পথে পরিচালিত হলে তিনি সন্তুষ্ট হবেন আর কোন পথে হবেন অসন্তুষ্ট। এই ইলম আপনি লাভ করতে পারবেন শরীয়তের মাধ্যমে, বিজ্ঞান ও দর্শন দ্বারা তা হবে না, জ্যামিতি ও এলজাবরা দ্বারাও হওয়ার নয়। কুরআন ও হাদীস দ্বারা জানা যাবে যে, কিসে আল্লাহ সন্তুষ্ট এবং কিসে অসন্তুষ্ট; কিসে খুশি এবং কিসে নাখোশ।

সুতরাং ঐ ইলম অর্জন করুন যা দ্বারা পরকালে উপকার হয়। এ জগতে যে সকল নেয়ামত রয়েছে তা এখানেই আরামদায়ক মাত্র। এগুলো সাথে কবরে যাবে না। আমরা যদি এখানে উন্নত ও মূল্যবান গদি, মশারি, বালিশ ব্যবহার করি তাহলে তার আরাম আয়েশ এখানে সীমাবদ্ধ থাকবে, কবরের আরামের জন্য এ সকল জিনিস কিছুই করতে পারবে না, কোন প্রকার আরাম প্রদান করতে সক্ষম হবে না। সেখানের আরামদায়ক জিনিসই পৃথক। আর তা হল নেক আমল। সেখানের বালিশ হল নেক আমল। তুলা, পশম, প্লাস্টিক দ্বারা সে জগতের বালিশ হবে না। সেখানে অন্য জিনিস রয়েছে। এখানে চাল, ডাল, রুটি প্রভৃতি খাদ্যদ্রব্য দ্বারা পেট ভরে যায় কিন্তু কবরে এসব জিনিস আহার্য হবে না। সেখানে হবে নেক আমলের আহার্য, তা-ই হবে উপকারী। সেখানকার শয্যাও হবে নেক আমল দ্বারা তৈরি। হাদীসে বলা হয়েছে, যে মৃত ব্যক্তি যখন সঠিক উত্তর প্রদান করবে যে, আমার প্রভু আল্লাহ, আমার ধর্ম ইসলাম, আমার পয়গাম্বর ছিলেন হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তখন একজন ঘোষণাকারী ঘোষণা করবেন–

ان صدق عبدى، فافرشوه من الجنة والبسوا له من الجنة وافتحوا له بابا من الجنة.

আমার বান্দা সত্য বলেছে। তার জন্য জান্নাতী শয্যা বিছিয়ে দাও, তাকে জান্নাতের পোশাক পরিয়ে দাও, তার জন্য জান্নাতের দরজা খুলে দাও।

তো সে জগতের আহার্য ও নেয়ামতরাজি ভিন্ন এবং এ জগতেরগুলো ভিন্ন। আল্লাহ যেমন আমাদের জন্য এ জগতে খাবারের ব্যবস্থা করেছেন, পরকালের জন্যও খাবারের ব্যবস্থা করার ফিকির করা উচিত। এখানে অল্প-বেশি ফিকির

ছিল, পরজগতের জন্য আরো অধিক চিন্তাভাবনা করা কর্তব্য। কিন্তু আমাদের কারবার সম্পূর্ণ উল্টো। এ জগতের চিন্তাভাবনা অনেক, পরজগতের খাতা শূন্য। এ জগতের আরাম-আয়েশের জন্য সদা সতর্ক, সদা সচেষ্ট, পরজগতের আরাম-আয়েশের কোন খেয়ালই নেই। অন্তত কিছু সময় পরকল ভাবনায় ব্যয় করা উচিত, মৃত্যুর চিন্তা করা উচিত। তাই সর্বপ্রথম জিনিস হল ইলম, যেন আল্লাহর সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টি জানা হয়ে যায়। দ্বিতীয় জিনিস হল সৎপথ, আর তা হল নেক আমল। নেক আমল দ্বারা আমরা আল্লাহর নৈকট্য লাভে সমর্থ হব। তৃতীয় জিনিস অন্তরের মাকামাত, আর এ গুলোর মধ্যে সর্বপ্রধান ও সর্ববৃহৎ হল ইখলাস, যার দ্বারা আমাদের হৃদয়ের পথ পরিষ্কার হয়ে যায়। তার চয়েও বড় জিনিস হল ফিকরে আখিরাত। যেন সর্বদা পরকালের ধ্যান থাকে, গাফিলতি, অলসতা, বিমুখতার মধ্যে জীবন অতিবাহিত হয়ে না যায়।

মুসলমানদেরকে চিন্তাশীল করে সৃষ্টি করা হয়েছে

মুসলমানদেরকে চিন্তাশীলরূপে সৃষ্টি করা হয়েছে, গাফেল বানানো হয়নি। প্রকৃত মুসলমান সেই ব্যক্তি যে চিন্তাশীল, সার্বক্ষণিক তার মধ্যে চিন্তা কাজ করবে। হাদীসে বলা হয়েছে–

الكافر يأكل بسبعة امعاء والمؤمن يأكل بمعى واحد.

কাফেরগণ সপ্ত নালী (খাদ্যনালী বা অন্ত্র) পূর্ণ করে খায় এবং মুমিনগণ মাত্র একটি নালী পূর্ণ করে খায়।

মুমিনের আহার্য থাকে অল্প, কাফেরের থাকে অধিক। একই মাপের দুজন মানুষ নিন, একজন মুসলিম অপরজন অমুসলিম। কাফের অধিক আহার করবে আর মুসলিম করবে অল্প।

এর কারণ এই, কফেরের অন্তরে কোন চিন্তাভাবনা নেই, আর মুমিনের অন্তরে সর্বদা পরকালের চিন্তা বিরাজমান থাকে। কোন মুসলমানের আমল যতই খারাপ হোক না কেন অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে যে, তার অন্তরে পরকালের ভাবনা রয়েছে; চাই তা সামান্যই হোক না কেন। লাখপতি কোটিপতি মানুষও জানতে চায়, মাওলানা! এ জিনিসটি জায়িয আছে কি? জায়িয নাজায়িযের কথা কেন জিজ্ঞেস করছে? তার অন্তরে মৃত্যুভয় ও পরকালের চিন্তা রয়েছে বলেই তো জিজ্ঞেস করছে। যদি পরকালের চিন্তাভাবনা না-ই থাকত তবে জায়িয নাজায়িয জিজ্ঞেস করার কী প্রয়োজন ছিল? তাদেরকে বলতে শোনা যায়– আমি এ

কারবার করছি, এটা হারাম নয় তো। কাজটা কিন্তু সে করছে, তবুও জানতে চাচ্ছে। যেহেতু তার অন্তরে চিন্তাভাবনা রয়েছে তাই জিজ্ঞেস করছে। চিন্তা ভাবনা যদি না থাকত তবে জিজ্ঞেস করত না। এমন কোন মুমিন নেই যার অন্তরে পরকালের সামন্যতম চিন্তাও নেই। যখন অন্তরে চিন্তাভাবনা থাকে তখন খাদ্যের পরিমাণ হ্রাস পায়, আরাম-আয়েশের মাত্রা হ্রাস পায়। মুসলমানের সমপর্যায়ের একজন কাফেরকে দেখুন, সে মুসলমান হতে পাঁচগুন অধিক আয়েশী জীবন যাপন করবে। আর মুসলমান তার অনুপাতে একগুণ আরামে থাকবে। এজন্য যে, তার অন্তরে একটি চিন্তা কার্যকর রয়েছে, চাই তা যত অল্পই হোক– সময় আসছে, যেতে হবে, হিসাব-নিকাশ দিতে হবে। আর কাফেরের এসব ভাবনা-চিন্তা নেই।

পরকাল চিন্তাকে শাণিত করা আবশ্যক

তাআলা আমাদের মধ্যে চিন্তা ক্ষমতা দান করেছেন, যা ঈমানের সাথে সংযুক্ত হয়ে প্রত্যেক মুমিনের অন্তরে রয়েছে। কিন্তু একে কিছুটা শাণিত করা আবশ্যক। ঈমান সকলের মধ্যেই আছে, শুধু আমলের মাধ্যমে একে শাণিত করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। এমনিভাবে ঐ চিন্তাকেও উজ্জীবিত করা আবশ্যক। চিন্তা ভাবনা ততক্ষণ পর্যন্ত উজ্জীবিত হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত অন্তরে ইখলাস সৃষ্টি না হবে। আর ইখলাসও সে পর্যন্ত আসবে না যে পর্যন্ত আমলের যযবা ও আগ্রহ সৃষ্টি না হবে। আর আমল তৈরিই হতে পারবে না যে পর্যন্ত ইলম না হবে। সুতরাং ইলম, আমল, ইখলাস এবং পরকাল চিন্তা আবশ্যক।

এজন্যই আমি এ কয়েকটি কথা আরয করলাম যে, আমাদের তালিমেও বহু ত্রুটি হচ্ছে। পুরুষদের এবং মহিলাদেরও তালিমের প্রয়োজন রয়েছে। আর এর সাথে সাথে আমল, ইখলাস ও ফিকরে আখিরাতেরও আবশ্যকতা রয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যদি এ চারটি জিনিস না থাকে তবে ধ্বংস আর ধ্বংস, বরবাদী আর বরবাদী। এ চারটি জিনিসের দ্বারাই নাজাত লাভ হবে । তাই বলা হয়েছে, সকল মানুষ ধ্বংসের মুখে অবস্থান করছে, রক্ষা পাবেন মাত্র আলেমগণ। আলেমগণও ধ্বংস হয়ে যাবেন, নাজাত লাভ করবেন কেবল আমলকারীগণ। আমলকারীগণও ধ্বংসপ্রাপ্ত হবেন, মুক্তি পাবেন কেবল মুখলিসগণ। মুখলিসগণও ধ্বংস হয়ে যাবেন, নাজাত ও মুক্তি পাবেন শুধু পরকাল চিন্তায় বিভোর ব্যক্তিগণ। অর্থাৎ গাফিলতি দ্বারা মুক্তি হবে না, বিপর্যয় আসবে।

এজন্যই আমি অত্র হাদীসের আলোকে এ কয়েকটি কথা আরয করলাম। আশা করি এ কথাগুলোর উপর আপনারা চিন্তাভাবনা করবেন, মাঝে মধ্যে এগুলো নিয়ে ভাববেন, মস্তিষ্কে এগুলো ঘোরাফেরা করবে। এ চিন্তা করেন যে, কেমন করে এ হাদীসের উপর আমল করা যায়, কিভাবে আমরা আমাদের মনুষ্যত্বকে উৎকর্ষিত করতে পারি। সুতরাং চিন্তাভাবনা করতে থাকা উচিত যে, আমরা আমলের একটি নকশা তৈরি করব। একা এক ব্যক্তি একটি নকশা দাঁড় করাতে পারে। চারজনে মিলিত হয়ে করলে নকশাটি সুন্দর ও বৃহৎ হবে, আর যদি সমস্ত জাতি একত্রিত হয়ে তৈরি করে তবে অত্যন্ত উন্নতমানের নকশা প্রস্তুত হবে, সকলেই আমল করতে শুরু করবে। তাই আল্লাহর কাছে দুআ করি, তিনি যেন আমাদেরকে ও আপনাদেরকে, নারী-পুরুষ সকলকে নেক আমল, খুলুসিয়াত ও লিল্লাহিয়াত এবং পরকাল চিন্তার তাওফীক দান করেন। ইহকালেও যেন মুক্তি দান করেন এবং পরকালেও যেন মুক্তি দান করেন। আমীন।

اللهم ربنا تقبل منا إنك انت السميع العليم، وارنا مناسكنا وتب علينا، إنك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله واصحابه اجمعين، برحمتك يا ارحم الراحمين.

বয়ান : ৮

মধ্যম পথ

প্রতিটি মানুষের বিবেক-বুদ্ধি পৃথক। সুতরাং বুদ্ধি অনুযায়ী যদি আমল করা হয় তবে ধর্মীয় কাজে বিভিন্নতা সৃষ্টি হতে বাধ্য। কাজেই কিতাবপত্র ও বুযুর্গদের সাথে সম্পর্ক– এ উভয়ই প্রয়োজন। এটাই হল মধ্যপন্থা। আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের এটাই তরিকা। আর যে সকল মানুষ কোন ব্যক্তিকেই সমালোচনার ঊর্ধ্বে মনে করে না, তারা শুদ্ধ-সঠিক আমল থেকে সর্বদা বঞ্চিত থাকবে। আর যারা (অতীতেও) আমল করেছেন তারা ঐ সকল ব্যক্তিদের নিকট থেকেই আমল শিখেছেন।

– হযরত হাকীমুল ইসলাম রহ.





اَلْحَمْدُ لله نَحْمَدُه وَنَسْتَعِيْنُه وَنَسْتَغْفِرُه وَنُؤْمِنُ به وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِالله مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسنَا وَمِنْ سَيِّاٰتِ أَعْمَالنَا، مَنْ يَّهْدِه اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَه، وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلا هَادِىَ لَه، وَنَشْهَدُ أنْ لاَّ إِلٰهَ إلاَّ اللهُ وَحْدَه لاَ شَرِيْكَ لَه، وَنَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَمَوْلاَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُه وَرَسُوْلُه، أَرْسَلَهُ اللهُ إِلىٰ كَافَّـــةً لِّلنَّاسِ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا وَّدَاعِيًا إِلَيْهِ بِإِذْنِه وَسِرَاجًا مُّنِـــيْرًا.

أَمَّـــا بَعْدُ:

فَاَعُوْذُ بِالله مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ○ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ○ هُوَ الَّذِىْ أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ مِنْهُ اٰيٰتٌ مُّحْكَمٰتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتٰبِ وَأُخَرُ مُتَشٰبِهٰتٌ ط فَاَمَّا الَّذِيْنَ فِىْ قُلُوْبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُوْنَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَاْوِيْلِهِ ج وَمَايَعْلَمُ تَأْوِيْلَه إِلاَّ اللهُ ۘ وَالرّٰسِخُوْنَ فِى الْعِلْمِ يَقُوْلُوْنَ اٰمَنَّا بِهِ لا كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا ج وَمَا يَذَّكَّرُ إِلاَّ أُولُو الأَلْبَابِ○

বুযুর্গানে মুহতারাম!

প্রথমে এ আয়াতগুলোর তরজমা শুনে নেয়া প্রয়োজন। তা হল এই–

> আল্লাহ হলেন সেই মহান সত্তা যিনি স্বীয় বান্দা হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওপর স্বীয় কিতাব কুরআন অবতীর্ণ করেছেন; এ কিতাবে কিছুসংখ্যক আয়াত রয়েছে মুহকাম (দৃঢ় প্রত্যক্ষ ও সুস্পষ্ট অর্থবোধক), সেগুলোই কিতাবের আসল অংশ আর অন্য আয়াতগুলো হল মুতাশাবিহ (পরোক্ষ ও রূপক অর্থবোধক)। সুতরাং যাদে অন্তরে গোমরাহী ও বক্রতা রয়েছে, তারা বিভ্রান্তি সৃষ্টি, ফিতনা বিস্তার ও অপব্যাখ্যার উদ্দেশ্যে মুতাশাবিহ আয়াতগুলোর অর্থ অনুসন্ধান করতে থাকে। আর এ আয়াতগুলোর সঠিক অর্থ ও মর্ম সম্পর্কে আল্লাহ তাআলাই অধিক জ্ঞাত। আর যাদের ইলম ও জ্ঞান সঠিক ও পরিপক্ব তারা বলে, আমরা এ আয়াতগুলোর ওপর ঈমান আনয়ন করলাম; এসবই আমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে। আর বোধশক্তি সম্পন্নেরা ছাড়া অপর কেউ শিক্ষা গ্রহণ করে না। [আলে ইমরান : ৭]

(অতঃপর দুআর তালিম দেয়া হয়েছে) :

> হে আল্লাহ! আমাদের অন্তরকে বক্রতা থেকে রক্ষা কর, হিফাযত কর, যেহেতু তুমিই আমাদেরকে হিদায়াত দান করেছ, আর তোমার পক্ষ থেকে আমাদের ওপর রহমত ও করুণা বর্ষণ কর, দয়া কর, নিশ্চয়ই তুমি অত্যন্ত দানশীল। [আলে ইমরান : ৮]

(দ্বিতীয় দুআ হল) :

> হে আল্লাহ! তুমি অবশ্যই সকল লোকজনকে একত্রিত করবে এমন এক দিবসে, যে দিন সম্পর্কে কোন সন্দেহ বা দ্বিধা-সংশয় নেই, নিশ্চয়ই তুমি প্রতিশ্রুতির ব্যতিক্রম কর না। [আলে ইমরান : ৯]

শানে নুযুল

এ তো হল আয়াতের প্রায় শাব্দিক তরজমা। এ আয়াতসমূহে এমন একটি মূলনীতি বর্ণিত হয়েছে যে, যদি তার উপর আমল করা হয় তবে দীন নিরাপদ হয়ে যাবে। এ নীতিটি বর্ণনা করাই আমার উদ্দেশ্য, কিন্তু তার পূর্বে আয়াতের শানে নুযুলও শুনে রাখুন। কেননা, শানে নুযুল দ্বারা আয়াতের অর্থ বুঝতে যথেষ্ট সাহায্য হয়। আর শানে নুযুল হল এই: নাজরানবাসী খ্রিস্টানদের একটি দল মদীনা মুনাওয়ারায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে মুনাযারা (তর্কযুদ্ধ) করার জন্য এল। এ দলে আবদুল মাসীহ, আবু হারিস, ইবনে আলকমা– তিনজনই উপস্থিত ছিল। এদের মধ্যে আবদুল মাসীহ ছিল বিশিষ্ট চিন্তাবিদ এবং আবু হারিস ছিল অত্যন্ত প্রতিভাবান ও মেধাবী, তার স্মরণশক্তি ছিল অতি প্রখর এবং জ্ঞান ছিল ব্যাপক বিস্তৃত। তাওরাত ও ইঞ্জিলের ব্যাপক জ্ঞান ছিল তার; সে ছিল সকল গির্জার প্রধান পাদ্রী এবং নিজ ধর্মের প্রধান নেতা।

খ্রিস্ট আকীদা-বিশ্বাসের অসারতা প্রমাণ

খ্রিস্টানদের মৌলিক আকীদা এই ছিল যে, হযরত ঈসা আ. আল্লাহর ছেলে। এ বিষয়ে মুনাযারা করার জন্য তারা এসেছিল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর তখনকার আলোচনার মধ্যে এ কথাটিও ছিল যে, আল্লাহ তাআলা 'হাইয়ুন' অর্থাৎ নিজে চিরঞ্জীব এবং 'কাইয়ুমুন' অর্থাৎ জীবনকে রক্ষাকারী। আর হযরত ঈসা আ.-এর জন্য ফানা বা মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। আর যার মৃত্যু অবধারিত, নিজ জীবনকে রক্ষা করার সাধ্য যার নেই, সে অন্যদের ইলাহ (পূজনীয়) হবে কেমন করে? উপরন্তু এক সীমাহীন কাল পর্যন্ত তিনি স্বয়ং অস্তিত্বহীন ছিলেন। আর ইলাহ তো তিনি হওয়া আবশ্যক, যিনি স্বয়ং বিদ্যামান হবেন এবং সর্বকালে বিদ্যমান থাকবেন। অর্থাৎ আদি হতে অনন্তকাল পর্যন্ত। যে এমন হবে না, সে আল্লাহ হতে পারে না।

কুরআন মাজিদের অন্যত্র আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন–

كَانَا يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ

অর্থাৎ হযরত ঈসা আ. ও হযরত মারইয়াম আ. উভয়ে পানাহার করতেন। বোঝা গেল তারা পানাহারের মুখাপেক্ষী ছিলেন। আর যে ব্যক্তি পানাহারের মুখাপেক্ষী সে জমিনেরও মুখাপেক্ষী, কেননা খাদ্যশস্য জমিনেই উৎপন্ন হয়। সে

সূর্যেরও মুখাপেক্ষী, কেননা তার দ্বারা শস্যাদি উৎপন্ন হয়। এজন্যই মৌলিক উপাদান চতুষ্ঠয়, এমনকি গরু-মহিষ এবং ঘাস-উদ্ভিদ প্রভৃতিরও মুখাপেক্ষী। আর প্রভুত্ব ও পরমুখাপেক্ষিতা একত্র হতে পারে না। কেননা আল্লাহ তাআলার গুণাবলির মধ্যে 'সামাদ'ও একটি গুণ। যার অর্থ হল তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন এবং সমগ্র সৃষ্টিজগৎ তাঁর মুখাপেক্ষী।

খ্রিস্টানগণ যখন এসব কথার উত্তর দিতে ব্যর্থ হল তখন 'মুতাশাবিহ' আয়াতগুলো নিয়ে আলোচনা করতে শুর করল। বলতে লাগল যে, আপনার কিতাবেই তো ঈসা আ. সম্পর্কে বলা হয়েছে– وَكَلِمَتُهُ — وَرُوْحٌ مِّنْهُ অর্থাৎ 'তিনি আল্লাহর কালিমা এবং তাঁর থেকে নির্গত রূহ'। এ দ্বারা বোঝা যায়, তিনি আল্লাহরই অংশবিশেষ। (যাই হোক, তারা আসল কথার উত্তর দিতে ব্যর্থ হয়ে মুতাশাবিহ আয়াতগুলো নিয়ে আলোচনা করতে লাগল)।

আয়াত দুই প্রকারের

কুরআনের আয়াতগুলো সম্পর্কে কিছুটা ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ আবশ্যক। কুরআনের আয়াতগুলো হল দুই প্রকার– 'মুহকাম' তথা প্রত্যক্ষ ও সুস্পষ্ট অর্থবোধক ও 'মুতাশাবিহ' তথা পরোক্ষ ও রূপক অর্থবোধক। মুহকাম বলা হয় ঐ সকল আয়াতকে যার উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট এবং তার অর্থ সম্পূর্ণ প্রকাশ্য। চাই তার আভিধানিক অর্থ একটিই হোক বা বিভিন্ন হোক, অন্য নীতি দ্বারা একটি অর্থ নির্দিষ্ট হয়ে যায়।

আর মুতাশাবিহ বলা হয় ঐ সকল আয়াতকে যার উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট নয়। উদাহরণত তার বিভিন্ন অর্থ বিদ্যামান থাকে এবং কোন একটি অর্থকে নির্দিষ্ট করা যায় না, অথবা একটিই অর্থ থাকে কিন্তু এ স্থানে অর্থটি ঠিক হয় না।

এখন এ আয়াতগুলোর ব্যাপারে ফিৎনাকারীদের একটি পদ্ধতি তো এই যে, নিছক নিজস্ব মতামত দ্বারা একটি অর্থকে নির্দিষ্ট করে নেয়, যদিও তা মুহকাম আয়াতের পরিপন্থীও হয়। অপর দিকে হকপন্থীদের নীতি হল এই, হল মুতাশাবিহ আয়াতগুলোকে মুহকাম আয়াতগুলোর সাথে মিলিয়ে দেখতে হবে। মুহকাম আয়াতের অর্থ অনুযায়ী মুতাশাবিহ আয়াতের অর্থ করতে হবে। এরূপ করলে দীনের মধ্যে কোনরূপ বিভেদ সৃষ্টি হবে না। যদি প্রথমোক্ত পন্থা গ্রহণ করা হয়, তবে প্রত্যেকের বুদ্ধি-বিবেচনা পৃথক পৃথক হওয়ার কারণে দীন ও ধর্মে বিভেদ দেখা দিবে, মতপার্থক্য ও দলাদলি দেখা দিবে। খ্রিস্টানগণ এ পন্থাই গ্রহণ করেছে। কেননা 'রূহুম মিনহু' দ্বারা বাহ্যিক দৃষ্টিতে ঈসা আ.কে

আল্লাহর ছেলে বলার ধারণা হতে পারে, আর যদি অন্য আয়াতগুলোর সাথে এ শব্দকে মিলিয়ে দেখা হয় তবে ছেলে না বলার ধারণা বদ্ধমূল হয়ে যায়। এখন সঠিক পন্থা হল এই, মুতাশাবিহ আয়াতকে মুহকাম আয়াতের অর্থের সাথে সামাঞ্জস্য রেখে অর্থ করতে হবে। মুহকাম আয়াতে আল্লাহ বলেছেন–

إِنْ هُوَ إِلاَّ عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ

অর্থাৎ 'হযরত ঈসা আ. আমার একজন বিশিষ্ট বান্দা, যার উপর আমি বিশেষ নেয়ামত দান করেছি'। কাজেই বান্দা হওয়া আল্লাহ হওয়ার পরিপন্থী। অন্যত্র বলেছেন–

إِنَّ مَثَلَ عِيْسٰى عِنْدَ اللهِ كَمَثَلِ اٰدَمَ ط خَلَقَهٗ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ○

নিঃসন্দেহে আল্লাহর নিকট ঈসা (আ.)-এর দৃষ্টান্ত হচ্ছে আদম আ.-এর মত। আল্লাহ আদমকে মাটি দ্বারা তৈরি করেছিলেন, অতঃপর বললেন, হয়ে যাও, সঙ্গে সঙ্গে হয়ে গেলেন। [আলে ইমরান : ৫৯]

এ আয়াতে ঈসা আ.কে পরিষ্কার ভাষায় মাখলুক (সৃষ্ট) বলা হয়েছে, আর সৃষ্টি ও স্রষ্টা হল সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী।

আল্লাহর গুণাবলি সম্পর্কীয় মুতাশাবিহ-এর হুকুম

যেভাবে হযরত ঈসা আ. সম্পর্কে অত্র আয়াতটি মুতাশাবিহ, তদ্রূপ আল্লাহ তাআলার সিফাত (গুণাবলি) সম্পর্কেও বহু মুতাশাবিহ আয়াত রয়েছে। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন– يُرِيْدُوْنَ وَجْهَهٗ 'তারা আল্লাহ তাআলার চেহারা কামনা করে'। এ শব্দ দ্বারা বাহ্যিক দৃষ্টিতে আল্লাহর মুখমণ্ডল থাকা প্রমাণিত হয়। অন্যত্র বলা হয়েছে– يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ 'যেদিন আল্লাহ তাআলার পায়ের গোছা প্রকাশ করা হবে'। এ আয়াত দ্বারা আল্লাহ তাআলার পা ও পায়ের গোছ রয়েছে বলে প্রমাণিত হয়। মোটকথা মানুষের মত সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ প্রমাণিত হয়।

যেমনিভাবে এক হাদীসে বলা হয়েছে, রেহেম (আত্মীয়তার বন্ধন) এবং আমানত উভয়ে আল্লাহ তাআলার উদর জড়িয়ে ধরে বলতে লাগল, হে আল্লা! যে ব্যক্তি আমাকে মিলিয়ে রাখবে (অর্থাৎ আত্মীয়তার বন্ধনকে দৃঢ় রাখবে) তুমি

তাকে তোমার সাথে মিলিয়ে রেখ। আর যে ব্যক্তি আত্মীয়তার বন্ধনকে ছিন্ন করবে, তুমিও তাকে ছিন্ন করে দিও।

অন্য এক হাদীসে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তাআলা আদম আ.কে নিজ আকৃতি অনুযায়ী সৃষ্টি করেছেন। আরেক হাদীসে রয়েছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমি আল্লাহ তাআলাকে অত্যন্ত সুন্দর আকৃতিতে দেখেছি। অন্য এক হাদীসে রয়েছে– আল্লাহ তাআলা আমার বক্ষের ওপর তাঁর হাত রাখলেন, তখন ঐ হাতের স্নিগ্ধ পরশ আমি আমার হৃদয়ে অনুভব করলাম। আরো এক হাদীসে রয়েছে, সমস্ত মাখলুকের আত্মা আল্লাহ তাআলার দুটি অঙ্গুলির মধ্যে রয়েছে।

এখন বাহ্যিক দৃষ্টিতে এ সকল আয়াত ও হাদীসের এক অর্থ তো এই ধরা যেতে পারে যে, আল্লাহ তাআলার জন্য দেহ ও শরীরের অস্তিত্ব মেনে নেয়া, আরেক পদ্ধতি হল এগুলোকে মুতাশাবিহা-এর অন্তর্ভুক্ত করে অবোধগম্য ধরে নেয়া। এই পরিপ্রেক্ষিতে কেউ কেউ বলতে শুরু করল যে, আমাদের দেহের ন্যায় আল্লাহ তাআলারও দেহ রয়েছে। বেশির বেশি পার্থক্য এই যে, তাঁর দেহটি অনেক বড়– অনেক বিরাট। এ বিশ্বাসে বিশ্বাসী (ভ্রান্ত) সম্প্রদায়কে 'মুজাস্‌সামা' বা দেহবাদী সম্প্রদায় বলা হয়। কেউ কেউ এ মত পোষণ করতে লাগল যে, আল্লাহ তাআলার দেহ নেই বটে, তবে তিনি দেহধারী জিনিসের অনুরূপ। এ মতে বিশ্বাসীদেরকে 'মুশাব্বাহা' বলা হয়। আরো একটি ভ্রান্ত দল তৈরি হয়েছে, যারা মনে করে এসব শব্দের কোন অর্থ নেই– এগুলো হল অর্থহীন শব্দ। এ বিশ্বাসে বিশ্বাসীদেরকে বলা হয় 'মুয়াত্তালাহ'। এ তিন সম্প্রদায়ই ভ্রান্ত সম্প্রদায়।

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত তথা হক পন্থীদের আকীদা হল এই– আল্লাহ তাআলার এসব গুণাবলি রয়েছে কিন্তু এগুলোর বাহ্যিক ও বাস্তব অর্থ ও রূপ কী, তা আমাদের জানা নেই। কেননা, আল্লাহ তাআলা নিজেই বলেছেন–

لَيْسَ كَمِثْلِهٖ شَيْءٌ

তাঁর অনুরূপ কোন বস্তু নেই।

পবিত্র কুরআনের আয়াত–

الرَّحْمٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوٰى

(রহমান আল্লাহ তাআলা আরশে সমাসীন হলেন)-এর তাফসীর প্রসঙ্গে ইমাম মালিক রহ. বলেন–

الإستواءُ معلومٌ والكيفُ مجهولٌ، والإيمان به واجب، والسّوال عنه بدعة.

ইসতিওয়া (অবস্থান নেয়া, উপবিষ্ট হওয়া) শব্দের অর্থ আমাদের জানা কিন্তু তার কাইফিয়াত বা ধরণ অজানা। এর প্রতি ঈমান ও বিশ্বাস স্থাপন করা ওয়াজিব এবং এ প্রসঙ্গে প্রশ্ন করা বিদআত।

অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ন্যায় কোন কোন বর্ণনায় আল্লাহ তাআলার জন্য মানবিক গুণাবলির কথা বলা হয়েছে। যেমন হাদীসে বলা হয়েছে, আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক রাতের শেষাংশে নিম্নাকাশে অবতরণ করেন এবং বলতে থাকেন–

اَنَا الرَّزَّاقُ فهل من يسترزقنى، انا الملك فهل من يسئلنى، انا الغَافِرُ فهل من يستغفرنى.

আমিই রিযিক প্রদানকারী, আমার কাছে রিযিকের প্রত্যাশী কেউ আছে কি? আমিই রাজাধিরাজ, আমার কাছে কোন কিছু কামনা করার কেউ আছে কি? আমিই ক্ষমাকারী, আমার কাছে ক্ষমাপ্রার্থী কেউ আছে কি?

আরো এক হাদীসে বলা হয়েছে, তিন জায়গায় আল্লাহ তাআলা হেসে দেন– প্রথমত যখন নামাযিগণ প্রথম কাতারে দাঁড়ানোর জন্য দৌড়াতে থাকেন। দ্বিতীয়ত শেষ রাতে যখন স্বামী জাগ্রত হয়ে স্বীয় স্ত্রীর মুখে পানির ছিটা দেয় এবং সেও জেগে উঠে নামায পড়ে অথবা স্ত্রী জাগ্রত হয়ে স্বীয় স্বামীর মুখে গানির ছিটা দেয় এবং সেও জেগে উঠে নামায পড়ে। তৃতীয়ত যখন সর্বশেষ ব্যক্তিকে জাহান্নাম থেকে বের করা হবে। জাহান্নাম থেকে সর্বশেষ বের হওয়া ব্যক্তির অন্তরে আল্লাহ তাআলা অনেক আশা আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি করে দেবেন। তখন সে বলবে, হে আল্লাহ! আমার মুখমণ্ডলকে দোযখের দিক হতে ফিরিয়ে দিন। আল্লাহ তাআলা বলবেন, যদি তোমার চেহারা ফিরিয়ে দেয়া হয় তবে অন্য কিছু চাইবে না তো? সে বলবে– না, অন্য কোন কিছু চাইব না, আর কিছুই প্রার্থনা করব না। আল্লাহ বলবেন, তোমাকে বিশ্বাস নেই, তুমি শপথ করে বল, অন্য কিছু চাইবে না। সে শপথ করে বলবে, আমি অন্য কিছু চাইব না। তখন তার চেহারা আগুনের দিক থেকে ফিরিয়ে দেয়া হবে। যখন সে জান্নাতের পরিবেশ দেখতে পাবে, তখন তার অন্তরে এ খেয়াল উদিত হবে, আমি এখনও কষ্টে

রয়েছি, তাই তার অন্তরে আকাঙ্ক্ষা হবে এবং বলতে থাকবে, হে আল্লাহ! আমাকে জাহান্নাম থেকে দূরে সরিয়ে দিন। আল্লাহ বলবেন–

ويلك يا ابن ادم، ما أغدرك!

দুর্ভোগ হোক তোমার জন্য হে আদম সন্তান, তুমি বড়ই অঙ্গীকার ভঙ্গকারী!

(অনুরাগ ও আদরচ্ছলে আল্লাহ এ কথা বলবেন)। অতঃপর আল্লাহ তাআলা বলবেন, এর পর আর কিছু তো চাইবে না? সে শপথ করে বলবে, আর কিছুই চাইব না। এ কথার পর আল্লাহ তাআলা তাকে জাহান্নাম থেকে কিছুটা দূরে সরিয়ে দেবেন এবং সে হামাগুড়ি দিয়ে এগুতে থাকবে আর বলতে থাকবে–

تبارك الذى نجانى منها

সকল প্রশংসা ঐ সত্তার যিনি আমাকে হাজান্নাম থেকে নাজাত দিয়েছেন।

তারপর যখন সে 'নহরে হায়াত' বা জীবন প্রস্রবণ দেখবে তখন নিজেকে কষ্টে পতিত রয়েছে বলে মনে হতে থাকবে এবং পুনরায় আকাঙ্ক্ষা ও প্রার্থনা করতে শুরু করবে– হে আল্লাহ! আমাকে ঐ নহরের নিকট পৌছিয়ে দাও। আল্লাহ বলবেন–

ويلك يا ابن ادم، ما أغدرك!

হে আদম সন্তান! তুমি নেহায়াত অঙ্গীকার ভঙ্গকারী, তুমি ধ্বংস হও!

অতঃপর আল্লাহ বলবেন, যদি তোমাকে ওখানে পৌছিয়ে দেয়া হয়, তবে অন্যকিছু চাইবে না তো? সে শপথ করে বলবে, আমি আর কিছুই চাইব না। তাকে সে ঝর্ণা পর্যন্ত পৌছিয়ে দেয়া হবে। সে গিয়ে তাতে গোসল করবে, এতে তার দগ্ধিভূত কালো দেহ চাঁদের ন্যায় উজ্জ্বল হয়ে উঠবে। সে অন্তরে এ ধারণা করবে– যে দয়া আমার উপর করা হয়েছে তা অন্য কারো প্রতি করা হয়নি। তারপর যখন বেহেশতের দরজাগুলো দেখতে পাবে, এগুলোর মধ্যে প্রত্যেকটির দূরত্ব এ পরিমাণ হবে, যে পরিমাণ দূরত্ব মক্কা ও আদনের মধ্যে রয়েছে। এ দূরত্ব হাজারো মাইলের হবে। এরই সাথে বেহেশতের পরিচ্ছন্ন দেয়ালের মধ্য দিয়ে হেবেশতের অভ্যন্তরীণ জিনিসগুলোও দখেতে পাবে। পুনরায় সে আকাঙ্ক্ষা করতে আরম্ভ করবে– হে আল্লাহ! আমাকে বেহেশতের দরজা পর্যন্ত

পৌঁছিয়ে দাও। আল্লাহ বলবেন–

ويلك يا ابن ادم، ما أغدرك!

হে আদম তনয়! দুর্ভোগ হোক তোমার, তুমি বড়ই বিশ্বাস ও অঙ্গীকার ভঙ্গকারী। যদি তোমাকে সে জায়গায় পাঠিয়ে দেয়া হয় তবে অন্য কিছু চাইবে না তো? সে শপথ করে বলবে, আর কিছুই চাইব না। তাকে বেহেশতের দরজার নিকট পৌঁছিয়ে দেয়া হবে। তারপর জান্নাতের নেয়ামতসমূহ দেখতে পেয়ে আবার নিজেকে কষ্টে আছে বলে ভাবতে আরম্ভ করবে এবং পুনর্বার আকাঙ্ক্ষা ও দুআ করতে লেগে যাবে– হে আল্লাহ আমাকে জান্নাতের ভিতরে প্রবেশ করান। আল্লাহ বলবেন–

ويلك يا ابن ادم، ما أغدرك!

হে আদম সন্তান! তুমি যে অত্যন্ত অঙ্গীকার ভঙ্গকারী। আচ্ছা যাও, তোমাকে এক দুনিয়ার সমপরিমাণ জান্নাত দান করা হল। সে জান্নাতে প্রবেশ করবে কিন্তু কোন জায়গাই খালি পাবে না– সবই পূর্ণ রয়েছে। সে ফিরে এসে বলবে, কোথাও তো খালি জায়গা নেই। আল্লাহ বলবেন, তোমাকে দুই দুনিয়ার সমপরিমাণ রাজত্ব দান করলাম। সে আবার জান্নাতে প্রবেশ করবে, এবার দেখতে পাবে, পূর্বের তুলনায় জায়গার অভাব আরো প্রকট। পুনরায় ফিরে গিয়ে আল্লাহর দরবারে একই আবেদনই করবে। আল্লাহ বলবেন, যাও তোমাকে তিন দুনিয়ার সমপরিমাণ রাজত্ব দান করা হল। সে গিয়ে দেখবে জায়গার অভাব আরো তীব্র, আরো প্রকট। তখন সে আল্লাহ তাআলাকে লক্ষ করে বলবে–

اتستهزيني وأنت رب العالمين

আপনি বিশ্ব প্রতিপালক হয়ে আমার সাথে ঠাট্টা করছেন?

এ কথা শুনে আল্লাহ তাআলা হেসে দিবেন এবং বলবেন যাও, তোমাকে দশ দুনিয়ার সমপরিমাণ রাজত্ব দান করলাম। এবার প্রবেশ করে দেখতে পাবে তার রজত্ব ঠিকই রয়েছে। বোঝা গেল সর্বশেষ যে ব্যক্তিকে জান্নাতে প্রবেশাধিকার দান করা হবে, তাকেও দশ দুনিয়ার সমপরিমাণ রাজত্ব দেয়া হবে। আর হাদীস দ্বারা এও জানা গেল যে, আল্লাহ তাআলা হাসেন। এ জন্য আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত বলেন, এ জাতীয় সিফাত ও গুণাবলি আল্লাহ তাআলার রয়েছে, তবে এর কাইফিয়াত ও বাস্তব অবস্থা আমাদের বোধগম্য নয়।

নবী আ.গণের ব্যাপারে মুতাশাবিহ নস-এর হুকুম

কুরআন হাদীসে আল্লাহ তাআলার সিফাত সম্পর্কে যেমন মুতাশাবিহ শব্দাবলি বলা হয়েছে, কোন কোন নবী আ. সম্পর্কেও তদ্রূপ মুতাশাবিহ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। কাজেই এ ক্ষেত্রে মধ্যম পন্থা হল এই যে, এগুলোকে মুহকাম আয়াতগুলোর সাথে মিলিয়ে দেখা হবে। যথা যেহেতু নস (কুরআন হাদীসের অকাট্য প্রমাণ) দ্বারা প্রমাণিত যে, নবীগণ আ.গণ সগীরা ও কবীরা গুনাহ হতে পবিত্র হয়ে থাকেন, সেহেতু কোন নবী আ. দ্বারা এমন কোন কাজ যদি হয়ে যায়, যা বাহ্যিক দৃষ্টিতে ভাল মনে না হয়, তবে সেখানেও এরূপ বলা হবে যে, নবী যা করেন আল্লাহর পক্ষ থেকেই করেন। যদি জ্ঞান-বুদ্ধি দ্বারা অর্থ নির্ধারণ করা হয় তবে এখান থেকে গোমরাহী আরম্ভ হয়ে যাবে এবং নতুন একটি মাজহাব জন্ম নিবে। আমি বলে থাকি যে, মতবিরোধ তো তারাই করে যারা আহলে সুন্নাত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পৃথক মাজহাব বানিয়ে নিয়েছে। আর প্রকৃতপক্ষে বিদআতীগণই দ্বন্দ্ব-কলহ করে থাকে।

সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে মুতাশাবিহ শব্দের হুকুম

নবী আ.গণের মত সাহাবায়ে কেরামের ব্যাপারেও এ পথ অবলম্বন করতে হবে। কেননা, তাঁরা স্বার্থপরতা, ধর্মদ্রোহিতা ও বেদীনি হতে অনেক দূরে ছিলেন। আল্লাহ তাআলা বলেন–

وَالسَّابِقُوْنَ الأَوَّلُوْنَ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالأَنْصَارِ وَ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُمْ بِإِحْسَانٍ لا رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْ عَنْه.

প্রাথমিক যুগের মুহাজির ও আনসারগণ এবং তাদের অনুসারীগণ– সকলের প্রতি আল্লাহ সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তাঁরাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট রয়েছেন। [তাওবা : ১০০]

এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা সাহাবীগণের প্রতি তাঁর সন্তুষ্টির ঘোষণা দিচ্ছেন, যা কিয়ামত পর্যন্ত বিদ্যমান থাকবে।

অন্যত্র ইরশাদ করা হয়েছে–

مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللهِ ط وَالَّذِيْنَ مَعَه أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَّبْتَغُوْنَ فَضْلاً مِّنَ اللهِ وَرِضْوَانًا

سِيْمَاهُمْ فِىْ وُجُوْهِهِمْ مِّنْ اَثَرِ السُّجُوْدِ ط ذٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِى التَّوْرَاةِ ج وَمَثَلُهُمْ فِى الْاِنْجِيْلِ.

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল, তাঁর সঙ্গী-সাথীগণ কাফেরদের প্রতি অত্যন্ত কঠোর, নিজেদের মধ্যে খুবই নম্র হৃদয়। তুমি তাঁদেরকে দেখতে পাবে, তাঁরা রুকু ও সিজদাকারী অবস্থায় আল্লাহ অনুগ্রহ ও দয়া প্রার্থনা করছে। সিজদার কারণে তাদের চেহারাতে চিহ্ন ফুটে রয়েছে। তাঁদের এসব গুণাবলি তাওরাত ও ইঞ্জিলে বর্ণিত হয়েছে। [ফাতাহ : ২৯]

আয়াতের প্রথমাংশে সাহাবীগণ সম্পর্কে مَعَه বলা হয়েছে। এ শব্দ এদিকেই ইঙ্গিত করছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে তাদের সম্পর্ক ও যোগাযোগ মুত্তাসিল বা অবিচ্ছেদ্য রয়েছে, মুনকাতি বা বিচ্ছিন্ন নয়। এবং اَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّار দ্বারা তাঁদের 'বুগযু ফিল্লাহ' বা আল্লাহর জন্য শত্রুতা-এর প্রশংসা করা হয়েছে এবং رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ দ্বারা 'হুব্বু ফিল্লাহ' বা আল্লাহর জন্য ভালবাসা-এর আলোচনা করা হয়েছে আর এ গুণগুলো দীনের পূর্ণতা অর্জন ব্যতীত হাসিল হতে পারে না। অতঃপর تَرَاهُمْ দ্বারা আল্লাহ তাআলা তাঁদের আমল সম্পর্কে সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, তাঁরা রুকু সিজদায় ব্যস্ত থাকেন। সদা সর্বদা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের চিন্তায় মগ্ন থাকেন।

এখানেই শেষ নয় বরং বলা হয়েছে যে, পূর্ববর্তী কিতাবসমূহেও তাঁদের গুণাবলি বর্ণিত রয়েছে। যেন আদম আ. থেকে আরম্ভ করে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত সর্বযুগে সাহাবীগণের প্রতি আল্লাহর মাকবুল বান্দাহ বলে সাক্ষ্য দেয়া হয়েছে। আর কুরআনেও তাদের মাকবুল বান্দাহ হওয়ার সাক্ষ্য রয়েছে, যা কিয়ামত পর্যন্ত বিদ্যমান থাকবে। এখন যদি তাঁদের থেকে এমন কোন কাজ হয়ে যায়, যা বাহ্যিক দৃষ্টিতে অসংগত মনে হয়, তখন আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির ঘোষণার প্রতি লক্ষ্য করে উপযুক্ত ও সংগত তাবিল করে অর্থ সাব্যস্ত করতে হবে। যেমন, কোন সাহাবী অন্যের সম্পর্কে 'কিজব' বা মিথ্যা শব্দ ব্যবহার করেছেন, তখন এ কথা বলা যাবে না যে, তাঁর মিথ্যা বলার অভ্যাস ছিল, একথাও বলা যাবে না যে, তাঁরা পরস্পর হিংসাত্মক ও আক্রমণাত্মক কথাবার্তা বলতেন; বরং তাদের অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করে সে অনুযায়ী অর্থ

সাব্যস্ত করা হবে এবং একে 'ইজতিহাদী খতা' বা গবেষণা জনিত ভ্রান্তি বলা হবে। সে কাজেও তারা একটি করে নেকী পাবেন। তাদেরকে জবাবদিহি করতে হবে না।

আল্লাহর ওলীগণের কথাবার্তা সম্পর্কে আহলে হকের নীতি

যেমন হযরত মানসুর হাল্লাজ রহ. 'আনাল হক' (আমিই ধ্রুব সত্য– আল্লাহ) বলেছিলেন, এ কথা শুনেই হক হওয়ার ব্যাপারে তাঁর সাথে বেআদবী করা যাবে না। বরং তাঁর সম্পূর্ণ জীবনকে দেখে তার সাথে সংগতিপূর্ণ অর্থ করা হবে। আর মূল কথা হল এই যে, সুফিগণের বেলায় 'ফানা ফিল্লাহ' নামের একটি স্তর রয়েছে। যার অর্থাৎ আল্লাহর নিকট সবকিছু বিলিয়ে দেয়া, নিঃশেষ করে দেয়া। হযরত মানসুর নিজেকে এ পরিমাণ বিলিয়ে দিয়েছিলেন যে, 'আনা' বা আমি দ্বারা তাঁর নিজ সত্তা উদ্দেশ্য ছিল না বরং আল্লাহ তাআলার সত্তা উদ্দেশ্য ছিল। এ স্তরে পৌঁছে যাওয়ার পর 'আমি' ও 'তুমি' দ্বারা উদ্দেশ্য একই হয়ে থাকে।

এর বিপরীতে ফেরাউন যখন 'আনাল হক' বলল, তখন তার বাহ্যিক অর্থই গ্রহণ করা হয়েছে। কেননা, তার জীবনই এমন ছিল যে, নিজেকে আল্লাহ বলে দাবি করত। সুতরাং এ জাতীয় মুতাশাবিহ শব্দগুলোর অর্থ সমস্ত জীবনের অবস্থাদির আলোকে স্থির করতে হবে। হযরত মানসুরের জীবন আউলিয়ার ন্যায় ছিল, আর ফেরাউনের জীবন ছিল শয়তানের ন্যায়। কাজেই সে অনুযায়ী অর্থ করা হবে।

হযরত বায়েজিদ বোস্তামী রহ.-এর একটি প্রসিদ্ধ উক্তি রয়েছে–

ملكى اعظم من ملك الله

আমার রাজত্ব আল্লাহ তাআলার রাজত্ব অপেক্ষা বড়।

ঘটনা এই হয়েছিল যে, একবার তিনি 'বে-খুদী' বা আত্মহারা অবস্থায় পৌঁছে গিয়েছিলেন। তখন তাঁর মুখ দিয়ে এ বাক্যটি বের হয়েছিল। যখন তিনি চৈতন্য ফিরে পেলেন, তখন মুরীদগণ আরয করল, হযরত! আপনার মুখ দিয়ে আজ কুফরী কালাম বেরিয়েছে। তিনি বললেন, তবে তোমরা আমাকে কিভাবে ছেড়ে দিলে?

অতঃপর দ্বিতীয়বার যখন তিনি ঐ অবস্থায় পৌঁছে গেলেন তখন মুরীদগণ তাঁকে প্রহার করতে লাগল। কিন্তু ব্যাপার হয়ে গেল উল্টো– তারা প্রহার করছিল পীর সাহেবকে আর আঘাত লাগছিল তাদের দেহে। আঘাতজনিত কারণে তাদের

অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়ল। তিনি যখন হযরত চৈতন্য ফিরে পেলেন, তখন তিনি জিজ্ঞেস করলেন, বিষয় কী? মুরীদগণ বলল, আজও আপনার মুখ দিয়ে কুফরী কথা বের হয়েছে, তখন আমরা আপনরাকে প্রহার করলাম, কিন্তু আঘাত গড়ল আমাদের দেহে। এ কারণে আমাদের এ দুরবস্থা হয়েছে। হযরত বায়েজিদ রহ. বললেন, ঐ কালেমা কী ছিল? মুরীদগণ তা বললেন। তখন তিনি বললেন, এতো হল ঈমানের কথা। কেননা আল্লাহর রাজত্ব হলাম আমি এবং এ বিশ্বজগৎ আর আমার রাজত্ব হলেন স্বয়ং আল্লাহ তাআলা। যার মধ্যে আমি সর্বক্ষণ ভ্রমণ করি। সুতরাং নিশ্চিত যে, আমার রাজত্ব আল্লাহর রাজত্ব হতে বড়।

এখন এখানেও বক্র হৃদয় গোমরাহদের তরীকা হল এই, হয়ত আল্লাহর ওলীদের এত অধিক পরিমাণ প্রশংসা করে যে, তাঁদেরকে আল্লাহর পর্যায়ে নিয়ে যায়। অথবা কুরআন-হাদীসের বাহ্যিক অর্থের প্রতি লক্ষ না করে আউলিয়াদের বর্ণনাতীত পর্যায়ের অবমাননা করে। আর একটি হল মধ্যমপন্থা। আর তা হল এই, যেন কুরআন ও হাদীসের নীতিসমূহ যথাস্থানে ঠিক থাকে এবং আউলিয়াগণের কথাকেও তাঁদের জীবনী দেখে সে অনুযায়ী অর্থ করা হয়। আর এ হক ও সত্য-সঠিক পথ সীমালঙ্ঘনকারীদের নসীব হয় না বরং মধ্যপন্থীদের ভাগ্যেই তা নসীব হয়ে থাকে।

হযরত নিজামী রহ.-এর একটি বিস্ময়কর ঘটনা

কথা প্রসঙ্গে হযরত ফখরুদ্দীন নিজামী রহ.-এর একটি ঘটনা মনে পড়ল হল, হযরত হাজী সাহেব রহ. ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন। হযরত নিজামী ছিলেন অত্যন্ত উঁচু স্তরের একজন বুযর্গ। চৌদ্দ বছর বয়সেই ইসলাহের (চরিত্র সংশোধন ও গঠন) কাজ আরম্ভ করে দিয়েছিলেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত সুশ্রী। তিনি মসজিদে যাওয়ার সময় জনগণ তাঁকে দেখার জন্য সড়কের দু'পাশে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে থাকতেন। তিনি যার দিকে চক্ষু তুলে দেখতেন সে বেহুশ হয়ে পড়ে যেত। তখন তিনি বলতেন, আরো গভীর মনোযোগের সাথে দেখতে থাক।

ঘটনাটি হল এই, তাঁর একজন মুরীদ আরয করল, আল্লাহ তাআলার দিদার লাভের আকাঙ্ক্ষা প্রবলভাবে দেখা দিয়েছে, কোন আমল বলে দিন, যার দ্বারা আল্লাহ তাআলার জিয়ারত নসিব হয়। তিনি বললেন, ফরজ নামায পড়া ছেড়ে দাও। মুরীদ একথা শুনে অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হল যে, ফরজ নামায কী করে ছেড়ে দেয়া সম্ভব!

তিনদিন পর আবার সে দরবারে উপস্থিত হয়ে বলল, হযরত! আল্লাহ তাআলার দিদার লাভের আকাঙ্ক্ষা প্রবলভাবে দেখা দিয়েছে, কোন ওজিফা বলে দিন। হযরত বললেন, তোমাকে তো ওজিফা বলে দিয়েছি, ফরজ নামায পড়া ছেড়ে দাও। সে ফিরে গেল এবং দু-তিনদিন পর পুনরায় হাজির হয়ে সেই একই দরখাস্ত করল, তিনিও সেই একই উত্তর প্রদান করলেন। মুরীদ চলে গেল, কিন্তু ফরজ নামায ছেড়ে দেয়ার সাহস হল না, তবে সুন্নত না পড়ে শুয়ে পড়ল। স্বপ্নে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যিয়ারত নসীব হল। তিনি বললেন, আল্লাহর বান্দা, আমি কী অন্যায় করেছি যে, তুমি আমার সুন্নতকে ছেড়ে দিলে?

তখন তাড়াতাড়ি উঠে ওজু করে সুন্নাত নামায আদায় করলেন। সকাল বেলা বিষয়টি হযরত নিজামী রহ.কে জানালে তিনি বললেন, যদি ফরজ নামায ছেড়ে দিতে তবে স্বয়ং আল্লাহ তাআলা আগমন করতেন এবং বলতেন কেন ফরজ নামায ছেড়ে দিলে?

এখানেও দুটি পথ বেরিয়ে আসে– এক. ওলীদের সকল কথাবার্তাকে কুরআন-হাদীস হতে দৃষ্টি ফিরিয়ে মেনে নেয়া হবে। দুই. কুরআন হাদীসের নীতিগুলো ঠিক রেখে ওলীগণের কথাবার্তার মুনাসিব অর্থ বর্ণনা করা হবে।

আল্লাহওয়ালাগণ দুই ধরনের

হযরত হাজী সাহেব রহ. বলতেন, যারা আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছতে সক্ষম হয়েছেন তাঁরা দুই ধরনের ব্যক্তি। এক– ঐ সকল লোক যাঁরা রিয়াযত ও মুজাহাদা তথা চেষ্টা সাধনা করে আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছে থাকেন। দুই– ঐ সমস্ত মানুষ যাঁদেরকে আল্লাহ তাআলা স্বয়ং বেছে নিয়ে তাদের তারবিয়াত দান করেন। যাঁরা চেষ্টা সাধনা করে আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছেন তাদেরকে সুফীদের পরিভাষায় 'মুরীদ' বলা হয়, আর যাঁদেরকে স্বয়ং আল্লাহ তাআলা বাছাই করে নেন তাদেরকে 'মুরাদ' (উদ্দেশ্য) বলা হয়।

এর উদাহরণ হল এমন যে, এক ব্যক্তি তাঁর সততা, বিশ্বস্ততা, জনসেবা, দিয়ানত ও আন্তরিকতার দ্বারা এত উন্ন হল যে, তাকে স্বয়ং বাদশাহ নিজের নায়েব বানিয়ে নিলেন। আরেক ব্যক্তি হল ঐ ব্যক্তি যাকে বাদশাহ নিজেই নির্বাচন করলেন এবং তার শিক্ষক ঠিক করে দিলেন, যিনি তার শিক্ষা ও চরিত্র গঠন করবেন। যদি পড়তে না চায় তবে জবরদস্তি করে হলেও পড়াবেন। বাধ্যতামূলক তার তালিম ও তারবিয়াত হবে।

এক হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন– ঐ সকল লোকদের ব্যাপারে আমার খুব বিস্ময় লাগে যারা জান্নাতে যেতে চায় না কিন্তু তাদেরকে শেকলবদ্ধ করে নিয়ে আসা হবে যে, তোমাদেরকে জান্নাতে যেতেই হবে।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন–

اللّٰهُ يَجْتَبِىْ إِلَيْهِ مَنْ يَّشَاءُ وَيَهْدِىْ إِلَيْهِ مَنْ يُّنِيْبُ.

> আল্লাহ তাআলা যাকে ইচ্ছে করেন নিজের জন্য মনোনীত করে নেন, আর যাঁরা আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করে, তিনি তাঁদেরকে সঠিক রাস্তা প্রদর্শন করেন। [শুরা : ১৩]

কুরআনের পরিভাষায় আল্লাহর নির্বাচিত ব্যক্তিবর্গকে 'মুজতাবা' এবং চেষ্টা-সাধনার মাধ্যমে যারা পৌঁছেন তাঁদেরকে 'মুনীব' বলা হয়। হযরত হাজী সাহেব রহ. বলেন, ঐ ব্যক্তি (হযরত নিজামীর মুরিদ) মুরীদ ছিলেন না, তিনি ছিলেন মুরাদ। যদি তিনি ফরজ নামায না পড়ে শুয়ে পড়তেন তবে আল্লাহ তাআলা স্বয়ং এসে নামায পড়াতেন। হযরত নিজামী রহ.-এর জানা ছিল যে, এ ব্যক্তির নামায ছুটে যেতে পারে না।

দীনের পথে অবিচলদের অবস্থা

ওলীগণের সম্মান রক্ষার্থে কুরআনের অর্থ বিকৃত করাও গোমরাহী এবং কুরআনের বাহ্যিক নীতিগুলোর ভিত্তিতে ওলীদের প্রতি দোষারোপ করাও গোমরাহী। এ জাতীয় মানুষের লক্ষণ হল এই, তাদের অন্তর ইলমের গর্ব ও অহংকারে ভর্তি থাকে। আর যাদের অন্তরে ইলমের কারণে অহংকার না থাকে, তারা যদি কোন কথাকে নকলও করেন, তবে তারা অনুসারী হিসেবে তা করেন, আবিষ্কারক হিসেবে করেন না।

হযরত শায়খুল হিন্দ রহ. এর একটি ঘটনা মনে পড়ল। একবার তাঁকে খুব উৎফুল্ল দেখাচ্ছিল, উপস্থিত লোকেরা বলল, হযরতকে আজ অত্যন্ত আনন্দিত মনে হচ্ছে, তার কারণ কী? তিনি বললেন, বত্রিশ বছর যাবত মনে একটি কথা ছিল, যা প্রকাশ করিনি এজন্য যে, পূর্ববর্তী বুযুর্গানের কারো থেকে এমন কথা বর্ণিত আছে বলে কোন কিতাবে পাইনি, গত রাত্রে একজন তাবেঈর কথা পেয়ে গেলাম, যা আমার কথার অনুরূপ, তাই আমি আনন্দিত হয়েছি। আহলে ইস্তে

কামাদের (দীনের পথে অবিচলদের) অবস্থা এমনই হয়, তাদের এক হাত কুরআনের উপর আর অন্য হাত বুযুর্গানে দীনের সামনে রয়েছে। আর এটা তখনই অর্জিত হয়, যখন আরিফদের সাথে নিজেকে সম্পর্কযুক্ত করে রাখে, তাদের সংশ্রবে থাকে। আজকের বিশ্বে এমনও একটি দল রয়েছে যারা কুরআনকে পশ্চাতে ফেলে রেখেছে এবং আউলিয়াদের এত অধিক সম্মান করে যে, তাদের প্রতিটি কথাকে প্রকৃত দীন বানিয়ে রেখেছে (যদিও তা কুরআন-হাদীস বিরুদ্ধ হয়)। কোন বুযর্গ হয়ত ধর্ম-সঙ্গীত শুনেছেন, যা ছিল তার এক বিশেষ অবস্থা, একেও শরীয়তের অংশ হিসেবে মেনে নিয়েছে।

ইহুদীগণ এজন্য ধ্বংস হয়েছে যে, তারা নবীগণকে ত্যাগ করেছে, তাদের অবমাননা করেছে, অনেককে হত্যাও করেছে, আর শুধু কিতাবকে তারা হাতে রেখেছে এবং নিজেদের খেয়ালখুশি অনুযায়ী তার অর্থ করেছে। যা তাদের চাহিদামাফিক হয়েছে তা গ্রহণ করেছে আর যা হয়নি তা ছুঁড়ে ফেলেছে। এতে করে তাদের মধ্যে অহংকার জন্ম নিয়েছে। যেমন আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন–

سَأَصْرِفُ عَنْ اٰيٰتِيَ ... إلى قوله تعالى : وَكَانُوْا عَنْهَا غَافِلِيْنَ○

> আমি আমার নিদর্শনসমূহ হতে তাদেরকে ফিরিয়ে রাখি, যারা পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে গর্ব করে। যদি তারা সমস্ত নিদর্শন প্রত্যক্ষ করে ফেলে, তবুও তা বিশ্বাস করবে না। আর যদি হেদায়েতের পথ দেখে, তবে সে পথ গ্রহণ করে না। অথচ গোমরাহীর পথ দেখলে তাই গ্রহণ করে নেয়। এর কারণ, তারা আমার নিদর্শনসমূহকে মিথ্যা বলে মনে করেছে এবং তা থেকে বে-খবর রয়ে গেছে। [আরাফ : ১৪৬]

এ অহংকারের সংশোধন তখনই হতে পারে, যখন আল্লাহ ওয়ালাদের সাহচর্য গ্রহণ করা হয়। খ্রিস্টানগণ এজন্যই পথভ্রষ্ট হয়েছে যে, তারা আল্লাহর কিতাবকে সম্পূর্ণরূপে বর্জন করেছে এবং নবী আ.কে, এমনকি তাঁর সাথী-সঙ্গীগণকেও আল্লাহর আসনে অধিষ্ঠিত করেছে। এ ধরনের বাড়াবাড়ি ও সংকীর্ণতা মানুষকে গোমরাহীর দিকে ধাবিত করে। কাজেই মধ্যম পন্থা হল এই, কুরআন হাদীসকেও যেন ত্যাগ করা না হয় এবং আল্লাহওয়ালাদেরকেও যেন হাতছাড়া করা না হয়।

শুধু কুরআনের হরফই যথেষ্ট নয়

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন–

تركتُ فِيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله و سنتي.

আমি তোমাদের নিকট দু'টি জিনিস রেখে গেলাম, যতক্ষণ তোমরা দু'টিকে দৃঢ়ভাবে ধরে থাকবে, পথভ্রষ্ট হবে না। একটি হল আল্লাহ তাআলাব কিতাব, অপরটি হল আমার সুন্নাত।

আর আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন–

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَة

নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসূলের মধ্যে উত্তম আদর্শ রয়েছে। [আহযাব : ২১]

এ দ্বারা বোঝা গেল কেবল কুরআনের অক্ষর ও শব্দাবলিই হিদায়াতের জন্য যথেষ্ট নয় বরং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আদর্শও প্রয়োজন। তাকওয়ার কাইফিয়াত কলব থেকে কলবের সঞ্চারিত হয়, কাগজের দ্বারা হয় না।

সাহাবায়ে কেরাম রা. বলেন, আমরা তখনও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সমাধিতে পরিপূর্ণভাবে মাটি দেইনি, এমতাবস্থায়ই আমাদের অন্তরে পরিবর্তন লক্ষ্য করলাম যে, পূর্বাস্থা আর বিদ্যমান নেই। অথচ কুরআন এবং ইলম বিদ্যমান ছিল, শুধু বিদ্যমান ছিল না একটি জিনিস আর তা হল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বরকতময় সত্তা। কাজেই কিতাবুল্লাহর সাথে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আমল ও তাঁর আদর্শের আবশ্যকতা রয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন–

صلوا كما رأيتموني أصلي

যেভাবে আমাকে নামায পড়তে দেখ ঠিক সেভাবে তোমরাও নামায পড়।

কেননা, আমলের আকার আকৃতি একমাত্র তিনিই জানতেন। সালাতের আভিধানিক অর্থ হল দুআ, আর এ অর্থ সাহাবীগণও জানতেন, কিন্তু আল্লাহ

তাআলার উদ্দেশ্য এ অর্থ নয়। এভাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অজু করে দেখিয়েছেন, একবার অঙ্গগুলোকে ধৌত করলেন এবং বললেন, এ হল অজু। আল্লাহ তাআলা এরূপ অজু ব্যতীত কোন নামায কবুল করেন না। তারপর অঙ্গগুলো দুবার করে ধৌত করলেন এবং বললেন, যে ব্যক্তি এরূপ অজু করবে সে দ্বিগুণ সাওয়াব লাভ করবে। অতঃপর অঙ্গগুলোকে তিনবার করে ধৌত করলেন এবং বললেন, এ হল আমার এবং আমার পূর্ববর্তী নবী আ.দের অজু।

এভাবে হজ্জের আদেশ দিয়েছেন এবং হজ আদায় করে দেখিয়েছেন। সামাজিকতার শিক্ষা দিয়েছেন এবং নিজে তা পালন করে দেখিয়েছেন। অথচ এসব শব্দের আভিধানিক অর্থ সবার জানা ছিল, কিন্তু এ অর্থ শরীয়তের উদ্দেশ্য ছিল না। কাজেই ব্যক্তিত্বকে ত্যাগ করে শুধু লিটারকে যথেষ্ট মনে করা দ্বারা দীন শেখা যায় না।

শুধু বুদ্ধির মাধ্যম দীন বুঝতে চাওয়ার পরিণাম

প্রতিটি মানুষের বিবেক-বুদ্ধি পৃথক। সুতরাং বুদ্ধি অনুযায়ী যদি আমল করা হয় তবে ধর্মীয় কাজে বিভিন্নতা সৃষ্টি হতে বাধ্য। কাজেই কিতাবপত্র ও বুযর্গদের সাথে সম্পর্ক– এ উভয়ই প্রয়োজন। এটাই হল মধ্যপন্থা। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের এটাই তরিকা। আর যে সকল মানুষ কোন ব্যক্তিকেই সমালোচনার ঊর্ধ্বে মনে করে না, তারা শুদ্ধ-সঠিক আমল থেকে সর্বদা বঞ্চিত থাকবে। আর যারা (অতীতেও) আমল করেছেন তারা ঐ সকল ব্যক্তিদের নিকট থেকেই আমল শিখেছেন।

আমি আমার পিতার নিকট 'মিশকাত শরীফ' অধ্যয়ন করেছি। তিনি হাদীসের তরজমাও করতেন এবং সাথে সাথে রুকু-সিজদা করে দেখিয়ে দিতেন। আমি আরয করলাম, হযরত! এসব তো আমি জানি, করে দেখানোর প্রয়োজন নেই। তিনি বললেন, এজন্যই জানতে পেরেছ যে, করতে দেখেছ। তারপর বললেন, আমি হযরত গাংগুহী রহ.-এর নিকট মিশকাত শরীফ অধ্যয়ন করেছি, তিনিও আমাকে রুকু-সিজদা করে করে আমল করার পদ্ধতি দেখিয়েছেন। আমিও আরয করে ছিলাম যে, হযরত এসবের কী প্রয়োজন? আমি তো এসব জানি। তিনি বললেন, এ জন্যই জান যে তুমি অন্যদেরকে করতে দেখেছ। হযরত গাংগুহী রহ. আরো বললেন, আমি মিশকাত শরীফ হযরত শাহ আব্দুল গনী রহ.-এর নিকট পড়েছি, তিনিও আমাকে রুকু-সিজদা করে দেখিয়েছেন। আমি আরয

করলাম হযরত, এসব আমার জানা আছে, দেখানোর প্রয়োজন নেই। তিনি বললেন, এজন্যই জান যেহেতু করতে দেখেছ। এভাবে শাহ আবুদল গনী রহ. শাহ ইসহাক রহ. থেকে, তিনি শাহ আব্দুল আযিয রহ. থেকে, তিনি শাহ ওয়ালীউল্লাহ রহ. থেকে, তিনি শায়খ আবু তাহির মাদানী রহ.-এর আমলের কাইফিয়াত (ধরণ) বর্ণনা করেছেন। এভাবে এ কাইফিয়াত ও আকার-আকৃতি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত পৌঁছেছে।

মিশকাত শরীফে একটি হাদীস রয়েছে, প্রাক-ইসলামী যুগে এ প্রথা প্রচলিত ছিল যে, মৃত্যুকালে কেউ কেউ ছয়মাস পর্যন্ত কান্নাকাটি ও বিলাপ করার জন্য অসিয়ত করে যেত। যেন মানুষ মনে করে যে, মৃতব্যক্তি বিরাট বড়লোক ছিল, যার উপর ছয়মাস বিলাপ করা হয়েছে। নিজের মানুষ না থাকলে ভাড়া করে মহিলাগণকে আনা হত। আমি যখন এ হাদীস পাঠ করলাম, তখন আমার পিতা কান্নার আকৃতি ভঙ্গি করে দেখালেন, তারপর বললেন, হয়ত তোমার মনে এ সন্দেহ হতে পারে যে, আমি এমন করলাম কেন? কারণ হযরত গাংগুহী রহ. এ ভঙ্গি আমাকে দেখিয়েছেন এবং বলেছেন, হয়ত তোমার এ সন্দেহ হবে যে, আমি এমন করলাম কেন? শাহ আব্দুল গনী রহ. আমাকে এভাবে ভঙ্গি করে দেখিয়েছেন এবং বলেছেন, এ সিলসিলা এভাবে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমার রা. পর্যন্ত পৌঁছেছে।

সঠিক দীন বোঝার জন্য ব্যক্তিরও প্রয়োজনীয়তা রয়েছে

হযরত মাওলানা খলীল আহমাদ সাহারানপুরী রহ.-এর হাদীসের সনদ অত্যন্ত উঁচু পর্যায়ের ছিল। একবার সাহারানপুর সফরকালে তাঁর সাথে থাকার সুযোগ হয়েছিল আমার। তিনি বললেন, যেহেতু আমার সনদ উঁচু কাজেই তুমি আমার থেকে হাদীসের ইজাযত নিয়ে যেও। কিন্তু শর্ত হল সাহারানপুর এসে ইজাযত নিয়ে যেতে হবে। আমি সানন্দে তার প্রস্তাব গ্রহণ করলাম, কিন্তু ঘটনাক্রমে সেখানে যেতে পারিনি। এরপর একটি বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেল। অতঃপর দ্বিতীয় সফরে আবার তাঁর সাথে থাকার সুযোগ হল। তখনও তিনি বললেন, আমার নিকট থেকে হাদীসের ইজাযত নিয়ে যাও। আমি ওয়াদা করলাম, কিন্তু কিছুদিন অতিবাহিত হয়ে গেল আমি যেতে পালাম না। শেষ পর্যন্ত তিনি হিজরত করে মদীনায় চলে যাওয়ার ইচ্ছা করলেন। এ সংবাদ শুনে আমি তাঁর খিদমতে হাজির হলাম। হযরত বললেন, যথাসময়ে তোমার খেয়াল হয়েছে,

এখনো দু'তিনটি সফর বাকি রয়েছে। অতঃপর তিনি শাইখুল হাদীস হযরত মাওলানা জাকারিয়া সাহেবকে হাদীসের সব কিতাব নিয়ে আসার জন্য বললেন। তিনি সব কিতাব নিয়ে এলেন। কোন কোন কিতাবের প্রথম ও শেষ অংশ আমি পাঠ করলাম এবং কোন কিতাবের প্রথম ও শেষ অংশ তিনি নিজে পাঠ করলেন। তারপর বললেন, আমি তোমাকেও এভাবে আমলের অনুমতি প্রদান করলাম। এমনিভাবে দীনকে বোঝা ও অনুধাবন করা বিশেষ ব্যক্তিদের উপরই নির্ভরশীল, নতুবা ইবারত দ্বারা অনেক সময় তরজমা বোঝাও সম্ভব হয় না। যেমন উর্দুতে 'কিয়াবাত হায়'– একটি ছোট বাক্য। একে যদি বিশেষ ভঙ্গিতে উচ্চারণ করা হয়, তবে প্রশ্নের অর্থ বোঝায়, অধিকন্তু বিরাটত্ব, তুচ্ছ ও হেয়, আশ্চর্য ইত্যাদি অর্থেও অত্র বাক্যটি ব্যবহৃত হয়। কিন্তু কোন অর্থ উদ্দেশ্য তা শব্দ দ্বারা বোঝা যায় না, বরং উচ্চারণ ও প্রকাশভঙ্গি দ্বারা বোঝা যায়। এভাবে কিতাব-পত্রের সাথে আমলের আকার ও কাইফিয়াতেরও প্রয়োজন রয়েছে।

হাদীস শরীফে এসেছে, যখন রোযা সংক্রান্ত এ আয়াতটি নাযিল হল–

وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْاَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْاَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ.

যতক্ষণ পর্যন্ত সাদা সুতা ও কালো সুতার মধ্যে পার্থক্য করা না যায় ততক্ষণ পর্যন্ত পানাহার করতে থাক। [বাকারা : ৮৭]

তখন হযরত আদী ইবনে হাতিম রা. একটি কালো সুতা ও একটি সাদা সুতা নিজ বালিশের নিচে রেখে দিতন এবং ভোর পর্যন্ত পানাহার করতে থাকতেন আর উভয় সুতার দিকে নজর রাখতেন। যখন যথেষ্ট ফর্সা হয়ে যেত এবং উভয় সুতার মধ্যে পার্থক্য করা সম্ভব হত তখন পানাহাপর বন্ধ করে দিতেন।

যখন এ সংবাদ জনাব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানতে পারলেন তখন বললেন–

إن وسادتك لعريض

তোমার বালিশটি তো অত্যন্ত প্রশস্ত, যার নিচে সুবহে সাদিক ও সুবহে কাজিব উভয়ই প্রবেশ করতে পারছে।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলে দিলেন, কালো সুতা দ্বারা উদ্দেশ্য সুবহে কাজিব এবং সাদা সুতা দ্বারা উদ্দেশ্য সুবহে সাদিক। এ ক্ষেত্রে হযরত আদী রা. আভিধানিক অর্থ বুঝেছিলেন কিন্তু শরীয়তে এ অর্থ

উদ্দেশ্য ছিল না। আল্লাহ তাআলার উদ্দেশ্যও তা নয়। এমনিভাবে কুরআনে নামাযের নির্দেশ রয়েছে, যার আভিধানিক অর্থ দুআ। অথচ এ অর্থ আল্লাহ তাআলার উদ্দেশ্য নয়। হজ-এর অর্থ ইচ্ছা করা কিন্তু আল্লাহ তাআলার উদ্দেশ্য তা নয়। সুতরাং কুরআন মাজিদকে মান্য করা যেমন আবশ্যক তদ্রূপ যাদের মাধ্যমে এ কুরআন আমাদের নিকট পৌঁছেছে তাঁদেরকে সমালোচনার উর্ধ্বে ও সমালোচনা হতে পবিত্র মনে করা আবশ্যক। যাঁদের তাকওয়ার সাক্ষ্য স্বয়ং আল্লাহ তাআলাই দিয়েছেন। তাঁদের প্রতি সন্তুষ্টির ঘোষণাও দিয়েছে। তাঁদের সম্পর্কে বলেছেন যে, তাঁরা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করেন এবং কোন তিরস্কারকারীর তিরস্কারকে ভয় করেন না।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা.-এর নিকট এমন এক ব্যক্তি হাজির হল যে ছিল কাদরিয়া (তাকদীর অস্বীকারকারী) মতাদর্শের অধিকারী। তিনি তার সালামের উত্তর দিলেন না এবং বললেন, তুমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক বর্ণিত উদ্দেশ্যের বিপরীত কথা বলেছ। এমনিভাবে একবার হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রা. তাঁর এক ছেলের সম্মুখে একটি হাদীস বর্ণনা করলেন যে, 'মহিলাগণকে মসজিদে যেতে বাধা প্রদান কর না'। তখন তাঁর ছেলে বলল, যেহেতু এখন ফেৎনা-ফাসাদের যুগ, কাজেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগের সাথে তুলনা করা উচিত হবে না। এজন্য আমরা অবশ্যই মহিলাগণকে মসজিদে যেতে বাধা দিব। বাস্তবে তাঁর কথা ঠিকই ছিল, কিন্তু যেহেতু এটা ছিল হাদীসের বিরুদ্ধে তাই হযরত ইবনে উমর রা. বললেন, আমি তোমার কাছে হাদীস বর্ণনা করছি আর তুমি তোমার মত পেশ করছ, বেরিয়ে যাও এখান থেকে, আমি তোমার মুখ এ জীবনে আর দেখতে চাই না। তিনি অনেক কাকুতি-মিনতি করলেন, অনেক সুপারিশ করা হল, কিন্তু তিনি জীবনে কখনো আর ঐ ছেলের মুখ দেখলেন না। সাহাবায়ে কেরামের পরস্পরে যদি দৃশ্যত ঝগড়া-বিবাদও হয়ে যায় তবে এতে খায়র ও বরকতের দিক থাকে, যা আমাদের সন্ধি ও মীমাংসায়ও থাকে না।

মানুষ দুই প্রকার

মোটকথা, আয়াত দুই প্রকার বলে বর্ণনা করা হয়েছে এবং মানুষেরও দুই প্রকার বর্ণিত হয়েছে। বলা হয়েছে, যাদের অন্তরে বক্রতা রয়েছে তারা নিজস্ব বুদ্ধি দ্বারা মুতাশাবিহ আয়াতগুলোকে বাজে অর্থে ব্যাখ্যা করে। এ আয়াতগুলোর অর্থ নির্ধারণে পূর্ববর্তীদের অনুকরণ করা কর্তব্য। তাদেরকে সমালোচনা ও ভর্ৎসনার

ঊর্ধ্বে স্থান দেয়া আবশ্যক। আশ্চর্যের বিষয় হল, মানুষ সাহাবায়ে কেরাম রা.কে অনুকরণীয় বলে মেনে নিয়েও কি করে তাঁদের সমালোচনা করে? তাদেরকে দোষারোপ করে? (পরস্পর বিরোধী) এ দু'টি জিনিস একত্রিত হতে পারে না।

এ প্রসঙ্গে হযরত মাওলানা কাসেম নানুতবী রহ.-এর একটি ঘটনা মনে পড়ল। হযরত হাজী সাহেব রহ. একটি কিতাব লিখে তা পুনরায় কপি করার জন্য মাওলানা কাসেম নানুতবী সাহেবকে দিলেন। কিতাবের এক স্থানে একটি আক্ষরিক ভুল ছিল, হযরত মাওলানা কাসেম সাহেব অত্যন্ত আদবের কারণে তা শুদ্ধও করলেন না, আবার এভাবে ভুল রেখে দেয়াও যুক্তিযুক্ত মনে করলেন না। যখন কপি করা শেষ হল তখন হাজী সাহেবের খিদমতে হাজির হলেন এবং আরয করলেন হযরত, এ শব্দটি বুঝতে পারিনি। তখন হযরত হাজী সাহেব বললেন, ভাই, আমার ভুল হয়েছে, 'আইন' বর্ণের স্থলে 'হামযা' লিখে দাও। তারপর তিনি শুদ্ধ করলেন।

যাই হোক, (আলোচনার শুরুতে পঠিত আয়াতে) দুই ধরণের মানুষের কথা বর্ণনা করার পর 'যায়গ' বা বক্রতা থেকে রক্ষা পাওয়ার দুআ শিক্ষা দেয়া হয়েছে– 'হে আল্লাহ! আমাদের অন্তরকে বক্রতা থেকে রক্ষা করুন'। আর বক্রতার হতে রক্ষা পাওয়া যেহেতু আল্লাহর রহমতের ওপর নির্ভরশীল, তাই রহমত প্রার্থনা করার দুআও শিক্ষা দিয়েছেন। আর যখন হেদায়াত নসীব হয়ে যায় তখন তাকে টিকিয়ে রাখা কঠিন বিধায় মৃত্যুর উপস্থিতি আবশ্যক হয়েছে। এর ভয়ে হেদায়াতকে শক্তভাবে দাঁতে কামড়ে ধরা হবে।

আর এ বিষয়টি ইসলাহ ও তারবিয়াত দ্বারা অর্জিত হয়, যা বুযুর্গানের সাহচর্যের মাধ্যমে লাভ করা যায়। এজন্যই নিজেকে তুচ্ছ জ্ঞান করা এবং বুযর্গদের খিদমতে থাকা আবশ্যক।

হযরত আম্বিয়া আ.-এর বিনয়ের স্বরূপ এই যে, কেয়ামতের দিন তাঁরা বলবেন–

ما عرفناك حق معرفتك

হে আল্লাহ! তোমার যথাযথ পরিচয় লাভ করতে আমরা সক্ষম হইনি।

আর জনাব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

اللهم لا احصى ثناءً عليك كما اثنيت على نفسك.

হে আল্লাহ! তোমার পরিপূর্ণ প্রশংসা করতে পারিনি, তুমি যেমন করেছ।

হযরত আদম আ.-এর একটি ইজতেহাদী ভুল হয়ে গিয়েছিল, তথাপি তিনি অত্যন্ত বিনয় ও আহাজারিসহ ক্ষমা প্রার্থনা করলেন, বললেন–

رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ○

হে আমার প্রতিপালক! আমি নিজের প্রতি জুলুম করেছি। যদি আপনি আমাকে ক্ষমা না করেন এবং আমার প্রতি অনুগ্রহ না করেন, তবে আমি অবশ্যই ধ্বংস হয়ে যাব। [আরাফ : ২৩]

আর ইবলিস আল্লাহ তাআলার নাফরমানী করেও ক্ষমা প্রার্থনা করার পরিবর্তে অহংকার করল। এ অহংকারের সংশোধন আল্লাহওয়ালাগণের সাহচর্য ব্যতীত অত্যন্ত কঠিন।

قال را بگزا، مرد حال شو

پیش مردے کاملے پامال شو

বাক্যবচন ছেড়ে দিয়ে অবস্থার পরিবর্তন ঘটাও। কামেল ব্যক্তিদের সামনে নিজেকে মিটিয়ে দাও।

হযরত জুনাইদ বাগদাদী রহ. বলেন, বিনয় ও নম্রতা সে পর্যন্ত পূর্ণাঙ্গ হবে না, যে পর্যন্ত নিজেকে খ্রিস্টানদের কুকুরের চেয়েও অধম জ্ঞান করতে না পারবে।

হাদীস শরীফে রয়েছে, বান্দা যখন দাবি করে বলে যে, আমি ইবাদত করেছি, তখন আল্লাহ বলেন, শক্তি তো আমিই দিয়েছিলাম, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও তো আমিই দিয়েছিলাম, তুমি কী করেছ? মানুষ যদি বিনয়ের পথ গ্রহণ করে এবং বলে– হে আল্লাহ! সবকিছু তোমার রহমতেই হয়েছে। তখন আল্লাহ বলেন, প্রথমে তুমিই তো পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলে আর তুমিই ইচ্ছা করেছিলে, তুমিই অগ্রসর হয়েছিলে। এসব বলে যেন তাকে সম্মানিত ও মহিমান্বিত করে তোলেন।

এক হাদীসে এসেছে–

لايدخل الجنة من كان فى قلبه مثقال ذرة من كبر.

যার অন্তরে অনুপরিমাণ অহংকার থাকবে সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।

কোন এক কবি কী চমৎকার বলেছেন–

پستی سے سربلند ہو اور سرکشی سے پست

اس راہ کے عجیب نشیب و فراز ہیں

নতশিরে (বিনয়ে) মাথা হয় উন্নত আর ঊর্ধ্বশিরে (অহংকারে) হয় অবনত। এ হল এই পথের এক অদ্ভুত উন্নত-অবনত খেলা।

পাথর ও মাটি উভয়ের উপর সমভাবে বৃষ্টি বর্ষিত হয়, কিন্তু তার দ্বারা পাথরের কিছুই অর্জন হয় না, আর মাটি হতে নানা প্রকার জিনিস উৎপন্ন হয়।

সার কথা হল এই, আল্লাহ তাআলা আয়াতের প্রকার বর্ণনা করেছেন আর মানুষেরও প্রকার বর্ণনা করেছেন এবং ঈমানকে হেফাযত করার পদ্ধতিও বর্ণনা করে দিয়েছেন।

এখন আমি শেষ করছি, সময়ও যথেষ্ট হয়েছে।

اللهم ربنا تقبل منا إنك انت السميع العليم، وارنا مناسكنا وتب علينا، إنك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وأله واصحابه اجمعين، برحمتك يا ارحم الراحمين.



বয়ান : ৯

জীবনের উদ্দেশ্য

আল্লাহর ইবাদত দুনিয়া থেকে যাত্রা শুরু করে কবরে, ময়দানে হাশরে ও জান্নাতে গিয়ে পৌঁছে যাবে এবং সর্বাবস্থায় সঙ্গী হয়ে যাবে। একমাত্র ইবাদাতই কেবল জীবনের উদ্দেশ্য হতে পারে। জীবন যদি চিরস্থায়ী হয়ে থাকে তবে ইবাদতও চিরস্থায়ী। পানাহার চিরস্থায়ী নয়। পানাহার তো কবরে যাওয়ার পূর্বেই খতম হয়ে যায়। কবরে কোন প্রকার পানাহার নেই; আর যদি কিছু থেকেও থাকে তবে তা আল্লাহ তাআলার যিকিরই হবে। জান্নাতে পানাহার থাকবে কিন্তু তার আবশ্যকতা থাকবে না, মানুষ পানাহারের মুখাপেক্ষী থাকবে না। প্রয়োজন থাকবে একমাত্র আল্লাহর যিকিরের, আর তা মুখ দিয়ে জারী করে দেয়া হবে।

– হযরত হাকীমুল ইসলাম রহ.





اَلْحَمْدُ لله نَحْمَدُه وَنَسْتَعِيْنُه وَنَسْتَغْفِرُه وَنُؤْمِنُ بِه وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّاٰتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَّهْدِه اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَه، وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلا هَادِىَ لَه، وَنَشْهَدُ أَنْ لاَّ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَه لاَ شَرِيْكَ لَه، وَنَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَمَوْلاَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُه وَرَسُوْلُه، أَرْسَلَهُ اللهُ إِلىٰ كَافَّــةً لِّلنَّاسِ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا وَّدَاعِيًا إِلَيْه بِإِذْنِه وَسِرَاجًا مُّنِــيْرًا.

أَمَّــابَعْدُ:

فَاَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ○ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ○ وَمَا اُمِرُوْا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ لا حُنَفَاءَ وَيُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوا الزَّكٰوةَ وَذٰلِكَ دِيْنُ الْقَيِّمَةِ○

বুযুর্গানে মুহতারাম!

পৃথিবীতে মানুষ যখনই কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করে তখন তার কোন না কোন উদ্দেশ্য অবশ্যই থাকে। কোন বিবেক-বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষের কাজ উদ্দেশ্যহীন হয় না। যখন আপনি মসজিদে যাওয়ার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করেন, তখন উদ্দেশ্য হয় নামায। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে আপনি নিজ ঘর ত্যাগ করেন, কষ্ট করে মসজিদে আসেন। একজন শিক্ষার্থী যখন মক্তব-মাদ্রাসার দিকে যায়, তখন একমাত্র চলাই তার উদ্দেশ্য হয় না; বরং শিক্ষা গ্রহণই উদ্দেশ্য হয়। তাকে পড়তে হবে, জ্ঞান অর্জন করতে হবে– এজন্যই সেখানে যায়। কোন ব্যক্তি যখন তার শায়খের নিকট খানকায় যায় তখন তার এ পদক্ষেপের উদ্দেশ্য হয়ে থাকে চারিত্রিক সংশোধন। সে কামনা করে, আমার নফসের সংশোধন হবে। আপনি

যদি ট্রেনে সফর করে কোথাও যান, তবে কোন না কোন স্টেশন অবশ্যই থাকবে সেখানে আপনি নামবেন। যা হবে আপনার মনজিলে মাকসাদ বা উদ্দিষ্ট গন্তব্য। উদ্দেশ্যবিহীন পদক্ষেপ পাগলের কাজ। বিবেকবান যখনই কোন পদক্ষেপ নেবে, তার কোন না কোন উদ্দেশ্য অবশ্যই থাকবে, উদ্দেশ্যই তাকে বুদ্ধিমান বলে পরিচয় করিয়ে দেবে। নতুবা তাকে বোকা ও বির্বোধ বলা হবে। মোটকথা, জ্ঞান-বুদ্ধি ও যুক্তির দাবি হল এই, কোন পদক্ষেপ কখনো উদ্দেশ্য হয় না, পদক্ষেপ দ্বারা সেই গন্তব্য উদ্দেশ্য হয় যার দিকে মানুষ যায়।

মানবীয় সফরের সুচনা ও সমাপ্তি

এ নীতির পরিপ্রেক্ষিতে আপনি যদি চিন্তা করেন তবে দেখবেন যে, জীবনও একটি পদক্ষেপ। এক দিক থেকে আপনি যাত্রা শুর করে অন্য এক দিকে যাচ্ছেন। এ কোন ছোটখাট পদক্ষেপ নয় যে, দশ-বিশ মাইল পথ অতিক্রম করলেই শেষ হয়ে যাবে বরং এ হল এক সীমাহীন পদক্ষেপ, যার গন্তব্য বহু দূরে, আর সূচনাও হয়েছে বহু পূর্বে।

আপনি হয়ত এ ধারণা করে থাকবেন যে, মাতৃগর্ভ থেকেই আমাদের যাত্রা শুরু হয়েছে। না, বিষয়টি এমন নয়; বরং মাতৃগর্ভ তো একটি স্টেশন মাত্র। মানুষের হরকত বা জীবন পদক্ষেপ শুরু হয়েছে বহু পূর্বে। এখানে মানুষের যে হরকত রয়েছে তার সূচনা হয়েছে আলমে 'আলাস্ত' থেকে, যার বর্ণনা কুরআনে এসেছে এবং হাদীসেও এর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ রয়েছে। এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা হল এই, আল্লাহ তাআলা যখন হযরত আদম আ.কে সৃষ্টি করলেন তখন তাঁর কোমরে নিজ ডান হাত দিয়ে আঘাত করলেন। যে জাতীয় হাত আল্লাহ তাআলা শানের উপযোগী সে জাতীয় হাত, আমাদের মত হাত নয়। আমাদের হাত হল দৈহিক আর আল্লাহ দেহ হতে পবিত্র। সুতরাং তাঁর শানের উপযোগী হাত, তা আমাদের অজানা। ডান হাত দিয়ে আঘাত করলেন হযরত আদম আ.-এর কোমরে, তখন ঐ সকল সন্তান বেরিয়ে পড়ল, যারা হবে জান্নাতী এবং কিয়ামত পর্যন্ত দুনিয়ায় আসতে থাকবে। তারপর বাম হাত দিয়ে আঘাত করলেন কোমরে, তখন ঐ সকল সন্তান বেরিয়ে এল যারা জাহান্নামী হবে এবং কিয়ামত পর্যন্ত পৃথিবীতে আগমন করতে থাকবে। হযরত আদম আ.-এর পিঠ থেকে ভাল ও মন্দ উভয় প্রকার মানুষ বেরিয়ে এল। আল্লাহ তাআলা সবাইকে এক ময়দানে সমবেত করলেন। কিয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী কোটি কোটি মানুষের রূহের সমাগম হল। এতে কোন শৃংখলা বা সারিবদ্ধতার নিয়মনীতি ছিল না। বরং কারো মুখ কারো দিকে, কারো পশ্চাৎভাগ অন্যের দিকে, কারো এর ব্যতিক্রম। যেমন জনসমাগমে হয়ে থাকে।

হাদীসে ইরশাদ করা হয়েছে, যাদের মুখ মুখোমুখি ছিল তাদের মধ্যে মুহাব্বাত ও ভালবাসা সৃষ্টি হয়ে গিয়েছে এবং যাদের পশ্চাত ভাগ মিলিত হয়েছিল তাদের মধ্যে শত্রুতা সৃষ্টি হয়ে গিয়েছে। আর যাদের বাহু বা হাতের মিলন হয়েছিল তাদের মধ্যে কিছু শত্রুতা, কিছু ভালবাসা সৃষ্টি হয়েছে। এ কারণেই একজন মানুষ প্রাচ্যের আরেকজন পাশ্চাত্যের, একজন এশিয়ার অপরজন আফ্রিকার, তাদের মধ্যে দেখাসাক্ষাৎ নেই। কিন্তু যখন দেখা সাক্ষাৎ হয় তখন অত্যন্ত নিগুঢ় মুহাব্বত ও ভালবাসা দেখা যায়। অথচ প্রথম থেকে কোন সম্পর্ক ছিল না।

এ হল ঐ 'আলমে আলাস্ত'র কারণে। বলা হয়েছে جنود مجندة الأرواح রূহগুলোকে সমবেত করা হল, তখন বন্ধুত্ব ও শত্রুতা সৃষ্টি হয়ে গেল এবং ভূ-পৃষ্ঠে আগমনের পর তা প্রকাশ লাভ করল।

আপনারা দেখে থাকবেন, এক মায়ের গর্ভে দু'ভাই অবস্থান করে এসেছে। সহোদর ভাই তারা, কিন্তু পরস্পরের মাঝে শত্রুতা, দ্বন্দ্ব-কলহ। কোনভাবেই দু'জনের মধ্যে মুনাসাবাত হয় না, মিল মুহাব্বাত হয় না। একজন অপরজনের সাথে যুদ্ধ-কলহ করতেই থাকে। অন্যদিকে, দু'জন অপরিচিত এভাবে মিলে মিশে যায়, যেন দুই সহোদর। আদিকাল থেকে কারো প্রতি মুহাব্বত ও ভালবাসা আর কারো প্রতি শত্রুতা দিয়ে দেয়া হয়েছে। এভাবে রূহগুলোকে সেখানে সমবেত করা হয়েছিল।

হাদীসে এ কথা বলা হয়েছে যে, সেখানে জোড়া জোড়া করে দেয়া হয়েছিল, যার সাথে বিবাহ হবে তার নিকটই ঐ মহিলা দাঁড়িয়েছিল, সেখানেই স্বামী-স্ত্রী সাব্যস্ত করে দেয়া হয়েছে। এভাবে একজন ছেলে ও একজন মেয়েকে একত্রিত করে জোড়া জোড়া করে দাঁড় করানো হয়েছিল। তখন সাবাইকে লক্ষ্য করে আল্লাহ তাআলা বলেছিলেন, তাদের সাথে প্রত্যক্ষভাবে আল্লাহ তাআলা আলাপ করেছিলেন এবং নিজের জামাল (সৌন্দর্য) দেখিয়েছিলেন। সে কারণে সকলের অন্তরে মালিকের প্রতি ভালবাসা সৃষ্টি হয়েছিল। তখন এ কথাও বলেছিলেনঃ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ؟ 'আমি কি তোমাদের প্রতিপালক নই?'

হাদীসে বলা হয়েছে, তখন সকল মানুষ একে অন্যের মুখপানে দেখতে লাগল– কী উত্তর দেবে। সর্বপ্রথম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলে উঠলেনঃ بَلَى 'হ্যাঁ, অবশ্যই আপনি আমাদের প্রভু'।

তাঁর বলার সাথে সাথে অন্যান্য নবী-রাসূলগণের মুখ থেকে বেরিয়ে এলঃ بَلَى، بَلَى 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, অবশ্যই আপনি আমাদের প্রভু'। আম্বিয়ায়ে কেরাম আ.-এর পর সকল মানুষের অন্তরে এ কথাটি ঢেলে দেয়া হল এবং সমস্ত মানুষ 'বালা, বালা' বলতে লাগল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেন সর্বপ্রথম শিক্ষক, তাঁর

শিক্ষা পেয়ে সকল নবী-রাসূল আ. বললেন 'বালা'। আর নবীগণের মাধ্যমে সকল মানুষ শিক্ষা পেয়ে গেল, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শিক্ষা সকলের নিকট পৌঁছে গেল।

সকলেই আল্লাহ পাককে মালিক ও প্রভু বলে স্বীকার করেছেন, তাঁর প্রভুত্বকে মেনে নিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা বললেন, এটা ভুলে যেও না। আমি নবীগণকে পাঠাব, তারা গিয়ে তোমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিবেন। তারপর তোমাদের জীবনকে পাক-পবিত্র সুন্দর করে শুদ্ধ সঠিক করে গড়ে আগামীকাল পুনরায় আমার সামনে আসতে হবে। তখন এ অঙ্গীকারকে অন্তরে রেখে নিয়ে এসো, তখন এ কথা বল না যে, আমাদেরকে কেউ কিছু বলেনি, আমাদেরকে কেউ শিক্ষা দেয়নি। কুরআনে বলা হয়েছে–

شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هٰذا غَافِلِيْنَ.

> কিয়ামতের দিন এ কথা বলার সুযোগ থাকবে না যে, এ বিষয়টি আমাদের জানা ছিল না। আমরা কাউকে প্রভু বা মালিক বলে জানতে পারিনি, আমাদেরকে এ কথা কেউ বলেনি। [আরাফ : ১৭২]

তাই আল্লাহ বলেন, আমি আমার প্রভু হওয়া সম্পর্কে বলে দিলাম এবং তোমাদের সকলের পিতা হযরত আদম আ.কে সাক্ষী বানানো হয়েছে। তাঁকে বলা হয়েছে, আমি তোমাকে সাক্ষী ঠিক করলাম যে, আমি আমার প্রভুত্বের স্বীকারোক্তিকে তাদের অন্তরে ঢেলে দিলাম। আকাশ ও পৃথিবীকে সাক্ষী ঠিক করলাম, এ কথার ওপর যে, আমি তোমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছি এবং আমার জামাল দেখিয়ে তোমাদের অন্তরে আমার প্রতি মুহাব্বত ও ভালবাসা সৃষ্টি করে দিলাম। আর প্রশ্নের উত্তর শিখিয়ে দিয়ে আমার প্রভুত্বের স্বীকারোক্তি নিলাম যে, আমি তোমাদের সবার প্রভু আর তোমরা এ থেকে গাফেল ও বে-খবর নও।

এ কারণেই মানুষ ভূমিষ্ঠ হওয়ার সাথে সাথে তার অন্তরে একটি জামাল অনুভব করে যে, আমার মালিক ও খালিক (সৃষ্টিকর্তা) একজন নিশ্চয়ই রয়েছেন, আর তিনি এক ও অদ্বিতীয়। একথা মানুষকে তার বুদ্ধি বিবেচনা শিখিয়ে দেয়। এ কারণে সকলের ফিৎরাতে (জন্মগত স্বভাব) এ স্বীকারোক্তি রয়েছে, প্রত্যেকের অন্তরে আল্লাহর প্রেম ও ভালবাসা বিদ্যমান রয়েছে, মানুষ তা অনুভব করে। নবীগণ এসে তাকে দাওয়াত দেন, আহ্বান করেন, পথ ও পন্থা বলে দেন যে, প্রেম ও ভালবাসা কিভাবে প্রকাশ করবে, রবুবিয়াতের এ স্বীকারোক্তি কিভাবে প্রকাশ করবে। তারা শিক্ষা দিয়ে বিশ্লেষণও করে দেন, সংক্ষিপ্তাকারে সকল মানুষের অন্তরে এ আবেগ বিদ্যমান রয়েছে।

আলমে বরযাখের অবস্থা

আমার উদ্দেশ্য হল একথা বলা যে, আমাদের সফর 'আলমে আরওয়াহ' থেকে আরম্ভ হয়েছিল। প্রথম পদক্ষেপ হল আমরা হযরত আদম আ.-এর কোমর থেকে বেরিয়ে এলাম। আল্লাহর তাওহীদ ও একত্বের অঙ্গীকার ও স্বীকারোক্তি করে পুনরায় তাঁর কোমরে প্রত্যাগমণ করেছি। তারপর হযরত আদম আ.-এর সন্তানসন্ততি হয়েছে এবং সিলসিলা ও পরম্পরা সদা চালু রয়েছে, মানুষ নিজ নিজ পিতার পিঠে স্থানান্তরিত হতে থাকছে। সর্বপ্রথম স্টেশন যেখান থেকে মানুষ রওয়ানা হয়েছে তা হল হযরত আদম আ.-এর পৃষ্ঠদেশ, তারপর ক্রম বিবর্তনের মাধ্যমে নিজ নিজ পিতৃবর্গের পৃষ্ঠদেশে স্থানান্তরিত হল। তারপ প্রত্যেকটি মানুষ তার মাতৃগর্ভে আগমন করল, নয় মাস সেখানে অবস্থান করল, সেখানে তাকে কিছু আহার্য দেয়া হল, কিছু জিনিস তাকে বুঝিয়ে দেয়া হল। নয় মাস সময় অতিবাহিত করে গাড়ি অগ্রযাত্র করল এবং দুনিয়ার স্টেশনে এসে পৌছল। তারপর দুনিয়ায় কারো বয়স পঞ্চাশ, কারো ষাট, কারো শত, কারো দুইশত বছর হল। পূর্ব যুগের উম্মতগণ হাজার, বারশত, আঠারশত, দুই হাজার বছর বয়স পেত। এখন বয়সের পরিমাণ ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছে। মানুষ পৃথিবীতে আসছে এবং নিজ নিজ বয়স অনুযায়ী অবস্থান করছে। যখন তার পার্থিব বয়স শেষ হয়ে যায়, তখন পৌছে যায় আলমে বরযাখে, যাকে কবর বলা হয়। দেড়-দু'গজের গর্তটি কবর নয়, এতো হল নিদর্শন। কবর হল স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি আলম, একটি জগৎ, যাকে আলমে বরযাখ বলা হয়। যা ইহ-পরকালের মধ্যবর্তী স্থান, এর কিছু স্পর্কে রয়েছে দুনিয়ার সাথে এবং কিছু রয়েছে পরকালের সাথে। মৃতব্যক্তি পূর্ণাঙ্গভাবে দুনিয়াতে অবস্থানরত থাকে না এবং পূর্ণাঙ্গভাবে পরকালেও পৌছায় না, বরং মধ্যবর্তী অবস্থায় থাকে।

হাদীসে বলা হয়েছে, কবরের দিকে জান্নাতের কিছু সংখ্যক জানালা খুলে দেয়া হয়। মানুষ জান্নাতে তার জন্য নির্দিষ্ট স্থানটি দেখতে পায় এবং আকাঙ্ক্ষা করে বলে, হে প্রভু! অতি সত্ত্বর কিয়ামত কায়েম করুন, তাহলে আমি আমার ঐ সম্মানিত স্থানে পৌছে যেতে পারব। জান্নাত থেকে ঘ্রাণ ও সুগন্ধি আসতে থাকবে এবং এতেই সে আত্মহারা হয়ে থাকবে। তখন দুনিয়া ও আখিরাত উভয়ই তার সম্মুখে বিদ্যমান। কেউ যদি ইছালে সাওয়াব করে তবে তার নিকট সাওয়াব পৌছে যায়।

যদি যিয়ারতের উদ্দেশ্যে কবরের নিকট কোন ব্যক্তি গমন করে, তবে হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী যিয়ারতের নিয়ম ও আদব হল এই, কিবলার দিকে পিছন দিয়ে এবং কবরের দিকে মুখ করে যেন দাঁড়ায়। মৃত ব্যক্তি তাকে দেখতে পায় এবং

পরিচয়ও করতে পারে। মৃতের মুখ জান্নাতের দিকেও রয়েছে আবার দুনিয়ার দিকেও রয়েছে। জান্নাত থেকে সুশীতল সুগন্ধময় বাতাস আসছে, আর এদিক থেকে দুআ ও সাওয়াব পৌঁছছে। বরযাখে অবস্থানকারীগণও দুনিয়াবাসিরদের জন্য দুআ করেন। হাদীসে বর্ণিত আছে, মৃত ব্যক্তি যখন নেয়ামতগুলো পেতে শুরু করে এবং আল্লাহর নিকট গ্রহনীয় হয়ে যায়, তখন সে বলে হে আল্লাহ! আমার যত প্রিয়জন এবং মুসলমান ভাই রয়েছেন, তাদেরকে পরিপূর্ণ তওবা না করা পর্যন্ত মৃত্যু দিও না। তওবা করে তারা যেন পাক-পবিত্র হয়ে যায় সকল গুনাহ থেকে এবং পাক-পবিত্র অবস্থায় এখানে আগমন করে। প্রতিটি মৃত ব্যক্তি দুনিয়াবাসীদের জন্য দুআ করে এবং দুনিয়াবাসীও মৃতদের জন্য দুআ করেন–

اللهم اغفرلهم وارحمهم

হে আল্লাহ! তাদেরকে ক্ষমা করে দাও, তাদের প্রতি দয়া ও করুণা বর্ষণ কর।

اعلِ درجاتهم فى الفردوس

জান্নাতুল ফেরদাউসে তাদেরকে উঁচু মর্যাদা দান কর।

আমরা তাদের জন্য এবং তারা আমাদের জন্য দুআ করছেন। তাদের দুআর উপঢৌকন আমাদের নিকট পৌঁছে এবং আমাদের দুআর উপঢৌকন তারা লাভ করেন। এজন্য বলা হয়েছে, মৃতের উপর অত্যধিক কান্নাকাটি, বিলাপ করা সমীচীন নয়। বিলাপ-মাতম তখনই হত যদি এ বিচ্ছেদ চিরস্থায়ী হত। এ বিচ্ছেদ তো হল মাত্র কিছুদিনের ব্যাপার। আমরাও সেখানে পৌঁছে যাব যেখানে তারা পৌঁছে গেছেন। কাজেই অত্যাধিক বিলাপ করার প্রয়োজন নেই। আপনি কবরে গিয়ে অথবা না গিয়েও সাওয়াব পাঠিয়ে দিন, তারা পেয়ে যাবেন। আর তারাও দুআ করার মাধ্যমে হাদিয়া পাঠায় যা আপনি পেয়ে যান, এ কেমন বিচ্ছেদ হল?

এর উদাহরণ হল এমন, যেন আমাদের কোন প্রিয়জন হিন্দুস্তানে চলে গেল, সেখান থেকে চিঠিপত্রের আদান-প্রদান হচ্ছে, হাদিয়া তোহফাও আসছে, সালাম-কালাম কথাবার্তাও বিনিময় হয়, কাজেই মানুষ বিলাপ করে না। বলে যখন ইচ্ছা দেখা সাক্ষাৎ করে নেব, আর অর্ধ সাক্ষাৎ তো হতেই থাকে।

এ জন্য বলা হয়েছে, এত অধিক কান্নাকাটি করা যাকে মাতম ও বিলাপ বলা হয়, নিজের পরিধেয় বস্ত্র, চুল, চোহারাকে চিরে-ফেঁড়ে ক্ষতবিক্ষত করে দেয়া– এ হল আল্লাহর উপর অবিশ্বাসের বহিঃপ্রকাশ, উপরন্তু বোকামীও। এত অধিক কান্নাকাটি তো কেবল তখনই হতে পারে যখন আর কখনো দেখাসাক্ষাতের

কোন সম্ভাবনা না থাকে। এতো হল মাত্র কয়েক দিনের বিচ্ছেদ, অতঃপর আবার দেখাসাক্ষাৎ হচ্ছে।

আসল কথা হল, আমরা যাকে কবর বলি তা দেড়গজ বিশিষ্ট স্থান নয়, বরং তা হল আলমে বরযাখ। এ আলম এত বিরাট যে, কয়েক লক্ষ পৃথিবীর এতে সংকুলান হয়। মানুষ আলমে বরযাখের দিকে স্থানান্তরিত হয়ে যায়, আর যখনই সে স্থানান্তরিত হয় তখনই উন্নতি ও সমৃদ্ধির পানে স্থানান্তরিত হয়। মানুষ আদম আ.-এর কোমর থেকে যখন বের হল তখন হাদীসের বর্ণনানুযায়ী সকল মানুষ পিপিলিকার মত ছিল। যখন মাতৃগর্ভে আগমন করল তখন আকার-আকৃতি বৃদ্ধি পেল, আহার্যও পেতে লাগল, যখন দুনিয়াতে আগমন করল তখন আকার-আকৃতি আরো বেড়ে গেল, আহার্যও বেড়ে গেল, পরিবর্তিত হল। মাতৃগর্ভে ঋতুস্রাবের রক্ত দেয়া হত, এখানে দেয়া হল পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন দুধ, মিষ্টিজাত দ্রব্যাদি, চাল, ডাল। শাকসবজি ফলমূলও পেতে লাগল। মাতৃগর্ভে এসব ছিল না, সেটি ছিল একটি সংকীর্ণ জগৎ। সে সংকীর্ণ জগতের তুলনায় পৃথিবী হল একটি বিশাল জগৎ। ওরকম কোটি কোটি মাতৃগর্ভ এখানে হওয়া সম্ভব।

এখন নবী আ.গণ সংবাদ দিলেন যে, তোমরা ক্রমান্বয়ে উন্নতি ও সমৃদ্ধির জগতে প্রবেশ করছ। পৃথিবীর পর আরো একটি আলম সম্মুখে আসছে, সে আলম ও জগৎ এত বিরাট যে, পৃথিবীর ন্যায় কোটি কোটি জগৎ সেখানে হতে পারে। সে জগতের নাম হল 'আলমে বরযাখ'। সেখানে নেয়ামত ও আরাম আয়েশ অনেক বেশি হবে। দুনিয়াতে যদি পেরেশানও থাকেন কিন্তু ঈমান অন্তরে থাকে, তবে কবরে যাওয়ার পর সুখশান্তি পাবেন। হাজার হাজার বছর মর্যাদার আসনে, সম্মানের শয্যায় নিদ্রা যাবেন। দুনিয়াতে অত্যাধিক নিদ্রা যাওয়ার প্রয়োজন নেই। কিছু ইবাদত করে নিন। কিছু আল্লাহর নামের যিকির করুন, কষ্ট হলেও তা সহ্য করুন। কেননা এ দুনিয়া কষ্টেরই জায়গা।

হাদীসে রয়েছে, যখন কবরে সাওয়াল-জাওয়াব হয়ে যাবে, মুনকার ও নাকিরকে সকল প্রশ্নের উত্তর দিয়ে দিবে– আমার রব আল্লাহ, আমার দীন ইসলাম, আমার নবী ছিলেন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন। তখন গায়েবী আওয়াজ হবে–

أن صدق عبدى، فافرشوه من الجنة والبسوه من الجنة

وافتحوا له بابا من الجنة، ويوسع له قبره مبدّ بصره.

আমার বান্দা সত্য বলেছে, তার জন্য জান্নাতের দজা খুলে দাও, জান্নাতের শয্যা বিছিয়ে দাও, জান্নাতের পোশাক পরিয়ে

দাও। তার কবর এত প্রশস্ত করে দেয়া হবে, যে পর্যন্ত তার দৃষ্টি পৌঁছে।

শুধু মাঠ আর মাঠ দেখা যাবে। আমাদের দৃষ্টি আকাশ পর্যন্ত পৌঁছে, পৃথিবী হতে আকাশ পর্যন্ত পাঁচশত বছরের পথ। কবরে প্রত্যেক মুমিনকে এমন বিশাল এক জগৎ দেয়া হবে যা পৃথিবী হতে আকাশ পর্যন্ত স্থানের সমপরিমাণ। আলমে বরযাখে দুনিয়ার মত লক্ষ লক্ষ দুনিয়া হতে পারে, বোঝা গেল মানুষ উন্নতির পথে রয়েছে। আলমে বরযাখে পৌঁছে যাওয়ার পর কী হবে? নবীগণ আ. সংবাদ দিয়েছেন যে, এরপর আরো একটি আলম ও জগৎ রয়েছে, যে জগৎ বরযাখ থেকেও বিরাট হবে, তাকে বলা হয় 'আলমে মাহশার'। এ আলমের বয়স কয়েক শতাব্দী হবে। ঐ আলমের একদিন পৃথিবীর পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান হবে। একই দিনে পূর্বাপর সকল মানুষ সমবেত হবেন। তারপর নবীগণ সংবাদ দিলেন, আরেকটি আলম আসছে যার নাম জান্নাত। এ আলম এত বিরাট যে, আলমে বরযাখের মত কোটি কোটি আলম হতে পারে। এজন্য যে, বরযাখে একজন মানুষকে এ পরিমাণ জায়গা দেয়া হত যে পরিমাণ পৃথিবী হতে আকশ পর্যন্ত। আর জান্নাতে একজন সাধারণ জান্নাতীকেও এত বিরাট এরিয়া দেয়া হবে, যা এ দুনিয়ার দশগুণ বড় হবে। এখন অনুমান করুন জান্নাত কত বিরাট!

মানুষ 'আলমে আলাস্ত' হতে যাত্রা শুরু করে গর্ভজগতে আগমন করল, গর্ভজগৎ থেকে যাত্রা শুরু করে দুনিয়ায় এসে পৌঁছল। এখান থেকে আবার যাত্রা শুরু করে আলমে বরযাখে পৌঁছল। আলমে বরযাখ থেকে পুনরায় আলমে মাহশারে স্থানান্তরিত হবে, অতঃপর সেখান থেকে আবার তার যাত্রা হবে আলমে জান্নাতের দিকে। আর জান্নাত দৈনন্দিন উন্নতি হতে থাকবে, নব নব আলমের দ্বার উদঘাটন করা হবে মানুষের জন্য, আশ্চর্যজনক বস্তুরাজি প্রকাশ করা হবে। প্রতিদিন তাদেরকে রকমারি নেয়ামত দ্বারা সমাদর করা হবে। এ কারণেই মানুষের নিত্য নতুনের প্রতি রয়েছে প্রবল আকর্ষণ। সবসময় তার সম্মুখে নতুন নতুন জিনিস আসতে থাক– এই সে চায়। যদি সদা সর্বদা পুরাতন জিনিসগুলোই থাকে, তবে মানুষের মনে বিরক্তি ধরে যায়। যদি প্রতিদিন পোলাও খেতে দেয়া হয় তবে মানুষের বিরক্তি লাগবে, মন অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে। কোন দিন ডাল, কোন দিন ভাত, কোন দিন পোলাও– প্রতিদিন নতুন জিনিস হলে মানুষ আনন্দিত হয়। প্রতিদিনের আহার্য যদি একই হয় তবে তা যতই উন্নত হোক না কেন মানুষের মন অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে।

এজন্যই পৃথিবীতে প্রতি বছর নতুন নতুন মডেলের মটরটেক্সি বের হয়, ভবন-প্রাসাদের ডিজাইন পরিবর্তিত হয়, গতকাল একরকম ছিল, আজ অন্যরকম।

বর্তমানে আমেরিকার স্টাইলে গৃহ নির্মাণ করা হচ্ছে, এগুলো অন্য আকারের। একশত বছর পর পৃথিবীতে কী কী ডিজাইন বের হবে কেউ বলতে পারবে না। এ হল মানুষের স্বভাবের চাহিদা যে, প্রত্যহ নতুন নতুন বস্তু সামনে আসুক। জান্নাতের নেয়ামতরাজি যতই সুস্বাদু হোক না কেন, যদি সর্বদা একই প্রকারের নেয়ামত দেয়া হত তবে বিরক্তি এসে যেত। এজন্যই প্রতিদিন নতুন নুতন সরঞ্জাম হবে।

হাদীসে বলা হয়েছে, জান্নাতে একটি আলিশান প্রাসাদ রয়েছে, এতে মানুষ বাস করবে। কিছু সময় বসার পর যখন চোখ তুলে দেখবে, এ পর্যন্ত যে প্রাসাদটি সবুজ রঙের ছিল, এখন তা লাল রঙের হয়ে গিয়েছে। কিছুক্ষণ পর লক্ষ্য করবে, তখন দেখবে হলুদ রং হয়ে গিয়েছে, প্রাসাদগুলোর রং পরিবর্তিত হতে থাকবে। নতুন নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হবে, নতুন নতুন নেয়ামতরাজি সামনে আসবে। প্রতি মুহূর্তে আনন্দ ও ফুর্তি বৃদ্ধি পেতে থাকবে। বোঝা গেল, জান্নাতেও উন্নতিই হতে থাকবে এবং কখনোই তার ঘটবে না, বরং উন্নতি হতে থাকবে। প্রকৃত উন্নতি যেন সেখানেই হবে।

যাক, এসব উন্নতির বিশদ বিশ্লেষণ আমার উদ্দেশ্য নয়। শুধু এ কথাটি বলাই উদ্দেশ্য যে, মানুষ পদক্ষেপের পর পদক্ষেপ নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে, মানুষের জীবন সর্বদা গতিশীল রয়েছে। এখনও আপনি গতিশীল, কবর ও হাশরেও গতিশীল থাকবেন। জান্নাতে যাওয়ার পর আলম নির্ধারিত হয়ে যাবে, কিন্তু নেয়ামরাজি ও এদের স্বাদ উন্নতির পর উন্নতি করতে থাকবে। কাজেই এই দীর্ঘ পদক্ষেপের কোন উদ্দেশ্য থাকা আবশ্যক। ঘর থেকে মাদ্রাসায় কিংবা খানকায় যাওয়ার মত সামান্য পদক্ষেপেরও একটি উদ্দেশ্য থাকে, অথচ এটা মাত্র কয়েক ঘণ্টার ব্যাপার। আর মানব জীবনের পদক্ষেপ হল হাজার হাজার বছর ব্যাপী বিস্তৃত। এত দীর্ঘ পদক্ষেপ উদ্দেশ্য বিহীন হওয়া বিবেকবান কেউ স্বীকার করবে না। সুস্থ বিবেকবুদ্ধি এ কথা মেনে নেবে না যে, মানুষ অযথাই এসব পদক্ষেপ গ্রহণ করছে, এসবের কোন উদ্দেশ্য নেই। বিবেক এ সাক্ষ্য প্রদান করে যে, অবশ্যই কোন না কোন উদ্দেশ্য রয়েছে। আল্লাহ তাআলা তাকে অনর্থক সৃষ্টি করেননি।

জীবনের তাৎপর্য

প্রকৃতপক্ষে আপনার জীবনই হল একটি স্বতন্ত্র পদক্ষেপ, একটি হরকত। যা মানুষের মধ্যে প্রবল বেগে সচল রয়েছে এবং সুদূর গন্তব্যে গিয়ে পৌঁছবে। যে পর্যন্ত মানুষের দেহে হরকত বা নড়াচড়া বিদ্যমান থাকে সে পর্যন্ত বলা হয় মানুষটি জীবিত, আর যখন নড়াচড়া বন্ধ হয়ে যায়, তখন বলা হয় লোকটি মারা

গেছে। হৃদয় যখন সক্রিয় থাকে তখন বলা হয় মানুষটি জীবিত আর যখন হৃদক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায় তখন বলা হয় মানুষটি মৃত্যুবরণ করেছে। বোঝা গেল, হরকত বন্ধ হয়ে যাওয়ার নাম হল মৃত্যু আর হরকত বা নড়াচড়া সচল থাকার নাম হল জীবন। মানুষের পাকস্থলী যে পর্যন্ত সচল ও কর্মরত থাকে, মলমূত্র ইত্যাদি যথারীতি বের হতে থাকে, মানুষ তখন সুস্থ-সবল থাকে। যদি পাকস্থলী যথাযথ সক্রিয় না থাকে, আহার্য বস্তু পরিপাক না হয়ে বিঘ্ন ঘটে তখন দেখা দেয় কোষ্ঠ কাঠিন্য এবং শেষ পর্যন্ত এটাই মৃত্যুর পূর্বাবস্থার রূপ ধারণ করে।

পাকস্থলী, হৃদযন্ত্র, মস্তিষ্ক সবই হরকত বা নড়াচড়া করছে, চলমান রয়েছে। এমন কি মানুষের বিবেক বুদ্ধিও হরকত করছে। এর মাধ্যমে সর্বক্ষণ মানুষ কিছু না কিছু চিন্তাভাবনা করতে থাকে। মস্তিষ্কের এই সার্বক্ষণিক তৎপরতা যদি বন্ধ হয়ে যায় তখন বলা হবে লোকটি বোকা, বুদ্ধি-বিবেচনাহীন। সুতরাং মানুষের সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গই নড়াচড়া করছে। চিন্তা করলে দেখা যায় যে, শুধু মানুষই নয়, মানুষের জীবনও নড়াচড়া করছে। এজন্যই ইমাম গাযালী রহ. লিখেছেন: মানুষ অনাদি নয়, সে সর্বদা ছিল না; কিন্তু সে আবাদী অর্থাৎ অনন্তকাল থাকবে। সৃষ্টি হওয়ার পর তার আর ধ্বংস নেই, তার জীবন অনন্তকালের। স্থান পরিবর্তন হতে থাকবে। প্রথম জগৎ থেকে দ্বিতীয় জগতে, দ্বিতীয় হতে তৃতীয় জগতে, তৃতীয় হতে চতুর্থ জগতে স্থানান্তরিত হবে। জগৎ পরিবর্তন হবে কিন্তু মানুষ সব জগতেই বিদ্যমান থাকবে।

পানাহারই কি জীবনের উদ্দেশ্য

এত দীর্ঘ জীবনের উদ্দেশ্য কী? উদ্দেশ্যও এ পরিমাণ দীর্ঘ হওয়া আবশ্যক যে পরিমাণ দীর্ঘ এই জীবন সফর। হাজার হাজার বছরের হল সফর আর উদ্দেশ্য হল সাধারণ-সংক্ষিপ্ত– তা যথার্থ হয় না। দীর্ঘ জীবনের অনুপাতে উদ্দেশ্যও দীর্ঘ ও মহান হওয়া উচিত। সফর যত দীর্ঘ, উদ্দেশ্যও তত বিরাট হওয়া উচিত। তো সে উদ্দেশ্যটি কী? যার জন্য আমাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং এত দীর্ঘ সফরের আয়োজন করা হয়ছে?

মনে করুন উদ্দেশ্য হল, আপনি ভাত-রুটি খাবেন। এও একটি উদ্দেশ্য যে, কিছু টাকা পয়সা সঞ্চয় করবেন, পানাহার করবেন, আনন্দ-ফুর্তি করবেন– ব্যাস, মানুষ শেষ হয়ে গেল। এত দীর্ঘ সফর আর তার উদ্দেশ্য মাত্র ভাত-রুটি? এ কখনো হতে পারে না। পানাহার তো জীবজন্তু, পশুপক্ষীও করে। এর জন্য মানুষ সৃষ্টির কী প্রয়োজন ছিল? গরু, মহিষ, ছাগল সবাই এ উদ্দেশ্যকে পূরণ করছে। মানুষ হল সৃষ্টির সেরা, এত উত্তম ও উন্নত সৃষ্টির উদ্দেশ্য কেবল

পানাহার করা আর শেষ হয়ে যাওয়া? (অথবা এমনসব কাজে জীবন অতিবাহিত করে দিল যেগুলোর শেষ ফল গিয়ে দাঁড়ায় পানাহার, যেমন ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প ও কারিগরি ইত্যাদি অথবা অন্যান্য উপকরণ যা দ্বারা ভাত কাপড়ের সংস্থান হয়) এ কোন গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য নয়। যদি উদ্দেশ্য এই হত, তবে যে সৃষ্টিজীব এ উদ্দেশ্যকে সুচারুরূপে সমাধা করত সেই হত আশরাফুল মাখলুকাত। মানুষ তা হতে পারে না বরং হাতি-মহিষ, গরু– এসবই আশরাফুল মাখলুকাত হত, মানুষ হত না। এসব জন্তু যে পরিমাণ ভক্ষণ করতে পারে মানুষ তা পারে না। যদি আহারের প্রতিযোগিতা হয়, তবে মানুষ হাতির উপর বিজয়ী হতে পারবে না। তার না আছে এত বিরাট উদর, না আছে পাকস্থলীতে সে পরিমাণ শক্তি। কাজেই এত দীর্ঘ জীবনের উদ্দেশ্য একমাত্র ভাত-কাপড়-রুটি হতে পারে না। এত দীর্ঘ-প্রস্থ জীবন সংগ্রাম আল্লাহ তাআলা কি শুধু এজন্য দিয়েছেন যে, কয়েক লোকমা খেয়ে নিবেন? এ তো একটি অস্থায়ী ব্যাপার মাত্র। তারপর কথা হল, পানাহারের প্রকৃত উদ্দেশ্য হল জীবন ও দেহকে বাঁচিয়ে রাখা। কিন্তু দেহ রক্ষার উদ্দেশ্য কী? এখন আরম্ভ হল উদ্দেশ্যের তালাশ। ভাত-রুটিই যদি উদ্দেশ্য হত তবে তা একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ জিনিস হত, অথচ তা হল জীবনকে লালন-পালন করার মাধ্যম মাত্র। এরপরও প্রশ্নটি যথাস্থানে থেকেই যেত– পানাহার জীবন ধারণের মাধ্যম হল, তাহলে জীবনকে লালন করার উদ্দেশ্য কী?

মনে করুন পানাহারই না হয় জীবন ধারণের উদ্দেশ্য, তাহলে এত দীর্ঘ জীবন সংগ্রাম আর উদ্দেশ্য মাত্র এতটুকু? এ উদ্দেশ্য তো জীবজন্তু দ্বারাই পূরণ হয়ে যায়, তারাও পানাহার করে, আপনিও পানাহার করলেন, এতে শ্রেষ্ঠত্বের কী আছে? আপনি হয়ত বলতে পারেন, আমরা পোলাও জর্দা ও মুরগি খাই, জীবজন্তু তো এগুলো খায় না। আমি বলি জীব-জন্তু মুরগি খাচ্ছে না কিভাবে, বিড়াল মুরগির বাচ্চা খেয়ে ফেলে, বাঘ গরু খেয়ে ফেলে, তবে একথা বলা যেতে পারে যে, তারা মশলা বিহীন খেয়ে থাকে। আপনি গরুর গোশত ভক্ষণ করলেন এতে মাহত্মের কী আছে? বাঘও ভক্ষণ করে আপনিও করলেন। মশলা দিয়ে ভক্ষণ করায় মাহত্ম্যের কী আছে? বরং মশলা দ্বারা গোশতের প্রকৃত স্বাদ নষ্ট হয়ে যায়। গোশতকে যদি অল্প লবণ মরিচ দিয়ে সঠিকভাবে পাকানো যায়, তবে তার প্রকৃত স্বাদ বিদ্যমান থাকে, অত্যধিক মশলার কারণে গোশতের স্বাদ নষ্ট হয়ে যায়।

আমি বলে থাকি যে, উড়োজাহাজের খানা অত্যন্ত উন্নতমানের হয়ে থাকে। তারা গোশতকে বিশেষ পদ্ধতিতে পাক করেন। এতে লবণ, মরিচ, মশলা থাকে না। তরকারি সামনে রেখে দেয়, ইচ্ছা মত লবণ মরিচ মিলিয়ে খেয়ে নিন। এভাবে

তরকারির প্রকৃত স্বাদ বিদ্যমান থাকে। আর আমরা অত্যধিক মশলা দিয়ে তরকারির প্রকৃত স্বাদ শেষ করে দেই।

আমার আরয করার উদ্দেশ্য হল, আপনি মুরগি খাবেন, বিড়ালও মুরগি খাবে। সে পায় প্রকৃত স্বাদ আর আপনি পান বিকৃত স্বাদ। আপনি খেলেন ভেজাল গোশত আর সে খেল প্রকৃত গোশত। এতে কোন ও মাহাত্ম্য আছে কি? এ যদি কোন কামাল হত তবে বিড়ালও আশরাফুল মাখলুকাত হত। কাজেই পানাহার কোন মহৎ কাজ ও উদ্দেশ্য হতে পারে না। এ হল প্রয়োজনের তাগিদে কৃত একটি কাজ, যেন দেহ রক্ষা পায়। এ দ্বারা উপকৃত হওয়া যায়, কাজ করানো যায়, আর ঐ কাজই হবে প্রকৃত উদ্দেশ্য যার জন্য দেহের রক্ষণাবেক্ষণ। আমরা দেখি যার উপর কাজ ও দায়িত্ব অধিক থাকে সে অধিক আহার গ্রহণকে ভয় পায়। মানুষ বলে থাকেন, কাজের চাপ অধিক খানা এখন রেখে দাও। বোঝা গেল আহারকে প্রকৃত উদ্দেশ্য মনে করা হচ্ছে না, কাজ করাকে প্রকৃত উদ্দেশ্য মনে করা হচ্ছে। আহার করা সময় বিশেষে কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজ নয়। যদি আমরা এমন কোন পথ পেয়ে যাই, আহার না করেও কাজ চালিয়ে যেতে পারি, তবে আহারের দিকে চোখ তুলেও দেখব না। এতো হল আমাদের অপারগতা– না খেয়ে কোন কাজ করতে পারি না, জীবন বাঁচে না।

এখানে আমার বুযুর্গানের একটি ঘটনা মনে পড়ল। দারুল উলুম দেওবন্দের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মাওলানা কাসেম নানুতবী রহ., যিনি আমার পিতামহ ছিলেন, তার যুগে আর্য সমাজের প্রতিষ্ঠাতা পণ্ডিত দিয়ানন্দ সরস্বতী ইউ,পি,র সাহারানপুর জেলার একটি ছোট শহরে এল। এসে ঘোষণা করল, মুসলমানদের কোন আলেম আমার সাথে মুনাযারা (কর্তযুদ্ধ) করতে আসুক। এও বলে দিল, কোন ছোট আলেমের সাথে আমি মুনাযারা করব না। মৌলভী কাসেমকে নিয়ে এস, তাঁর সাথে আমি মোকাবিলা করব। হযরত ঐ সময়ে কিছুটা অসুস্থ ছিলেন; কিন্তু সেখানকার ভক্তবৃন্দ লিখলেন– হযরত, আমাদের এলাকার পরিস্থিতি ও অবস্থায় আপনাকেই তাশরীফ আনয়ন করতে হয়। কেননা সে ঘোষণা ও চ্যালেঞ্জ করেছে যে মৌলভী কাসেম-এর সাথে মুনাযারা হবে। সেই অসুস্থ অবস্থায়ই হযরত তাশরীফ নিয়ে গেলেন। তার ধারণা ছিল যে, তিনি আসবেন না। হযরত যখন গিয়ে পৌছলেন তখন তার ভাবনা হল এখন প্রাণে বাঁচার উপায় কী? পলায়নের পন্থা কী?

মুন্সি নেহাল আহমাদ সাহেব হযরতের বিশেষ খাদেম ছিলেন। তিনি অত্যন্ত মেধাবী ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধির অধিকারী ছিলেন। হযরত তাঁকে মুনাযারার শর্তাবলি সম্পাদন করার জন্য পণ্ডিতজির নিকট পাঠালেন। কী কী শর্তে ও কী পরিবেশে

মুনাযারা অনুষ্ঠিত হবে, কী পন্থা অবলম্বন করলে সুষ্ঠু পরিবেশে মুনাযারা অনুষ্ঠিত হতে পারে এসব বিষয়ে আলোচনা করার জন্য তাকে পাঠান হর। মুন্সি সাহেব গিয়ে দেখলেন পণ্ডিতজি খাওয়া দাওয়ায় ব্যস্ত আছেন। তিনি দেখতে পেলেন পণ্ডিতজি যে রুমে আছেন সেখানে বিরাটকায় একটি খাবার থালা রয়েছে এবং এর মধ্যে হালুয়া, পুরী, তরকারি ইত্যাদি অনেক কিছুই রয়েছে। মোটকথা, দশ-পনের কেজি পরিমাণ ওজনের নানা জাতীয় খাবার এতে রয়েছে, সে থালাটি পণ্ডিতজির নিকট নেয়া হল।

পরিষ্কার কথা, এতসব জিনিস একজনের খাবার হতে পারে না। মুন্সি সাহেব মনে করলেন, হয়ত ভেতরে অন্য লোকজন রয়েছে। একজন মানুষ আর কি পরিমাণই বা খেতে পারে? পণ্ডিতজির আগমন উপলক্ষে হয়ত বিরাট নিমন্ত্রণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। তিনি বাইরে বসে অপেক্ষা করতে থাকলেন। প্রায় অর্ধঘণ্টা পর যখন থালাটি বের করে আনা হল, তখন থালাটি খালি ছিল। তিনি এ ধারণাই করলেন, এক ব্যক্তি এতসব খেতে পারে না। নিশ্চয় ভেতরে কয়েকজন হবেন, সবাই মিলে খেয়েছেন। অতঃপর তাঁকে ভেতরে নেয়া হল, গিয়ে দেখতে পেলেন পণ্ডিতজি একাই বসে আছেন। এই ভেবে তিনি পেরেশান হলেন যে, দশ-পনের কেজি পরিমাণ খাবার একা এক ব্যক্তি কেমন করে গলধকরণ করতে পারে? মনে মনে ভাবলেন, যে রুমে পণ্ডিতজি বসেছেন, হতে পারে এ রুমের অন্য কোন দরজা রয়েছে এবং অন্যরা খেয়ে ঐ দরজা দিয়ে বের হয়ে গেছেন, কিন্তু সেই রুমে অন্য কোন দরজা ছিল না। একই দরজা ছিল, এবং তিনি এ দরজা দিয়েই প্রবেশ করেছিলেন। অতঃপর তিনি লোকজনকে জিজ্ঞেস করলেন, পণ্ডিতজির সাথে আহারে অন্য কেউ ছিল কি? তারা বলল, না অন্য কেউ ছিল না। এখন তিনি চিন্তা করতে লাগলেন, একি মানুষ? না মানব রূপী অন্য কোন জন্তু! এত অধিক জিনিস একাই ভক্ষণ করে ফেলল কেমন করে?

যখন ফিরে এলেন, হযরতের নিকট শর্ত-শরায়েত বর্ণনা করলেন, এসব কথা শুনানো তো উদ্দেশ্য নয়, কিন্তু যখন হযরতের সাথে আলাপ আলোচনা শেষ করে বেরিয়ে এলেন, তখন নিজের সতীর্থ হযরত শায়খুল হিন্দ মাওলানা মাহমুদুল হাসান রহ. ও মাওলানা মুহাম্মাদ আমরুহী রহ.-এর সাথে আলোচনা করলেন। বললেন, আমি এক ভীষণ চিন্তা ও পেরেশানে আছি, কোন সুরাহা দেখতে পাচ্ছি না। সকল সঙ্গী মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করে বললেন, বিষয় কী? খুলে বলুন। তিনি বললেন– পেরেশানী হল, যখন মুনাযারা হবে, আমাদের হযরত ইনশাআল্লাহ বিজয়ী হবেন, এজন্য যে, তিনি হক ও সত্যের উপর রয়েছেন। ইলম দ্বারা যদি মুনাযারা করা হয় তবে আমাদের হযরত অপেক্ষা বড়

আলেম অন্য কেউ নেই, কাজেই হযরতই বিজয়ী হবেন, কিন্তু যদি পানাহারে মুনাযারা হয় তবে কী হবে? এ একটি হাসির কথা ছিল, সকলেই হাসলেন, আলাপের ইতি হয়ে গেল। কিন্তু এ কথা হযরতের নিকটও পৌঁছল।

হযরত তাঁকে ডাকলেন এবং বললেন, মুন্সিজী! আপনি কী কথা বলেছেন? তিনি আতংকিত হয়ে পড়লেন এজন্য যে, হাসির কথা ছিল, বন্ধু বান্ধবকে শুনিয়েছেন, এখন শায়খের সম্মুখে নিরব। কী বলবেন তাঁকে?

হযরত বললেন, তুমি যা বলেছ তা আমি শুনেছি, তোমার মুখে একটু শুনতে চাই যাতে তোমাকে উত্তর বলে দিতে পারি। এজন্য যে, তুমি বলেছ এ বিষয়টি খুব জটিল এবং এর সমাধান হওয়া উচিত। আমি এর সমাধান করে দেব। কিন্তু তুমি তোমার নিজের মুখে তা প্রকাশ কর। তিনি কেঁপে কেঁপে আরয করলেন, হযরত আমি একথা বলেছিলাম যে, যদি ইলম ও জ্ঞানে মুনাযারা হয় তবে ইনশাআল্লাহ আমাদের হযরত জয়ী হবেন, কিন্তু যদি আহারে মুনাযারা হয় তবে কী অবস্থা হবে? এজন্য যে, পণ্ডিতজি পনের বিশ কেজি পরিমাণ আহার্য খেয়ে ফেলবে, আর আপনি অর্ধেক চাপাতিও খেতে পারবেন না।

হযরত বললেন, এর দু'টি উত্তর রয়েছে, একটি হল হাসি কৌতুকের, অন্যটি হল প্রকৃত। হাসির উত্তর হল, সকল মুনাযারার জন্য কেবল আমিই কেন, তোমরা কোন কাজের জন্য? যদি আহার গ্রহণে মুনাযারা হয় তবে তোমাদেরকে অগ্রসর করে দেব। তারপর বললেন, তোমাদের মনে এ চিন্তা কেন এল, যদি আহারে মুনাযারা হয় তবে কে জয়ী হবে? ভক্ষণ করা হল জীব-জানোয়ারের আলামত। মুনাযারা কি মূর্খতা ও হিংস্রতার মধ্যে হয়, নাকি ইলম ও জ্ঞানের মধ্যে হয়? যদি মূর্খতা ও পশুত্বে মুনাযারা হয়, তবে আমরা পণ্ডিতজির মোকাবেলায় হাতি, মহিষকে পেশ করব– খেতে থাকো, এদের বিপরীতে দেখি কত খেতে পার। তারপর বললেন, তোমাদের অন্তরে এ প্রশ্ন কেন উদিত হল না যে, যদি অনাহারে থাকার মধ্যে মুনাযারা হয় তবে কী হবে? আমি এজন্যও প্রস্তুত রয়েছি। পানাহার করিয়ে পণ্ডিতজিকে এক রুমে বন্ধ করে দেয়া হোক এবং আমাকেও এক রুমে বন্ধ করে দেয়া হোক এবং ছয়মাস পর দরজা খোলা হোক। যে জীবিত থাকবে সেই হক বলে সাব্যস্ত হবে। পানাহার করা হল চতুষ্পদ জন্তুর কাজ, এদের স্বভাব, অভ্যাস এবং মূর্খতার উৎস। আর পানাহার না করা হল ফেরেশতাদের স্বভাব, যারা ইলম ও জ্ঞানের উৎস। মুনাযারা হয় ইলম ও জ্ঞানের দ্বারা, মূর্খতা ও অজ্ঞতা দ্বারা নয়। যদি মূর্খতা ও অজ্ঞতার মুনাযারা হয় তবে জীবজন্তুদেরকে মোকাবেলার জন্য পেশ করে দেব। আর যদি ইলমের হয়, জ্ঞানে হয় তবে আমরা করব।

এ কথা স্মরণ হয়েছিল এ কারণে যে, মানুষ যখন সৃষ্টির সেরা, কাজেই পানাহার তার বিশেষত্ব হতে পারে না। কেননা মানুষই শুধু পানাহার করে না বরং মানুষের চেয়েও বহুগুণ অধিক ভক্ষণ করে মহিষ, গরু ইত্যাদি জীবজন্তু। সুতরাং মানব জীবনের উদ্দেশ্য এ হতে পারে না যে, সে পানাহার করল আর উদ্দেশ্য সফল হয়ে গেল। আর তার জন্য এত দীর্ঘ সফর– আদম আ.-এর কোমর থেকে বের হওয়া, মাতৃগর্ভে আগমন, পৃথিবীতে আগমন; আর উদ্দেশ্য কেবল এতটুকু যে পানাহার করবে, এ কি কোন উদ্দেশ্য হল? পানাহার কোন গরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়, এ হল পশুত্বের আলামত। মানুষের মধ্যেও যেন পশুত্ব রয়েছে। আল্লাহ তাকে পানাহার করার অনুমতি দিয়েছেন, সে উন্নত ও উত্তমভাবে পানাহার করে, আহার্যকে পাক পবিত্র সুন্দর করে আহার করে, কিন্তু জীবনের উদ্দেশ্য এ হতে পারে না।

রূহানী শক্তির বিস্ময়কর অবস্থা

ফেরেশতা আ.-গণ জীবিত রয়েছেন, কোন গোশত-রুটি তাঁরা খাচ্ছে? আল্লাহ তাআলার যিকির দ্বারাই তো তাঁরা জীবিত রয়েছেন। আল্লাহর জিকিরের নামই হল প্রকৃত জীবনের। যেহেতু এ ব্যাপারে আমরা পূর্ণ অবগত নই এবং জিকরুল্লাহর কোন কাইফিয়াত আমাদের অন্তরে নেই, তাই আমরা ভ্রান্তিমূলক একথা বুঝে নিয়েছি যে, পানাহারের নামই হল জীবন। নতুবা প্রকৃতপক্ষে বন্ধুর নাম স্মরণ করা, বন্ধুর নামের যিকির করাই হল জীবন।

এ পৃথিবীতে যদি কারো প্রতি কারো প্রেম-প্রীতি সৃষ্টি হয়ে যায় এবং প্রিয়জন দূরদেশে, চোখের আড়ালে চলে যায়, তবে সে বন্ধুর বিচ্ছেদে পেরেশান হয়ে পড়ে। এমতাবস্থায় যদি হঠাৎ কেউ এসে বলে তোমার বন্ধু এসেছে তবে সাথে সাথে সে উঠে বসে যাবে এবং বলবে কোথায়? এই যে হঠাৎ শক্তি এসে গেল, প্রাণে স্পন্দন এসে গেল তা কোথা থেকে এল? সে কি কোন আহার গ্রহণ করেছে? পানি পান করেছে? শুধু প্রিয়জনের নাম শুনেছে মাত্র। বোঝা গেল, জীবনের প্রকৃত শক্তি বন্ধুর মিলনে নিহিত রয়েছে, ভাত-রুটি পোশাক-পরিচ্ছদে কোন জীবনী শক্তি নেই। এসব হল আনুষঙ্গিক অস্থায়ী জিনিসপত্র। কোন কবি বলেছেন–

ہر چند کہ پیر وخستہ وناتواں شدم

ھر دم نگاہ بروئے تو کرم بس جواں شدم

আমি বৃদ্ধ হয়েছি, দুর্বল ও হীন অবস্থায় পতিত হয়েছি, কিন্তু যখন তোমার চেহারার প্রতি দৃষ্টিপাত করি তখন সম্পূর্ণ জওয়ান হয়ে যাই, শক্তি এসে যায়।

এজন্য যে, প্রিয়জনের সৌন্দর্য যখন অন্তরে প্রবেশ করে তখন শক্তির সৃষ্টি হয়।

পৃথিবীতে মানুষ যখন এসব সাধারণ ও ক্ষুদ্র বন্ধু ও প্রিয়জনের শক্তিতে সঞ্জীবিত হয়ে ওঠে, তবে কারো অন্তরে যদি আল্লাহ তাআলার প্রেম ও ভালবাসা বদ্ধমূল হয়ে যায়, তার জীবনী শক্তির কি কোন পরিমাপ থাকবে? আম্বিয়ায়ে কেরাম আ. সদা আল্লাহর প্রেমে নিমগ্ন থাকেন, এজন্য তাদের জীবনী শক্তিও প্রিয়জনের নাম ও জিকিরের কারণে অক্ষুণ্ন রয়েছে। রুটি পানি দ্বারা নবীগণ জীবিত থাকেননি। আল্লাহর যিকির দ্বারাই জীবিত থেকেছেন। নবীগণ যদি একটি দানাও ভক্ষণ না করেন তবুও তাদের জীবনী শক্তিতে কোন পার্থক্য হতে পারে না। তাঁরা তাদের আবদিয়াত ও দাসত্ব প্রকাশ করণার্থে পানাহার করেন। উম্মতের জন্য সুন্নত করে দেয়াই তাদের উদ্দেশ্য। কেননা তাঁরা যদি আমল করে না দেখান তবে আমরা পানাহার করব কেমন করে? আমাদের জন্য আদর্শ প্রতিষ্ঠা করেছেন, তাঁদের আদর্শের অনুসরণ হিসেবে আমরা পানাহার করি– জীবন রক্ষার জন্য নয়। জীবন রক্ষা হচ্ছে আল্লাহ তাআলার যিকির দ্বারা। আজ যদি আমরা এ স্তরে পৌঁছতে পারি যে, আল্লাহর যিকির দ্বারা জীবন রক্ষায় সক্ষম হই; তবে কখনো রুটির দিকে ভ্রূক্ষেপ করার দরকার হবে না। এ হল আমাদের অপারগতা যে, আল্লাহর জিকিরের স্বাদ, মর্ম ও মাহাত্ম্য বুঝি না। ভুলের শিকার হয়ে মনে করছি যে, ভাত-রুটি দ্বারা আমাদের জীবন রক্ষা পাচ্ছে, তাই সর্বদা এগুলোর পেছনে ঘুরে বেড়াচ্ছি।

আমার পিতামহ হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ কাসেম নানুতবী রহ. যিনি দারুল উলুম দেওবন্দের প্রতিষ্ঠাতা, কামিল ওলী ছিলেন। তিনি ইন্তেকালের দু'মাস পূর্বে বলেছিলেন– আলহামদুলিল্লাহ, এখন আমার বেঁচে থাকার জন্য পানাহারের প্রয়োজন নেই। সুন্নতের অনুসরণ করার জন্য পনাহার করি, নতুবা প্রয়োজন নেই। অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার যিকির মন মস্তিষ্কে এভাবে বদ্ধমূল হয়েছে যে, এখন এ দ্বারা বেঁচে আছি, তথাপি ইত্তেবায়ে সুন্নতের জন্য পানাহার করি, এ জন্যও সাওয়াব দেয়া হবে। যদি আমাদের হাতে এমন কোন পন্থা এসে যায় যে, পানাহার ব্যতীত আমরা বেঁচে থাকতে পারি, তবে কখনো আহারের কল্পনা আমাদের মনে উদিত হবে না। কে এ আপদে পতিত হতে চায় যে, সকাল বিকেল চুলা জ্বালিয়ে পাক কর, চাষাবাদ কর, ধান, পাট, শস্য কেটে আন, চাল বের কর, এসব হল মুসিবত। আমরা যখন এসব ব্যতীত বেঁচে থাকতে সক্ষম, কাজেই এসব বিপদে পতিত হওয়ার কী প্রয়োজন?

আমার আলয় করার উদ্দেশ্য হল এই, আহার করা মুখ্য উদ্দেশ্য নয়, জীবজন্তুরাও তা করে থাকে। যদি কোন পর্যায়ে এসব উদ্দেশ্য হত, তবে এ উদ্দেশ্যে জীবজন্তুও মানুষের অংশীদার, কাজেই মানুষকে এত দীর্ঘ জীবন দেয়া হল কেন? এ হল একটি তুচ্ছ জিনিস, আর জীবন হল অত্যন্ত মূল্যবান ও সম্মানের বস্তু। মহামূল্যবান বস্তুর উদ্দেশ্য তুচ্ছ ও ছোট বস্তু হবে, এ হল আল্লাহর হিকমতের পরিপন্থী।

প্রকৃতপক্ষে পানাহারকে বর্জন করা কামাল ও মাহাত্ম্যের লক্ষণ, পানাহার করা মাহাত্ম্যের লক্ষণ নয়। নবীগণ আ.ও প্রয়োজন অনুযায়ী পানাহার করতেন। সাহাবায়ে কেরাম রা.-এর অবস্থা এমন ছিল যে, সারাদিন জিহাদের ময়দানে ঘোড়ার পিঠে সওয়ার, খানাপিনার কোন খবরও নেই। সবসময় জিহাদে ব্যস্ত। কারো কারো সাথে কিছু খেজুর-রুটির টুকরা থাকত, সময়ে খেয়ে নিতেন, আবার কারো কারো এ টুকরাগুলোও থাকত না, শুধু খেজুরের বীজগুলো পড়ে থাকত, যখন ক্ষুধার যন্ত্রণায় অচল হয়ে পড়তেন তখন বীজগুলো মুখে দিয়ে মনকে সান্ত্বনা দিতেন– আমি একটা কিছু আহার করছি। নতুবা এ কোন আহার্য বস্তু নয়। তাঁরা যে পরিমাণ কষ্ট ও পরিশ্রম করেছেন, চব্বিশ ঘণ্টা অশ্ব পিঠে সাওয়ার, জিহাদে ব্যস্ত, আল্লাহর কালেমাকে উঁচু করছেন, আল্লাহর দীনকে প্রতিষ্ঠিত করছেন, এ হল তাঁদের কামাল, তাঁদের মাহাত্ম ও পূর্ণতা। তাঁরা পানাহার ত্যাগ করেছেন। পানাহার কোন মাহাত্ম্যের কাজ নয়। প্রকৃত কামিলগণ, মহৎ ব্যক্তিগণ আহার অল্পই করেন। আম্বিয়ায়ে কেরাম আ. অল্প আহার করেছেন, সাহাবায়ে কেরাম রা. অল্প আহার করেছেন। ওলীগণও অল্প আহার করে থাকেন।

হযরত শায়খ আবদুল কুদ্দুস গাংগুহী রহ. যিনি চিশতিয়া তরীকার বিশিষ্ট বুযর্গ ছিলেন, তাঁর মালফুযাতে লিখেছেন, আমি এমন এক ব্যক্তিকে জানি, যে প্রত্যহ একটি বাদাম দ্বারা ইফতার করে চল্লিশ বছর যাবৎ রোযা রাখছে, কোন রোযাই তিনি ত্যাগ করছেন না। ব্যাখ্যাদাতাগণ বলেন, এ ব্যক্তি তিনি নিজেই ছিলেন। চল্লিশ বছর পর্যন্ত তাঁর পূর্ণ আহার্য ছিল দৈনিক এক দানা বাদাম। আর শরীরে শক্তি এত অধিক যে, রাত্রে যখন যিকির করতেন তখন তার আওয়াযের প্রতিধ্বনী পূর্ণ শহরে শোনা যেত। প্রত্যেক ব্যক্তি মনে করত যে আমাদের ঘরের দরজায় যিকির করছেন। এ শক্তি আহাপর্য বস্তুর নয়, এ ছিল আধ্যাত্মিক শক্তি যা জিকরুল্লাহ দ্বারা সৃষ্টি হয়।

হাদীসে বর্ণিত আছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সওমে বেসাল (একাধারে রোযা) রাখতে আরম্ভ করলেন, দিনের পর দিন রোযা। তাঁকে দেখে

কোন কোন সাহাবীও আরম্ভ করে দিলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানতে পেরে বললেন–

ايكم مثلى يطعمنى ربى ويسقين.

তোমাদের মধ্যে আমার মত কে আছে? আমাকে আমার প্রভু পানাহার করান।

এ দ্বারা আমার অন্তরে শক্তি সঞ্চয় হয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে কী জিনিস আহার করানো হত? আকাশ থেকে পোলাও, জর্দা-বিরিয়ানী ভর্তি পাত্র অবতীর্ণ হত না, এ শক্তি ছিল জিকরুল্লাহর শক্তি, যা রক্তে মাংসে বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল। শরীরের পশমে পশমে পৌঁছে গিয়েছিল। এ ছিল আধ্যাত্মিক শক্তি, এ শক্তি দ্বারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাজ করতেন। এ শক্তি জড়বাদী শক্তি নয়। সারা জীবন যদি একটি গ্রাসও গ্রহণ না করতেন তবে তাঁর শক্তিতে কোন পার্থক্য পরিবর্তন দেখা দিত না। তিনি পানাহার এ জন্য করতেন যেন উম্মতের জন্য আদর্শ হয়। তাদের জন্য পথ সহজ হয়। জায়িয না জায়িয বুঝতে পারে। নতুবা আহারের কোন প্রয়োজন ছিল না। সারমর্ম হল এই, পানাহার করা কোন কামাল নয়, মাহাত্ম্য নয়, বরং একে ত্যাগ ও বর্জন করাই কামাল। বিশ্ববাসীও একে কামাল বলে স্বীকার করে। যদি কোন ব্যক্তি অত্যধিক ভক্ষণ করে তবে কেউ তার প্রতি ভ্রূক্ষেপও করবে না। যদি আপনি বলেন, আমি অত্যন্ত কামিল ব্যক্তি এজন্য যে, আমি অত্যধিক আহার্য গ্রহণ করি, তখন আপনাকে বলা হবে এ কাজে কামাল ও মাহাত্ম্য কী আছে? সবাই আহার করে, জীবজন্তুরাও করে। কিন্তু যদি এমন কোন ব্যক্তি পাওয়া যায় যে আট-দশ দিন পর্যন্ত পানাহার না করে থাকতে পারে, মানুষ তার পিছনে লেগে যাবে যে, মনে হয় মানুষটি কামিল ওলী।

বোঝা গেল, দুনিয়াবাসীও পানাহার না করাকে কামাল বলে মনে করেন। এজন্য রোযাকে মূল ইবাদতের মর্যাদা দেয়া হয়েছে, যেহেতু রোযায় পানাহার ইত্যাদি ত্যাগ করতে হয়। পানাহার করা নিয়ত দ্বারা ইবাদত সাব্যস্ত হয়, এগুলো সত্তাগত ইবাদত নয়। আর রোযা হল সত্তাগত ইবাদত। পানাহার বর্জনের মাধ্যমে আল্লাহর দরবারে মাকবুলিয়াতের মর্যাদা লাভ করা যায়, পনাহারের মাধ্যমে তা হয় না।

আল্লাহওয়ালাগণ পানাহার ত্যাগ করেছেন, আমরা তো আল্লাহওয়ালা নই, আমরা সকাল-বিকাল উদর পূর্তি করে আহার করি। সকালে নাশতা, দুপুরে খানা, বিকালে, রাত্রে চারবার খাওয়ার পর কোন সুযোগ থাকে না, নতুবা

আরেকবার খেয়ে নিতাম। মোটকথা, পানাহার করা কামাল নয়, না করা হল কামাল। এখন এত দীর্ঘ জীবনের উদ্দেশ্য যদি হয় পানাহার তবে একে কোন কামাল ও মাহাত্ম্যের কাজ আপনিও মনে করেন না। কাজেই এত দীর্ঘ সফরের উদ্দেশ্য এ হতে পারে না।

জীবনের উদ্দেশ্য কি সম্মান ও ক্ষমতা লাভ

জীবনের উদ্দেশ্য তাহলে কী? হয়ত আপনি বলতে পারেন যে, পৃথিবীর এ দীর্ঘ সফরের উদ্দেশ্য পানাহার নয়, কিন্তু ক্ষমতার আসন, মান-সম্মান, প্রভাব প্রতিপত্তি, ঐশ্বর্য ও মর্যাদা লাভই উদ্দেশ্য। এগুলো ভাত-রুটি হতে উন্নত জিনিস। মানুষ তার মান-সম্মান রক্ষার্থে অকাতরে টাকা পয়সা বিলিয়ে দেয়, যেন তার মান-মর্যাদায় কলঙ্কের ছাপ না পড়ে। সুতরাং আহার্য হতে মান সম্মান উন্নত ও উঁচু জিনিস।

কিন্তু আমি আরয করছি, জীবনের উদ্দেশ্য এসব মান-মর্যাদাও হতে পারে না। কারণ, আপনি যাকে সম্মান মনে করছেন সে জিনিসটি কী? তা হল, অন্য মানুষ যেন আপনাকে ভাল মনে করে, ভাল বলে, একেই বলা হয় সম্মান ও মর্যাদা। এছাড়া অন্য কিছু নয়। মানুষ মনে করবে আপনি বিরাট বড় লোক। বোঝা গেল, ইজ্জত সম্মান একটি কাল্পনিক বস্তু। কেউ ধারণা করে নিল আপনি বিরাট বড়লোক, আপনিও বিরাট বড়লোক হয়ে গেলেন। কেউ আপনাকে বড়লোক বলে ধারণা করল না, এতেই আপনি ছোটলোক হয়ে গেলেন? এ হল এমন একটি জিনিস যার বাস্তবে কোন অস্তিত্ব নেই, একটি কাল্পনিক জিনিস। অধিকন্তু কল্পনাও নিজের নয়, অন্যের। যদি নিজের ধারণা-কল্পনা হত তবে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত এ ধারণা নিয়ে বসে থাকতাম– 'আমি অত্যন্ত বড়লোক', 'আমি অত্যন্ত মর্যাদার পাত্র'। কিন্তু আফসোস! এ হল একটি কাল্পনিক বস্তু, আর কল্পনাও অন্যের, যার উপর আমাদের কোন হাত নেই, কর্তৃত্ব নেই। অন্যে যদি এ কল্পনা করে বসে থাকে, আপনি বড়লোক, তাহলে আপনিও বড়লোক হয়ে বসে থাকবেন। আর অন্যে যদি ধারণা করে আপনি বড়লোক নন, তবে আপনি ছোটলোক হয়ে গেলেন, তুচ্ছ হয়ে পড়লেন। তাই সম্মান ও মর্যাদা হল একটি ভিত্তিহীন বস্তু, একটি খেয়ালী বিষয়, অন্য আর কিছু নয়।

প্রকৃত ইজ্জত ও সম্মান হল আল্লাহ তাআলার দরবারে মকবুল হয়ে যাওয়ার নাম। কারো কল্পনা ও ধারণা পোষণ করার নাম ইজ্জত নয়। আল্লাহ তাআলা যাকে কবুল করে নেন সে সম্মানিত, আর যাকে বিতাড়িত করে দেন, ধিকৃত করেন, সে হল লাঞ্ছিত, অপমানিত। সম্মান ও অসম্মান সবই আল্লাহর পক্ষ

থেকে হয়। মানুষের হাতে কিছুই নেই। মানুষ দ্বারা সম্মান পেতে হলে তাদের তোষামোদ করতে হয়। পূর্বেই তো হীন ছিলেন, এখন সম্মানের আশায় হাতজোড় করে 'জনাব, আমাকে সম্মান করুন' বলে তোষামোদের দ্বারা আরো অধিক অপমানিত হলেন। ইজ্জত লাভের পূর্বে হীন ছিলেন, তোষামোদের পর আরো হীন হলেন। ইজ্জত লাভ তো হলোই না। আর যদি আপনি ডাণ্ডা হাতে নিয়ে বলেন, আমাকে সম্মান কর, তবে ঐ ব্যক্তি আপনার ঘাড়ে ডাণ্ডা মেরে বলবে তুমি আমাকে সম্মান কর। এতো হবে পূর্বাপেক্ষা অধিক অপমান। কাজেই সম্মান মানুষকে বাধ্য করেও লাভ করা যায় না এবং তোষামোদ করেও লাভ করা যায় না। আল্লাহর পক্ষ হতে সম্মান লাভ হয়। বান্দা যখন আল্লাহ তাআলার আনুগত্য করে, আদেশ পালন করে, তখন আল্লাহ তাআলা তাকে কবুল করে নেন। আল্লাহ তাআলার কবুল করে নেয়ার কারণে মানুষের মধ্যে কবুলিয়াত লাভ হয়ে যায়। এটাই হল প্রকৃত ইজ্জত, প্রকৃত সম্মান।

হাদীসে বর্ণিত রয়েছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তাআলা যখন কোন বান্দার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যান, তখন জিবরাঈল আ.কে ডেকে বলেন, আমি অমুক বান্দার প্রতি রাজি ও সন্তুষ্ট রয়েছি তুমিও রাজি ও সন্তুষ্ট হয়ে যাও। তখন জিবরাঈল আ.ও সন্তুষ্ট হয়ে যান এবং আসমানে ঘোষণা করে দেন, অমুক বান্দা আমার নিকট মাকবুল হয়ে গিয়েছে, (এ হল আল্লাহর দরবারে মাকবুল হওয়ার লক্ষণ) কাজেই তোমরাও তাঁকে মাকবুলদের অন্তর্ভুক্ত করে নাও। অতঃপর সকল ফেরেশতা তাকে ভালবাসতে শুরু করেন। যখন ফেরেশতাদের মধ্যে তাঁর সম্মান ও মর্যাদা সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। ঐ ফেরেশগণের প্রভাব পৃথিবীতে অবস্থানরত ফেরেশতাদের উপর পতিত হয়। তারাও সম্মান করতে শুরু করেন। পৃথিবীতে অবস্থানরত ফেরেশতার প্রভাব প্রতিফলিত হয় আউলিয়াদের অন্তরে, তখন ওলীগণও তাদেরকে সম্মানের চোখে দেখতে থাকেন, আর ওলীগণের সাথে যাদের সম্পর্ক থাকে তারা নেককারই হন। অতঃপর তাদের মাধ্যমে জনসাধারণের মধ্যে সম্মানের পাত্র হয়ে যান। এক কথায় তাঁর মাকবুলিয়াত সমস্ত উম্মতের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। এ মাকবুলিয়াত কখন হয়? যখন সর্বপ্রথম আল্লাহ তাআলা তাঁকে মাকবুল বানিয়ে নেন, তারপর অন্যদের অন্তরে তার মাকবুলিয়াত জন্ম লাভ করবে। কাজেই সম্মান ও মর্যাদা হল এই– 'আল্লাহ কাউকে মাকবুল বানিয়ে নেন, তার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যান'। মানুষ ধারণা করবে অমুক ব্যক্তি অত্যন্ত সম্মানী– এ হল একটি ভিত্তিহীন কল্পনা মাত্র। সুতরাং বুনিয়াদি মৌলিক ইজ্জতই হল প্রকৃত ইজ্জত। তা না হলে পৃথিবীতে মানুষের সম্মান এমনই হবে, যেমন রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের হয়ে থাকে। জনপ্রিয় হয়ে গেলে গলায় ফুলের মালা দেয়া হবে, কিন্তু

আগামীকাল যখন জনগণের মত পরিবর্তিত হবে; জনপ্রিয়তা হ্রাস পেয়ে শূন্যের কোঠায় নেমে আসবে তখন গলায় জুতার মালা পরিয়ে দেয়া হবে। এখন সে সম্মান ও মর্যাদাহীন অবস্থায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। কেউ তাকে জিজ্ঞেসও করছে না। একি কোন সম্মান হল? প্রকৃত সম্মানের ভিত্তি হল আল্লাহ তাআলা কর্তৃক সম্মান দেয়া। যদি আল্লাহ তাআলা কবুল করে নেন, তবেই হল সম্মান। আর আল্লাহ তাআলা তখনই কবুল করেন, যখন সে কোন নেকী করে, সৎ কাজ করে, নির্দেশাবলি পালন করে এবং নিষিদ্ধ ও মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকে। খারাপ কাজ, খারাপ আমল কখনো সম্মানের পাত্র হতে পারে না। তাই প্রকৃত সম্মান নেকী ও নেক কাজের মধ্যে রয়েছে। আল্লাহ তাআলার ইবাদত ও আনুগত্য এবং তাঁর সম্মুখে অবনত মস্তকে ঝুঁকে যাওয়ার মধ্যে রয়েছে প্রকৃত ইজ্জত ও সম্মান। মানুষের ধারণা ও কল্পনা 'অমুক ব্যক্তি সম্মানের যোগ্য'– এর নাম সম্মান নয়। এ হল ভিত্তিহীন এক কল্পনা, যা কাল থাকবে, পরশু থাকবে না।

সারকথা হল এই, জীনের এত দীর্ঘ প্রশস্ত সংগ্রামের উদ্দেশ্য যেমন রুটি-রুজি হতে পারে না, তদ্রূপ মান-সম্মান, ক্ষমতা, প্রভাব-প্রতিপত্তিও হতে পারে না। এজন্য যে, আহার গ্রহণ চতুষ্পদ জন্তুর লক্ষণ। আর ক্ষমতা-প্রীতি সম্মান-প্রীতি একটি কাল্পনিক জিনিস। কাজেই জীবন হবে বাস্তব আর উদ্দেশ্য হবে কাল্পনিক, তা সামঞ্জস্যহীন কথা। এটা বোধগম্য কোন জিনিস নয়। অধিকন্তু, আল্লাহ তাআলার হিকমতেরও পরিপন্থী।

কুরআনের আলোকে জীবনের উদ্দেশ্য

উল্লেখিত জিনিস দু'টি (পানাহার ও সম্মান) জীবনের উদ্দেশ্য হতে পারে না। তাহলে উদ্দেশ্য কী হওয়া উচিত? দীর্ঘ জীবনের উদ্দেশ্যও তদ্রূপ দীর্ঘ হওয়া উচিত যেন শেষ পর্যন্ত জীবনের সাথে সংযুক্ত থাকে। বিষয় দু'টি (রুটি-রুজি ও ক্ষমতার আসন) সুদূরপ্রসারী কোন উদ্দেশ্য নয়। কারণ আহারের প্রয়োজন ততক্ষণ হবে, যতক্ষণ আপনি এ পৃথিবীতে বিদ্যমান আছেন। যখন আপনি কবরে চলে গেলেন, পানাহার পেছনে পড়ে রইল, অথচ জীবন এখনো চলমান রয়েছে। এর অর্থ দাঁড়ায় এই, জীবন এখনো সামনের দিকে চলমান অথচ উদ্দেশ্য শেষ হয়ে গিয়েছে। সুতরাং এটা কি করে জীবনের উদ্দেশ্য হতে পারে?

এভাবে পৃথিবীর সম্মান ও প্রতিপত্তি– যা একটি ধারণা প্রসূত বিষয়, এও কোন স্থায়ী জিনিস নয়। যখন ব্যক্তি শেষ হয়ে যাবে এবং এখান থেকে স্থানান্তরিত হবে, তখন সম্মানও শেষ হয়ে যাবে।

একজন বাদশাহ যখন ইন্তিকাল করে, তখন তার সম্পূর্ণ ক্ষমতা প্রভাব-প্রতিপত্তি দুনিয়ায় রেখে যায়। তার রাজত্ব, রাজকীয় ক্ষমতা তার সাথে কবরে যায় না। এখনও তার জীবন রয়েছে কিন্তু ক্ষমতার প্রতাপ আর নেই। কাজেই জীবনের উদ্দেশ্য মান-সম্মান, প্রভাব-প্রতিপত্তি, ক্ষমতা লাভ হতে পারে না। কেননা, জীবন সম্মুখের দিকে চলমান আর উদ্দেশ্য থেকে গেল পিছনে। এজন্যই ভাত-কাপড়, রুটি-রুটি, মান-সম্মান, প্রভাব-প্রতিপত্তি, ক্ষমতার মসনদ কিছুই জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য হতে পারে না। শুধু একটি জিনিস জীবনের উদ্দেশ্য হতে পারে, সে উদ্দেশ্যকে কুরআন এভাবে ব্যক্ত করেছে–

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنْسَ إِلا لِيَعْبُدُوْنِ○

আমি মানব জাতি ও জিন জাতিকে সৃষ্টি করেছি শুধু এ উদ্দেশ্যে যে, তারা আমার ইবাদত ও আনুগত্য করবে। [যারিয়াত : ৫৬]

মানব সৃষ্টির প্রকৃত ও মৌল উদ্দেশ্য হল এই, মানুষ যদি ইবাদাতে আত্মনিয়োগ করে, তবে বলা হবে সে জীবনের উদ্দেশ্য পূর্ণ করেছে। আর যদি ইবাদতে আত্মনিয়োগ না কের , তবে বলা হবে তার জীবন সংগ্রাম সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে, উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়নি এতটুকুও।

পবিত্র কুরআন জীবন সংগ্রামের উদ্দেশ্য বর্ণনা করেছে– জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য হল আল্লাহর ইবাদত ও আনুগত্য করা। আল্লাহর ইবাদাত যদি হয়, তবে সম্মানও লাভ হবে এবং অনাহারীও থাকতে হবে না। এই হল প্রকৃত উদ্দেশ্য। একে উদ্দেশ্য বানানো হল কেন? এ জন্য যে, আহারকে উদ্দেশ্য বানানো হলে তা তো কবরে গিয়েই শেষ হয়ে যেত, অথচ জীবন অনেক দূর বিস্তৃত। যা পূর্ণ জীবন সাথে থাকতে সক্ষম হবে না তা কি করে জীনের উদ্দেশ্য হবে? উদ্দেশ্য তো এমন হওয়া চাই যা জীবনের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত সাথে থাকবে। এভাবে কাল্পনিক মান-সম্মানও কবর পর্যন্ত যেতে সক্ষম নয়, যখন আমরা কবরে পৌছে যাব, তখন কেউ আমাদের বড়ত্ব ও মহত্বের কল্পনা করুক অথবা না করুক, আমাদের জন্য সবই সমান। ওখানে নিজ আমলের মূল্যায়ন হবে। ওখানে এসব দেখা হবে না যে, জনগণ আমাদের সম্পর্কে কী ধারণা পোষণ করেন।

চিরস্থায়ী জীবনের চিরস্থায়ী উদ্দেশ্য

যদি ইবাদত ও আনুগত্যকে উদ্দেশ্য সাব্যস্ত করা হয়, তবে এ উদ্দেশ্য প্রকৃতপক্ষে এক দীর্ঘ উদ্দেশ্য যা পুরো জীবনের ওপর কার্যকর হয়। মানুষ যতক্ষণ পৃথিবীতে অবস্থান করবে, ইবাদতও তার সাথে থাকবে, কবরে যখন

পৌছবে, তখনও ইবাদত সেখানে পৌছবে। হযরত আম্বিয়া আ. সম্পর্কে তো বলা হয়েছে–

الأنبياء احياء فى قبورهم يصلون.

নবীগণ তাঁদের নিজ নিজ কবরে জীবিত রয়েছেন এবং নামায আদায় করছেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

كأنى انظر إلى موسى يلبّى

আমি যেন মুসা আ.কে দেখতে পাচ্ছি তিনি লাব্বাইক লাব্বাইক বলে আরাফার দিকে অগ্রসর হচ্ছেন।

বোঝা গেল যে, নবীগণ হজও করেন এবং নামাযও পড়েন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমি হযরত ইউনুস আ.কে দেখেছি, তিনি উটের ওপর সওয়ার হয়ে হজ আদায় করছেন। উটটির লাগাম ছিল পশমের তৈরি। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাইতুল্লাহ তাওয়াফ করলেন। হযরত জিবরাঈল আ.ও সাথে ছিলেন। তখন তিনি দেখতে পেলেন এক ব্যক্তিকে যার গোলগাল গড়ন, প্রশস্ত বক্ষ, লাল-সাদা চেহারা, যেন গোলাপ ফুল। আর এতই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন যে, মনে হয় এইমাত্র গোসল করে এসেছেন। চুল থেকে যেন পানি এখনো ফোঁটা ফোঁটা পড়ছে। লাবণ্যময় শোভন তরতাজা সুন্দর সুশ্রী চেহারা তাঁর। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিবরাঈল আ.কে জিজ্ঞেস করলেন, ঐ ব্যক্তি কে? তিনি উত্তর দিলেন, হযরত ঈসা মাসিহুল্লাহ আ.। বোঝা গেল, নবী আ.গণ তাওয়াফও করেন। লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা লাব্বাইক বলে আরাফার ময়দানেও যান। নামাযও পড়েন। কবরে বসে আল্লাহ তাআলার যিকিরও করেন।

আম্বিয়া আ. কবরে ইবাদত-বন্দেগী করেন একথা হাদীসে পরিষ্কার বর্ণিত হয়েছে। তবে আমি আপনি এবং সাধারণ মুসলমানদের বেলায় একথা বর্ণিত নেই যে, তারা অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দ্বারা ইবাদত করেন। কিন্তু একটি ইবাদত আমরাও করব, দেহ যেহেতু থাকবে না তাই আমরা তা করব কলব ও হৃদয় দ্বারা। নবীগণের দেহ যথাবস্থায় বিদ্যমান থাকে, তাই তাঁরা দেহ দ্বারা ইবাদত করেন। আমাদের দেহ মাটির সাথে মিশে যাবে, এজন্য দৈহিক ইবাদত থাকবে না, কিন্তু রূহানী ইবাদত আমরাও বরব। আর তা হল রূহের আবেগ ও কল্পনার ইবাদত। দৈহিক ইবাদত তখনই করা হবে, যখন দেহ বিদ্যমান থাকবে। দেহ হল

আমলের মাধ্যম। যখন দেহ থাকবে না, শুধু রূহ থাকবে, আর রূহ আমল করতে পারে না; কিন্তু ইবাদতের আগ্রহ প্রকাশ করতে পারে। তখন এ আবেগ ও আগ্রহ প্রকাশই হবে ইবাদত।

হাদীসে রয়েছে, সাওয়াল-জওয়াবের জন্য কবরে মুনকার-নাকীর আসেন এবং তিনটি প্রশ্ন করেন– তোমার রব কে? তোমার দীন কী? তোমার নবী কে? তাওহীদ, শরীয়ত ও রিসালাতের এ তিন বিষয়ে প্রশ্ন করা হয়। হাদীসে বলা হয়েছে, যখন ফেরেশতাগণ মুমিনকে বলবেন, 'তোমার প্রভু কে?' তখন হাদীসের বর্ণনানুযায়ী যে সময় দেখানো হবে, তা হবে এমন– যেন সূর্য অস্ত যাওয়ার উপক্রম হয়েছে, রৌদ্র হলুদ রং ধারণ করেছে, দিন শেষে সন্ধ্যা আগত প্রায়, কবরে সূর্যের প্রতিচ্ছবি দেখানো হবে। তখন ফেরেশতাদের প্রশ্নের উত্তরে এই মুমিন বান্দা বলবে– دعونى أصلى 'আমাকে নামায পড়তে দিন' সময় সংকীর্ণ হয়ে পড়েছে, আমার নামায কাযা হয়ে যাচ্ছে, মাগরিব এসে পড়বে। তখন দ্বিতীয় ফেরেশতা বলবে, একে রব সম্পর্কে কী প্রশ্ন করছ, সে তো রবের ইবাদত করছে। প্রথমজন বলবে, সে যাই হোক আমাদের দায়িত্ব আদায় করতে হবে। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস এ সঠিক উত্তর দিবে, তার আমল ও চেহারা একথা বলছে।

আমার আরয করার উদ্দেশ্য হল, ওখানে দৈহিক আমল করতে পারবে না, কিন্তু কল্পনা ও আগ্রহের ইবাদত করতে পারবেন। এমন আগ্রহের কারণেই বলবে: دعونى أصلى 'মিয়া সরে দাঁড়াও, আমাকে নামায পড়তে দাও।'

একথা শুনে ফেরেশতাগণ বলবেন, এখন নামাযের সময় না, আপনি এখন আলমে বরযাখে রয়েছেন। নামাযের জন্য যে আদেশ দেয়া হয়েছিল তা দুনিয়াতে ছিল, আলমে বরযাখ ও আলমে আখিরাতে এ আদেশ দেয়া হয়নি। তখন সে বুঝতে পারবে, এ তো সূর্য নয়, সূর্যের প্রতিচ্ছবি। এ প্রকৃত দিন নয় এবং এখন তো কবরে রয়েছি। কিন্তু: دعونى أصلى 'ছেড়ে দাও, নামায পড়ব'– এ কথা কে বলবে? ঐ ব্যক্তিই বলবে, যে দুনিয়ায় অবস্থানকালে যথারীতি নামায পড়েছে। নামাযের অভ্যাস হয়েছে তার। যদি দুনিয়াতে থাকাকালীন নামাযের প্রতি অমনোযোগী থাকে তবে তার মুখ দিয়ে 'ছেড়ে দাও নামায পড়ি' বের হবে না। কারণ জীবনে প্রতিদিন প্রকৃত মাগরিবের নামাযের ওয়াক্ত আসত আর সে নামাযের কোন পরোয়া করত না। কাজেই যে ব্যক্তি দুনিয়াতে নামাযের প্রতি উদাসীন ছিল সে কবরে গিয়েও উদাসীনই থাকবে। যে এখানে মনোযোগী ছিল সে ওখানে গিয়েও মনোযোগী হবে। হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেনঃ তোমাদের হাশর এ অবস্থায় হবে, যে অবস্থায় মৃত্যু এসেছিল। আর মৃত্যু এ অবস্থায় আসবে যে অবস্থায় জীবন অতিবাহিত করেছ। যদি জীবন যিকির ও ইবাদতের মধ্যে অতিবাহিত করে থাক, তবে মৃত্যুকালেও যিকির ও ইবাদাতরে ধ্যান থাকবে। যখন কবর হতে উঠবে, পুনরুত্থান হবে, তখনও জিকিরের ধ্যান থাকবে। হদীসে বলা হয়েছে, যদি কোন হাজী আরাফার ময়দানে অথবা মিনায় লাব্বাইকা লাব্বাইক বলতে বলতে মারা যায়, তবে সে কবর থেকে উঠে যখন ময়দানে মাহশারে গমন করবে তখন তার মুখে লাব্বাইকা লাব্বাইক উচ্চারিত হতে থাকবে।

لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك.

সে এ কথাই মনে করবে, আমি আরাফার ময়দানে যাচ্ছি, সম্মুখে অগ্রসর হয়ে বুঝতে পারবে, এ যে ময়দানে মাহশার, আরাফার ময়দান নয়। কিন্তু মুখ দিয়ে লাব্বাইক কেন বের হল? এ জন্য যে লাব্বাইক বলতে বলতে মৃত্যু হয়েছিল। কিন্তু লাব্বাইক বলে ইনতেকাল করেছিল কেন? এজন্য যে, সারা জীবন এ আগ্রহ ও আকাঙ্ক্ষা অন্তরে ছিল যে, কেমন করে হজ করব। কজেই মানুষ যে অবস্থার উপর জীবন অতিবাহিত করে ঐ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তার মৃত্যু হয়। আর যে অবস্থার উপর মৃত্যু আসে কবর হতে পুনরুত্থানকালে ঐ অবস্থাই হবে।

বোঝা গেল, ইবাদত ও জিকরুল্লাহ এমন বস্তু যা দুনিয়াতেও সঙ্গে রয়েছে, কবরেও সঙ্গে থাকবে, ময়দানে মাহশারেও সঙ্গে থাকবে এবং জান্নাতেও সঙ্গে থাকবে। হাদীসে রয়েছে–

يلهمون التسبيح

জান্নাতবাসীদের উপর তাসবীহ ইলহাম করা হবে।

ইচ্ছাবিহীন শ্বাস-প্রশ্বাসের সাথে আল্লাহ আল্লাহ'র যিকির জারী থাকবে। ইচ্ছা ও ইরাদা করার প্রয়োজন হবে না। জান্নাতে এ আদেশ দেয়া হবে না যে, তোমরা বসে বসে আল্লাহর যিকির কর, ইবাদত কর, নামায পড়। জান্নাত হল আয়েশ ও আরামের স্থান, সর্বক্ষণ শুধু আরাম আর আরাম। কিন্তু তাদের অন্তরে যিকির ঢেলে দেয়া হবে, সর্বদা শ্বাস-প্রশ্বাসের সাথে আল্লাহ আল্লাহ জারী হয়ে যাবে এবং এ যিকিরই হবে তাদের প্রকৃত আহার্য। অন্যান্য খাদ্যদ্রব্যও থাকবে, কিন্তু পানাহারের প্রয়োজন হবে না। আনন্দ উপভোগ হিসেবে পানাহার করা হবে। ক্ষুধার কষ্ট হবে না, কেননা জান্নাতে কষ্ট-ক্লেশের নাম গন্ধও নেই।

আল্লাহর ইবাদত দুনিয়া থেকে যাত্রা শুরু করে কবরে, ময়দানে মাহশারে ও জান্নাতে গিয়ে পৌঁছে যাবে এবং সর্বাবস্থায় সঙ্গী হয়ে থাবে। একমাত্র ইবাদাতই

কেবল জীবনের উদ্দেশ্য হতে পারে। জীবন যদি চিরস্থায়ী হয়ে থাকে তবে ইবাদতও চিরস্থায়ী, পানাহার চিরস্থায়ী নয়। পানাহার তো কবরে যাওয়ার পূর্বেই খতম হয়ে যায়। কবরে কোন প্রকার পানাহার নেই; আর যদি কিছু থেকেও থাকে তবে তা আল্লাহ তাআলার যিকিরই হবে। জান্নাতে পানাহার থাকবে কিন্তু তার আবশ্যকতা থাকবে না, মানুষ পানাহারের মুখাপেক্ষী থাকবে না। প্রয়োজন থাকবে একমাত্র আল্লাহর জিকিরের, আর তা মুখ দিয়ে জারী করে দেয়া হবে।

পার্থিব জীবনের প্রাণ

জীবনের উদ্দেশ্য হওয়ার উপযোগী যদি কোন বস্তু থাকে তবে তা হল আল্লাহর ইবাদত, তাঁর যিকির ও আনুগত্য। এগুলোই মানুষকে প্রকৃত মানুষে পরিণত করে, মানুষ প্রকৃত মানুষ হয়।

কবি আকবর এলাহাবাদী ছিলেন অত্যন্ত বড় মাপের একজন কবি, যাকে 'লিসানুল আসর' বা যুগের মুখপাত্র উপাধি দেয়া হয়েছিল। তিনি দু'টি শের বলেছেন–

ایک ہی کام سب کو کرنا ہے یعنی جینا ئے اور مرنا ہے،
اب رہی بحث رنج وراحت کی وہ فقط وقت کا گزرنا ہے

সবাইকে একই কাজ করতে হবে, অর্থাৎ বাঁচতে হবে আর মরতে হবে। এখন কথা হল শুধু সুখ-দুঃখ নিয়ে, আর তা হল সময় অতিবাহিত করা মাত্র।

দুঃখও চলে যাবে, সুখও চলে যাবে, কালের আবর্তে বিলীন হয়ে যাবে। সুখ-দুঃখ কোনটিই চিরস্থায়ী নয়। আকবর বলেছেন, জীবন-মরণ সবারই জন্য, আর সুখ-দুঃখ সাময়িক জিনিস– আসে এবং চলে যায়। কবিতাগুলোতে জীবনের উদ্দেশ্য বর্ণিত হয়নি, শুধু এ কথা বলা হয়েছে যে, এসব জিনিসের প্রতি ভ্রূক্ষেপ কর না। এখন প্রশ্ন হল মনোনিবেশ করব কার প্রতি? তাই আমি তিনটি পঙক্তি বাড়িয়ে দিয়েছি এবং এগুলোতে জীবনের উদ্দেশ্য প্রকাশ করা হয়েছে। আকবরের উপরোল্লেখিত দু'টি পঙক্তির মত আমারও দুটি পঙক্তি রয়েছে–

راہ گیا عزو جاہ کا جھگڑا یہ خیل کا پیٹ بھرنا ہے

থেকে গেল সম্মান ও মর্যাদার প্রশ্ন, এ হল কল্পনার উদরপূর্তি করা মাত্র। এ হল কাল্পনিক জিনিস, মনোযোগ দেয়ার যোগ্য জিনিস নয়। তারপর আমি বলেছি–

قابل ذکر ہی نہیں خورد و نوش یہ بھی کی خوس لڑنا ہے

পানাহার তো উল্লেখের যোগ্যই নয়– এ হল চতুষ্পদের অভ্যাস নিয়ে আত্মকলহ।

গানাহার হল চতুষ্পদ জন্তুর নিদর্শন। জীবজন্তুরা পানাহার করে, আমরাও তাই করি; এ হল বিপদ যা আমাদের গলায় ধারণ করছি। এটা জীবনের কোন উদ্দেশ্য নয়। তারপর উদ্দেশ্য উল্লেখপূর্বক আমি বলেছি–

مقصد زندگی ہے طاعت حق نہ کہ فکر جہاں میں پڑنا ہے

জীবের উদ্দেশ্য হল আল্লাহ আনুগত্য করা, পার্থিব চিন্তা-ভাবনায় জড়িয়ে পড়া নয়।

প্রকৃত উদ্দেশ্য হল আল্লাহ তাআলার বন্দেগী ও আনুগত্য নসীব হয়ে যাওয়া। কুরআনে এ কথাটিই বলা হয়েছে–

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنْسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُوْنِ○

আমি মানব জাতি ও জিন জাতিকে সৃষ্টি করেছি শুধু এ উদ্দেশ্যে যে, তারা আমার ইবাদত ও আনুগত্য করবে। [যারিয়াত : ৫৬]

একথা বলা হয়নি যে–

وما خلقت الجن والإنس إلا ليأكلون

আমি মানুষ ও জিনকে একমাত্র পানাহার করার জন্য সৃষ্টি করেছি, ইচ্ছামাফিক পানাহার করবে, মজা করবে।

এ কথাও বলা হয়নি যে, إلا ليعزّون 'তারা মানসম্মান ও মর্যাদার কল্পনা করতে থাকবে'। বরং বলেছেন: إِلاَّ لِيَعْبُدُوْنَ 'শুধু আমারই ইবাদত করবে'। তারপর আল্লাহ তাআলা বলেন–

وَمَا أُرِيْدُ مِنْهُمْ مِنْ رِّزْقٍ وَّمَا أُرِيْدُ أَنْ يُّطْعِمُوْنِ○

আমি তাদের নিকট রিযিক চাচ্ছিনা এবং এটাও চাচ্ছি না যে, তারা আমাকে আহার্য যোগাবে। [যারিয়াত : ৫৭]

তারপর আল্লাহ বলেন–

إِنَّ اللهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُوالْقُوَّةِ الْمَتِيْنُ○

আল্লাহ তাআলাই তো রিজিকদাতা, সকল শক্তির উৎস, পরাক্রান্ত। [যারিয়াত : ৫৮]

অর্থাৎ একটি কাজের দায়িত্ব আমি স্বয়ং গ্রহণ করেছি। তোমরাও একটি কাজের দায়িত্ব গ্রহণ কর। তোমাদের কাজ এই যে, তোমরা আমার ইবাদত করবে আর আমার কাজ হল আমি তোমাদেরকে রিজিক প্রদান করব। তোমরা যদি ইবাদত করা ত্যাগ করেলে আমিও ভাত-রুটি বন্ধ করে দেব, আমি তোমাদের দরিদ্র ও নিস্ব করে দেব। বোঝা গেল, জীবনের উদ্দেশ্য একমাত্র আল্লাহরই আনুগত্য করা।

একটি সন্দেহের অবসান

এখানে কেউ কেউ প্রশ্ন করতে পারেন, আর প্রশ্ন ঐ ব্যক্তিই করতে পারেন যিনি কুরআন শরীফ পাঠ করেছে, কুরআনের কিছু উদ্দেশ্য তার নজরে রয়েছে। প্রশ্ন এই হতে পারে যে, কুরআনের বর্ণনা দ্বারা বোঝা যায়, জীবজন্তু সৃষ্টির উদ্দেশ্যও তাই, তারাও ইবাদত করে। কুরআনে বলা হয়েছে–

تُسَبِّحُ لَهُ السَّمٰوٰتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيْهِنَّ ۚ وَإِنْ مِّنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهٖ وَلٰكِنْ لَّا تَفْقَهُوْنَ تَسْبِيْحَهُمْ ۚ إِنَّهٗ كَانَ حَلِيْمًا غَفُوْرًا ۝

সপ্ত আকাশ ও পৃথিবী এবং এগুলোর মধ্যে যা কিছু আছে সমস্ত কিছু তাঁরই পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে এবং এমন কিছু নেই যা তার সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে না। কিন্তু তাদের পবিত্রতা, মহিমা ঘোষণা তোমরা অনুধাবন করতে পার না। নিশ্চয় তিনি অতি সহনশীল, ক্ষমাপরায়ন। [বনী ইসরাইল : ৪৪]

সৃষ্টি জগতে এমন কোন বস্তু নেই, যে আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করছে না, তাসবীহ পাঠ করছে না। বৃক্ষ এবং তার শাখা-প্রশাখাগুলো, আকাশ, পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য, সবই আল্লাহ তাআলার পবিত্রতা বর্ণনায় নিয়োজিত রয়েছে। ভাষা সকলের পৃথক পৃথক, তাসবীহর পদ্ধতি পৃথক পৃথক, কিন্তু সকলেই তাসবীহ পাঠে ব্যস্ত। কেউ ক্লাসের ভাষায় আল্লাহকে স্মরণ করছে, আমরা তা বুঝি না, কেউ কার্সি ভাষায় মুনাজাত করছে, কার্সি ভাষাভাষী ব্যতীত কেউ তা বুঝতে পারছে না। কেউ আরবী ভাষায় দুআ করছে, আমরা তা বুঝতে সক্ষম নই।

আমরা যখন আমাদের ভাই-বন্ধুদের ভাষা বুঝতে পারছি না, তখন জীবজন্তুর ভাষা যদি বুঝতে না পারি তাতে আশ্চর্যের কী আছে? তোতা পাখি কোন ভাষায় কথা বলছে কিংবা কবুতর কোন ভাষায় কথা বলছে, তা যদি আমরা বুঝতে না পারি তবে এতে কী যায় আসে? আমরা তো আমাদের ভাই-বন্ধুদের ভাষাও বুঝি না। যে মানুষ তার ভাইয়ের কথা বুঝতে পারে না, সে যদি জীবজন্তুর ভাষা না বোঝে তবে বিস্ময়ের কী রয়েছে? কুরআনে এ কথাটিই বলা হয়েছে যে, প্রতিটি বস্তু তাসবীহ পাঠ করে, وَلٰكِنْ لَّا تَفْقَهُوْنَ تَسْبِيْحَهُمْ কিন্তু তোমরা তাদের তাসবীহ পাঠ বুঝতে সক্ষম নও। তাদের ভাষা পৃথক, তোমাদের ভাষা পৃথক। পক্ষিকুল বাহ্যিক দৃষ্টিতে শুধু শিস বাজায়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে আল্লাহ তাআলার তাসবীহ পাঠ করছে, বাঘ গর্জন করছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে আল্লাহর পবিত্র নামের তাসবীহ পড়ছে। হাতি হুঁক হুঁক করছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর নাম স্মরণ করছে। ওরা নিজস্ব ভাষায় শব্দ করছে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এ হল তাদের তাসবীহ। আল্লাহ তাআলা যদি তাদের ভাষা আমাদেরকে শিখিয়ে দেন তখন আমরা বুঝতে পারব, এরা তো হামদ ও সানা করছে, আল্লাহর গুণকীর্তন করছে।

এর উদাহরণ হল এমন, আপনি যদি টেলিগ্রাম করার জন্য কখনো টেলিগ্রাম অফিসে গিয়ে থাকেন তবে আপনি টেলিগ্রাম লিখে অফিসারকে দিয়েছেন, সে মেশিনের উপর পিতলের বাটের ওপর তা রেখে একে নাড়াচাড়া করতে শুরু করল, তখন খটাখট খটাখট শব্দ হতে লাগল, আপনি বলবেন লোকটি অত্যন্ত বোকা, আমি তাকে বলেছিলাম টেলিগ্রাম করার জন্য আর সে খটখট শুরু করেছে। কিন্তু এই খটখটের মধ্য দিয়ে সকল কথা সকল জ্ঞান ও রহস্য অন্যত্র স্থানান্তরিত হচ্ছে, অন্য দেশে চলে যাচ্ছে। বাহ্যিক দৃষ্টিতে খট খট মনে হচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে এগুলো হচ্ছে একটি পরিভাষা, এর মাধ্যমে যে সংবাদ, যে পয়গাম পাঠাচ্ছে, তা অন্য দেশে চলে যাচ্ছে, কিন্তু বাহ্যিক দৃষ্টে খটখট ব্যতীত কিছুই না। এভাবে বাহ্যিক দৃষ্টিতে এসব পাখি শিস বাজাবেই, কিন্তু বাস্তবে তারা তাসবীহ পাঠ করছে। আল্লাহ তাদেরকে অনুভূতি দিয়ে দেন। তারা ইবাদত-বন্দেগী করে। যেভাবে আমরা টেলিগ্রামের ঐ আওয়াজকে শুধু আওয়াজই মনে করি। কিন্তু আমরা বুঝতে পারি না, যদি আমরা এ পরিভাষা শিখে নেই, তবে বুঝতে পারব এসব খটখট নয় বরং এতে অর্থ রয়েছে, জ্ঞান-বিজ্ঞানের কথা রয়েছে। ঠিক তদ্রূপ জীবজন্তুর ভাষাও আমরা যদি কোনভাবে আয়ত্ব করতে পারি তবে আমরা বুঝতে সক্ষম হব, এরা সব আল্লাহর হামদ ও সানা এবং গুণগানে ব্যস্ত রয়েছে।

হযরত সুলায়মান আ.কে আল্লাহ তাআলা পক্ষিকুলের ভাষা শিখিয়েছিলেন। কুরআনুল কারীমে বলা হয়েছে–

يٰأَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَأُوْتِيْنَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِيْنُ○

> হযরত সুলায়মান আ. বলেন, হে লোকসকল! আমাকে আল্লাহর পক্ষ থেকে জীবজন্তু ও পক্ষিকুলের ভাষা শিখানো হয়েছে এবং আমাকে সবকিছু দেয়া হয়েছে। নিশ্চয় এটা সুস্পষ্ট অনুগ্রহ। [নমল : ১৬]

কোন জন্তু কিছু বললে তিনি তার অর্থ বলে দিতেন।

হাদীসে পশু-পাখির তাসবীহসমূহ বর্ণিত হয়েছে। পনেরটি উপমা দেয়া হয়েছে। যেমন তিতিরের কথা বলা হয়েছে যে, তিতির বলে– كما تدين تدان 'যেমন কর্ম তেমন ফল'। এ হল তার তাসবীহ।

হাদীসে আছে, কোন কোন ফেরেশতা এই তাসবহি পাঠ করেন–

سبحان من زين الرجال باللحى[১] والنساء بالذوائب

> পবিত্র ঐ সত্তা যিনি পুরুষগণকে দাড়ি এবং মহিলাগণকে কেশরাশি দ্বারা সৌন্দর্য দান করেছেন।

মেয়েদের জন্য কেশ ও কেশগুচ্ছ সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে এবং পুরুষদের জন্য দাড়ি শোভা বর্ধন করে। প্রত্যেকের শোভা সৌন্দর্য পৃথক পৃথক, পুরুষের শোভা দাড়ি, মহিলাদের শোভা কেশ ও কেশগুচ্ছ। এই হল কোন কোন ফেরেশতার তাসবীহ। সুতরাং বিভিন্নভাবে জীব-জন্তু, পশু-পক্ষি, হিংস্র প্রাণী এমনকি প্রতিটি সৃষ্টি কোন না কোন তাসবীহ পাঠে ব্যস্ত রয়েছে। তাই কুরআনের কোন পাঠক এ প্রশ্ন করতে পারেন, আপনি মানুষকে আশরাফুল মাখলুকাত– সৃষ্টির সেরা বলে তার জীবনের উদ্দেশ্য ইবাদত ও জিকরুল্লাহ বলেছেন। ইবাদত ও যিকির জীবজন্তু, পাথর, কঙ্কর সাবাই করে, তাহলে যিকির ও ইবাদতে মানুষের কামাল ও মাহাত্ম্য কী হল? যেমন আপনি বলেছিলেন, গাধা, গরু এবং অন্যান্য জীবজন্তুও আহার করে। কাজেই মানুষ যদি আহার গ্রহণ করে তবে এতে বিশেষত্ব কী হল? কুরআন পাকের আলোকে আমরা বলব যে, আল্লাহর যিকির ও ইবাদত জীবজন্তুও করে, যদি মানুষও তা করে নেয় তবে এতে কামাল হল কী? এ কেমন মহৎ উদ্দেশ্য হল? হতে পারে কারো অন্তরে এ সন্দেহ উঁকি ঝুঁকি দিচ্ছে?

এ সন্দেহ ও প্রশ্নের উত্তর হল এই, নিঃসন্দেহে জীবজন্তু সবাই তাসবীহ ও ইবাদত করে, কিন্তু তাদের ইবাদত স্বেচ্ছায় নয়, তারা ইচ্ছাকৃতভাবে ইবাদত করে না। এ হল তাদের স্বভাবজাত অভ্যাস, ফিৎরাতের চাহিদা। যেমন, মেশিন চলতে থাকে, কিন্তু মেশিন ইচ্ছাকৃতভাবে চলে না, বরং ইচ্ছা থাকে পরিচালকের হাতে। মেশিনের কাজ হল এতটুকু– বিরামহীনভাবে চলতে থাকবে। কাজেই পশু-পক্ষি যে তাসবীহ পাঠ করে, এ তাদের স্বভাব হিসেবে, ফিৎরাত হিসাবে করে। ইচ্ছা, অনুভূতি ও নিজ মর্জিমাফিক করে না। একথা বুঝে অনুভব করে যে, এ কাজ হল ইবাদত; এর ফলাফল হবে এই, এ জাতীয় বিবেক বুদ্ধি ও অনুভূতি জীবজন্তুদেরকে দেয়া হয়নি। ইচ্ছাকৃত ইবাদত একমাত্র মানুষই করে থাকে। ইচ্ছাহীন ইবাদতে কোন প্রতিদান ও সাওয়াব পাওয়া যাবে না। স্বেচ্ছাকৃত ইবাদতে সাওয়াব ও প্রতিদান পাওয়া যাবে। আর এসব কাজের মাধ্যমেই উন্নতির সোপান লাভে সমর্থ হয়। যেসব ইবাদত ইচ্ছাহীন, স্বয়ংক্রিয়াভাবে হতে থাকে, এগুলোর উপর না আছে কোন প্রতিদান, না আছে উন্নতিদানের কোন প্রতিশ্রুতি।

সার কথা, জীবজন্তুরা ইবাদত করে কিন্তু তাদের ঐ ইবাদত স্বেচ্ছায় নয়, এতে তাদের ইচ্ছা ও মর্জির কোন সংস্রব নেই। এ হল তাদের স্বভাবজাত ব্যাপার, ফিৎরাতের আকর্ষণ। যেমন, স্বভাবের চাহিদায় আমরা পানাহার করি, বুদ্ধি ও অনুভূতির কারণে নয়। ক্ষুধা যখন দেখা দেয়, তখন কোন দলীল প্রমাণ নিয়ে আসে না যে, আপনি নীরবে নির্জনে বসে গবেষণা করবেন, বুদ্ধি দ্বারা সমস্যার সমাধান করবেন। এ সময় আমার ক্ষুধা লাগা উচিত কিনা, যদি ক্ষুধা দেখা দেয় তবে এর উপকার, মুনাফা ও বরকত এসব হবে। কিন্তু ক্ষুধা যখন দেখা দিবে তখন লক্ষ প্রমাণ দ্বারা আপনি প্রতিহত করতে চেষ্টা করুন, প্রতিহত করা যাবে না, দমন করা যাবে না, ক্ষুধা লেগেই যাবে। যেমন মানুষ অনিচ্ছায় পানাহার করে, এতে কোন সাওয়াব ও প্রতিদান দেয়া হয় না, ঠিক সেভাবে কেউ যদি অনিচ্ছায় ইবাদত করে, তবে ঐ ইবাদতের উপরও কোন সাওয়াব দেয়া হয় না।

মানুষ বুঝে শুনে, স্বেচ্ছায় নিজ মাবুদের পরিচয় লাভ করে, তাঁর ইবাদত করে। মানুষের এই শান, এ হল তাঁর সিফাত ও গুণাবলি, এ হল তাঁর কামালাত। কাজেই এমন প্রভুর ইবাদত করা তাঁর সম্মুখে সিজদা করা আমাদের কর্তব্য।

আমার মালিককে স্মরণ করা আমার উপর ওয়াজিব, আমার দায়িত্ব। মানুষ প্রমাণাদি ভেবেচিন্তে স্বেচ্ছায় সজ্ঞানে ইবাদত করে। আর কবুতর, কুকুর, বিড়াল এ অনুভূতিসহ ইবাদত করে না। শিস বাজানো তাদের স্বভাবজাত চাহিদার অনুকরণে তাসবীহ– কাজেই পার্থক্য হয়ে গেল।

অন্য ভাষায় সারাংশ এভাবে বর্ণনা করা যাবে, এত দীর্ঘ ও প্রশস্ত জীবনের উদ্দেশ্য ইচ্ছাকৃতভাবে যিকির ও ইবাদত করা। আর জীবজন্তু প্রাণিকুলের নিকট এ জিনিস (ইচ্ছা) নেই।

দ্বিতীয় সন্দেহের অবসান

এর পরও হয়ত আপনার মনে এ প্রশ্ন জাগতে পারে, আমরা মেনে নিলাম জীবকুল স্বেচ্ছায় ইবাদত করে না, অথবা মানুষই একমাত্র স্বেচ্ছায় ইবাদত করে, কিন্তু ফেরেশতারাতো স্বেচ্ছায় ইবাদত করেন, তাঁরা তাদের মাবুদের পরিচয় লাভ করেই সজ্ঞানে ইবাদত করেন। তারপর যদি মানুষও স্বেচ্ছায় ও সজ্ঞানে ইবাদত করে, তবে এতে কী কামাল হল? মানুষ সৃষ্টির কী প্রয়োজন ছিল? এ কাজ তো ফেরেশতারাই করছিলেন। পুনরায় সেই প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে।

এ প্রশ্নের উত্তর হল, নিঃসন্দেহে ফেরেশতাগণ স্বেচ্ছায় ইবাদত করছেন, নিজ নিজ মর্জি মাফিক ইবাদত করছেন; কিন্তু একমাত্র ইবাদতই হল তাঁদের নফসের কাম্য বিষয়। এজন্য যে, তাদের মধ্যে গুনাহ করার ক্ষমতা নেই, তারা তো অন্যায় কাজ করতেই পারেন না। তাঁরা যখনই কিছু করবেন, নেককাজ করবেন, যখনই কিছু করবেন ইবাদতই করবেন। সুতরাং তাঁদের এ কাজও স্বভাবজাত চাহিদার অনুকরণ হল। পার্থক্য এটুকু যে, প্রাণীকুল তাদের স্বভাবজাত চাহিদার কারণে ইচ্ছা ব্যতীতই ইবাদত করছে আর ফেরেশতা আ.গণ স্বভাবজাত চাহিদার কারণে স্বেচ্ছায় ইবাদত করছেন। সুতারাং উভয় স্থানেই স্বভাবজাত চাহিদা বিদ্যমান রয়েছে। ফেরেশতাদের স্বভাবে গুনাহের যোগ্যতা নেই কিংবা মন্দ স্বভাবের যোগ্যতা নেই যে, এসবের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে ইবাদত করতে হবে। তাঁরা শুধু ইবাদত করার জন্য সৃজিত হয়েছেন এবং ইবাদত করছেন।

মানুষ তার নফসের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে ইবাদত করে। নফস চায় আমি আরামে ঘুমিয়ে থাকব, সে বলে তা হবে না, লেপ ছেড়ে নিজ প্রভুর ইবাদত কর। শীতকালে নফসের কাম্য হল গরম লেপের নিচে শুয়ে থাকবে কিন্তু মানুষ এ গরম লেপকে ত্যাগ করে অযু কতে যায়। ঠাণ্ডা-গরমের খেয়াল তার থাকে না। শীতল বাতাসকে উপেক্ষা করে মসজিদে যায়, মসজিদে বসে তন্দ্রাক্রান্ত হয়ে পড়ে কিন্তু এতদসত্ত্বেও সে ইবাদত করে। সুতরাং তার ইবাদত হল নিজ নফসের সাথে মোকাবিলার মাধ্যমে। ফেরেশতাগণ নফসের মোকাবিলা করে ইবাদত করছেন না। তাদের নফস তো পাক পবিত্র, তাদের নফসের চাহিদাই হল ইবাদত করা। এই হল পার্থক্য। সুতরাং সেই ইবাদত অধিক মূল্যবান যা

নিজের নফসের মোকাবিলা করে করা হয়। কারণ স্বভাবজাত চাহিদায় কৃত কাজ অধিক মনোযোগ আকর্ষণে সক্ষম হয় না।

আপনি যদি এ কথা বলেন যে, আমি খুবই উঁচু মাপের একজন অসাধারণ মানুষ, কারণ আমি আহার করে থাকি। তাহলে লোকজন বলবে– ভাই, এতে কী শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে? এতো তোমার স্বভাবজাত চাহিদা, এ কাজ তো তোমাকে করতেই হবে। এমন কোন কাজ বল যা তুমি তোমার নফসের বিরুদ্ধাচারণ করে করছ। কারো সম্পর্কে যদি এ কথা জানা যায় যে, অমুক ব্যক্তি এক সপ্তাহ পর্যন্ত কিছুই পানাহার করেনি তাহলে সবাই তার দিয়ে এই ভেবে ছুটে যাবে যে, হয়ত তিনি আল্লাহর ওলী হবেন। দুনিয়াবাসী তার দিকে ঝুঁকে পড়বে। কেন এমন হবে? এজন্য যে, তিনি নফস ও প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে কাজ করছেন। নফসের চাহিদা হল আহার্য গ্রহণ করা, আর তিনি এক সপ্তাহ পর্যন্ত কিছুই আহার করেননি। সুতরাং আহার গ্রহণ করায় কোন মাহাত্ম্য নেই, আহার গ্রহণ না করাই হল মাহাত্ম্য।

এজন্য ফেরেশতাগণ যদি ইবাদত করেন তবে তা নফসের বিরুদ্ধে নয়। এ হল এমন, যেন আমরা খাবার খেলাম। যদি নফসের বিরুদ্ধাচরণ করে ইবাদত করা হত তবে তা মাহাত্ম্যজনক বলে গণ্য হত এবং তার যথাযথ মূল্যায়নও করা হত। বোঝা গেল, ফেরেশতাদের ইবাদত হতে মানুষের ইবাদত অধিক মূল্যবান। অধিক মর্যাদার অধিকারী। ফেরেশতাগণ স্বভাবের চাহিদ পূরণ করেন আর মানুষ স্বভাবের বিরোধিতা করে ইবাদত করে। সার্বাগ্রে নিজেকে বিলীন করে দেয়, তারপর ইবাদত করে। এটা অধিক গুরুত্বযোগ্য।

এখন এ দীর্ঘ জীবনের উদ্দেশ্য এই সাব্যস্ত হল যে, তা হল এমন এক ইবাদত যা স্বেচ্ছায় কৃত এবং নফসের বিরোধিতা করে কৃত। এ কাজ একমাত্র মানুষই করতে পারে, অন্য কেউ করতে পারে নয়। এজন্যই পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে–

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ ○

আমি মানব জাতি ও জিন জাতিকে সৃষ্টি করেছি শুধু এ উদ্দেশ্যে যে, তারা আমার ইবাদত ও আনুগত্য করবে।
[যারিয়াত : ৫৬]

এমন ইবাদত যা স্বেচ্ছায় করা হবে এবং নফসের বিরোধিতা করে করা হবে। কাজেই মানুষের ইবাদতেই এই বিশেষত্ব রয়েছে যে, এ ইবাদত ফেরেশতা ও অন্যান্য সৃষ্টিজগতের ইবাদত হতে অধিক মূল্যবান, অধিক শ্রেষ্ঠ ও উত্তম।

মোটকথা, জীবনের উদ্দেশ্য যদি কোন জিনিস হতে পারে, তবে তা একমাত্র ইবাদত এবং আল্লাহর আনুগত্যই হতে পারে।

আল্লাহর ইবাদত কেন মানব জীবনের উদ্দেশ্য

এর ভিত্তি ও তাৎপর্য হল এই, সৃষ্টি জগতের যা কিছুই রয়েছে সবই আপনাদের কাজের জন্য, সবকিছুই আপনাদের কাজে ও সেবায় নিয়োজিত রয়েছে। পৃথিবী আপনাদের সেবায় নিয়োজিত, সূর্য আপনাদের কাজে ও খেদমতে ব্যস্ত, নদী-নালা, সাগরও আপনাদের সেবায় নিয়োজিত। মোটকথা বিশ্বের প্রতিটি অণু-পরমাণু আপনাদের খাদেম আর আপনারা হলেন মনিব।

কারণ, মানুষের জীবন এগুলোর উপর নির্ভরশীল। এদের কোন একটি যদি বিদ্যমান না থাকে, তবে মানুষ বেঁচে থাকবে না। যদি সূর্যকে সম্পূর্ণ সরিয়ে নেয়া হয় তবে জীবন শেষ হয়ে যাবে। না সূর্য উদিত হবে, না আলো থাকবে, না তাপ থাকবে। এতে করে মানুষ টিকে থাকতে পারবে না, জীবনের শৃঙ্খলা বিধ্বস্ত হয়ে পড়বে। এভাবে যদি বিশ্ব থেকে বাতাসকে তুলে নেয়া হয় তবে এক মুহূর্তের জন্যও মানুষ বেঁচে থাকতে পারবে না, নিঃশ্বাসই চলমান থাকবে না। কাজেই জীবন শেষ হয়ে যাবে। অনুরূপভাবে যদি পৃথিবীতে পানি না থাকে, এক ফোঁটা পানিও যদি কেউ না পায় তবে মানুষ বেঁচে থাকতে পারবে না। মোটকথা, মাটি, পানি, বাতাস, আগুণ, সূর্য, চন্দ্র, তারকারাজি ইত্যাদি থেকে যদি একটি বস্তুকে শেষ করে দেয়া হয়, তবে মানবজীবন শেষ হয়ে যাবে। বোঝা গেল, প্রতিটি জিনিসই মানুষের প্রয়োজনীয়, মানুষের জন্যই সৃষ্টি করা হয়েছে, কিন্তু স্বয়ং মানুষ এদের মধ্যে কারো কোন কাজে বা উপকারে আসছে না। যদি সম্পূর্ণ মানব জাতি ধ্বংস হয়ে যায় তবে সূর্যের কিছুই হবে না। যদি একজন মানুষও বেঁচে না থাকে, তবে পৃথিবী যেমন আছে তেমনই থাকবে। আকাশ এভাবেই থাকবে যেভাবে এখন রয়েছে। তো আপনি উপলব্ধি করতে পেরেছেন যে, এদের মধ্য হতে কোন একটি জিনিস যদি না থাকে তবে মানুষ বেঁচে থাকতে পারবে না। আর মানব জাতি শেষ হয়ে গেলেও তাদের কিছুই হয় না।

বোঝা গেল, এ সমস্ত জিনিস মানুষের কাজের আর মানুষ তাদের কারো কোন কাজের নয়। পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষ শেষ হয়ে গিয়েছেন, আর এসবকিছুই যেমন ছিল তেমনই রয়েছে।

মানুষ শুধু আল্লাহর কাজের জন্য

এদের কারো কাজের জন্যই মানুষ নয়। এখন প্রশ্ন হল এসব জিনিসই যখন মানুষের কাজের জন্য তাহলে মানুষ কী কাজের জন্য?

তার উত্তর হল এই, মানুষ যখন মাখলুকাতের কারো কাজের জন্যই নয়, তখন সে খালিক (সৃষ্টিকর্তা)-এর কাজের জন্য হবে। আর 'খালিকের কাজ' হল এই– তাঁর আনুগত্য করবে, তাঁর সম্মুখে মুখাপেক্ষিতা পেশ করবে, ইবাদত করবে এবং মাথা নত করবে। সুতরাং মানব জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য দাঁড়াল আল্লাহর ইবাদত ও আনুগত্য। এ উদ্দেশ্যেই বিশ্ব কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। পানাহার ব্যতীত মানুষ ইবাদত করতে পারবে না বিধায় খাদ্যদ্রব্য, পানি ও বাতাস সৃষ্টি করা হয়েছে। অদ্রূপ আলো না থাকলে মানুষ ইবাদত করতে পারবে না বিধায় আল্লাহ তাআলা চন্দ্র-সূর্যকে সৃষ্টি করেছেন। গাছপালা, জীব-জন্তু, পাহাড়-পর্বত সৃষ্টি করেছেন। এসবই এজন্য সৃষ্টি করেছেন, যেন এসব ব্যবহার করে মানুষ প্রস্তুত হয়ে যায় এবং আল্লাহর ইবাদতে মনোনিবেশ করে। মোটকথা, এসব আয়োজন মানুষের জন্য, আর মানুষ হল তার মালিক ও প্রভুর জন্য।

এর উদাহরণ হল এমন, এক ব্যক্তি ঘোড়া পুষল, সে ঘোড়ার জন্য আস্তাবল তৈরি করল, তার সেবা-যত্ন ও ঘাস পানির ব্যবস্থা করার জন্য একজন লোক নিয়োগ করল। এসবই করা হচ্ছে ঘোড়ার জন্য। আর ঘোড়া কার জন্য? শুধু মালিকের সওয়ার হওয়ার জন্য। সওয়ার হওয়ার সময়ে যদি ঘোড়া বদমায়েশী আরম্ভ করে দেয়, সওয়ার হতে না দেয় তবে এ ঘোড়া কোন কাজের জন্য? এতো গুলি করে হত্যা করার যোগ্য। মালিক বলবে, আমি তার জন্য সব ব্যবস্থাই করছি এবং তাকে রেখেছি আমার কাজের জন্য। যদি আমার কাজেই না লাগল তাহলে এর থাকার যোগ্যতা কোথায়? ঘোড়া যখন শেষ হয়ে যাবে তখন তার মালিক আস্তাবল, সহিস-কর্মচারী প্রভৃতিকে শেষ করে দেবে। কেননা এসব জিনিস ঘোড়ার জন্য ছিল, আর ঘোড়া রাখার উদ্দেশ্য ছিল প্রয়োজনে মালিকের সাওয়ারীর কাজ দেয়া। যখন এ উদ্দেশ্যই পূর্ণ হল না, তখন ঘোড়াও শেষ, আস্তাবলও শেষ, চাকরও বিদায়।

আমরা সবাই ঐ আস্তাবলেই রয়েছি। পৃথিবীকে আল্লাহ তাআলা আস্তাবল বানিয়েছেন। যেখানে খাদ্যদ্রব্য রেখেছেন, আস্তাবলের উপর ছাদও নির্মাণ করেছেন। তারপর এর মধ্যে আগুন, পানি ইত্যাদি সবই রেখেছেন। এসবই আপনার জন্য, আর আপনি এজন্য যে, মালিকের ইবাদত করবেন। মানুষ যদি মালিকের ইবাদতই না করবে, তবে গুলি মেরে শেষ করে দেয়ার যোগ্য। যদি

সকল মানুষ একত্রিত হয়ে ইবাদত ছেড়ে দেয়, তবে মানুষ জাতি শেষ হয়ে যাবে। এ আস্তাবলকেও ধ্বংস করে দেয়া হবে। এতে যেসব খাদ্যসামগ্রী রয়েছে, তাও শেষ করে দেয়া হবে। আর এরই নাম হল কিয়ামত।

বর্ণিত হয়েছে, নিকৃষ্টতম মাখলুকের উপর কিয়ামত কায়েম হবে। ঐসব লোকের উপর যারা সৃষ্টি জগতের মধ্যে সর্বনিকৃষ্ট হবে। যাদের মধ্যে ভালমন্দের পার্থক্য থাকবে না। একেবারে প্রকাশ্য জনসমক্ষে অন্যায় ও অসৎ কাজ করে বেড়াবে, যেমন জীবজন্তুরা করে থাকে। তাদের অন্তরে আল্লাহ তাআলার কোন স্থান থাকবে না। যখন এরূপ মানুষে পৃথিবী পূর্ণ হয়ে যাবে, তখন তাদেরকেও শেষ করে দেয়া হবে, আকাশকেও ধূলিসাৎ করে দেয়া হবে, পৃথিবীকেও নিশ্চিহ্ন করে দেয়া হবে। এজন্য যে, মানব সৃষ্টির দ্বারা যখন আল্লাহর উদ্দেশ্য পূরণ হচ্ছে না তখন এসব জিনিসও অর্থহীন হয়ে পড়বে। এ সব কিছুই মানুষেরে জন্য ছিল। যদি সে মালিকের কাজে আত্মনিয়োগ করে, তবে সব জিনিস যথাস্থানে কার্যরত থাকবে, আর যদি সে মালিকের কাজে না থাকে, তবে এসব জিনিস শেষ করে দেয়া হবে।

বিবেকের মানদণ্ডে আল্লাহর ইবাদতের আবশ্যকতা

আপনি আল্লাহর সাথে সম্পর্ক স্থাপন করুন, বিশ্বের সবকিছু আপনার খেদমত করবে। কিন্তু যদি আপনি মালিকের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে বিশ্বের বস্তুরাজির সাথে সম্পর্ক স্থাপন করেন তবে মালিকের কোন ক্ষতি হবে না বরং তিনি বলবেন, এমন মানুষ তো গুলি দ্বারা হত্যার যোগ্য।

এর উদাহরণ এমন– এক ব্যক্তি সুন্দরী এক যুবতীকে বিয়ে করল। অত্যন্ত সভ্য, ভদ্র, রূপসী ও লাবণ্যময়ী নারী সে। এ স্ত্রীর জন্য খুব উন্নত একটি বিল্ডিং তৈরি করল, ফার্নিচার দ্বারা তাকে সজ্জিত করল– যেন স্ত্রী আরাম আয়েশে জীবনযাপন করতে পারে। বিল্ডিংটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য ঝাড়ুদার নিয়োগ করল। নিয়মিত খাবার তৈরির জন্য বাবুর্চি নিয়োগ করল। স্ত্রীর যেন কোন রকমের অসুবিধা না হয় এজন্য তাজমহলতুল্য একটি উন্নতমানের বিল্ডিং সে তৈরি করল। এসব কেন করল? শুধুই স্ত্রীর জন্য। আর স্ত্রী কার জন্য? শুধুই স্বামীর জন্য।

এ স্ত্রী যদি স্বামীর পরিবর্তে কোন চাকরের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে অথবা এ প্রাসাদে যদি বাইরের কোন ব্যক্তি আসতে শুরু করে তবে স্বামীর অবস্থা কেমন হবে? তখন সে বলবে, এ স্ত্রী তালাক দিয়ে দেয়ার যোগ্য, গুলি করে মেরে

ফেলার যোগ্য। সে আমার সম্মানকে ধূলিসাৎ করে দিয়েছে। তখন সে স্ত্রীকে শেষ করে দিবে কিংবা পরিত্যাগ করবে। যখন স্ত্রীই নেই, তখন দালান দিয়ে কি করবে? বাবুর্চি, চাকর-চাকরানী কী কাজে আসবে? এসবই তো স্ত্রীর জন্য ছিল। যখন স্ত্রীকে তালাক দিয়ে বের করে দিয়েছে তখন এসব জিনিসের কি প্রয়োজনীয়তা রয়েছে? এ ঘটনা কখন ঘটবে? যখন স্ত্রী নিজ স্বামীর অবাধ্য হয়ে অন্য কারো হয়ে যাবে। চাকরদের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করবে, অন্যদের সাথে প্রেম-প্রীতি করবে– এমতাবস্থায় এ স্ত্রী বের করে দেয়ারই যোগ্য।

ঠিক এভাবে বুঝে নিন, আল্লাহ মানুষকে শ্রেষ্ঠ মাখলুক বানিয়েছেন। একজন স্বামীর তার স্ত্রীর প্রতি যে পরিমাণ মুহাব্বত ও ভালবাসা থাকে, এর চেয়ে অনেক অধিক মুহাব্বত ও ভালবাসা রয়েছে মানুষের প্রতি আল্লাহ তাআলার। বরং সন্তানের প্রতি মাতৃস্নেহ যে পরিমান থাকে, এর চেয়েও অধিক। মানুষের প্রয়োজনে আল্লাহ তাআলা একটি বিশাল প্রসাদ নির্মাণ করেছেন, আকাশকে সামিয়ানার ন্যায় টানিয়ে দিয়েছেন এবং পৃথিবীকে করেছেন শয্যাতুল্য। কুরআনে বলা হয়েছে–

الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ فِرَاشًا وَّالسَّمَاءَ بِنَاءً.

আমি জমিনকে তোমাদের জন্য শয্যা বানিয়েছি এবং আকাশকে সুরক্ষিত ছাদ বানিয়েছি। [বাকারা : ২২]

আলোর প্রয়োজন ছিল; তাই চন্দ্র-সূর্যের বাল্ব লাগিয়ে দিয়েছি যেন বিশ্ব আলোকিত হয়ে যায়। কাজকর্ম, ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য প্রখর আলোর প্রয়োজন ছিল; তাই দিনের বেলায় সূর্য দিয়েছি। রাত্রিকালে স্নিগ্ধ আলোর প্রয়োজন হয়; তাই চন্দ্র ও তারকারাজি লাগিয়ে দিয়েছি। এগুলোর মধ্যে আলো রয়েছে; কিন্তু নয়ন ঝলসানো নয়। রাত্রে স্নিগ্ধ ও দিনে প্রখর আলোর ব্যবস্থা রেখেছি। দিন কাজকর্ম করার জন্য এবং রাত আরাম ও বিশ্রাম করা জন্য। আল্লাহ তাআলা বলেন–

اللهُ الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ لِتَسْكُنُوْ فِيْهِ وَ النَّهَارَ مُبْصِرًا.

রাত্রিকে শান্তিদায়ক বানিয়েছি যেন তোমরা আরাম গ্রহণ করতে পার এবং দিনকে বানিয়েছি কাজকর্মের জন্য যেন সর্বপ্রকার কাজকর্ম করতে পার।

দিনে প্রখর আলো এবং রাতে স্নিগ্ধ ও আরামদায়ক আলো রেখেছেন। পানির প্রয়োজন ছিল তাই সর্বত্র নদী-নালা প্রবাহিত করে দিয়েছেন, বৃষ্টির ব্যবস্থা

করেছেন যেন সর্বদা পানির সরবরাহ ঠিক থাকে, মানুষের কোন কষ্ট না হয়, অসুবিধা না হয়। জমিকে শয্যাতুল্য করেছেন। এ যেন শয্যাও আবার খাদ্য ভাণ্ডারও। সকল খাদ্যদ্রব্য এর ভিতরই রয়েছে; সকল প্রকার শাকসবজি এরই মধ্যে রয়েছে। এর উপর বৃষ্টিপাত হচ্ছে, নদী-নালা রয়েছে এর মধ্যে। তার পানি আকাশে নয় বরং ভূ-গর্ভে রয়েছে। জমিনের উপরিভাগে রাখা হয়নি যেন মানব সমাজের কষ্ট বা অসুবিধা না হয়। সূর্যের রয়েছে আলো। এ যেন একটি হারিকেন বা প্রদীপ, যা মানুষের জন্য আলো বিতরণ করছে। এ যেন একটি ঘড়ি যা দ্বারা সঠিক সময় জানা যাচ্ছে। যেদিন থেকে আল্লাহ তাআলা একে সৃষ্টি করেছেন সেদিন হতে নির্ভুল সময় দিয়ে যাচ্ছে। আজ পর্যন্ত কোন দিন বিকল হয়নি। এ যেন একটি হিটার; সর্বদা তাপ বিতরণ করছে। সূর্য একটি কিন্তু তার উপকারিতা বিভিন্নমুখী, অগণিত। এভাবে পৃথিবী ও জমি একটি কিন্তু তার উপকারিতা অসংখ্য-অগণিত।

এসব জিনিসকর্ম এজন্য, যেন মানুষের কোন কষ্ট না হয়। আহার্য, পানীয়, আলো বাতাস সবই সহজে পেতে পারে এবং তাদের কাজকর্মে কোন বিঘ্ন ও প্রতিকূলতা সৃষ্টি না হয়। সব জিনিসই মানুষের জন্য, আর মানুষ হল তার মালিকের জন্য। সে মালিকের ইবাদত বন্দেগী করবে, দাসত্ব ও আনুগত্য করবে। যেহেতু সবকিছুরই দাতা তিনিই। তিনি উদার, তিনি দয়ালু। তাঁর দান ও দয়ার প্রতি লক্ষ্য করে তাঁরই ইবাদাত করা কর্তব্য।

ইবাদত ও আনুগত্যের ব্যাপকতা

আল্লাহ তাআলা ইবাদত ও আনুগত্যের অর্থকে এত ব্যাপক রেখেছেন যে, জীবনের প্রতিটি শাখা-প্রশাখার সাথে তার সম্পর্ক হতে পারে। একে বিশেষ কোন পদ্ধতিতে নির্দিষ্ট করে দেননি, বরং এতই সহজ করে দিয়েছেন যে, মুসলমানদের সেবা করা, বন্ধুবান্ধবের সেবা করাকেও 'আল্লাহ আল্লাহ' করা বলে ধরে নিয়েছেন, যা ইবাদত ও আনুগত্যের অন্তর্ভুক্ত।

আমার শ্রদ্ধেয় আব্বাজান বলতেন, যে বছর আমি হজ করতে গেলাম, সে বছর ওখানে কলেরা মহামারী আকারে বিস্তার লাভ করল। আমার পিতা হযরত হাজী ইবাদুল্লাহ সাহেবের নিকট বাইআত ছিলেন, তাঁর খলীফাও ছিলেন। সে বছর হাজারো হাজী সাহেবান এ রোগে ইন্তেকাল করেন। তিনি বলতেন, আমার সঙ্গী-সঙ্গী সবাই এ রোগে আক্রান্ত ছিলেন আর আমার কাজ এই ছিল যে, একজনকে ঔষধ খাওয়াচ্ছি তো অন্যজনের জন্য খাদ্য নিয়ে আসছি। এভাবে

সেবা-যত্ন করায় নিয়োজিত হয়ে রইলাম। না তাওয়াফও করতে পারছিলাম, না হারাম শরীফে হাজির হতে পারছিলাম। এত কাজ ছিল যে, কখনো কাউকে ঔষধ খাওয়াচ্ছি তো কারো লোটায় পানি ভরে দিচ্ছি, ইত্যাদি ইত্যাদি।

মোটকথা, এই পেরেশানীতেই ছিলাম। তখন আমার শায়খ হযরত হাজী সাহেবের নিকট আমার অবস্থা অভিযোগের সুরে বর্ণনা করলাম যে, আমার এখানে আসা না আসা সমান হয়ে গেল, আমি তাওয়াফও করতে পারছি না, মদীনায়ও যেতে পারছি না। আমার হাতে সর্বক্ষণ ঔষধের পেয়ালা রয়েছে। সব সময় রোগীদের নিকট পড়ে থাকি। আব্বা বলেন, হাজী সাহেব আমার কথা শুনে এভাবে আঙ্গুলে কামড় দিলেন এবং বললেন, বেটা! এ কি বলছ তুমি? হজ ও তাওয়াফ অবশ্যই ইবাদত কিন্তু মুসলমানদের খেদমত করা, সেবা-যত্ন করা এর চেয়ে উত্তম ইবাদত। এ কাজে হজ ও যিয়ারতের চেয়ে অনেক অধিক সাওয়াব পাওয়া যাবে।

دل بدست آوز کہ حج اکبر است

নিজের আত্মাকে নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসা সবচেয়ে বড় হজ।

বললেন, হজ্জের ফরজগুলো আদায় করেছ, এখন রোগীদের সেবা-যত্ন কর। শত সহস্র তাওয়াফ হতে এর সাওয়াব অধিক। যেন বললেন, ইবাদত শুধু নামায ও সদকায় সীমাবদ্ধ নয়। ইবাদতের বহু শাখা-প্রশাখা রয়েছে।

দারুল উলুম দেওবন্দের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মাওলানা কাসেম নানুতবী রহ. এবং প্রথম সদরে মুদাররিস হযরত মাওলানা ইয়াকুব সাহেব রহ. খানা খেতে বসেছিলেন। এ সময় মাওলানা শাহ রফিউদ্দীন রহ. এলেন, যিনি ছিলেন দারুল উলুমের প্রথম মুহতামিম এবং অনেক কাশফ ও কারামতের অধিকারী নকশবন্দী তরীকার একজন বুযর্গ। নানুতবী রহ. রফিউদ্দীন সাহেবকে উদ্দেশ্য করে বললেন, হযরত! আপনিও খানায় শরীক হোন। তিনি বললেন, আমি রোযা রেখেছি। রোযা ছিল নফল এবং সূর্যাস্তের আনুমানিক দশ মিনিট বাকি ছিল। তাঁরা বললেন, হযরত আসুন, আল্লাহ এতে আপনাকে অধিক সাওয়াব দান করবেন। তিনি তৎক্ষণাৎ বসে পড়লেন এবং খেতে আরম্ভ করলেন। তিনি বলতেন, তাঁদের আদেশ ও মন রক্ষায় আমি যে সাওয়াব পেয়েছি যদি সহস্র রোযাও আমি রাখতাম তবে এত অধিক সাওয়াব পেতাম না যা ঐ সময় রোযা ভঙ্গ করে পেয়েছি।

সুতরাং ইবাদত শুধু নামায-রোযায় সীমাদ্ধ নয়। পানাহারেও ইবাদত রয়েছে, শয়নে-জাগরণে ও চলাফেরায়ও সাওয়াব রয়েছে। আল্লাহকে শুধু মসজিদেই

পাওয়া যায় না, ঘরেও আল্লাহকে পাওয়া যায়, দস্তারখানায়ও তাঁক পাওয়া যায়। সর্বত্র মানুষ আল্লাহর জামাল দর্শন করতে পারে। যদি নিয়ত শুদ্ধ সঠিক হয়, শরীয়তের অনুকরণে কাজ করা হয় এবং আনুগত্যের আবেগ ও আগ্রহ তাতে থাকে তাহলে প্রতিটি জিনিস ইবাদতের রূপ ধারণ করে।

ইসলাম পার্থিব কাজকর্ম থেকে বিরত রাখতে আসেনি

আল্লাহ তাআলা বলেছেন যে, সমস্ত বিশ্ব তোমাদের জন্যই সৃষ্টি করা হয়েছে, আর তোমরা সৃজিত হয়েছ তোমাদের মালিকের জন্য। গোলামের কাজ হল সে তার মালিকের সামনে বিনয়াবনত হবে এবং আনুগত্য করবে। এ বিষয়ে মানুষ যখন সুদৃঢ় হবে তখন পার্থিব যে কাজই করুক না কেন তাতে কল্যাণ ও বরকত থাকবে। ইসলাম বলে না যে, তোমরা কারবার কর না, পার্থিব লেনদেন ও কাজকর্ম ছেড়ে দাও, আত্মরক্ষার কোন পন্থা অবলম্বন কর না। বরং সবকিছুই কর, কিন্তু আল্লাহকে হাজির নাযির জেনে কর, আবিদ ও বান্দা হয়ে কর। এ কথা বিশ্বাস করে কর যে, আসবাব বা উপকরণে কিছুই নেই, শুধু আদেশ পালনার্থে আমরা এগুলোকে গ্রহণ করছি। দীন ইসলাম রাস্তাকে সঠিক ও দুরুস্ত করার জন্য এসেছে, আপনার কাজকর্মে বাধার সৃষ্টি করতে আসেনি। আত্মার মনোযোগ আল্লাহর দিকে ফিরিয়ে দাও এবং দুনিয়ার সব কাজ করতে থাক, সব কাজ খায়র ও বরকতময় হয়ে যাবে। মুসলমানের অবস্থা হবে এই, হৃদয় আল্লাহর সঙ্গে জড়িত, আল্লাহর প্রেমে বিভোর এবং হাত-পা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো কাজে ব্যস্ত। হৃদয় কোন কাজে আবদ্ধ নয়, কাজে আবদ্ধ থাকবে হাত-পা অঙ্গসমূহ। এ জাতীয় কারবারে খায়র ও বরকত হয় এবং এ কাজকে ইবাদতের মধ্যে গণ্য করা হয়।

সুতরাং ইসলাম ব্যবসা-বাণিজ্য, কৃষি ও চাষাবাদকে বাধা দেয়ার জন্য আসেনি। সব কাজেরই অনুমতি দিয়েছে কিন্তু আমার (আল্লাহর) সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে আমার নির্দেশ অনুযায়ী চল, এজন্য ইসলাম এসেছে। যদি নিজের নফস ও প্রবৃত্তির নির্দেশ অনুযায়ী চল তবে প্রত্যেকের নফসই তো স্বেচ্ছাচারী ও বিদ্রোহী স্বভাবের। পরিষ্কার কথা, একে দিয়ে দুনিয়ার কাজও হবে না পরকালের কাজও হবে না। যদি সকল কাজকর্ম আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী সম্পাদন করা হয় তবে এতে খায়র ও বরকত হবে, দুনিয়াও সুন্দর হবে পরকালও সুন্দর হবে।

দীনের কাজ হল আত্মার জন্য সঠিক পথ নির্দেশ করা। যখন সঠিক পথ লাভে সমর্থ হবে তখন নির্বিঘ্নে শেষ পর্যন্ত পথ অতিক্রম করে পৌঁছে যাবে। আল্লাহ না

করুন যদি পথ নির্দেশ ভুল হয়, তবে সকল কাজই ভুল হবে। মনে করুন আপনি সফরে গেলেন এবং দু-চার হাজার মাইল সফর করলেন কিন্তু পথ ভুল করলেন। এখন আপনি যতই সম্মুখে অগ্রসর হবেন, গন্তব্যস্থল হতে ততই দূরে সরে যেতে থাকবেন। সফরের জন্য প্রস্তুতিতে আপনি কোন ত্রুটি করেননি, যথেষ্ট টাকাপয়সাও ব্যয় করেছেন, পাথেয় সংগ্রহ করেছেন কিন্তু গন্তব্যস্থলের পরিবর্তে বিপরীত দিকে চলে গিয়েছেন। আপনি যাত্রী ছিলেন নাইরোবীর কিন্তু পথ ধরেছেন ফ্রান্সের, আর মনে মনে বিশ্বাস করে রেখেছেন যে, আমি নাইরোবী যাচ্ছি। যতই সম্মুখে অগ্রসর হবেন, নাইরোবী হতে সে অনুপাতে দূরে চলে যাবেন।

ইসলাম বলে, পথ চল, টাকাপয়সা ব্যয় কর, কিন্তু গন্তব্যস্থল নির্ধারণ করে নাও যে, আমাকে যেতে হবে আল্লাহ তাআলার দরবারে, আমাকে যেতে হবে পরকালে, যেতে হবে জান্নাতের ঠিকানায়। সঠিক দিক নির্ধারণ করে নাও তাহলে সমস্ত দুনিয়া দীন হয়ে যাবে। যদি আল্লাহর নিকট হতে দিক পরিবর্তন করে নাও, তবে এ সমস্ত জিনিসই তোমার জান ও প্রাণের জন্য মহাবিপদের কারণ হয়ে দাঁড়াবে, খায়র ও বরকতের প্রশ্নই তখন অবান্তর। ইসলামের কাজ হল পথ শুদ্ধ করে নেয়া এবং সীরাতুল মুস্তাকীম-এর উপর পরিচালিত হওয়া। আর এটাই হল ইবাদতের মূল বিষয়, যার জন্য মানব জাতিকে সৃষ্টি করা হয়েছে। বলা হয়েছে–

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ.

আমি মানব ও জিন জাতিকে এজন্য সৃষ্টি করেছি যে, তারা আমার ইবাদত ও দাসত্ব করবে। [যারিয়াত : ৫৬]

আর ইবাদতকে ব্যাপক অর্থবোধক করা হয়েছে। এজন্য আহার করা, পান করা, নিদ্রা যাওয়া, জাগ্রত হওয়া, সবকিছুই ইবাদতে পরিণত হবে। আর তা তখনই হবে, যখন আমাদের গন্তব্যস্থল সাব্যস্ত করা থাকবে। মুসলমানের উদ্দিষ্ট গন্তব্যস্থল হবেন আল্লাহ। এ অবস্থায় সে যে কাজই করুক না কেন তা আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছে যাবে। তার প্রতিটি কাজ খায়র ও বরকতের কারণ হবে।

কুরআন মাজিদে ইরশাদ হয়েছে–

مَا أُرِيْدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيْدُ أَنْ يُطْعِمُوْنِ○ إِنَّ اللهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُوالْقُوَّةِ الْمَتِيْنُ○

অর্থাৎ আমি এ কথা বলছি না– তোমরা আমাকে রিজিক দান কর, তোমরা আমাকে আহার করাও; আমি তো অভাবমুক্ত। রুজির জিম্মাদার হলেন আল্লাহ, তিনি মহান দাতা। আমি রুজি চাচ্ছিনা, তোমাদের বিনীত প্রার্থনা ও মুখাপেক্ষিতা কামনা করি। রুজি আমিই দান করব।

আল্লাহ ও বান্দার মধ্যে চুক্তি

একটি কাজ আল্লাহ তাআলা নিজ দায়িত্বে রেখেছেন এবং একটি কাজ বান্দার দায়িত্বে দিয়েছেন। তিনি এ দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন যে, আমি রিজিক দেব, মান-সম্মান দেব, তোমাদের দায়িত্ব হল তোমার ইবাদত করবে, আবেদন নিবেদন করবে। এখন যদি তোমরা নিজেদের কাজ ছেড়ে দাও তবে তিনিও তাঁর কাজ ছেড়ে দেবেন। এজন্য যে ব্যক্তি ইবাদতকে পরিত্যাগ করবে, তার রিজিক, মান-সম্মান, প্রভাব প্রতিপত্তি যা দেয়া হচ্ছিল তা বন্ধ করে দেয়া হবে।

আর যদি ঐ কাজে লেগে থাকেন যা আপনার দায়িত্বে রয়েছে, তখন তিনিও তাঁর দায়িত্ব পূর্ণ করে যাবেন; এ যেন একটি চুক্তি। যখন একপক্ষ চুক্তি ভঙ্গ করবে তখন অপর পক্ষের উপর চুক্তি রক্ষা করার দায় থাকে না।

আজ বিশ্বব্যাপী সকল মুসলমান বিপর্যস্ত, আমাদের প্রাধান্য শেষ হয়ে গিয়েছে; আমাদের প্রভাব, প্রতিপত্তি, ক্ষমতা শেষ হয়ে গিয়েছে। হিংসুক শত্রুগণ আমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে, এর কারণ কী? কারণ তো এই, আমরা আমাদের কাজ ও দায়িত্ব ত্যাগ করেছি। আল্লাহও তাঁর দায়িত্ব ত্যাগ করেছেন।

আল্লাহ তাআলা এজন্য দায়িত্ব ত্যাগ করেননি যে, তাঁর কোষাগারে ঘাটতি দেখা দিয়েছে, সম্পদের অভাব পড়েছে। না তা নয় বরং চুক্তি ছিল এই– তোমরা এ কাজ করবে, আমি ঐ কাজ করব। যখন তোমরা চুক্তি ভঙ্গ করবে তখন আমারও দায়িত্ব থাকবে না। এ হল আল্লাহ তআলার বিধান। আপনি আনুগত্যের চুক্তি ত্যাগ করেছেন; তিনিও রিজিক প্রদানের অঙ্গীকার ত্যাগ করেছেন। রিজিক শুধু ভাত ও রুটিকেই বলা হয় না বরং ভাত-রুটি, মান-সম্মান, প্রভাব-প্রতিপত্তি, ক্ষমতা, নিরাপত্তা, অন্তরে শান্তি-শৃংখলা সবই এর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। বর্তমানে আমরা দেখছি যে, আমরা সবাই পেরেশান, ভীত-সন্ত্রস্ত। খাদ্য আমাদেরকে খাচ্ছে আর আমরা খাদ্যকে খাচ্ছি। এ অবস্থা কেন? এজন্য যে, শান্তিদায়ক রিজিক আমাদের জন্য বন্ধ কর দেয়া হয়েছে; তা আমাদের থেকে ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে। আর এজন্য ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে যে, আমরা চুক্তি ভঙ্গ করেছি।

আমাদের এ চুক্তি ও অঙ্গীকার স্মরণ করিয়ে দেয়ার জন্য এ আয়াতগুলো তিলাওয়াত করেছি। এ আয়াতগুলো ঐ চুক্তি ও অঙ্গীকার সম্পর্কীয়। এখান থেকে আপনার জীবন শুরু হয়েছে অর্থাৎ 'আহদে আলাস্তু' হতে। আল্লাহ তাআলা বলেছিলেনঃ আমি কি তোমাদের প্রভু ও প্রতিপালক নই? তোমাদের রিজিক, রুজি, সম্মান প্রদানকারী নই? এসব জিনিসই 'রব'-এর মধ্যে রয়েছে। আল্লাহ তাআলা এ প্রশ্ন করলেন এবং সবাই উত্তর দিলেন 'নিশ্চয়ই আপনিই আমাদের রব, আমাদের প্রভু'। আপনিই আমাদের সবকিছু। তখন আল্লাহ বললেনঃ

شَهِدْنَا اَنْ تَقُوْلُوْا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هٰذَا غٰفِلِيْنَ○

তোমরাও সাক্ষী থেকো, কিয়ামতের দিন এমন কথা বল না যে, এ বিষয়টি আমাদের জানা ছিল না। [আরাফ : ১৭২]

অর্থাৎ তোমরা যেন বলতে না পার– আমাদেরকে তো এ কথা বলাই হয়নি যে, আমরা কার ইবাদত করব? কাকে রব বলে স্বীকার করব? এজন্য আমি জানিয়ে দিলাম, বুঝিয়ে দিলাম। কিয়ামতের দিন একথাও বলা না যে–

إِنَّمَا أَشْرَكَ اٰبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّنْ بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُوْنَ○

আমাদের পূর্ববর্তীগণ বহু পাপাচার করেছে, শিরক করেছে, আমরা তাদের পরবর্তী বংশধর ছিলাম, তাদের কারণে আমরা সঠিক কথা বুঝতে পারিনি। তাহলে কি সে কর্মের জন্য আমাদেরকে ধ্বংস করবেন, যা পথভ্রষ্টরা করেছে? [আরাফ : ১৭৩]

একজনের পাপের জন্য অন্যজনকে শাস্তি দেয়া হবে না। নিজ নিজ কৃতকর্মের শাস্তি ভোগ করবে। তোমরা এ কথা বল না– أَشْرَكَ اٰبَاؤُنَا 'আমাদের পিতামাতা শিরক ও মূর্তিপূজা করেছে'। আমরা তো পরবর্তীতে ছিলাম, আমাদেরকে কেন শাস্তি দেয়া হচ্ছে? উত্তরে আমি বলছি, মাতা-পিতার জন্য কাউকে গ্রেফতার করা হবে না। যেভাবে মাতা-পিতার নিকট হতে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলাম, তোমাদের থেকেও অঙ্গীকার গ্রহণ করছিলাম। প্রত্যেক ব্যক্তি হতে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলাম। তারা যদি অঙ্গীকার ভঙ্গ করে থাকে তবে তুমি কেন করলে? কিয়ামতের দিন এ ওজর গ্রহনযোগ্য হবে না যে, পূর্বর্তীদের পাপকর্ম

আমাদেরকে অন্ধকারে রেখেছিল, আমরা কিছুই জানা ছিল না, আমরা বেখবর ছিলাম।

সুতরাং আমাদের জীবন যাত্রা 'আহদে আলাস্ত' হতে সূচনা হয়েছে, যেখানে আল্লাহর রবুবিয়াত ও প্রভুত্বের স্বীকারোক্তি করেছিলাম। আল্লাহ তাআলা বলেছিলেন, আমি তোমাদের খালিক ও মালিক, আমাকে স্মরণ রেখ। এ অঙ্গীকারকে স্মরণ করিয়ে দেয়ার জন্য আম্বিয়ায়ে কেরাম আ. আগমন করেছেন, এই যে দৈনন্দিন ওয়াজ-নসিহত হচ্ছে সবই ঐ অঙ্গীকারকে স্মরণ কিরয়ে দেয়ার জন্য যে, তোমরা এ অঙ্গীকারকে ভুলে যেও না।

এ জন্যই বান্দা যতক্ষণ এ অঙ্গীকারের উপর অবিচল থাকবে এবং সে অনুযায়ী জীবনযাপন করবে, ততক্ষণ আল্লাহ তাআলারও স্বীয় অঙ্গীকার পূরণ করা জরুরী হয়ে পড়ে।

আয়াতের আলোকে এ কয়েকটি কথাই আমার আরয করার ছিল। সময় অনেক হয়েছে, আয়াতের প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যাও করা হয়েছে। এখন দুআ করুন, আল্লাহ আমাদের সকলকে উত্তম চরিত্র, ইবাদত, রিয়াযাত এবং আল্লাহর প্রতি মনোনিবেশ করার তাওফিক দান করুন এবং আমাদেরকে স্বীয় সন্তুষ্টি অনুযায়ী পরিচালিত করুন। আমীন!

وأخر دعوانا ان الحمد لله رب العٰلمين.



বয়ান : ১০

মৃত্যু দর্শন

মৃত্যু যেমন মহা ভয়ের জিনিস, যেমন মহাবিপদ; তদ্রূপ মহান নেয়ামত এবং আল্লাহর পক্ষ হতে মহা পুরস্কারও বটে। মৃত্যু প্রসঙ্গে শুধু একদিকেই দৃষ্টিপাত করা, শুধু হায় হায় করা উচিত নয়। বরং খুশিরও একটা দিক রয়েছে। এ হল মুমিনের জন্য উপহার, আল্লাহর সাথে মিলিত হওয়ার একমাত্র পথ। এ হল পৃথিবীকে আবাদ ও সমৃদ্ধ রাখার পথ, নতুন নতুন জ্ঞান-বিজ্ঞান সৃষ্টির পথ এবং নতুন নতুন সংস্কারক ও মুরব্বিদের আগমণের পথ। সুতরাং মৃত্যুর কেবল একটি দিকই নয় যে, একে শুধু ভয় করবে; বরং এতে খুশির দিকও রয়েছে। তাই এর জন্য অপেক্ষাও করা উচিত এবং তার আকাঙ্ক্ষাও অন্তরে থাকা উচিত।

– হযরত হাকীমুল ইসলাম রহ.





اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُه وَنَسْتَعِيْنُه وَنَسْتَغْفِرُه وَنُؤْمِنُ بِه وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّاٰتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَّهْدِه اللّٰهُ فَلاَ مُضِلَّ لَه، وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلا هَادِىَ لَه، وَنَشْهَدُ أَنْ لاَّ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَه لاَ شَرِيْكَ لَه، وَنَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَمَوْلاَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُه وَرَسُوْلُه، أَرْسَلَهُ اللّٰهُ إِلٰى كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا وَّدَاعِيًا إِلَيْهِ بِإِذْنِه وَسِرَاجًا مُّنِيْرًا.

أَمَّابَعْدُ:

فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ○ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ○ يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ ... إِلٰى قوله تعالى: هُمُ الْمُهْتَدُوْنَ○ البقرة : ١٥٣-١٥٧

বুযুর্গানে মুহতারাম!

এবার আমার মুলতানে আগমনের উদ্দেশ্য কোন সভা সমাবেশ ছিল না। আলোচনা ও ওয়াজ-নসিহতের কোন খেয়ালও মনে ছিল না। এবার এখানে উপস্থিতির উদ্দেশ্য হল হযরত মাওলানা খায়র মুহাম্মাদ সাহেব রহ. (প্রতিষ্ঠাতা, খায়রুল মাদারিস, মুলতান)-এর ওফাতের পর এখানে আমার এই প্রথম আগমন। যাতে তার শোকসন্তপ্তদের প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করতে পারি। সমবেদনা প্রকাশের জন্য সভা ও জনসমাগম হয় না। প্রথমেই যদি আমি অবগত হতাম যে, সভার ঘোষণা করা হয়েছে তবে আমি বাধা দিতাম এবং আমার এ আশও ছিল যে, হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ শরীফ সাহেব (মুহতামিম খায়রুল মাদারিস ও সাহেবজাদা হযরত মাওলানা খায়র মুহাম্মাদ রহ.) আমার

কথা মেনেও নিতেন। কিন্তু এখানে এসে হঠাৎ জানতে পারলাম যে, একটি সভারও আয়োজন করা হয়েছে। সভা ও বক্তৃতার জন্য মনে আনন্দ থাকা প্রয়োজন, মানসিক অবস্থা ফুরফুরে থাকা প্রয়োজন। কিন্তু আমি এখন হাজির হয়েছি মৃতপ্রায় শোকাভিভূত হৃদয় নিয়ে। মাওলানার বিরহ বেদনা পূর্ব থেকেই অন্তরেই ছিল, এখানে এসে তা তীব্রভাবে অনুভূত হচ্ছে; অথচ তাঁর ওফাতের পর অনেক দিন অতিবাহিত হয়ে গিয়েছে। তাঁর সাথে আমার সম্পর্ক অনেক গভীর ছিল। দীর্ঘদিন যাবত তাঁর সাথে প্রাণের সম্পর্ক ছিল। মাওলানা মরহুম যখন জালন্ধরে বসবাস করছিলেন তখন পাঞ্জাবে যখনই আমার কোন সফর হয়েছে তখনই দু'জায়গায় আমাকে অবশ্যই হাজির হতে হত। জালন্ধরে মাওলানা মরহুমের কারণে এবং অমৃতসরে মাওলানা মুফতি মুহাম্মাদ হাসান সাহেব মরহুমের কারণে। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর মাওলানা মরহুম মুলতানে স্থায়ী হন। তাঁর জীবদ্দশায়ও এখানে আমি দু'একবার উপস্থিত হয়েছি। এবার তাঁর ওফাতের পর আমার প্রথম উপস্থিতি। এখন ঐসব সম্পর্কের কথা স্মৃতিতে ভেসে উঠেছে। অতীতের ইতিহাসগুলো স্মরণ হচ্ছে। এ কারণে অন্তরে এক দুঃখের বোঝা অনুভূত হচ্ছে। এ বোঝা নিয়ে আমি কী ওয়াজ করব আর কী করে সভার হক আদায় করব? অধিকন্তু আমারও এখন বার্ধক্যজনিত দুর্বলতা রয়েছে, ঐ শক্তি এখন আর নেই যা পূর্বে ছিল; আবেগ ও উৎসাহ শীতল হয়ে গিয়েছে। এমতাবস্থায় ওয়াজ করলে তা কেমন হবে?

যাই হোক, যখন একটি সমাবেশ হয়ে গিয়েছে এবং আপনারাও সমবেত হয়েছেন, তখন এর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করাও কর্তব্য। সেমতে কিছু না কিছু আলোচনা করা উচিত। এজন্য শোকাভিভূত হৃদয়ের সমবেদনারমূলক আলোচনা হবে। বিশেষ কোন ওয়াজ ও নসীহত এতে থাকবে না।

বিশ্বের স্থায়িত্ব আধ্যাত্মিকতার স্থায়িত্বের দ্বারা সম্ভব

প্রকৃত কথা হল এই যে, মাওলানা মরহুমের সত্তা ছিল এক চুম্বকীয় সত্তা। যা সকল হৃদয় ও আত্মাকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করত। তাঁর ওফাত যেন প্রসিদ্ধ প্রবাদের অনুরূপ: موتُ العَالِم موت العَالَم 'আলেমের মৃত্যু প্রকৃতপক্ষে বিশ্বের মৃত্যু।' এজন্য যে, আলেমের দ্বারা হায়াত ও জীবনী শক্তি বিস্তার লাভ করে। সে হায়াত এ হায়াত নয় যা পানাহার দ্বারা হয়ে থাকে। সে হায়াত হল রূহানী ও আধ্যাত্মিক হায়াত। আর ঐ হায়াতই হল প্রকৃত হায়াত এবং ঐ রূহ-ই হল প্রকৃত রূহ। এজন্যই আল্লাহ তাআলা কুরআনকে নিজের রূহ বলেছেন। ঐ রূহ দ্বারাই জাতি জীবিত থাকে এবং তা বেরিয়ে গেলে মৃত্যু ছায়া আচ্ছন্ন করে নেয়।

কুরআনের এক স্থানে আল্লাহ বলেছেন–

وَكَذٰلِكَ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ رُوْحًا مِّنْ اَمْرِنَا.

হে নবী! আমি আপনার নিকট ওহী অবতীর্ণ করেছি অর্থাৎ আমার রূহকে আপনার মধ্যে সঞ্চার করে দিয়েছি। [শুরা : ৫২]

এই 'রূহ'ই হল বিশ্বের রূহ। আর তা হল আল্লাহর কিতাব কুরআন মাজিদ। একে রূহ বলা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে কুরআনই হল সমস্ত বিশ্বের জীবনী শক্তি। এ রূহটি যদি ব্যক্তি হতে বেরিয়ে যায় তবে ব্যক্তি মরে যাবে; সমস্ত বিশ্ব থেকে যদি বেরিয়ে যায় তবে সম্পূর্ণ বিশ্বও মৃত্যুমুখে পতিত হবে।

হাদীসে ইরশাদ হয়েছে–

لا تقوم الساعة حتى يقال فى الأرض الله الله

ঐ সময় পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবে না, যে পর্যন্ত এ বিশ্বে একজন মানুষ 'আল্লাহ আল্লাহ' বলতে থাকবে'। যখন একজনও থাকবে না তখন কিয়ামত সংঘটিত হয়ে যাবে। আর কিয়ামত হল এ বিশ্বের মৃত্যু। এ হাদীস দ্বারা স্পষ্ট হয়ে গেল যে, এ বিশ্বের জীবন ও রূহ হল 'আল্লাহ আল্লাহ'। যখন এ রূহ বেরিয়ে যাবে তখন এ বিশ্ব হয়ে যাবে মৃত; ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে, খণ্ডবিখণ্ড হয়ে যাবে তার সবকিছু। আসমান জমিন চুরমার হয়ে যাবে, বিশ্বের নিয়ম শৃঙ্খলা হবে বিপর্যস্ত-বিক্ষিপ্ত। মোটকথা, বিশ্বের রূহ ও জীবন হল আল্লাহ তাআলার যিকির। শুধু বিশ্বেরই নয় বরং তার প্রতিটি অণু-পরমাণুরও প্রাণ।

প্রতিটি বস্তু তাসবীহ পাঠ করছে

হাদীসে বলা হয়েছে, বৃক্ষের প্রতিটি শাখা-প্রশাখা আল্লাহর তাসবীহ পাঠ করে। তাসবীহ বন্ধ হয়ে গেলে হলুদ রং তাকে আচ্ছন্ন করে নেয়। এ হল তার মৃত্যুকাল। রূহ বেরিয়ে গেছে এবং মৃত্যু তাকে আচ্ছন্ন করে নিয়েছে।

হাদীসে বলা হয়েছে, প্রবাহমান পানিও আল্লাহর তাসবীহ পাঠ করে, তাসবীহ পাঠ বন্ধ হয়ে গেলে সে স্থির হয়ে যায়, নষ্ট ও দুর্গন্ধযুক্ত হয়ে যায়। এ হল তার মৃত্যুর সময়। সুতরাং পানির জীবনও তাসবীহ ও তাহলীলের মধ্যে রয়েছে।

হাদীস শরীফে ইরশাদ করা হয়েছে, ইমামের জন্য এমন কাপড় পরিধান করে ইমামতি করা মাকরূহ তাহরিমী, যে কাপড় ঘাম লেগে হলুদ রং ধারণ করেছে, কাপড় থেকে ঘামের দুর্গন্ধ নির্গত হচ্ছে। ফকীহগণ লিখেছেন। এর বাহ্যিক কারণ হল এই, কাপড় যখন দুর্গন্ধযুক্ত হবে, তখন মুক্তাদিগণ ইকতেদা করতে

অপছন্দ করবে, তাদের মনে আগ্রহ থাকবে না। আল্লাহ ও বান্দার মধ্যে আর সম্পর্ক বিদ্যমান থাকবে না। এজন্য ফকীহগণ লিখেছেন, ইমামের জন্য পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পোশাক পরিধান করা কর্তব্য। এত অপরিষ্কার যেন না হয় যে, দুর্গন্ধ বের হয়, রং বদলে যায়। বাহ্যিক কারণ তো এই যে, দুর্গন্ধ দ্বারা মুক্তাদীর কষ্ট হয়। তারা লজ্জানুভব করে। কিন্তু প্রকৃত কারণ হল এই, কাপড় ময়লাযুক্ত হয়ে পড়লে সে কাপড়ের তাসবীহ পাঠ বন্ধ হয়ে যায়, আল্লাহর যিকির থেমে যায়। তখন কাপড়ও শেষ হয়ে যায়। তো প্রকৃতপক্ষে সমস্ত বিশ্বের প্রাণ হল আল্লাহ তাআলার যিকির। যিকির জারি, তো বিশ্বও স্বগৌরবে বিদ্যমান। যিকির থাকবে না বিশ্বও থাকবে না। বিশ্বের অংশগুলোও নিঃশেষ হয়ে যাবে। বিশ্বের প্রত্যেকটি জিনিস আল্লাহ তাআলার তাসবীহ পাঠে মশগুল রয়েছে। কুরআনে ইরশাদ করা হয়েছে– 'পৃথিবীতে এমন কোন বস্তু নেই, যা আল্লাহ তাআলার সপ্রশংস তাসবীহ পাঠ করে না। কিন্তু তোমরা তাদের ভাষা বুঝতে সক্ষম নও অথবা তাদের আওয়াজ শুনতে পাও না।' [বনী ইসরাইল : ৪৪]

আমরা তো শুনি হাতি আওয়াজ করছে, প্রকৃতপক্ষে সে আল্লাহ তাআলার তাসবীহ পাঠ করছে। আমরা শুনি বাঘ গর্জন কছে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে আল্লাহর তাসবীহ পাঠ করছে। পক্ষীকুল শিস বাজাচ্ছে, আমরা দেখছি কিচিরমিচির ও চেঁচামেচি করছে; প্রকৃতপক্ষে তারা নিজস্ব ভাষায় তাসবীহ পাঠ করছে।

ہر یکے را اصطلاحے دادہ ایم

প্রত্যেককে দিয়েছি নিজস্ব পরিভাষা।

সুতরাং প্রত্যেককে আল্লাহ তাআলা ভাষা দিয়েছেন, তারা তাদের ভাষায় আল্লাহ তাআলার হামদ, সানা ও তাসবীহ-তাহলীলে ব্যস্ত রয়েছে। আমরা তাদের ভাষা বুঝতে পারি না। আমরা যদি তাদের ভাষা বুঝতে না পারি তাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। আমরা আমাদের ভাই-বন্ধুদের সব ভাষা কি বুঝতে পারি? যদি কোন পশুভাষী পশু ভাষায় আল্লাহকে ডাকে, দুআ ও মুনাজাত করে তখন আমরা কী করব? বসে বসে দেখতে থাকব; কিন্তু বুঝব না কিছুই। পাঞ্জাবী ভাষায় যদি আপনি বলেন, তবে আমি কিছুই বুঝব না। কেউ যদি ইংরেজি ভাষায় আল্লাহকে ডাকে তবে আমরা কী বুঝব? পৃথিবীতে এক মানব জাতির মধ্যে হাজারো ভাষা প্রচলিত রয়েছে। আমরা আমাদের ভাই বন্ধুদের ভাষাই জানি না। কাজেই যদি পক্ষিকুলের ভাষা না জানি, না বুঝি তবে এতে আশ্চর্যের কী আছে? প্রত্যেকের পৃথক পৃথক তাসবীহ রয়েছে। নিজ নিজ ভাষায় তারা আল্লাহকে ডাকছে। আপনি যদি না বোঝেন তবে এতে কোন অসুবিধা হবে না। তাই বলা হয়েছে–

وَلٰكِنْ لاَّ تَفْقَهُوْنَ تَسْبِيْحَهُمْ.

কিন্তু তোমরা তাদের তাসবীহ্ পাঠকে বুঝতে পার না।

তবে মুজিযা হিসেবে আল্লাহ তাআলা কাউকে কাউকে এ ভাষা বোঝার ক্ষমতা দিয়েছিলেন। যেমন হযরত সুলায়মান আ. পশুপাখি ও অন্যান্য জীবজন্তুর কথা বুঝতেন। মুজিযা হিসেবে আগত এসব আওয়াজ কখনো কখনো আমাদের কানেও আসতে পারে।

যেমন হাদীসে বলা হয়েছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক মুষ্টি কঙ্কর হাতে নিলেন, তখন কঙ্করগুলো হতে সশব্দে 'সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ' আওয়াজ আসছিল। সাহাবীগণ রা. এ আওয়াজ শুনছিলেন। হুজুর কঙ্করগুলো হযরত আবু বকর রা.-এর হাতে দিয়ে দিলেন, তখনও তাসবীহ জারি ছিল। তিনি হযরত উমর ফারুক রা.-এর হাতে দিয়ে দিলেন, তখনও তাসবীহ জারি ছিল। এভাবে অন্যান্য সাহাবীর হাতে যেতে থাকল এবং ক্রমান্বয়ে আওয়াজ বন্ধ হয়ে গেল। তাসবীহ হয়ত জারিই ছিল কিন্তু আওয়াজ শ্রুত হয়নি। মুজিযা হিসেবে আমরাও শুনতে পারি। পক্ষিদের আওয়াজ তো এ কান দ্বারাই শুনি, কঙ্করের আওয়াজও অলৌকিকভাবে শুনতে পারি যখন আল্লাহ তাআলা কোন নবীর মাধ্যমে কোন মুজিযা প্রকাশ করতে চান।

ফেরেশতাগণসহ পৃথিবীর সকল জীব ও জড় পদার্থ আল্লাহ তাআলার তাসবীহ পাঠ ও ইবাদত করে। তবে ইবাদতের মধ্যে সর্বোত্তম আনুগত্য ও বন্দেগী একমাত্র নামাযের মাধ্যমে প্রকাশ পায়। মানুষের জন্য নামায ব্যতীত আল্লাহর সাথে সম্পর্ক স্থাপন করা সম্ভব নয়। *

নামায ব্যতীত আল্লাহর সাথে সম্পর্ক স্থাপন সম্ভব নয়

আল্লাহর সাথে বান্দার প্রকৃত সম্পর্ক স্থাপন নামায ব্যতীত সম্ভব নয়। আপনি যাকাত দিলে 'তায়ালুক মায়াল্লাহ' (মাখলুকের সাথে সম্পর্ক স্থাপন)-এর দায়িত্ব আদায় হয়ে যাবে। দরিদ্রদের সহায়তা হবে, তারা আপনার প্রতি কৃতজ্ঞ হবে। এভাবে সম্পর্ক স্থাপিত হবে। আদেশ পালনের কারণে আল্লাহর সাথেও সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হবে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা হল মাখলুকের সাথে সম্পর্ক স্থাপন।

---

* ইবাদতের স্বরূপ ও নামাযের শ্রেষ্ঠত্ব বিষয়ক পরবর্তী কিছু অংশের আলোচনা অত্র গ্রন্থের 'বয়ান : ৪'-এ 'সৃষ্টিজগতের নমুনা হওয়ার কারণে মানুষের করণীয়' শিরোনামে আলোচিত হয়েছে বিধায় পুনরায় তা পত্রস্থ করা হল না। –অনুবাদক

এজন্যই 'তায়াল্লুক মায়াল্লাহ' তথা আল্লাহর সাথে সম্পর্ক স্থাপন নামায ব্যতীত হতে পারে না। যদি নামাযে ত্রুটি থাকে তবে তার অর্থ হবে এই যে, এ ব্যক্তির সাথে আল্লাহ তাআলার সম্পর্ক স্থাপিত হয়নি। এ কারণেই যদি নামাযে অন্য চিন্তাভাবনা করে, এদিক-সেদিক দেখতে থাকে তবে আল্লাহ তাআলা বলেন, আমার হয়ে অন্যের দিকে মনোযোগ করছ, তোমার লজ্জা করে না? বান্দা যদি তখন সতর্ক হয়ে যায় তাহলে পুনরায় সম্পর্ক স্থাপিত হয়। আর যদি সতর্ক না হয় তবে আল্লাহ তাআলাও তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন, তাওয়াজ্জুহ সরিয়ে নেন। তখন নামায আর নামায থাকে না, শুধু ওঠা আর বসা থেকে যায়। তাই প্রকৃতপক্ষে নামাযের মাধ্যমেই সম্পর্ক স্থাপিত হয়।

নামাযের মাধ্যমে আল্লাহর দীদারের যোগ্যতা লাভ

নামাযের মাধ্যমেই আল্লাহর সাথে সম্পর্ক স্থাপিত হয় বিধায় হাদীসে সকল নামায সম্পর্কে, বিশেষ করে আসর এবং ফজরের নামায সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, এ উভয় নামায দ্বারা আল্লাহ তাআলার দীদার লাভের যোগ্যতা সৃষ্টি হয়। নামাযের মাধ্যমেই আল্লাহকে দেখার যোগ্যতা বান্দার মধ্যে তৈরি হয়। জীবনভর নামায পড়তে থাকলে প্রথম অবস্থায় আল্লাহকে দেখবে বিশ্বাসের চোখ দিয়ে, তারপর দেখবে কাশফের চোখ দিয়ে, তারপর এক সময় আসবে পরকাল, তখন এই চর্মচক্ষু দিয়ে দেখবে। সুতরাং ইবাদত দ্বারা প্রকৃত উদ্দেশ্য হল মবুদকে দেখা এবং তাঁর নৈকট্য হাসিল করা। আর তা কেবল নামায দ্বারাই সম্ভব। সুতরাং নামাযই হল প্রকৃত ইবাদত।

আল্লাহর রূহ প্রত্যেক জিনিসে বিদ্যমান

আমি আরয করছিলাম যে, আল্লাহ তাআলা কুরআন মাজিদকে নিজের রূহ বলেছেন। সে রূহের ভেতর ইবাদতও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর আদেশ পালন করাই হল তার রূহ। আল্লাহ তাআলা বান্দার ভিতর কুরআনের রূহ ঢেলে দিয়েছেন যাতে তার মধ্যে বন্দেগী করার যোগ্যতা সৃষ্টি হয়ে যায় এবং আল্লাহর মাবুদ হওয়া প্রকাশ লাভ করে। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে–

وَكَذٰلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوْحًا مِّنْ أَمْرِنَا.

হে নবী! 'আলমে আমরের' (যেখান থেকে আল্লাহর প্রত্যক্ষ আদেশ জারি হয়) রূহ আমি আপনার অন্তরে ঢেলে দিয়েছি। [শুরা : ৫২]

আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জুতার তোফায়েলে সে রূহ আমাদের পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছে। আমাদের মধ্যেও সেই রূহ রয়েছে। আমরা

যদি এ রূহকে আমাদের মধ্যে রাখি তবেই আমরা শক্তিশালী থাকব। সবল থাকা হল এ রূহের অবস্থানের লক্ষণ, আর দুর্বল হয়ে যাওয়া হল এ রূহ বের হয়ে যাওয়ার লক্ষণ।

মুসলিম জাতির সকল পেরেশানীর সমাধান

মুসলমানগণ অভিযোগ করেন যে, অমুক জাতি আমাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছে, অমুক জাতি তাদের প্রতারণা দ্বারা আমাদেরকে পেরেশান করে তুলেছে। আমাদের বিষয় সম্পত্তি শেষ করে দিয়েছে। আমাদের জান ও মাল খতম করে দিয়েছে। আমি বলি, এ অভিযোগ একান্তই ভুল। অভিযোগ তো করবে কাফের মুশিরিকগণ যে, তোমাদের অপকর্মের কারণে আমরাও নষ্ট হয়ে যাচ্ছি। তোমরা যদি সঠিকভাবে তোমাদের দীনের উপর কায়েম থাকতে, তবে আমরা তোমাদের অধীন হতাম, তোমাদের অনুসরণ করতাম। কিন্তু তোমরা যখন নিজেদের সঠিক পথে নেই, তখন আমাদের নিকট থেকে কী করে আশা কর যে, আমরা তোমাদের বাধ্য হব বা অনুসরণ করব?

সুতরাং প্রকৃতপক্ষে অভিযোগ হল মুসলমানদের বিরুদ্ধে, অন্যান্য জাতির বিরুদ্ধে অভিযোগ করার অধিকার মুসলমানদের নেই। পৃথিবীর বিভিন্ন জাতি-সম্প্রদায়ের সংশোধনের জন্য মুসলমানদের আগমন হয়েছিল। তাদেরকে বিশ্ব সম্প্রদায়ের নেতা মনোনীত করা হয়েছিল। ইমামেরই যদি অযু না থাকে তবে কি মুক্তাদিগণের নামায শুদ্ধ হবে? যখন ইমামেরই অযু ভঙ্গ হয়ে গিয়েছে, জাহের ও বাতেনে অপবিত্রতা দেখা দিয়েছে, তখন অন্যান্য জাতি কেন তাদের অনুকরণ করবে এবং কিভাবে তাদের আনুগত্য করবে? কারণ, যে শক্তির কারণে তারা প্রবল ছিল সে শক্তিকে তারা ধ্বংস করে দিয়েছে। ঐ রূহটি বাতাসের ন্যায় তাদের ভিতর ছিল। যে পর্যন্ত ঐ রূহ থাকবে, মুসলমানগণ প্রবল ও শক্তিশালী থাকবে। আর যখন বের হয়ে যাবে, তখন মুসলমান হয়ে পড়বে দুর্বল। আপনারা ফুটবল দেখে থাকবেন, এর ভিতর বাতাস ভর্তি থাকে, আপনি যদি একে সজোরে মাটির উপর নিক্ষেপ করেন তবে ধাক্কা খেয়ে দশগজ উপরে উঠে যায়, কারণ তার ভেতরে বাতাস ভর্তি রয়েছে। যদি এর মধ্যে সুঁই ঢুকিয়ে দেয়া হয় তবে বাতাস বেরিয়ে যাবে, তখন যেখানে নিক্ষেপ করবেন সেখানেই পড়ে থাকবে। আপনি তাকে পদদলিত করবেন, সে ওঠার নাম পর্যন্ত করবে না। কারণ, তার রূহ বেরিয়ে গিয়েছে।

ইসলামী রূহ বেরিয়ে যাওয়ার ফল

মুসলমানদের রূহ হল কুরআন। তাদের দাবিয়ে রাখার শক্তি-সামর্থ্য কোন জাতির নেই। দাবিয়ে রাখার চেষ্টা করবে, নিচে নিক্ষেপ করতে চাইবে, কিন্তু তারা দশগজ উর্ধ্বে উঠে যাবে এবং উর্ধ্বগামীই হতে থাকবে। الحق يعلو ولا يعلى (সত্য সমুন্নত ও বিজয়ী হয়, অধঃপতিত ও পরাজিত হয় না)। কিন্তু যদি এ রূহ না থাকে, তবে যেখানেই নিক্ষিপ্ত হবে সেখানেই পড়ে থাকবে। আজ বিশ্বে মুসলমানগণ লাঞ্ছিত পদদলিত হচ্ছে, তা এজন্য নয় যে, কাফেরদের মধ্যে জীবনী শক্তি রয়েছে বরং এজন্য যে, তোমরা নির্জীব হয়ে পড়েছে। যে রূহ ছিল তা বেরিয়ে গিয়েছে। রূহ বেরিয়ে যাওয়ার পর মানুষ লাশে পরিণত হয়। লাশের জন্য মানুষের প্রথম কর্তব্য হল একে পুতে ফেলা, জ্বালিয়ে দেয়া বা দাফন করে দেয়া। (মোটকথা, চোখের অন্তরালে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে সবাই একমত। এ বিশ্বে এখন তার কোন স্থান নেই)। তাকে ঘরেও রাখে না, বাইরেও রাখে না। একে রেখে দিলে পৃথিবীর পরিবেশ খারাপ হবে যাবে। এজন্য সর্বপ্রথম কাজ এই করা হয় যে, লাশকে দাফন করা হয়, কেউ জ্বালিয়ে দেয়, কেউ আবার পানিতে ডুবিয়ে দেয়। এসব কাজকে কেউ খারাপ মনে করে না। কিন্তু যদি জীবিত মানুষকে জ্বালিয়ে দেয়া হয় তবে সরকারই দাবি তুলবে যে, একে ফাঁসি দাও, সমগ্র জাতি দাবি করবে যে, এ লোক পাপী, অপরাধী। রূহ বিদ্যমান থাকাকালীন কারো ক্ষমতা নেই তাকে দাফন করে দেয়ার। কেউ করলে সে দোষী সাব্যস্ত হবে। কিন্তু রূহ বেরিয়ে যাওয়ার পর যে কেউ দাফন করে দিতে পারে, জ্বালিয়ে দিতে পারে। সুতরাং মুসলমানদের এ অভিযোগ করা যে, অমুক জাতি আমাদেরকে জ্বালিয়ে দিচ্ছে, অমুক জাতি আমাদেরকে অপদস্থ করেছে– আমি বলি এ কথা ভুল। মুসলামান নিজেকে নিজে অপদস্থ করেছে। যখন রূহ বের করে দিয়েছে, জীবন শেষ হয়ে গিয়েছে। জীবিত মানুষকে কেউ জ্বালিয়ে দিতে পারে না।

বিশ্বের রূহ আল্লাহ তাআলার যিকির

আমি আরয করছিলাম যে, প্রকৃত অর্থে আল্লাহ তাআলা দীনি রূহ মুসলমানদের মধ্যে বিস্তার করেছেন। আর তা হল পবিত্র কুরআন।

وَكَذٰلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوْحًا مِّنْ أَمْرِنَا.

সুতরাং প্রকৃতপক্ষে এ বিশ্বের রূহ হল আল্লাহ তাআলার যিকির। যখন এ রূহ বেরিয়ে যাবে তখন বিশ্ব হয়ে পড়বে লাশের মত। আর লাশের পরিণতি হল

ফুলে-ফেঁপে ওঠা, পঁচে-গলে যাওয়া ও চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাওয়া। কিয়ামতের দিন প্রতিটি বস্তুর ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশও চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাবে। এটা হবে বিশ্বের মৃত্যু। আর তা এ জন্য হবে যে, রূহ বেরিয়ে যাবে।

রূহের বাহ্যিক কেন্দ্র

এ রূহের সর্ববৃহৎ বাহ্যিক কেন্দ্র হল বাইতুল্লাহ শরীফ, যার দ্বারা বিশ্ব সচল রয়েছে। এখানেই আল্লাহ তাআলার তাজাল্লি বিদ্যমান রয়েছে। এর সামনেই আমরা ঝুঁকে যাই– সিজদা করি। এখান থকেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর তোফায়েলে আনওয়ার ও বারাকাত বিস্তার লাভ করে বিশ্বের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। এ বাইতুল্লাহ শরীফ হল রূহের বাহ্যিক কেন্দ্র। যখন কিয়ামত নিকটবর্তী হয়ে পড়বে, বিশ্ব-রূহের প্রস্থানে সময় আসন্ন হয়ে পড়বে। হাদীসে বলা হয়েছে একটি হাবশী কৃতদাস বাইতুল্লাহকে ভেঙ্গে চূর্ণবিচূর্ণ করে দিবে। প্রতিটি পাথরকে বিচ্ছিন্ন করে দিবে। সর্বপ্রথম বাইতুল্লাহ শেষ হবে, তারপর বিশ্বের উপর সংঘটিত হবে কিয়ামত।

এর উদাহরণ হল এমন, যেমন বাদশার সেনাবাহিনী যখন কোথাও গমন করে তখন গন্তব্যস্থলে গিয়ে সর্বপ্রথম নির্মাণ করা হয় বাদশাহর তাঁবু। যেন বাদশাহ এখানে অবস্থান করতে পারেন। তাঁর চারপাশে উজির-নাজির, মন্ত্রীবর্গের তাঁবু তৈরি করা হয়। যখন বাদশাহ পদার্পণ করেন এখানে তখন এ স্থানটি রূপ ধারণ করে বিরাট শহর ও নগরীর। কিন্তু যখন এখান থেকে ক্যাম্প প্রত্যাহার করা হয়, সৈন্যবাহিনী সরিয়ে নেয়া হয় অন্যত্র, ক্যাম্প ভেঙ্গে ফেলা হয়, ভাঙার সময় সর্বপ্রথম বাদশাহর ক্যাম্পকে ভাঙ্গা হয়, তারপর অন্যান্য উজির-নাজির ও মন্ত্রীবর্গের তাঁবু ভাঙা হয়। তারপর ময়দান পড়ে থাকে জনমানবশূন্য অবস্থায়। এখানেও ঠিক ঐ অবস্থা– আল্লাহ তাআলার তাঁবু (বাইতুল্লাহ) যেখানে তাঁর তাজাল্লী হতে থাকে সদাসর্বাদা, বিশ্বে সর্বপ্রথম একেই স্থাপন করা হয়েছিল। কুরআনে বলা হয়েছে–

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُّضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِىْ بِبَكَّةَ مُبٰرَكًا وَّ هُدًى لِّلْعٰلَمِيْنَ○

সর্বপ্রথম ঘর যা আল্লাহ তাআলা ইবাদতের জন্য নির্মাণ করেছেন তা হল ঐ পবিত্র ঘর যা মক্কা শহরে অবস্থিত, তার নাম হল পবিত্র কাবা শরীফ। [আলে ইমরান : ৯৬]

এ যেন বাদশাহী তাঁবু, যখন বিশ্বকে সৃষ্টি ও আবাদ করার ইচ্ছা হল তখন সর্বপ্রথম এই শাহী তাঁবু স্থাপন করা হল। আর যখন এ বিশ্বকে সমূলে উচ্ছেদ করা হবে, বিশ্ব তার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করবে, তখনও সর্বপ্রথম শাহী তাঁবু উচ্ছেদ করা হবে। যখন একজন হাবশী ক্রীতদাস বাইতুল্লাহর ইট পাথরগুলো এক একটি করে খসিয়ে ফেলবে, আল্লাহর তাজাল্লীও একে পরিত্যাগ করবে। তারপর বিশ্বের সকল মসজিদগুলো ধ্বংস হবে। সকল ওলীআল্লাহদের ইবাদতখানা, যিকিরখানা ধ্বংস হবে, ক্রমান্বয়ে সমস্ত পৃথিবী বিরান হয়ে যাবে। তাই বলছি সর্বপ্রথম স্থাপন করা হয় শাহী তাঁবু এবং এ তাঁবু হল ক্যাম্পের সর্বপ্রথম বস্তু আর উচ্ছেদ যখন করা হয় তখনও সর্বপ্রথম শাহী তাঁবু উচ্ছেদ করা হয়। এভাবে বিশ্বে সর্বপ্রথম যে জিনিসটি স্থাপন করা হয়েছে, তা হল বইতুল্লাহ শরীফ এবং কিয়ামতের প্রাক্কালে সর্বপ্রথম যে বস্তুটিকে ধ্বংস করা হবে তাও হল ঐ বাইতুল্লাহ শরীফ। মোটকথা, বিশ্বের রূহ ও জীবনী শক্তি হল আল্লাহ তাআলার যিকির যার কারণে এ বিশ্ব বিদ্যমান রয়েছে এবং এই রূহ ও জীবনী শক্তি দ্বারা বিশ্ব টিকে রয়েছে।

মৃত্যু-দর্শন ও উলামায়ে রব্বানীর শান

প্রকৃতপক্ষে মৃত্যু হল আল্লাহ তাআলার যিকির বন্ধ হয়ে যাওয়ার নাম। এ যিকির বন্ধ না হলে মানুষের মৃত্যু হয় না। এজন্যই হাদীসে বলা হয়েছে–

مثل الذاكر فى الغافلين كمثل الحى فى الأموات.

গাফেলদের মধ্যে আল্লাহ তাআলার যিকিরকারী যেন মৃতদের মধ্যে জীবিত ব্যক্তি।

সে গাফেলদের অন্তর্ভুক্ত নয় বিধায় সে মৃতদের মধ্যে জীবিত ব্যক্তির।

উলামায়ে রব্বনীর অবস্থা এরূপ বর্ণনা করা হয়েছে যে, তাদের রূহ, মস্তিষ্ক, আত্মা সর্বদা আল্লাহ তাআলার স্মরণে নিয়োজিত থাকে। এ হল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রভাব এবং তাঁরই দয়া। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে বলা হয়েছে–

كان يذكر الله على كل إحيانه.

সর্বক্ষণ আল্লাহ তাআলার যিকিরে তিনি ব্যস্ত থাকতেন। একটি মুহূর্তও আল্লাহর যিকির হতে অবসর থাকতেন না।

যবান দ্বারা যিকির করতেন; কলব দ্বারা যিকির করতেন– যাকে ফিকর বলা হয়; রূহ দ্বারা যিকির করতেন– যাকে তাওয়াজ্জুহ বলা হয়, মারেফাত বলা হয়। মোটকথা, কোন না কোনভাবে যিকির-এ ব্যস্ত থেকেছেন। যখন কোন আলেমে রব্বানী দুনিয়া হতে বিদায় নেন, যার সম্পর্কে বলা হয়েছে– موت العالِم كموت العالَم (আলেমের মৃত্যু যেন জগতের মৃত্যু)। তো এমন আলেমের তিরোধান যেন পুরো জগতের তিরোধান। কেননা রূহ বেরিয়ে যাওয়ার দ্বারা সম্পূর্ণ বিশ্বে বিচ্ছেদ বেদনা ছড়িয়ে পড়ে। আমি প্রথমে আরয করেছিলাম হযরত মাওলানা খায়র মুহাম্মাদ রহ.-এর নামে যেমন খায়র রয়েছে, তেমনই তাঁর ব্যক্তিত্বের মধ্যে আল্লাহ তাআলা খায়র ও বরকত রেখেছিলেন। বাস্তবিকই তিনি সর্বময় খায়র-এর অধিকারী ছিলেন। হাদীস শিক্ষা করা ও শিক্ষা দান, কুরআন পাকের তালিম, তাবলীগ, ওয়াজ নসীহত, নিজ উত্তরসূরীদের তারবিয়াত ও চরিত্র গঠন ইত্যাদি কাজে ব্যস্ত থাকতেন সদা-সর্বদা। মোটকথা আল্লাহ তাআলার যিকিরই ছিল তাঁর কাজ, তা যেভাবেই হোক।

এমন আলেমে রব্বানীর বিদায়, বিশ্বের মৃত্যুর এবং মৃত্যুর আলামতের প্রতি নিশ্চিত ইঙ্গিত। যখন কোন আলেমে রব্বানীর ইন্তেকাল হয় তখন মানুষের অন্তর এক ধরনের অন্ধকাচ্ছন্নতা অনুভব করে, পুরো জগতে রূহানিয়াতের কমতি অনুভব কর। প্রত্যেকে তা অনুভব করতে পারে না, আহলে দীন যারা, তারাই অনুভব করতে পারেন যে, নূর ও জ্যোতিতে কী পরিমান স্বল্পতা দেখা দিয়েছে। এজন্য বলা হয়: الموت فزع الأكبر 'মৃত্যু হল সর্বাধিক আতঙ্ক সৃষ্টিকারী বিষয়'। কিন্তু এর সাথে আমি এ কথাও আরয করতে চাই যে, মৃত্যু যেমন আতঙ্ক সৃষ্টি করে তদ্রূপ একটি মহা উপহারও বটে। এ একটি নেয়ামত এবং সে নেয়ামতও স্বয়ং আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত। যদি মৃত্যু না হয় তবে বিশ্বের আবাদ সম্ভব হবে না।

আল্লাহ ও ফেরেশতাদের মধ্যকার কথোপকথন

এক হাদীসে বলা হয়েছে আল্লাহ তাআলা হযরত আদম আ.-এর সমস্ত সন্তানকে একত্রে ফেরেশতাদের সম্মুখে পেশ করলেন, লক্ষ-কোটি মানুষ যারা কিয়ামত পর্যন্ত পৃথিবীতে আসবে। ফেরেশতাগণ এদেরকে দেখে সবিনয় আরয করলেন, হে আল্লাহ! পৃথিবীতে এদের সংকুলান হবে কেমন করে? এদের সংখ্যা তো শত শত কোটি হবে। তখন তারা বলবে, জন্ম শাসন কর, জন্ম নিয়ন্ত্রণ কর, পৃথিবীতে জনসংখ্যার বিরুদ্ধে চলবে সংগ্রাম। যদি পঞ্চাশ শত কোটি হয়ে যায়

তবে কী অবস্থা হবে? ফেরেশতাদেরও এ আশংকা হল যে, এদের সংকুলান হবে কেমন করে?

আল্লাহ তাআলা বললেন, আমি তাদের উপর মৃত্যুকে নিযুক্ত করে দেব। তারা পৃথিবীতে আসতে থাকবে এবং যেতে থাকবে, এভাবে পৃথিবী খালি হতে থাকবে; অর্থাৎ পরবর্তীগণ আসতে থাকবে এবং পূর্বর্তীগণ চলে যেতে থাকবে। আমি মৃত্যুকে নির্ধারিত করে রেখেছি, যেন প্রত্যাগমনকারীগণ চলে যেতে পারে এবং আগমনকারীগণ শূন্যস্থান পূরণ করতে পারে।

একথা শুনে ফেরেশতাগণ আরয করলেন, যখন তাদের জন্য মৃত্যু নির্ধারণ করে রাখা হবে তখন তারা সর্বক্ষণ মৃত্যু চিন্তায় বিভোর হয়ে থাকবে, এতে তাদের জীবন দুর্বিষহ হয়ে পড়বে, পার্থিব শৃঙ্খলা কিভাবে রক্ষা পাবে? সর্বদা তারা মৃত্যু চিন্তায় নিমজ্জিত থাকবে। আল্লাহ তাআলা বললেন, তাদের অন্তরে আমি মোহ সৃষ্টি করে দেব। তারা আশার জালে আবদ্ধ হয়ে থাকবে, মৃত্যুর কল্পনাও আসবে না। দুনিয়ার শৃঙ্খলা বজায় থাকবে।

মোটকথা, মৃত্যু একদিকে যেমন মহাআতঙ্কের বিষয়, অপরদিকে বিশ্ব আবাদেরও মাধ্যম। যদি মৃত্যু না থাকত তবে এ বিশ্বে বসবাস সম্ভব হত না। মানুষ পথিকের মত আসছে এবং স্থান শূন্য করে চলে যাচ্ছে।

মৃত্যু একটি পার্থিব উপহার

পার্থিব দৃষ্টিভঙ্গিতে যদি দেখা হয় তাহলেও মৃত্যু একটি বিস্ময়কর নেয়ামত বলে বিবেচিত হবে। হাদীসে বলা হয়েছে– الموت تحفة المؤمن 'মৃত্যু মুমিনের জন্য উপহার স্বরূপ'। আল্লাহর পক্ষ হতে এর চেয়ে বড় কোন নেয়ামত দেয়া হয়নি। মৃত্যুকে কেন উপহার বলা ল? তার কারণও হাদীসে বর্ণিত রয়েছে–

الموت جسر يصل الحبيب إلى الحبيب.

> মৃত্যু একটি সেতু বিশেষ, যাকে অতিক্রম করে মানুষ বন্ধুর সাথে মিলিত হয়।

তো প্রকৃত বন্ধুর সাথে মিলিত হওয়া কি কোন ভয়ের জিনিস? এতো হল মৌলিক খুশির জিনিস, বান্দা স্বীয় প্রভুর সাথে গিয়ে সাক্ষাৎ করবে। কাজেই যেভাবে কোন মানুষের জন্মগ্রহণ উপলক্ষে আনন্দ উৎসব করা হয়, আমি বলি মৃত্যুও আনন্দের বস্তু। এতেও আনন্দ উৎসব করা উচিত। কিন্তু মানুষ বলবে, একথা তো বাস্তবতা বিরোধী, জ্ঞান-বুদ্ধি ও যুক্তিবিরুদ্ধ কথা। কারণ মানুষ তখন কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে, বিলাপ ও মাতম করতে থাকে, উৎসব করবে কেমন করে?

আমি বলি ঐ শোক ও দুঃখ মৃত্যুর জন্য নয়। এ দুঃখ হয় বিচ্ছেদের কারণে। মৃত্যুর কারণে খুশি হয় যে, বান্দা তার মাওলার সাথে সাক্ষাৎ করছে। এজন্যই কারো উত্তম মৃত্যু হলে মানুষ বলে থাকে, 'আল্লাহ এমন মৃত্যু সবাইকে নসীব করুন।' যদি মৃত্যু আনন্দের বস্তু না হত তবে মানুষ এমন কথা বলে কেন?

বোঝা গেল, মৃত্যু ভয়-ভীতির বস্তু নয়। কান্নাকাটি যা করা হয় তা মৃত্যুর কারণে নয়- বিরহ বেদনার কারণে। এজন্য যে, একটি নেয়ামত আমাদের নিকট হতে চলে গেল। এ কষ্ট ও দুঃখ বিচ্ছেদের; মৃত্যুর নয়। মৃত্যু তো আনন্দিত হওয়ার জিনিস। কেননা বান্দা তার আল্লাহর সাথে মিলিত হবে, সাক্ষাৎ করবে, এ কোন বিপদ ও মুসিবত নয়। বন্ধুর সাক্ষাৎ, বন্ধুর মিলন আনন্দ ও খুশির বস্তু।

মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষা করা ওলী হওয়ার লক্ষণ

এজন্যই মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষাকে ওলী হওয়ার নিদর্শন বলা হয়েছে। ইহুদীগণ যখন নিজেদেরকে আল্লাহর ওলী ও প্রিয়জন বলে দাবি করেছিল, তখন কুরআন ঘোষণা করল–

قُلْ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ هَادُوْٓا اِنْ زَعَمْتُمْ اَنَّكُمْ اَوْلِيَآءُ لِلّٰهِ مِنْ دُوْنِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ○

হে ইহুদী সম্প্রদায়! অন্যান্য লোক ব্যতীত একমাত্র তোমরাই আল্লাহর বন্ধু বলে যদি দাবি কর, তবে মৃত্যুর জন্য আকাঙ্ক্ষা কর, যদি তোমরা স্বীয় দাবিতে সত্যবাদী হয়ে থাক। [সফ : ৬]

মৃত্যুর জন্য আকাঙ্ক্ষা ও তামান্না করাও একটি নেয়ামত। এজন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুআ করেছেন–

اللهم حبب الموت إلى من يعلم أني رسولك.

হে আল্লাহ! ঐ ব্যক্তির অন্তরে মৃত্যুর প্রতি ভালবাসা সৃষ্টি করে দাও, যে আমাকে নবী বলে বিশ্বাস করে।

এজন্য যে, আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছার একমাত্র মাধ্যম হল মৃত্যু। মৃত্যু যদি না হয় তবে বান্দা আল্লাহ পর্যন্ত কেমন করে পৌঁছবে? আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছার মাধ্যম হল মৃত্যু; এজন্য মৃত্যু হল উপহার, মৃত্যু হল নেয়ামত, মৃত্যু হল আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছার মাধ্যম। তাই বলা হয়েছে, মৃত্যু কামনা ওলী হওয়ার নিদর্শন।

আল্লাহর ওলীগণ দিনরাত মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষা করেন, তাঁদের মুখে সর্বদা উচ্চারিত হতে থাকে–

خرم آں روز کزیں منزل ویراں بردیم
راحت جاں طلبم وزپئے جاناں بردیم
نذ کردم کہ اگر آید بسر زیں غم روزے
تا در میکدہ شاداں وغزل خواں بردیم

কোন দিনটি হবে সেই মোবারক দিন, যেদিন এ ধ্বংসপ্রায় জনবসতি ত্যাগ করে আমি আমার গন্তব্যস্থলে পৌঁছে যাব! যেখানে আল্লাহর সাথে আমার সংযোগ স্থাপিত হবে। আল্লাহ করুন, ঐ মুহূর্তটি অতিসত্তর এসে যাক।

সুতরাং ওলীআল্লাহগণের অন্তর সর্বদা মৃত্যুর জন্য ব্যাকুল থাকে।

হযরত মাওলানা শাহ ইয়াকুব ভূপালী রহ. নকশবন্দী খান্দানের লোক ছিলেন। তিনি আমাদের প্রিয়জনদের একজন। তাঁর দ্বারা মানুষ অনেক উপকৃত হয়েছে। মৃত্যু রোগে আক্রান্ত হয়ে সময় যখন নিকটবর্তী হয়ে এল, মানুষ তাঁকে সান্ত্বনা দিল, হযরত! চিন্তা করবেন না, ইনশাআল্লাহ সুস্থ হয়ে উঠবেন। এ কথা শুনে মাওলানার রাগ এসে গেল। বললেন, সারাটি জীবন এ সময়ের অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলাম, এখন তোমরা এ মুবারক মুহূর্তকে দূরে সরাতে এসেছ? দীর্ঘদিন পর মৃত্যুকাল নিকটে এসেছে, আর সান্ত্বনা দিচ্ছ যে, বেঁচে থাক। সাবধান! এ কথা আর বলনা, বরং দুআ কর, ঈমানের সাথে মৃত্যু হয়ে যাক। এ বলে সান্ত্বনা দিওনা যে, আয়ু বেড়ে যাবে, জীবন দীর্ঘ হবে। জীবনভর এ সময়ের আকাঙ্ক্ষায় ছিলাম। এখন সময় এসেছে আর তোমরা তাকে সরিয়ে দিতে এসেছ।

একটি ছাত্রসুলভ সন্দেহ

এখানে কোন তালিবে ইলম ছাত্রসুলভ একটি প্রশ্ন করতে পারে যে, একটি হাদীসে মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষা করাকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। বলা হয়েছে–

لا يتمنين احدكم الموت.

তোমাদের কেউ যেন মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষা না করে।

এখানে বলা হচ্ছে, মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষা কর না। আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুআ করেছেন, হে আল্লাহ! প্রত্যেক মুসলমানের অন্তরে মৃত্যুর মুহাব্বত ঢেলে দাও। কাথাগুলি বাহ্যিকভাবে পরস্পর বিরোধী বলে মনে হচ্ছে।

উত্তর : আমি বলি উভয় বিষয়ের মধ্যে কোন বিরোধ নেই। যে হাদীসে মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষা করতে নিষেধ করা হয়েছে ঐ হাদীসে এ শব্দটিও রয়েছে– بضر نزل به 'পার্থিব কোন বিপদে পতিত হয়ে মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষা কর না'। অর্থাৎ কোন অসুখে আক্রান্ত হয়ে বল না, মৃত্যু কেন আসছে না? অভাব ও দারিদ্র্যের তাড়নায় বল না মৃত্যু কেন আসছে না? এসব হল নিষিদ্ধ। দুনিয়ার বিপদে অতিষ্ঠ হয়ে মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষা করা হল আল্লাহর প্রতি অবিশ্বাসের পরিচায়ক, আর এ হল বন্দেগীর পরিপন্থী। তবে আল্লাহর সাক্ষাৎ লাভের আকাঙ্ক্ষা করা হল ওলী হওয়ার লক্ষণ। সুতরাং প্রত্যেক কামিল ওলীর অন্তরে আল্লাহর সাক্ষাতের আগ্রহ থাকবে, এবং অতি সত্বর পৌঁছে যেতে চাইবে। মোটকথা, মৃত্যু যেমন ভয়ভীতি ও আতঙ্ক সৃষ্টিকারী জিনিস, তদ্রূপ একটি মহান উপহার ও নেয়ামতও বটে।

মৃত্যু তরুণদের প্রতিভা বিকাশের মাধ্যম

আমি বলি, এ দৃষ্টিকোণ থেকেও মৃত্যু একটি বড় নেয়মাত যে, প্রবীণগণ যদি কিয়ামত পর্যন্ত টিকে থাকতেন তবে নবীনদের প্রতিভা বিকাশের কোন পথ থাকত না। নবীনদের না ইলম প্রকাশ পেত, না মাহাত্ম্য প্রকাশ পেত, বড়দের মাহাত্ম্যই অগ্রণী থাকত এবং সবাই তাদরে নিয়ে থাকত। যদি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিয়ামত পর্যন্ত দুনিয়াতে অবস্থান করতেন তবে সাহাবায়ে কেরামের প্রতিভা ও গুণাবলি প্রস্ফুটিত হত না, এগুলোর বিকাশ ঘটত না। সর্বক্ষণ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অনুকরণ করতেন এবং জিন্দেগী কেটে যেত অনুকরণে। স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে কোন কাজে অগ্রসর হতেন না। তাঁদের মধ্যে নিহিত গুণাবলির বিকাশ ঘটাতে সক্ষম হতেন না। সিদ্দিকে আকবর রা.-এর অন্তর্নিহিত প্রতিভা ও গুণাবলি তাঁর মধ্যেই থেকে যেত, ফারুকে আযমের গুণাবলি ও অসাধারণ কৃতিত্ব প্রকাশ পেত না। এসব তখনই সম্ভবপর হয়েছে, যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পৃথিবী ত্যাগ করে পরপারে তাশরীফ নিয়ে গেছেন এবং তাঁরা তাঁর স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন। স্থলাভিষিক্তের দায়িত্ব সম্পাদনকালে বিকাশ ঘটেছে তাঁদের প্রতিভা, গুণাবলি ও শক্তিসমূহের। তাই আমি বলছি, এ হিসেবেও মৃত্যু একটি নেয়ামত। এর দ্বারা নবীনদের প্রতিভা বিকশিত হওয়ার সুযোগ পায়।

হযরত মাওলানা খায়র মুহাম্মাদ রহ. আজ আমাদের মধ্যে নেই, নিশ্চয়ই এটা দুঃখের বিষয়, কিন্তু তাঁর নেক ও যোগ্য উত্তরসূরি রয়েছেন, তাঁর শাগরিদগণ রয়েছেন, যাঁরা তাঁর কাজ ও মিশনকে চালু রাখবেন। তাদের প্রতিভা ও গুণাবলি যা তাদের মধ্যে সুপ্ত রয়েছে, এসবের বিকাশ ঘটবে। যদি মাওলানা রহ. থেকে যেতেন তবে এসব প্রতিভার বিকাশ ঘটত না। কাজেই এও একটি উপকারী

জিনিস। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের প্রতিভা বিকাশ লাভের মাধ্যম। তারা দুনিয়া আবাদ ও কর্মমুখর করে রাখবেন, দীন ও কালিমার তাবলীগ তারাই করবেন।

মৃত্যু ইসলাহ ও তারবিয়াতের সংস্কার সাধনের মাধ্যম

মৃত্যু যদি না হত তবে পরবর্তীদের জন্য দীন বোঝা কঠিন হত। কেননা প্রত্যেক যুগের মানসিকতা পৃথক পৃথক হয়ে থাকে, প্রত্যেক শতাব্দীর পর মানসিকতার পরিবর্তন ঘটে। এজন্যই হাদীসে ওয়াদা করা হয়েছে–

إن الله ليبعث لهذه الأمة على رأس كل مأة سنة من يجدلها دينها.

এ হাদীসে প্রতি শতাব্দিতে একজন মুজাদ্দিদ (সংস্কারক)-এর অঙ্গীকার করা হয়েছে। যিনি জাহিলী নিয়ম-নীতি যা মানুষ গ্রহণ করে নিয়েছে এবং দীনের সাথে সংমিশ্রণ করেছে, তা দূর করবেন। তিনি এসে দুধকে দুধ ও পানিকে পানি করবেন। (অর্থাৎ ভেজাল মুক্ত করে দেবেন)। দীন পুনরায় তার সঠিক রূপরেখা নিয়ে প্রকাশ লাভ করবে। এজন্য যে, প্রতি শত বছর পর এক প্রজন্ম শেষ হয়ে যায় এবং নতুন প্রজন্ম জন্ম নেয়। প্রত্যেক নতুন প্রজন্মের দৃষ্টিভঙ্গি থাকে ভিন্ন, চিন্তাভাবনা থাকে ভিন্ন, মন-মানসিকতা থাকে ভিন্ন। এজন্য প্রয়োজন দেখা দেয় যে, যুগের আলেমগণ তাদের মন মানসিকতা অনুযায়ী তাদেরকে দীন বুঝিয়ে দেবেন। প্রবীণগণ যদি থেকে যান, তবে তারা তাদের মন-মানসিকতা ও দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী দীনের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করতেন, নতুন প্রজন্ম সেসবের কিছুই উপলব্ধি করতে সক্ষম হত না। এজন্য আল্লাহ তাআলা মৃত্যুর ব্যবস্থা রেখেছেন। যখন নবীনগণ আসবেন, তখন নতুন মুজাদ্দিদ ও সংস্কারক-এর আগমন হবে এবং ঐ যুগের পরিভাষা, ভাষা ও ভাবধারা অনুযায়ী দীন পেশ করবেন এবং বুঝাবেন। এ হিসেবেও মৃত্যু একটি বড় নেয়ামত বলে প্রমাণিত হয়। কেননা মৃত্যু ইসলাহ ও তারবিয়াতের সংস্কার বিধান এবং নতুন নতুন পথ ও পন্থা আবিষ্কারের মাধ্যম হয়। যাতে করে মানুষ বিভিন্নভাবে বিভিন্ন পথে আল্লাহর দীনে প্রবেশ করতে পারে।

যুগের চাহিদা অনুযায়ী সমসাময়িক আলেমগণ ইসলামকে উপস্থাপন করেছেন

এক যুগ ছিল যখন রাওয়ায়েতের প্রাধান্য ছিল। সাধারণ মানুষ দীন সম্পর্কীয় কোন কথা সে পর্যন্ত গ্রহণ করত না, যে পর্যন্ত সনদসহ হাদীস পড়ে শুনানো না হত। সুতরাং এ ছিল রাওয়ায়েতের যুগ। রাওয়ায়েত দ্বারা দীনকে প্রমাণ করা হত। তারপর এল বুদ্ধি বিবেচনার যুগ, এ ছিল মুতাযিলাদের যুগ। কোন মানুষ

ধর্মীয় কথা অনুধাবন করতে চাইত না যে পর্যন্ত যুক্তি ও বুদ্ধির মাধ্যমে বোঝানো না হত। তখন আল্লাহ তাআলা ইমাম রাযী, ইমাম গাযালী রহ.কে পাঠালেন, তাঁরা যুগের পরিভাষায় দীনের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে বুঝিয়ে দিলেন। মানুষকে ফিরিয়ে আনলেন দীনের পথে। তারপর এল তাসাউফের যুগ, যে পর্যন্ত সুফীদের ভাষায় বোঝানো না হত, মানুষ বুঝতে চাইত না। তখন আল্লাহ তাআলা সুফী সাধকের দল সৃষ্টি করলেন, যারা প্রত্যেকটি মাসআলাকে সুফীদের ভাষায় বর্ণনা করে বুঝিয়ে দিয়েছেন। তখন মানুষ তা মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে।

বর্তমানে হল বাস্তবতার যুগ। পুরাতন দর্শনের যুগ শেষ হয়েছে, যা ছিল কেবল চিন্তাগত দর্শন। এখন হল বাস্তবতার যুগ, মুশাহাদাতের যুগ। উলামাগণ যে পর্যন্ত বাস্তবতার নিরিখে বিজ্ঞানসম্মত নিয়মানুসারে, বাস্তব উদাহরণ দিয়ে দীনেকে না বুঝাবেন, মানুষ বুঝতে সক্ষম হবে না। যদি প্রবীণগণ থেকে যেতেন এবং বর্তমানের পরিভাষা সম্পর্কে অবগত না হতেন তবে দীন বোঝাতে সক্ষম হতেন না। আল্লাহ তাঁদেরকে নিয়ে গেছেন এবং তাঁদের যোগ্য উত্তরসূরি সৃষ্টি করেছেন, যারা সমকালীন চাহিদা ও কাঠামো অনুযায়ী দীনকে উপস্থাপন করছেন। মোটকথা, মৃত্যু যেমন মহা ভয়ের জিনিস, যেমন মহাবিপদ; তদ্রূপ মহান নেয়ামত এবং আল্লাহর পক্ষ হতে মহা পুরস্কারও বটে। মৃত্যু প্রসঙ্গে শুধু একদিকেই দৃষ্টিপাত করা, শুধু হায় হায় করা উচিত নয়। বরং খুশিরও একটা দিক রয়েছে। এ হল মুমিনের জন্য উপহার, আল্লাহর সাথে মিলিত হওয়ার একমাত্র পথ। এ হল পৃথিবীকে আবাদ ও সমৃদ্ধ রাখার পথ, নতুন নতুন জ্ঞান-বিজ্ঞান সৃষ্টির পথ এবং নতুন নতুন সংস্কারক ও মুরব্বিদের আগমণের পথ। সুতরাং মৃত্যুর কেবল একটি দিকই নয়, একে শুধু ভয় করবে; বরং এতে খুশির দিকও রয়েছে। তাই এর জন্য অপেক্ষাও করা উচিত এবং তার আকাঙ্ক্ষাও অন্তরে থাকা উচিত। এজন্যই আমি আরয করেছি যে, মৃত্যুকে মানুষ সবসময় ভীতিকর মনে করে থাকে, অথচ এ কোন ভয়ের জিনিস নয়। যদি আল্লাহর সাথে সম্পর্ক সুদৃঢ় থাকে তবে এর চেয়ে উন্নত কোন নেয়ামত নেই। যদি গাফিলতি থেকে থাকে তবে নিঃসন্দেহে মৃত্যু মহাবিপদও বটে। একারণেই কাফেরদের বেলায় মৃত্যু হল মহামুসিবত, মুমিনদের বেলায় মুসিবত নয়।

কাফেরদের আকাঙ্ক্ষা

কুরআন মাজিদে বলা হয়েছে, কাফেরা আকাঙ্ক্ষা করে যে, জীবন বাড়তেই থাকুন–

وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيٰوةٍ ۚ وَمِنَ الَّذِيْنَ أَشْرَكُوْا ۚ يَوَدُّ

اَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ اَلْفَ سَنَةٍ.

তোমরা কাফেরদেরকে জীবনের প্রতি সবার চাইতে এমনকি, মুশরিকদের চাইতেও অধিক লোভী দেখবে। তাদের প্রত্যেকে কামনা করে, যেন হাজার বছর আয়ু পায়। [বাকারা : ৯৬]

মৃত্যুর নাম শুনলেই তাদের মৃত্যু-যন্ত্রণা হয়। আমি যদি তাদেরকে হাজার বছরের আয়ুও দিয়ে দেই, তবু তারা আকাঙ্ক্ষা করতে থাকবে যে, আরো একহজার বছর আয়ু হোক। এ হল কাফেরদের অবস্থা ও বৈশিষ্ট্য। আর মুমিনদের অবস্থা হল এই, তারা দীর্ঘ জীবনে অতিষ্ঠ হয়ে যায়। তারা বলে, হে আল্লাহ! তাড়াতাড়ি তলব করুন, আপনার সাক্ষাতে ধন্য হই।

সুতরাং উভয়ের অবস্থা সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী। মৃত্যুকে শুধু ভয় করা, আতংকিত হয়ে পড়া গাফিলতি ও আল্লাহ-বিমুখতার নিদর্শন। আর গাফিলতিই হল কুফরের প্রান্তসীমা। আল্লাহ সবাইকে রক্ষা করুন। আল্লাহর নিকট মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষা করা জাগ্রত আত্মার লক্ষণ, তায়ালুক মায়াল্লাহ'র লক্ষণ। তাই মৃত্যুর মাত্র একটি দিকই নয় যে, মানুষ আতঙ্কিত হয়ে থাকবে। এমনকি শোকে মুহ্যমান হয়ে থাকতে নিষেধও করা হয়েছে। স্বাভাবিক দুঃখ যত হোক, অসুবিধা নেই; কিন্তু এ দুঃখকে সঞ্চিত করে রাখা, তাজা করতে থাকা, এসবকে শরীয়ত পছন্দ করেনি। বলা হয়েছে–

ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب.

ঐ সমস্ত লোক আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয় যারা মৃত্যুশোকে চুল ছেঁড়ে, মুখমণ্ডল ও বক্ষকে ক্ষতবিক্ষত করে ফেলে।

কারণ, মৃত্যু আসে মানুষকে সজাগ করার জন্য, গাফেল বানানোর জন্য নয় যে, এ নিয়ে সর্বদা ব্যস্ত থাকবে। কারো মৃত্যু হলে অন্যরা ইন্নালিল্লাহ পড়ল, তারপর মৃতের পরিত্যক্ত কাজ আনজাম দিল, নিজের আমল সম্পাদন করতে থাকল, নিজের প্রস্তুতি গ্রহণ শুরু করল। সুতরাং মৃত্যু হল জাগরণ সৃষ্টিকারী জিনিস, গাফেল বানানোর জিনিস নয়। যার দ্বারা জাগরণ ও সচেতনতা সৃষ্টি হয় তাতো নেয়ামত, মুসিবত কি করে হয়? গাফিলতি যাদেরকে আচ্ছন্ন করে নিয়েছে মুসিবত কেবল তাদেরই জন্য।

আল্লাহ বিমুখতার ভয়াবহ প্রভাব

আল্লাহ বিমুখ ব্যক্তিদের মৃত্যুর নাম শুনলেই মৃত্যু-যন্ত্রণা শুরু হয়ে যায়। আল্লাহ বিমুখ ব্যক্তি মৃত্যুর নাম উচ্চারণ করাকেও পছন্দ করবে না। সর্বদা গাফিলতির

মধ্যেই থাকবে। অতঃপর তার মধ্যে ঔদ্ধত্য, একগুঁয়েমী ও বিদ্রোহী ভাব তৈরি হবে। ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন, ফেরাউনের বয়স চারশত বছর হয়েছিল। এ দীর্ঘ সময়ে তার অসুখ হয়নি, কোন বিপদাপদ আসেনি। তাই অহংকার ও শ্রেষ্ঠত্বের উন্মাদনায় মানবীয় সীমা অতিক্রম করে ফেলল এবং ঘোষণা করল– أَنَا رَبُّكُمُ الأَعْلَى 'আমিই তোমাদের প্রধান রব' এবং হযরত মুসা আ.কে হেয় প্রতিপন্ন ও লাঞ্ছিত করতে লেগে গেল। ঘোষণা করল–

أَلَيْسَ لِيْ مُلْكُ مِصْرَ وَهٰذِهِ الأَنْهٰرُ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِيْ ج أَفَلَا تُبْصِرُوْنَ○ أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِّنْ هٰذَا الَّذِيْ هُوَ مَهِيْنٌ لا وَلَا يَكَادُ يُبِيْنُ○

হে আমার কওম, আমি কি মিসরের অধিপতি নই? এই নদীগুলো আমার নিম্নদেশে প্রবাহিত হয়, তোমরা কি দেখ না? আমি যে শ্রেষ্ঠ এ ব্যক্তি থেকে, যে নীচ এবং কথা বলতেও সক্ষম নয়। [যুখরুফ : ৫১-৫২]

অর্থাৎ সে আপ্রাণ চেষ্টায় মুসা আ.কে অপদস্থ করতে চাইল। কেন সে অপদস্থ করার চেষ্টায় লিপ্ত হল? এজন্য যে, তার অন্তরে আল্লাহর প্রতি গাফিলতি ছিল। গাফেলদের মৃত্যুর নাম শুনলেই মৃত্যু-যন্ত্রণা শুরু হয়ে যায়। যখন ফেরাউনের মৃত্যুকাল এল এবং নিমজ্জিত হতে শুরু করল তখন উচ্চস্বরে বলতে লাগল: আমি মুসা আ. এবং তাঁর প্রভুর উপর ঈমান গ্রহণ করলাম। কুরআনে বলা হয়েছে–

أٰلْئٰنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِيْنَ○

এখন ঈমান গ্রহণ করছ (যখন অদৃশ্য জগৎ চোখের সামনে ভেসে উঠেছে)! অথচ তুমি ইতোপূর্বে নাফরমানী করছিলে এবং পথভ্রষ্টদেরই অন্তর্ভুক্ত ছিলে। [ইউনুস : ৯১]

কোন কোন বর্ণনায় রয়েছে, হযরত জিবরাঈল আ. তখন তার মুখে বালু-মাটি ভরে দিচ্ছিলেন, যেন এমন না হয় যে, এসব কথা বার বার বলার কারণে তার নাজাত হয়ে যায়। বদবখতের নাজাত যেন না হয়। সারাটি জীবন আল্লাহর মাখলুকদেরকে নির্যাতন করেছে, নানাভাবে জুলুম করেছে, এখন যেন তার নাজাত না হয়।

এ দ্বারা বোঝা গেল, ফেরেশতা আ.গণ মানুষের অবস্থার উপর প্রাধান্য বিস্তার

করেন। ভালবাসার প্রাধান্য হোক কিংবা শত্রুতার প্রাধান্য হোক। যাইহোক, মানুষ যখন আল্লাহ বিমুখ থাকে, তখন আল্লাহর সাথে তার কোন সম্পর্ক থাকে না। এ সম্পর্কহীনতার কারণে মৃত্যুকে ভয় করে, অপছন্দ করে। গাফিলতির পরিবর্তে যদি সচেতনতা ও কলবে আল্লাহর যিকির থাকে, তবে আল্লাহ তাআলার নৈকট্য লাভ হবে এবং মৃত্যুর জন্য আকাঙ্ক্ষাও করবে। এগুলো তখন আল্লাহর নৈকট্য লাভের কারণ হবে। কাজেই মৃত্যুতে যেমন কষ্টের দিক রয়েছে তদ্রূপ আনন্দের দিকও রয়েছে। যেখানে মন আকৃষ্ট হওয়ার বিষয় থাকে সেখানে অতিষ্ঠতার বিষয়ও থাকে। এজন্য উভয় দিকের প্রতি লক্ষ্য করা উচিত। কেউ মারা গেলে শোকে আত্মহারা হয়ে যাওয়া উচিত নয়, বুদ্ধি বিবেচনাকেও কাজে লাগাতে হবে। যা তার জন্য কল্যাণকর প্রমাণিত হবে।

মৃতের প্রতি হা-হুতাশ ব্যক্ত করা

মৃত্যুশোকে আচ্ছন্ন হয়ে মানুষ যদি শোক গাথা শুরু করে দেয়, তাতে মৃত ব্যক্তির কী লাভ হবে? বরং এতে তার কষ্ট হয়। হাদীসে বলা হয়েছে–

إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه.

বিলাপ করে মানুষ কান্নাকাটি করলে মৃত ব্যক্তির কষ্ট হয়।

এজন্যই আল্লাহ তাআলা বলেছেন, কেউ মারা গেলে সর্বপ্রথম কাজ হল ধৈর্যধারণ কর এবং ইন্নালিল্লাহ পাঠ কর। দ্বিতীয় কাজ হল সে যাতে উপকৃত হতে পারে তার চেষ্টা কর, সাওয়াব পৌঁছানোর চেষ্টা কর। আর তা কান্নাকাটি দ্বারা পৌঁছে না, যথারীতি সাওয়াব পৌঁছালেই তা পৌঁছে। যার জন্য ইসালে সাওয়াব করা হবে, তার উপকার ও কল্যাণ লাভ হবে। কাজেই আমাদের উচিত মৃত ব্যক্তির জন্য উপকারী হওয়া এবং যখন তার কথা স্মরণ হবে তখন তার জন্য উপকার পৌঁছানোর ব্যবস্থা করা। হাদীসে বলা হয়েছে–

أذكروا محاسن موتاكم.

মৃত ব্যক্তিদের সৎ গুণাবলি স্মরণ কর এবং মানুষের সাথে বর্ণনা কর।

তাদের দোষ আলোচনা কর না। দোষের সম্পর্ক আল্লাহর সাথে, তিনি ইচ্ছা করলে ক্ষমাও করে দিতে পারেন। যদি তিনি ক্ষমা করে দেন তবে তোমার সমালোচনায় কী হবে? তোমার মুখ অপবিত্র হবে। সে তো ক্ষমা পেয়েই গেছে। যথাসম্ভব তার গুণাবলি ও সৎ কার্যাবলি বর্ণনা কর, এসব শুনে নেক ও

সৎকাজের প্রতি মানুষের আগ্রহ সৃষ্টি হয়। মোটকথা, কারো মৃত্যুর পর স্বাভাবিক যে দুঃখ হয় আল্লাহ তা নিষেধ করেননি, তবে জ্ঞানগত একটি নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছেন যে, শোককে সঞ্চিত করার জন্য বর্ধিত কর না।

মৃতের প্রতি প্রয়োজনের অধিক শোক প্রকাশ করা একটি রুসুম; প্রকৃত শোক নয়। এটা লোক দেখানো শোক, জাহেলী যুগে যার প্রচলন ছিল। যখন সম্ভ্রান্ত কোন ব্যক্তির মৃত্যু হত তখন সে অসিয়ত করে যেত যে, আমার জন্য যেন ছয় মাস শোক প্রকাশ করা হয় কিংবা আমার জন্য যেন এক বছর শোক প্রকাশ করা হয়। তখন কৃতদাসীদেরকে ভাড়া করে নিয়ে আসা হত। তাদের মাতম করার প্রাকটিস থাকত; মাথা ঝাঁকানোর সাথে সাথে টপটপ করে অশ্রু ঝরতে শুরু করত। ভাড়া করে যেখানে কৃতদাসীদেরকে আনা হত, সেখানে প্রকৃত শোক কোথায়? এতো ছিল অভিনয় মাত্র। সে যুগে এটা ছিল বড়লোকী প্রকাশের ধরণ। সর্বজন বিদিত যে, এ কান্না কোন প্রকৃত কান্না ছিল না। এটা ছিল সামাজিক রুসুম ও লৌকিক কান্না। ইসলাম লৌকিকতা শিক্ষা দেয়নি। প্রকৃত জিনিস শিক্ষা দিয়েছে। লৌকিকতা কোন প্রকৃত জিনিস নয়। স্বভাবজাত দুঃখ হোক, কোন বাধা নেই; কিন্তু সজ্ঞানে শোক জিইয়ে রাখা বা বৃদ্ধি করা জাহিলিয়াতের স্মৃতি। ইসলাম একে সমর্থন করে না। ইসলাম এ সরল সোজা কথা শিক্ষা দিয়েছে– যদি কেউ মারা যায়, সবর কর এবং জানা থাকলে এ আয়াত পাঠ কর– ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

'ইন্না লিল্লাহ' আয়াতে সার্বিক সবরের শিক্ষা রয়েছে

'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন' আয়াতে ধৈর্যধারণ ও সান্ত্বনার সকল উপকরণ বিদ্যমান রয়েছে। যখন মানুষ উচ্চারণ করে 'ইন্না লিল্লাহ'– আমরা সবাই আল্লাহর অধীন, তখন এর দ্বারা বিবেকজাত সবর এসে যায়। এভাবে যে, আমরা যখন অধিন জিনিস এবং তিনি আমাদের মলিক, তখন তিনি তাঁর অধিনস্তদের যেভাবে ইচ্ছা ব্যবহার করবেন। ইচ্ছা করলে তুলে নেবেন, ইচ্ছা করলে পৃথিবীতে জীবিত রাখবেন– এত হস্তক্ষেপ করার আমরা কে? এর দ্বারা বিবেকপ্রসূত সবর এসে যাবে যে, আমরা হলাম গোলাম, আর গোলামের ব্যাপরে যা ইচ্ছে তা করার অধিকার মালিকের রয়েছে। এরপরও স্বভাব বা প্রকৃতিগত শোক থেকেই যায়। তাই দ্বিতীয় বাক্যে তার চিকিৎসা বর্ণনা করেছেন– 'ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন'। অর্থাৎ 'আমরাও অবশ্যই সেখানে চলে যাব।' যখন আমরাও সেখানে যাব এবং দেখাসাক্ষাৎও হবে, সুতরাং এ বিচ্ছেদ চিরস্থায়ী বিচ্ছেদ নয়। তাই 'ইন্না লিল্লাহি' দ্বারা আকলী বা বিবেকগত সবর এবং

'ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন' দ্বারা তবয়ী বা স্বভাবগত সবর এসে যায়। আল্লাহ তাআলা এ দুআ এ জন্য শিক্ষা দিয়েছে যে, যেন আমরা সবর ও ধৈর্যধারণ করে নিজ আমলে ব্যস্ত হই, পরকালের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করি, শোকাভিভূত হয়ে বসে না থাকি। (ফার্সি কবি উরফী'র একটি কবিতার মর্মার্থ হল এমন) :

কান্নাকাটি করার দ্বারা যদি মৃতগণ ফিরে আসত, তবে আমরা হাজার বছর মাতম করতাম, কিন্তু তারা আর ফিরে আসবে না। যে চলে গেছে সে চলেই গেছে, দ্বিতীয়বার এ বিশ্বে আগমন করবে না। দেখা-সাক্ষাৎ হলে ঐ জগতে হবে, এ জগৎও ধ্বংস হয়ে যাবে।

মুমিন ও কাফেরের মৃত্যুর তুলনা

মুমিনগণ সর্বদা আশায় থাকেন যে, প্রিয়জনদের সাথে সাক্ষাৎ হবে, বন্ধু বান্ধবদের সাথে সাক্ষাৎ হবে, অমুক অমুকের সাথে সাক্ষাৎ হবে। যে কাফেররা দুনিয়ার এই জীবনকেই সর্বস্ব মনে করেছে, তারাই নিরাশ, মুমিনগণ নিরাশ নন। এজন্য যে, এই দুনিয়া নিয়ে মুমিনের কোন উচ্চাকাঙ্ক্ষা নেই। মোটকথা, ঐ আয়াত পাঠে সবর এসে যায়।

আমি আরয করেছিলাম যে, এখন কোন সভা করা বা ওয়াজ করা আমার উদ্দেশ্য নয়। আমার উদ্দেশ্য হল তাযিয়াত বা সমবেদনা প্রকাশ করা। আর তাযিয়াত জনসমাগম কামনা করে না। আমাদের মাওলানা (শরীফ সাহেব, মুহতামিম মাদরাসায়ে খাইরুল মাদারিস, মুলতান) অযথা আপনাদেরকে কষ্ট দিয়েছেন। আমি তাযিয়াতের জন্য হাজির হয়েছিলাম, তাযিয়াত করে চলে যেতাম; কিন্তু আপনারা তাশরীফ এনেছেন, এ হল আপনাদের দয়া এবং আমার সৌভাগ্য যে, আপনাদের সাথে সাক্ষাৎ হয়ে গেল। কত ভাই-বন্ধুর সাথে সাক্ষাতের সৌভাগ্য হল। সবাই এভাবে সমবেত হয়েছেন যে, আপনারা বসেছেন সামনে আর আমাকে বসিয়েছেন এই চেয়ারে, সামনে রেখেছেন মাইক্রোফোন, কাজেই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কিছু কথা বলতেই হয়। তাই এমন কিছু কথা আরয করলাম যা আমার আগমনের উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, আর সে উদ্দেশ্য ছিল তাযিয়াত। সুতরাং তাযিয়াতেরই ধারাবাহিকতায় কিছু মৃত্যু সম্পর্কীয় আলোচনা, কিছু মৃত্যুর দিক সম্পর্কীয় আলোচ, কিছু হযরত মাওলানা খায়র মুহাম্মাদ সাহেবের গুণাবলি আলোচনা করলাম। তাঁর উত্তরসূরী ও খলিফাদের নিয়েও কিছু আলোচনা হল। তাযিয়াতে এসব বিষয়ই আলোচিত হতে পারে, এজন্যই কিছু কথা আরয করা হল। আল্লাহ তাআলা সবর করার তাওফীক দান করুন এবং আমাদেরকে মাওলানা মরহুমের নেয়ামতরাজির

অধিকারী করুন, তাঁর পরিত্যক্ত কাজকর্মকে আল্লাহ জারি রাখুন, প্রসারিত করুন। আমীন!

اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم.

বিশেষ দ্রষ্টব্য: আমাদের এখানে এ প্রথাটি জাতীয় বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়েছে যে, প্রত্যেক নবাগত ব্যক্তির সাথে মুসাফাহা করাকে জরুরি মনে করা হয় এবং এতে অন্যের আরামের প্রতি লক্ষ্য করা হয় না। অথচ নিয়ম-শৃঙ্খলা বজায় রাখা মুসলমানদেরই বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল। হযরত হাকীমুল ইসলাম মাদ্দাযিল্লুহুল আলী বয়ান শেষ করার পর মুসাফাহা করার আগ্রহে জনতার এক ঢল মঞ্চের দিকে আসতে শুরু করল। মুসাফাহা করার প্রচেষ্টায় আদব-ইহতেরাম ও ইযায়ে মুসলিম (মুসলমানকে কষ্ট দেয়া হারাম)-এর প্রতিও লক্ষ্য করা হল না। ভীষণ এক বিশৃঙ্খল অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল, যা ছিল অত্যন্ত দুঃখজনক। বিশেষত, যে সমাবেশ উলামায়ে কেরাম এবং মাদরাসার ছাত্রদের সংখ্যাধিক্য রয়েছে। কিন্তু এতদসত্ত্বেও এ সব ঘটল যা অন্তত দীনি শিক্ষায় শিক্ষিতদের নিকট থেকে কোনক্রমেই আশা করা যায় না। হযরত হাকীমুল ইসলাম মাদ্দাযিল্লুহুল আলী সভার বিশৃঙ্খল অবস্থা দেখে নিয়ম শৃঙ্খলা বজায় রাখার তালিম দিলেন। তারপরও কারী সাহেবকে মঞ্চ থেকে বিশ্রামাগার পর্যন্ত যেতে অত্যধিক সময় ক্ষেপন ও অসীম কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে। সভার উদ্যোক্তাগণ আম জনতার কারণে নিরুপায় হয়ে রইলেন। তখন আমাদের জাতীয় মানসিকতা সংশোধনের জন্য হযরত এ কয়েকটি কথা বলেছিলেন। নিম্নে তা প্রদত্ত হল। আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে আমল করার তাওফিক দান করুন। –সংকলক

মুসলমান হিসেবে শরীয়তে বর্ণিত আদব গ্রহণ করুন

আপনাদের মধ্যে নিয়ম শৃঙ্খলা থাকা উচিত। মুসাফাহা করা একটি অত্যন্ত বরকতের কাজ। এর জন্য সাওয়াবের ওয়াদা করা হয়েছে। বলা হয়েছে, যখন দু'জন মুসলমান মুসাফাহা করেন এবং তাদের মুখে মুচকি হাসি থাকে, তখন তাদের হাত পৃথক হওয়ার পূর্বেই দু'জনার গুনাহ মাফ করে দেয়া হয়। সুতরাং মুসাফাহা অত্যন্ত বরকতময় জিনিস; কিন্তু প্রত্যেক ইবাদতের সাথেই এ শর্ত রয়েছে যে, অন্যের যেন কষ্ট না হয়, কোন ইবাদত যেন অপরের কষ্টের কারণ না হয়। অন্যকে কষ্ট দেয়া হারাম, আর মুসাফাহা করা ফরজ নয়। একটি মুস্তাহাবের জন্য মাকরূহ কাজ করবে, এটা ভুল পদ্ধতি। মুসাফাহা করার জন্য ছুটাছুটি করা ইসলামী শিষ্টাচারের অন্তর্ভুক্ত নয়। একে ত্যাগ করা কর্তব্য। এভাবে করা হলে যার সাথে মুসাফাহা করা হয় তিনিও অপারগ হয়ে পড়েন।

এই পাকিস্তানে আমি যদি কোন অবস্থায় বিপদগ্রস্ত হয়ে পড়ি তবে নিয়ম মাফিক আমি পুলিশের দায়িত্বে ও হিফাজতে থাকার কথা। আর এখন পাকিস্তানবাসীর

নিয়ন্ত্রণে রয়েছি, তারা আমাকে ঘেরাও করে রেখেছেন। এ কেমন নিয়মবিরুদ্ধ কাজ? এটা কি মুসাফাহা হল? এ তো হল কষ্ট দেয়া। সুতরাং আপনারা কেউ মুসাফাহা করার জন্য কষ্ট করবেন না। আমি যখন এখান থেকে উঠব, রাস্তা ছেড়ে দেবেন। এই মুসাফাহায় খায়র ও বরকত হবে না যাতে এক মুসলমান দ্বারা অন্য মুসলমান কষ্ট পায়। হাদীসে বলা হয়েছে–

المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده ،

সত্যিকারের মুসলমান ঐ ব্যক্তি যার মুখ দ্বারা, যার হাত দ্বারা অন্য মুসলমানের কষ্ট না হয়।

এতো হল হাত দ্বারা কষ্ট দেয়া।

আপনারা হজ করতে যান। হাজরে আসওয়াদকে চুমু দেয়া একটি মুস্তাহাব কিংবা ওয়াজিব কাজ। কিন্তু যদি অন্যের কষ্ট হয় তবে শরীয়ত অনুমতি দিয়েছে সেদিকে হাত উঠিয়ে তাকে চুমু দেবে। এও মুসাফাহা। যদি হাতও উঠাতে না পারা যায় তবে লাঠি দ্বারা ইশারা করলেই যথেষ্ট হবে। সেখানে মুসাফাহা (চুমু দেয়া) ওয়াজিব ছিল, তারও বিকল্প ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

আর এখানে তো ওয়াজিবও নয়। এর জন্য অযথা অন্যকে কষ্ট দেয়া, ধাক্কাধাক্কি করায় সাওয়াব তো দূরের কথা, উল্টো শাস্তি হবে। কাজেই কেউ মুসাফাহার ইচ্ছা করবেন না। আর আমিও বৃদ্ধ ব্যক্তি এবং দুর্বল ও অসুস্থ। হাজারো ব্যক্তির সাথে মুসাফাহা করার শক্তি ও সামর্থ্য আমার নেই। আপনারা প্রত্যেকে তো একবার করবেন, কিন্তু আমাকে হাজারবার হাত তুলতে হবে। আমার মধ্যে এ শক্তি নেই। সুতরাং আপনারা বসুন এবং আমি উঠলে পথ ছেড়ে দিন।



বয়ান : ১১

ইসলামে পরকাল ভাবনা

আখিরাত সম্পর্কে ব্যাপকভাবে মানুষ এ ধারণা পোষণ করে যে, আখিরাত তো আকাশের উপর রয়েছে, আর দুনিয়া হল এই। এটি একটি ভুল ধারণা। আমাদের আখিরাত এ দুনিয়াতেই লুকায়িত রয়েছে, একে বের করে আনা আমাদের কাজ। এই পানাহার, এই নিদ্রা-জাগরণ প্রভৃতি কার্যাবলিতেই আখিরাত লুকিয়ে রয়েছে। এগুলোর মাধ্যমেই স্বীয় আখিরাত বের করে নাও। এ কথা নয় যে, আখিরাত পৃথক কোন জগৎ এবং দুনিয়াকে ত্যাগ করে তবে গিয়ে আখিরাতে পৌঁছবে; বরং দুনিয়ায় অবস্থান করেই তার মধ্য থেকে আখিরাতকে বের করে নেয়া বুদ্ধিমানের কাজ।

– হযরত হাকীমুল ইসলাম রহ.





اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُه وَنَسْتَعِيْنُه وَنَسْتَغْفِرُه وَنُؤْمِنُ بِه وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّاٰتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَّهْدِه اللّٰهُ فَلاَ مُضِلَّ لَه، وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلا هَادِىَ لَه، وَنَشْهَدُ أَنْ لاَّ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَه لاَ شَرِيْكَ لَه، وَنَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَمَوْلاَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُه وَرَسُوْلُه، أَرْسَلَهُ اللّٰهُ إِلىٰ كَافَّــةً لِّلنَّاسِ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا وَّدَاعِيًا إِلَيْهِ بِإِذْنِه وَسِرَاجًا مُّنِــيْرًا.

أَمَّــا بَعْدُ:

বুযুর্গানে মুহতারাম!

দুনিয়া ও আখিরাত– দু'টি জিনিস। আখিরাত সম্পর্কে ব্যাপকভাবে মানুষ এ ধারণা পোষণ করে যে, এ তো আকাশের উপর রয়েছে, আর দুনিয়া হল এই। এটি একটি ভুল ধারণা। আমাদের আখিরাত এ দুনিয়াতেই লুকায়িত রয়েছে, একে বের করে আনা আমাদের কাজ। এই পানাহার, নিদ্রা-জাগরণ প্রভৃতি কার্যাবলিতেই আখিরাত লুকিয়ে আছে, এগুলোর মাধ্যমেই স্বীয় আখিরাত বের করে নাও। এ কথা নয়, আখিরাত পৃথক কোন জগৎ এবং দুনিয়াকে ত্যাগ করে গিয়ে আখিরাতে পৌঁছবে; বরং দুনিয়ায় অবস্থান করেই তার মধ্যথেকে আখিরাত বের করে নেয়া বুদ্ধিমানের কাজ। আপনি যে নামায-রোজা করছে এগুলো হল দৈহিক কাজ। আর এই দেহটি কাল ও স্থানের মধ্যে অবস্থিত রয়েছে। তো স্থান ও কালের সাথে সম্পৃক্ত সবকিছুই পার্থিব কাজ। এ দ্বারাই জান্নাত তৈরি হচ্ছে। জান্নাত তো এই নামায হতেই নির্গত হয়, যে নামায আপনি শরীরের মাধ্যমে সম্পাদন কছেন। আখিরাত তো ভিন্ন কোন জিনিস নয়।

ইয়াতিমের মাথায় হাত রাখলেন, আপনার আমলনামায় হাজারো নেকী লিপিবদ্ধ করা হল। এই নেকীগুলোই তো জান্নাত। সুতরাং এই দুনিয়াতেই আখিরাত আত্মগোপন করে রয়েছে, বাইরে কোথাও যাওয়ার প্রয়োজন নেই। আমল

সহীহ-শুদ্ধ হলে জান্নাত এখান হতেই তৈরি হয়ে যাবে। যদি আমল হয় ভুল ও ভ্রান্ত তবে এখান থেকেই জাহান্নাম প্রস্তুত হয়ে যাবে।

হাদীসে বলা হয়েছে– মানুষ যদি আহার করতে বসে, আহার করা একটি স্বভাবজাত কাজ, ক্ষুধা পেলে মানুষ আহার করবে, কিন্তু যদি এ নিয়তে আহার করে যে, শরীরে শক্তি হবে আর তা দ্বারা ইবাদত করব, এবং বিসমিল্লাহ বলে শুরু করে ও আহারান্তে বলে 'আলহামদুলিল্লাহি কাসিরান' (অসংখ্য প্রশংসা আল্লাহ তাআলার জন্য), আল্লাহর রাসূল বলেন, তার পূর্ববর্তী সকল গুনাহ মাফ করে দেয়া হয়। করেছেন আহার কিন্তু ক্ষমা করা হল গুনাহ। গুনাহ মাফ হয়ে যাওয়াই তো আখিরাত। সুতরাং দুনিয়াতেই আখিরাত রয়েছে।

হাদীসে বলা হয়েছে– দুই বন্ধু যখন আন্তরিক ভালবাসার সাথে মুসাফাহা করে, উভয়ের মুখে থাকে মুচকি হাসি, তখন তাদের হাত পৃথক করার পূর্বেই পেছনের গুনাহ মাফ করে দেয়া হয়। একটি স্বভাবজাত কাজ সম্পাদন করা হল, কিন্তু এ দ্বারাও মাগফিরাত হয়ে গেল। যাই হোক, এই দুনিয়া থেকেই আমাদের আখিরাত নির্গত হয়।

পরকাল সম্পর্কে ইসলাম ও অন্যান্য ধর্মের মতপার্থক্য

এখান থেকে ইসলাম ও অন্যান্য ধর্মের মধ্যে পার্থক্য হয়ে যায়। অন্যান্য ধর্মগুলো মনে করে আখিরাত দুনিয়া হতে সম্পূর্ণ পৃথক কোন জিনিস, যে পর্যন্ত পৃথিবীতে থেকে পৃথক না হবে, আখিরাত পাবে না। যেমন হিন্দু ধর্ম। সে ধর্মে রয়েছে 'সন্ন্যাস প্রথা'। অর্থাৎ বাড়িঘর ত্যাগ করতে হয়, ছেলে-মেয়ে, স্ত্রী-পরিজন সবই ত্যাগ করতে হয় এবং কোথাও গিয়ে নির্জনে বসে থাকতে হয়। এভাবে সকল কামনা বাসনাকে ত্যাগ করার মাধ্যমে তারা মনে করে যে, আখিরাত তৈরি হয়ে গিয়েছে।

খ্রিস্টধর্মে কামনা বাসনা বর্জন করা একটি পবিত্র কাজ। যদি কোন ব্যক্তি গির্জায় প্রবেশ করে এবং এ অঙ্গীকার করে যে, আমি বিয়ে-শাদী করব না, কারো সাথে দেখা সাক্ষাৎ করব না, দুনিয়াকে সম্পূর্ণ ত্যাগ করে নির্জনবাস গ্রহণ করার পর মনে করা হয় তার আখিরাত লাভ হয়েছে।

ইসলাম এসব জিনিসকে প্রত্যাখ্যান করেছে। এসব হল বৈরাগ্য। ইসলাম গৃহকোণে আবদ্ধ হয়ে থাকা, পাহাড়-পর্বতের গুহায় চলে যাওয়া, সাগর পাড়ে আস্তানা বানানো– এসব করা থেকে বাধা প্রদান করেছ। এসব দ্বারা আখিরাত লাভ হয় না। পৃথিবীতে অবস্থান করে মানুষের সাথে মিলেমিশে থাকবে। জনগণের সুখ-দুঃখে শরীক থাকবে, ত্রুটি-বিচ্যুতি সংশোধনের চেষ্টা করবে, এ

দ্বারাই পরকাল লাভ হবে। পানাহার গ্রহণের মাধ্যমে পরকাল লাভ হবে, পানাহার বর্জনের মাধ্যমে নয়।

কুরআনে আদেশ করা হয়েছে–

يَاأَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوْا مِنَ الطَّيِّبٰتِ وَاعْمَلُوْا صَالِحًا.

আল্লাহ তাআলা আপনাদের জন্য যে পবিত্র জিনিসের ব্যবস্থা করেছেন তা ব্যবহার করুন এবং সৎকাজ করুন। [মুমিনুন : ৫১]

নিয়ত যত বিশুদ্ধ হবে সে অনুযায়ী পরকাল সুন্দর হবে। এ নয় যে, পানাহার ত্যাগ কর, জঙ্গলে চলে যাও, তাহলে পরকাল সুন্দর হবে।

পোশাক-পরিচ্ছদের ব্যাপারটিও এমন। কোন কোন ধর্মে পোশাক-পরিচ্ছদ ত্যাগ করতে হয়; শুধু লেংটি পরে থাকে। ফরয পোশাককেও ত্যাগ করে। ইসলাম এসবকে বৈরাগ্য আখ্যা দিয়ে নাজায়িয সাব্যস্ত করেছে। নির্জনবাস ইসলাম সমর্থন করে না। পোশাক পরিধান কর, ভাল পোশাক, মোটা কাপড়, মিহিন কাপড়– সবই পরতে পার, নিয়ত সৎ রাখ, এতেই আখিরাত তৈরি হবে। সুতরাং পানাহার, সমাজিকতা, গৃহবাস প্রভৃতিকে ইসলাম বাধা প্রদান করেনি; কিন্তু নিয়তকে পরিচ্ছন্ন রাখতে বলেছে। কিছুটা সৌন্দর্যময়তা ও মনের চাহিদা মাফিক কাজকর্ম করার অনুমতিও দিয়েছে; কিন্তু নিয়তকে বিশুদ্ধ রাখতে বলেছে। এর দ্বারাই এসব কজগুলো আখিরাত হয়ে যাবে। অন্যান্য ধর্মে তো এ কথা রয়েছে যে, দুনিয়াকে ত্যাগ করার দ্বারা আখিরাত লাভ হয় আর ইসলামে রয়েছে যে, সমাজে থেকেই সহীহ্-শুদ্ধ নিয়ত দ্বারা আখিরাত লাভ হয়। এসব পার্থিব কার্যাবলি দ্বারাই পরকাল গঠিত হবে।

এবার বাসগৃহের দিকে লক্ষ্য করুন। আমি গয়ায় (হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের তীর্থস্থান) দেখেছি, তাদের ওখানে ঐ ব্যক্তিতে খোদাপ্রিয় মনে করা হয় যার ঘর-দোর কিছু নেই। ভোরবেলা তাদের একটি দল বের হয়ে দ্বারে দ্বারে খাদ্য ভিক্ষা করে। তাদের ওখানে রান্নাবান্না করার কোন ব্যবস্থা নেই, কেউ কিছু ভিক্ষা দিলে তাই খেয়ে নেয়। ইসলাম এগুলোকে হীনতা ও যিল্লাতি বলে নিষিদ্ধ করে দিয়েছে। নিজেকে অপমান-অপদস্ত করা মুমিনের কাজ নয় বরং সে থাকবে মর্যাদাবান হয়ে। আহারও করুন, পানও করুন, পরিধান করুন, স্বভাবজাত কার্যাদি পূর্ণ করুন এবং নিয়ত রাখুন যে, পরকালের জন্য করছি; আল্লাহর আদেশ পালন করছি, তবে এ কাজগুলোই সাওয়াবের কারণ হবে। ইসলাম এ কথা বলেনি যে, তুমি ভিক্ষা কর, সমাজের উপর বোঝা হয়ে যাও; বরং উপার্জন করতে বলেছে। হালাল পন্থায় উপার্জন করাকে ফরয করা হয়েছে। ব্যবসা-বাণিজ্য কর,

কৃষিকাজ কর, অর্থ উপার্জন কর। এ দ্বারা নিজের উপকার সাধন কর, অপর মুসলিম ভাইদেরও সেবা কর। ইসলাম এ পথই নির্দেশ করেছে। সবকিছু ত্যাগ করে পাহাড়ের গুহায় গিয়ে বসে থাকতে বলেনি।

কোন কোন ধর্মে এ প্রথাও রয়েছে যে, অঙ্গকে অবস করে দাও, এতে পরকাল লাভ হবে। যেমন হাত উপরে তুলে বেঁধে রাখা হয়, এতে হাত শুকিয়ে যায় এবং কার্যক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। ব্যক্তি মনে করে এ দ্বারা তার পরকালের কল্যাণ সাধিত হল। ইসলাম বলে এসব অর্থহীন কাজ, এর সাথে পরকালের কী সম্পর্ক? পরকাল লাভের আশায় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে অকর্মণ্য করে তুলতে গিয়ে কেউ কেউ কথা বলা বন্ধ করে দেয়। ইসলাম বলে, একটি অঙ্গকে নষ্ট করে দেয়া কী করে আখিরাত হয়? শক্তিকে কাজে লাগানোর নাম আখিরাত, শক্তিকে কোন কাজে না লাগানোর নাম আখরাত নয়।

একবার আমি গয়া গিয়েছিলাম। সেখানে অনেক উঁচু একটি মন্দির রয়েছে। এতে অনেকগুলো বৌদ্ধমূর্তি রাখা ছিল। আমরা দেখলাম, বৌদ্ধের বিশাল একটি মূর্তির চারপাশে লোকজন ঘৃতপ্রদীপ জ্বালাচ্ছে। বহু পূজারী প্রদীপ জ্বালিয়ে চলে যাচ্ছে। আমি এক পূজারীর কাছে জানতে চাইলাম, তোমরা এত ঘি কেন নষ্ট করছ? কোন মানুষে খেয়ে নিলে তার শরীরে শক্তি হত, কেন অযথা এগুলো নষ্ট করছ? সে আমার কথা শুনেছে, কিন্তু কথা বলছে না। আমি মনে করলাম হয়ত সে বধির, তাই আমি একটু জোরে বলাম, কিন্তু সে আমার দিকে তাকিয়ে দেখছে কিন্তু উত্তর দিচ্ছে না। এবার আমি আরো জোরে বললাম, তখন লোকজন আমাকে বলল, কেন শক্তি ব্যয় করছেন? সে উত্তর দিবে না। তাদের ধর্মে নিরবতা পালন একটি ইবাদত। এ ব্যক্তি চল্লিশ বছর যাবৎ কথা বলছে না। অন্য একজনকে দেখিয়ে বলল, আর এ ব্যক্তি কথা বলছে না পঞ্চাশ বছর যাবত। তো বাকশক্তি হল আল্লাহ কর্তৃক প্রদত্ত একটি ক্ষমতা, একে ধ্বংস করে দেয়ার নাম ইবাদত নয়। ইসলাম বলে, এ শক্তি দ্বারাই তো পরকালের পূজি সঞ্চয় করবে, শক্তি ধ্বংস করে দিলে মানুষ ত্রুটিপূর্ণ হয়ে পড়বে, তখন তার পরকালও হবে ত্রুটিপূর্ণ। বাকশক্তিকে ব্যবহার কর আল্লাহর কালাম তিলাওয়াতে, দুরুদ শরীফ পাঠে, অন্যান্য ইবাদতে, মানুষের সংশোধনে, সৎ পরামর্শদানে এবং সত্যকথা বলায়। এসব বিষয়ে এ শক্তিকে কাজে লাগাও, পরকাল সুন্দর হবে। এমন করো না যে, এ শক্তিকে ধ্বংস করে দিয়ে অকর্মণ্য হয়ে বসে থাকলে। এ দ্বারা তো পাপ বৃদ্ধি পাবে।

আপনার হাত রয়েছে, এ দ্বারা মুসাফাহা করুন, সাওয়াব পাবেন, পরকাল উন্নত হবে। কুরআন পাককে স্পর্শ করুন সাওয়াব হবে। বাইতুল্লাহ শরীফকে স্পর্শ

করুন সাওয়াব হবে। হাত যদি থাকে তবে হাত দ্বারা সাওয়াব লাভ হবে। যদি হাত উপরে উঠিয়ে শুষ্ক করে ফেলা হয় তবে শক্তিও নিঃশেষ, সাওয়াবও নিঃশেষ। হাত দ্বারা সাওয়াব ও প্রতিদান লাভের যতগুলো পথ ছিল সবই রুদ্ধ হয়ে গেল। এভাবে যদি পাগুলো সচল থাকে তবে মসজিদে গমন করবে। বন্ধু-বান্ধবদের বাড়িতে যাবে, ইবাদতগাহে যাবে, ওয়াজ নসীহতের মাহফিলে যাবে। এসবের দ্বারা সাওয়াব ও প্রতিদান লাভ হবে। পায়ে কুড়াল মেরে যদি শেষ করে দেয়া হয়, তবে না মসজিদে যেতে পারবে, না ওয়াজের মজলিসে যেতে পারবে আর না হজ্জে যেতে পারবে। এমতাবস্থায় কী নেকী সে লাভ করবে?

সকল ধর্ম এ কথাই বলেছে যে, দুনিয়াকে বিসর্জন দাও তবেই আখিরাত লাভ হবে, শরীরকে ধ্বংস কর তবেই পরকাল পাওয়া যাবে। ইসলাম বলে পৃথিবীতে অবস্থান করে পরকাল সৃষ্টি কর। 'তরকে দুনিয়া' বা দুনিয়া বর্জন অর্থ এ নয় যে, দুনিয়ার নেয়ামতসমূহ ভোগ কর না, বরং এর অর্থ হল ভোগ কর কিন্তু সীমালংঘন কর না, মাত্রা ছাড়িয়ে যেও না। মধ্যমপন্থা অবলম্বন কর, সমতা বিধান কর। এর দ্বারা নিজের প্রয়োজনও মেটাও, অন্য ভাই-বন্ধুরও খেদমত কর। এতে তোমার পরকাল সুন্দর হবে। সুতরাং এগুলো নিয়ত নির্ভর এবং স্বেচ্ছায় করণযোগ্য কাজের জন্য প্রযোজ্য। যদি এ কাজগুলো আল্লাহর পছন্দ মাফিক হয় দুনিয়াতেই আখিরাত গঠিত হবে।

পার্থিব কাজের ব্যাপারে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি

পৃথিবীর প্রধান কাজগুলো হল নিদ্রা যাওয়া, জাগ্রত হওয়া, আহার করা, পান করা, বসবাস করা ও গৃহনির্মাণ করা। এসগুলোকে আল্লাহ তাআলা নেয়ামত বলে গণ্য করেছেন। বলা হয়েছে–

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِيْنَةَ اللهِ الَّتِىْ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبٰتِ مِنَ الرِّزْقِ.

হে নবী! আপনি বলুনঃ আল্লাহর সাজ-সজ্জাকে যা তিনি বান্দাদের জন্যে সৃষ্টি করেছেন এবং পবিত্র খাদ্যবস্তুসমূহকে কে হারাম করেছে? [আরাফ : ৩২]

আল্লাহ তাআলা এগুলোকে হারাম সাব্যস্ত করতে নিষেধ করেছেন। তবে সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছেন। যথা রেশমী কাপড় পুরুষদের জন্য নাজায়িয, মহিলাদের জন্য জায়িয। অলংকারের মধ্যে সোনা-রূপা মহিলাদের জন্য জায়িয, পুরুষদের জন্য নাজায়িয। তো সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছে, এই সীমার মধ্যে থেকে ব্যবহার করতে থাক।

বাসগৃহ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা তাঁর ইহসানের কথা উল্লেখ করে বলেছেন–

وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ بُيُوْتِكُمْ سَكَنًا.

আল্লাহ তাআলা তোমাদের বাসগৃহের মধ্যে তোমাদের জন্য শান্তি ও নিরাপত্তার ব্যবস্থা রেখেছেন। [নাহল : ৮০]

অতএব তোমরা ঘরবাড়ি নির্মাণ কর এবং তাতে বসবাস কর। আয়াতের পরবর্তী অংশে আল্লাহ তাআলা নানা ধরনের ঘরের কথা উল্লেখ করেছেন। কখনো কখনো এ ঘর কাপড়েরও হয়ে থাকে, অর্থাৎ কাপড়ের তাঁবু, কখনো চামড়ারও হয়ে থাকে, অর্থাৎ চামড়ার তাঁবু। কখনো বা হয়ে থাকে ইট-পাথরের। এভাবে বিভিন্ন প্রকারের ঘরের কথা উল্লেখ করে আল্লাহ তাঁর ইহসানের কথা প্রকাশ করেছেন। নেয়ামকেই ইহসান বলে গন্য করা হয়, বিপদাপদ ইহসানরূপে গণ্য হয় না। বাসগৃহকে আল্লাহ তাঁর নেয়ামত স্বরূপ গণ্য করেছেন, তো কে আছে আল্লাহর নেয়ামতকে অস্বীকার করার? সীমার মধ্যে থেকে তাকে ব্যবহার কর, বাড়াবাড়ি ও সীমালঙ্ঘন কর না। শরীয়তের সাধারণ নিয়মনীতি অনুসরণে আরামের সামগ্রী নিজের জন্য সংগ্রহ কর, তা আহার্য হোক বা পানীয় হোক। বরং এক হাদীসে এমনও বলা হয়েছে–

إن الله يحب ان يرى أثر نعمته على عبده.

আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাকে যে নেয়ামত দান করেছেন, তিনি ঐ নেয়ামতের প্রকাশ তাঁর বান্দার মধ্যে দেখতে পছন্দ করেন।

সুতরাং আহারও রকমারী হোক, পোশাকও আকর্ষণীয় হোক, বসবাসও উন্নত হোক। এমন নয় যে, জীর্ণশীর্ণ অবস্থায় থাকবে, ময়লা পোশাক ও মলিন আসবাব ব্যবহার করবে– না থাকবে পরিষ্কার, না থাকবে পরিচ্ছন্নতা। বাড়িঘর নির্মাণের নির্দেশ দেয়া হয়েছে, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, নিজ বাসগৃহের আঙ্গিনা ও আশপাশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখ, ঘর ও ভবনকে পরিষ্কার রাখ, রাস্তাঘাট পর্যন্ত পরিষ্কার রাখ। পোশাক-পরিচ্ছদ পরিচ্ছন্ন রাখার আদেশ দেয়া হয়েছে। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে ইসলামে বিশেষ একটি অধ্যায় রয়েছে। এসব জিনিস ত্যাগ করতে বলা হয়নি, সীমা নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে যে, এ সীমা অতিক্রম কর না। সুতরাং আমাদের পরকাল ইহকাল হতে প্রকাশিত হয়, এই দেহ হতেই পরকাল জন্মলাভ করে।

ঈমানী আমলের সুগন্ধি

হাদীসে বলা হয়েছে, যখন মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে আসে এবং ফেরেশতাগণ রূহ বের করার জন্য আগমন করেন, তখন হাত-পা শুঁকে দেখেন যে, তাতে ঈমানের সুগন্ধী কতটুকু রয়েছে? কেননা ঈমানী আমল সম্পাদনের দ্বারা শরীরে সুগন্ধির তৈরি হয়। এ জগতে আমরা তা অনুভব করতে পারি না। পরকালে তা অনুভব করতে পারব। হাদীসে বলা হয়েছে–

خلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك.

রোযায় মানুষ যখন পানাহার করে না তখন তার মুখে একপ্রকার দুর্গন্ধের সৃষ্টি হয়। আল্লাহর নিকট এ ঘ্রাণটি মিশক-আম্বরের সুগন্ধী হতেও অধিক প্রিয় ও পছন্দনীয়। এখানে তো এ হল দুর্গন্ধ, ওখানে তা হবে সুগন্ধি। আর প্রকৃতপক্ষে এ সুগন্ধি হল রোযার, আর রোযার মধ্যে ঘ্রাণ ও সুগন্ধি আসে ঈমানের কারণে। যদি ঈমান না থাকে, তবে রোযা উপবাসের নামান্তর। এই সুগন্ধি হল ঈমানের সুগন্ধী। ফেরেশতাগণ এ সুগন্ধিকে শোঁকেন, কী পরিমাণ সুগন্ধি রয়েছে তা যাচাই করেন। কখনো এমনও হয় যে, মানুষের কোন আমল নেই, ফেরেশতাগণ মনে করবেন এ ব্যক্তি জাহান্নামের উপযুক্ত। সেইসব ফেরেশতা এসে উপস্থিত হবেন, যারা কাফেরদের রূহ কবজ করার জন্য এসে থাকেন। এদের আকৃতি অত্যন্ত ভয়ানক হবে। তারা তাদের হাতকে যখন ঐ ব্যক্তির ভিতর ঢুকিয়ে দেবেন তখন বুঝতে পারবেন, তার পায়ের গোছার সাথে একটি আমল সংযুক্ত হয়ে রয়েছে। কোন উপলক্ষে সে একবার সুবহানাল্লাহ বলেছিল, যার একটি নেকী পাওয়া যাচ্ছে। তখন রহমতের ফেরেশতাগণ বলবেন, তোমরা সরে যাও, আমরা তার রূহ কবজ করব।

বোঝা গেল, এ আমলগুলো শরীর দ্বরাই সম্পাদিত হয়, পায়ের গোছা হতেও আমল বের হবে, কলিজা হতেও বের হবে। এমনও হয়, মানুষ কোন সময় আধ্যাত্মিক শক্তি দ্বারা আমল করে থাকে। তখন এ আমলের চিহ্ন হৃদয়ের ভাস্বর হয়ে থাকে। দাঁড়িয়ে যদি আমল করে, তবে যেহেতু মানুষ পেশীর উপর ভর করে দাঁড়ায় তাই এ আমলের লক্ষণ পাওয়া যাবে পেশীর মধ্যে। মানুষ বলে থাকে, অমুক ব্যক্তি অত্যন্ত সাহসী বুকে জিহাদ করেছেন, এ আমলের সম্পর্ক হল বুক বা কলিজার সাথে। প্রত্যেকটি অঙ্গের সাথে আমল সম্পর্কিত রয়েছে। আর ফেরেশতাগণ তা চিহ্নিত করতে পারেন। তারা প্রতিটি অঙ্গে তালাশ করবেন, অনুসন্ধান করবেন এবং বলবেন তাঁর এ আমল পায়ের গোছায় সম্পৃক্ত ছিল। এ ব্যক্তি নেককার ও পূণ্যবান, আযাবের ফেরেশতা তাঁর রূহ কবজ

করতে পারবে না, আমরাই কবজ করব। সুতরাং এই দেহ ও দেহের আমল দ্বারা আখিরাত তৈরি হয়েছে।

আল্লাহর দরবারে সর্বপ্রথম উপস্থিতি

একথাও রয়েছে যে, মৃত্যুর পর মুমিনের রূহ আসমানে চলে যায়। হাদীসে বলা হয়েছে, প্রথম আকাশে হযরত জিবরাঈল আ. তাকে অভ্যর্থনা জানান, তাঁর সাথে সত্তর হাজার ফেরেশতার একটি বিরাট দল থাকে। ফেরেশতাগণ সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন আর মুমিনের রূহ অত্যন্ত সম্মান ও মর্যাদার সাথে কাতারের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করে যায়। তারপর দ্বিতীয় আসমানে অবস্থানরত নৈকট্যশীল ফেরেশতাগণ তার সঙ্গী হন, তারপর তৃতীয় আসমানে অবস্থানরত নৈকট্যশীল ফেরেশতাগণ তার সঙ্গী হন। এভাবে রূহ আরশ পর্যন্ত পৌছে যায়। সেখানে পৌছে আল্লাহর দরবারে সিজদা করে। প্রাথমিক অবস্থায় আল্লাহ তাআলা ধমকের সুরে বলেন, কেন এসেছ? কেমন করে এসেছ? কী নিয়ে এসেছ?

এক আলেমের ইনতেকাল হল, তখন কোন এক আরিফের উপর তাঁর অবস্থাকে প্রকাশ করা হল। ঐ আলেমকে আল্লাহ তাআলার দরবারে পেশ করা হলে আল্লাহ তাআলা ধমকের সুরে বললেন, কেন এসেছ? কী নিয়ে এসেছ? তিনি বললেন, আমি একশত পঞ্চাশ খতম কুরআন নিয়ে এসেছি। আল্লাহ বললেন, একটিও কবুল হয়নি, তারপর বললেন, আমি এত রোযা রেখেছি, আল্লাহ বললেন, এসব কবুল হয়নি। তিনি বললেন, এত রাকাআত তাহাজ্জুদ নামায পড়েছি; আল্লাহ বললেন, সেসব কবুল হয়নি। এখন তিনি পেরেশান হয়ে পড়লেন– কী পেশ করবেন আল্লাহর দরবারে। আল্লাহর পক্ষ থেকে বারবার বলা হচ্ছে, কী নিয়ে এসেছ? সর্বশেষ তিনি বললেন, আমি আপনার রহমতের উপর ভরসা করে, রহমতের আশা নিয়ে এসেছি, অন্য কিছু আমার নিকট নেই। তখন আল্লাহ তাআলা বললেন, এখন সঠিক কথা বলেছ। আমার রহমত ও দয়া তোমার জন্য ওয়াজিব হয়ে গিয়েছে। কোন এক সময় হয়ত এ নিয়ত করেছিল, এখন তা কাজে লাগল।

আল্লাহর ব্যাপক বিস্তৃত মাগফিরাত

মানুষের জন্য কর্তব্য হল অন্তরের নিয়তকে বিশুদ্ধ রাখা। আমলের মধ্যে সবারই ত্রুটি হয়ে থাকে, প্রত্যেক ব্যক্তিরই ছোট হোক বা বড় হোক কিছুনা কিছু গুনাহ অবশ্যই হয়ে যায়। ব্যতিক্রম কেবল নবী আ.গণ, কারণ তাঁরা মাসুম হয়ে থাকেন। নবীগণ ব্যতীত এমন কোন ব্যক্তি নেই যার কোন ভুলভ্রান্তি বা অপরাধ

হয় না। এ বিষয়টিই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক হাদীসে ইরশাদ করেছেন–

ان تغفر اللهم تغفر جمًا، واى عبد لك لا السمًا.

হে আল্লাহ! তুমি যখন ক্ষমা করেই দেবে, তাহলে সকল গুনাহ ক্ষমা করে দাও। কে আছে এমন বন্দা যে কখনো কোন গুনাহ করেনি! তোমার দরবারে সকলেই গুনাহগার।

হাদীস শরীফে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এ দুআ বর্ণিত হয়েছে–

ربى مغفرتك اوسع من ذنوبى ورحمتك ارجٰى عندى من عملى.

অর্থাৎ হে আমার প্রতিপালক! তোমার ক্ষমা আমার গুনাহ হতে অনেক বেশি প্রশস্ত। যত গুনাহই করি, হাজার বছরও যদি গুনাহ করি, তবুও তা সীমাবদ্ধই হবে, আর তোমার রহমতের কোন সীমা-পরিসীমা নেই। তোমার রহমতের তুলনায় আমার গুনাহগুলো কী-ইবা মূল্য রাখে! আর আমার আমলগুলোও সীমিত, এমনকি উল্লেখযোগ্য কিছুই নয়, কিন্তু তোমার রহমত তার চেয় বহুগুণ প্রশস্ত এবং সুদূর বিস্তৃত।

তওবার পথ যেন ছেড়ে দেয়া না হয়

মোটকথা, মানুষের মধ্যে আল্লাহর এমন কোন কান্দা নেই, যার ভুল হয় না, ত্রুটি-বিচ্যুতি হয় না। কেবল আম্বিয়া আ. গুনাহ থেকে মুক্ত। এ কারণেই সবাই আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহের উপর নির্ভরশীল। আল্লাহ যখন দয়া করবেন তখনই মাগফিরাত লাভ হবে। নিয়ত সবসময় এমন হওয়া উচিত যে, মানুষ আল্লাহর উপর ভরসা করবে। যখন কোন গুনাহ হয়ে যাবে, তওবা করবে। গুনাহ সংঘটিত হওয়ার সাথে সাথে তওবা করে নেবে, যেন আমলের খাতা পরিষ্কার হতে থাকে। সুতরাং প্রকৃত জিনিস হল নিয়ত, অর্থাৎ মানুষের নিয়ত সবসময় সহীহ ও আল্লাহমুখী হওয়া কর্তব্য।

এক হাদীসে কুদসীতে ইরশাদ করা হয়েছে– 'হে বান্দাগণ! তোমরা যদি এত অধিক পরিমাণ গুনাহ নিয়ে আমার দরবারে উপস্থিত হও যে, তোমার গুনাহে আসমান-জমিন ঢেকে যায় তবে আমি তোমার গুনাহ হতে অধিক বর্ধিত মাগফিরাত নিয়ে তোমার সাথে সাক্ষাৎ করব। কিন্তু শর্ত হল এই, তোমার অন্তরে আমার বড়ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব থাকতে হবে।' সুতরাং প্রকৃত বিষয় হল আল্লাহ

তাআলার বড়ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব। কৃতজ্ঞ ব্যক্তিই প্রতিষ্ঠিত থাকবে। সে যদি কোন ভুলও করে ফেলে, তখন মালিক বলবে একে ক্ষমা করা যেতে পারে। এ জন্যই যদি গুনাহ হয়ে যায় তবে সাথে সাথে তওবা করে নিবে। কেননা, যদি গুনাহ করে এবং তা অন্তরে বদ্ধমূল হয়ে যায়, তারপর পুনরায় গুনাহ করে, তবে ক্রমান্বয়ে তওবার তাওফিককে ছিনিয়ে নেয়া হয়। গুনাহর পর ক্ষমা প্রার্থনা কর, এতে অন্তরে মরিচা পড়তে পারে না, গুনাহ ধুয়ে মুছে পরিষ্কার হয়ে যায়।

হাদীসে বলা হয়েছে, কোন ব্যক্তি যদি অত্যন্ত গুরুতর গুনাহ করে ফেলে অতঃপর লজ্জিত হয়ে বলে, يا رب 'হে আমার প্রতিপালক', এখনও এ কথা বলেনি যে, আমাকে মাফ করে দাও। শুধু 'ইয়া রাব্বি' বলেছে, সাথে সাথে আল্লাহ বলেন–

ان يعلم ان له ربًّا يواخذه

আচ্ছা সে একথা জানতে পেরেছে যে, তারও কোন রব রয়েছেন যিনি তাকে পাকড়াও করবেন।

আল্লাহ বললেন, সে যখন একথা বুঝতে পেরেছে, কাজেই তার ক্ষমা প্রার্থনার পূর্বেই তাকে ক্ষমা করে দিলাম। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তার মাগফিরাত হয়ে গেল। তারপর পুনরায় ঐ গুনাহ করল যা পূর্বে করেছিল এবং লজ্জিত হয়ে পড়ল, তারপর আবার বলল, ইয়া রাব্বি। তখনও মাফ হয়ে গেল, তারপর পুনরায় ঐ গুনাহে লিপ্ত হয়ে পড়ল ... রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, হে মানব জাতি! তোমরা গুনাহ করে করে অতিষ্ঠ হয়ে যাবে, ক্লান্ত হয়ে পড়বে, কিন্তু আল্লাহ তাআলা ক্ষমা করে ক্লান্ত হবেন না। আল্লাহর রহমত ও দয়া সীমাহীন। এজন্য মানুষের যখনই ভুল হয়, ত্রুটি হয়ে যায়, সাথে সাথে তওবা করবে। ব্যাস, লেনদেন পরিষ্কার হয়ে গেল।

এর উদাহরণ এমন, যেমন একজন পথিক পথ চলছে, কোথাও ধাক্কা লেগে পড়ে গেল, সাথে সাথে উঠে শরীর ও পোশাক ঝেড়ে মুছে পরিষ্কার করে পুনরায় রওয়ানা হয়ে পড়ল। কিছু দূর গিয়ে আবারও পড়ে গেল এবং সাথে সাথে উঠে ঝেড়ে মুছে রওয়ানা দিল, এ ব্যক্তি তার গন্তব্যস্থলে অবশ্যই পৌছে যাবে। আর যে ব্যক্তি পড়ে যওয়ার সাথে সাথে পথ পরিবর্তন করে ফেলে সে কখনো গন্ত ব্যস্থলে পৌছতে পারবে না। সুতরাং রাস্তা ত্যাগ করা যাবে না। যখই গুনাহ হয়ে যায়, সাথে সাথে তওবা করে নাও। একদিন না একদিন পৌছে যাবে গন্ত ব্যস্থলে।

এজন্য হাদীসে বলা হয়েছে–

سددوا وقاربوا وروحوا واغدوا وشئ من الدنيا.

আল্লাহর পথে লেগে থাক, মধ্যমপন্থা অবলম্বন কর, লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে কোন বাগানে বা উদ্যানে বসে পড় না। বরং পথ ধরে এগিয়ে যেতে থাক, একদিন না একদিন অবশ্যই গন্তব্যে পৌছে যাবে।

তাওবার শক্তি

হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, যখন হযরত আদম আ. ও শয়তানের মধ্যে শত্রুতা সৃষ্টি হয়ে গেল তখন শয়তান হযরত আদম আ.-এর প্রতি হিংসা করতে শুরু করল এবং প্রতারকরূপ ধারণ করল। হযরত আদম আ.কে খেলাফতের মুকুট পরিয়ে দেয়া হল। জান্নাতের ওয়াদা দেয়া হল। তখন শয়তান ভীষণ চিন্তায় পড়ল এবং বলল, হে আল্লাহ! সর্বাবস্থায় আমার শত্রু হিসেবে হযরত আদম আ. চিহ্নিত হয়ে গেলেন এবং আমিও তাঁর চিরশত্রু হয়ে গেলাম। তার নিকট বিবেক বুদ্ধি রয়েছে, হিদায়াতের উপায় উপকরণগুলো রয়েছে। তিনি আমার সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে দেবেন। আমাকেও কিছু শক্তি সামর্থ্য দান করুন, যেন আমি তাঁর উপর বিজয়ী হতে পারি।

আল্লাহ বললেন, আমি তোমাকে সংখ্যাধিক্যের শক্তি দান কলাম। আদমের যদি একটি ছেলে হয় তবে তোমার দশটি হবে, তার যদি একশ হয় তবে তোমার একহাজার হবে। সর্বদা তুমি সংখ্যাগরিষ্ঠ থাকবে। তারা একশ কোটি হলে তোমরা একহাজার কোটি হবে।

কিন্তু শয়তানও খুব হুশিয়ার ছিল। ভাবল, সংখ্যালঘুও কখনো কখনো সংখ্যাগরিষ্ঠের উপর প্রাধান্য বিস্তার করে থাকে। সংখ্যাগরিষ্ঠের জন্য বিজয়ী হওয়া আবশ্যকীয় কিছু নয়। সে আরয করল, হে আল্লাহ! (আপনি যখন বলেছেন) নিঃসন্দেহে আমি সংখ্যাগরিষ্ঠ থাকব, কিন্তু সংখ্যালঘু দল যদি শক্তিশালী হয়, তবে তারা সংখ্যাগরিষ্ঠের উপর বিজয়ী হয়ে যেতে পারে, কাজেই আমাকে আরো অধিক শক্তি প্রদান করুন। আল্লাহ বললেন– তোমাকে আমি এ শক্তি দিচ্ছি যে, আদমের শরীরে তুমি এভাবে প্রবেশ করতে পারবে, যেভাবে রক্ত তার শিরা উপশিরায় ছুটাছুটি করে।

শয়তান তখন বলতে লাগল, এখন আমি তাকে কাবু করতে পারব। তার ভেতরে প্রবেশ করে কুমন্ত্রণা দিতে থাকব, মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটাব, আরো যা কিছু ইচ্ছা ভেতরে গিয়ে করব। এখন আমি শক্তিপ্রাপ্ত হলাম। সে এখন নিশ্চিন্ত হল।

এবার হযরত আদম আ. চিন্তায় পড়ে গেলেন, এই দুর্ভাগা অত্র শক্তির কারণে আমার ভেতরে ঢুকে পড়বে, তার ভেতরে প্রবেশ করার মত শক্তি তো আমার

নেই, কাজেই সে প্রবল হয়ে থাকবে এবং সকলকে জাহান্নামী করে ফেলবে। আমাকেও কোন শক্তি দিন (যেন আমি তার মোকাবিলা করতে পারি)।

আল্লাহ তাআলা বললেন– 'আমি আদমকেও একটি শক্তি প্রদান করছি যে, শয়তানের হাজার বছরের কার্যক্রম এক মুহূর্তে নিঃশেষ হয়ে যাবে এবং সে এমনভাবে ধরাশায়ী হবে যে, চারো হত-পা বিবশ হয়ে পড়বে।'

কেউ যদি কুফরী পর্যন্ত করে ফেল আর তওবা নসীব হয়, তবে এক মিনিটে সকল কুফরী শেষ হয়ে যাবে। সে একশ বছর কুফরী করাল আর তুমি একবার সত্যিকারের তওবা করলে, সেই শত বছরের সকল কুফরী শেষ হয়ে যাবে, তার সকল সৌধ ধ্বংস হয়ে যাবে। সুতরাং তওবার মধ্যে এমন বিশাল শক্তি নিহিত রয়েছে যে, শয়তানও এখানে অক্ষম অসহায় হয়ে পড়ে। তাই মানুষের উচিত তওবা ত্যাগ না করা। সামান্য গুনাহ হয়ে গেলেও সাথে সাথে তওবা করে নাও। এমন কি ইস্তেগফারকে স্বতন্ত্র তাসবীহরূপে পাঠ করা উচিত। দৈনিক অন্তত একশতবার ইস্তেগফার করবে।

استغفر الله تعالى ربي من كل ذنب واتوب إليه.

এই তাসবীহ একশত বার পাঠ করবে। দৈনিক একশতবার গুনাহ করবে না, কিন্তু ইস্তেগফার একশতবার হয়ে যাবে, সুতরাং তার গুনাহ শেষ হয়ে যেতে থাকবে। আর এটা কঠিন কোন কোন ব্যাপার নয়, শুধু দশ মিনিটের ব্যাপার। ফজরের নামাযের পর যদি একশতবার ইস্তেগফার পাঠ করে নেয়, তবে কোন পরিশ্রম হবে না, কষ্ট হবে না। সারা দিনে মানুষ একশত গুনাহ করে না, কিন্তু তওবা হয়ে গেল একশবার, ইনশাআল্লাহ সব গুনাহ শেষ হয়ে যাবে।

মোটকথা, কলবের নিয়তকে বিশুদ্ধ রাখবে। মধ্যম পন্থায় চলতে হবে। যখন কোন গুনাহ সংগঠিত হয়ে যাবে সাথে সাথে তওবা করে নেবে, একদিন না একদিন গন্তব্যস্থলে পৌঁছে যাবে।

এখন আমি শেষ করছি, দুআ করুন আল্লাহ আমাদেরকে তাঁর সন্তুষ্টি অনুযায়ী চলার তাওফিক দান করুন, উত্তম চরিত্র দান করুন এবং খাতেমা বিল খায়র নসীব করুন। আমীন!

واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.



বয়ান : ১২

জুমার দিনের ফযিলত

জুমা আমাদেরকে শিক্ষা দেয় যে, আমরা এক স্থানে সমবেত হব। আর সমবেত হওয়ার ধরন হবে এই– সকলের মুখ আল্লাহ তাআলার দিকে থাকবে, কিবলার দিকে মুখ করে থাকব। সবাই যখন একমুখী হয়ে বসব তখন একতার সৃষ্টি হবে। আর যদি মুখোমুখি হয়ে বসি তবে সংঘাত তৈরি হবে। সকলের মুখ একদিকে হলে সংঘাতের কোন কারণ থাকবে না। বাহ্যিকভাবে এখানে যেমন রয়েছেন, মসজিদের বাইরেও যদি আন্তরিকভাবে আল্লাহর দিকে মুখ করে নেন, তবে সেখানেও একই অবস্থার সৃষ্টি হবে। সুতরাং জুমার দিন আমাদেরকে বলছে– বাহ্যিকভাবে তোমরা যেমন একত্রিত হয়েছ, আন্তরিকভাবেও আমি তোমাদেরকে একত্র করে দিলাম। তোমরা যখন বাইরে যাবে তখন অন্তরের মুখ আল্লাহর দিকে রেখ, আল্লাহর সাথে সংযুক্ত করে রেখ, তোমাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি হবে না।

– হযরত হাকীমুল ইসলাম রহ.





اَلْحَمْدُ لله نَحْمَدُه وَنَسْتَعِيْنُه وَنَسْتَغْفِرُه وَنُؤْمِنُ بِه وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِالله مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّاٰتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَّهْدِه اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَه، وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلا هَادِىَ لَه، وَنَشْهَدُ أَنْ لاَّ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَه لاَ شَرِيْكَ لَه، وَنَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَمَوْلاَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُه وَرَسُوْلُه، أَرْسَلَهُ اللهُ إِلىٰ كَافَّـةً لِّلنَّاسِ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا وَّدَاعِيًا إِلَيْهِ بِإِذْنِه وَسِرَاجًا مُّنِـيْرًا.

أَمَّـابَعْدُ:

فَاَعُوْذُ بِالله مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ○ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ○ يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا إِذَا نُوْدِىَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَّوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِ اللهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ.

বুযুর্গানে মুহতারাম!

এখন আমি আমার নিজস্ব কিছু ব্যস্ততার কারণে আপনাদের বেশি সময় নিতে পারব না। তা ছাড়া কিছুটা ক্লান্তি ও অবসন্নতাও রয়েছে। রাতে প্রায় দুই-আড়াই ঘণ্টা বয়ান হয়েছে। কিছুক্ষণ পূর্বেও এক বিয়ে অনুষ্ঠানে প্রায় এক ঘণ্টা বয়ান

হয়েছে। এখন কোন কিছু বয়ান করার হিম্মত নেই। কিন্তু যেহেতু ঘোষণা করা হয়েছে, তাই তার প্রতি সম্মান করাও আবশ্যক। এজন্য আমি আপনাদের অল্প কিছু সময় ব্যয় করব।

সর্বপ্রথম প্রশ্ন হল আলোচ্য বিষয় নিয়ে যে, কোন বিষয়ে আলোচনা হবে? আলোচনা করার জন্য কোন বিষয়টি নির্বাচন করা হবে সেটা আমার জন্য একটি আলাদা কাজ হয়ে থাকে। এ মুহূর্তে সর্বোত্তম আলোচ্য বিষয় হল তাই যার জন্য আপনি আমি এখানে উপস্থিত হয়েছি। আর তা হল জুমার নামায; যা সর্বত্তোম আলোচ্য বিষয়, সর্বোত্তম ইবাদত এবং আল্লাহর নৈকট্য লাভেরও সর্বোত্তম মাধ্যম।

একটি হাদীস

এরই ধারাবাহিকতায় কয়েকটি কথা আরয করাই আমার উদ্দেশ্য। সে কথাগুলোও আমার নিজস্ব নয়, বরং একটি হাদীসের কথা, যা এখন আমার স্মরণ হল। সে হাদীসের তরজমা ও কিছু প্রাসংগিক কথা বর্ণনা করব। হাদীসে রয়েছে, একদা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপস্থিত হচ্ছিলেন, এমন সময় হযরত জিবরাঈল আ. উপস্থিত হলেন। তাঁর হাতে একটি আয়না ছিল এবং ঐ আয়নার ঠিক মধ্যখানে একটি কালো কোঁটা ছিল, যেটি ছিল অত্যন্ত স্পষ্ট। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, হে জিবরাঈ! এ কালো কোঁটাটি কী? এবং এ আয়নাটিইবা কেমন?

ময়দানে মাবিদ

হযরত জিবরাঈল আ. বললেন, এ কালো কোঁটাটি হল মাবিদ। যার অর্থ হল অতিরিক্ত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, মাবিদ কী? তিনি আরয করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! এ হল জান্নাতের মধ্যভাগে অবস্থিত একটি ময়দান। এর উপর-নিচে একশত জন্নাত রয়েছে। প্রতিটি জান্নাত আসমান জমিন হতে বড়। সর্বউপরের অংশ যা আরশের নিচে রয়েছে, সেখানে একটি মাঠ রয়েছে, যা সম্পূর্ণ সাদা। এখানকার ঘাসগুলোও সাদা, বৃক্ষরাজিও সাদা। মোটকথা, প্রতিটি জিনিস ধবধবে সাদা ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। আরো বললেন, মাঠটি এত বিরাট, হাজার হাজার বছর যাবৎ আমি ঘুরে বেড়াচ্ছি, কিন্তু এখন পর্যন্ত এর হাকিকত বুঝতে পারিনি।

হাদীসে রয়েছে, হযরত জিবরাঈল আ.কে তাঁর প্রকৃত আকার আকৃতিতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'বার দেখেছেন। তাঁর স্বরূপ ছিল এমন যে, জমিন হতে আকাশ পর্যন্ত, পূর্ব হতে পশ্চিম পর্যন্ত সম্পূর্ণ মহাশূন্য তার দেহ দ্বারা পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। তাঁর ছিল ছয়শত বাহু বা ডানা। মাথায় ছিল সূর্য হতে অধিকতর উজ্জ্বল মুকুট। এবার অনুমান করুন যে, সেই ময়দানটি কত বড় হবে যেখানে হযরত জিবরাঈল আ. হাজার হাজার বছর যাবত ঘুরছেন কিন্তু এখনো সম্পূর্ণ দেখতে পারেননি।

এরপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, এ ময়দানের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য কী? জিরবাঈল আ. আরয করলেন, আল্লাহর দরবার ও মজলিস অনুষ্ঠিত হওয়ার স্থান হল এ ময়দান। এ ময়দানে নবী আ.গণের মিম্বর স্থাপন হবে। গোল বৃত্ত আকারে মিম্বর সাজানো হবে। প্রত্যেক নবীর পশ্চাতে তাঁর উম্মতগণের চেয়ারগুলো সাজানো হবে। সম্পূর্ণ ময়দান অংশগ্রহণকারীদের চেয়ারে ভরে যাবে। পৃথিবীতে দীন ও নবীর সাথে যার যত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল তদনুযায়ী সে নবীর মিম্বরের নিকটবর্তী থাকবে। চেয়ারগুলো এভাবে সাজানো হবে যে, একজনের কারণে অন্যজনের কোন বিঘ্ন সৃষ্টি হবে না। যেমন আপনারা দেখে থাকবেন, বিরাট জনসমাবেশে চেয়ারগুলো এভাবে সাজানো হয় যে, সম্মুখের সারি কিছুটা নিচু এবং পিছনের সারি কিছুটা উঁচু রাখা হয়। যেন প্রত্যেকে নির্বিঘ্নে মঞ্চ দেখতে পায়। এভাবে চেয়ারগুলো সাজানো হবে। ময়দানের চারপাশের চেয়ার থাকবে না, বরং গালিচা, কার্পেট, ফানুস প্রভৃতি থাকবে। এভাবে এ ময়দান ভরে যাবে। চতুষ্পার্শ্বে নবী আ. গণের মিম্বর, তাঁদের পেছনে চেয়ারের সারি, মধ্যখানে রাখা হবে আল্লাহ তাআলার কুরসী। যার আলোচনা কুরআনে এসেছে এভাবে–

وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ

হাদীস শরীফে এ কুরসীর বড়ত্ব বর্ণনা করা হয়েছে যে, সাত আসমান ও সাত জমিন এ কুরসীর তুলনায় এমন, যেমন বিরাট মাঠে একটি আংটি পড়ে রয়েছে, এমনই বিরাট আল্লাহ তাআলার কুরসী। আর হবেই না বা কেন, যে শাহানশাহের এ কুরসী তাঁর আযমত ও বড়ত্ব অনুসারে কুরসী হবে। আল্লাহ তাআলা এ কুরসীর উপর উপবিষ্ট হন না। তিনি দেহ ও শরীর হতে পবিত্র। কিন্তু তাঁর একটি সিফাত 'মালিক' বা বাদশাহ। সুতরাং বাদশাহীর যত উপকরকণ রয়েছে সবই সমবেত করা হবে। সেখানে রাজসিংহাসনও রয়েছে, যাকে আরশে আযিম বলা হয়। আরশ হল গম্বুজের ন্যায়, যা সমস্ত সৃষ্টিকে

বেষ্টন করে রেখেছে এবং আচ্ছাদিত করে রেখেছে। আরশের উপর আল্লাহর রহমতের তাজাল্লি বিস্তৃত করে রয়েছে। কুরআনে বলা হয়েছে–

الرَّحْمٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوٰى

রহমান আল্লাহ তাআলা পবিত্র আরশে সমাসীন রয়েছেন।

সুতরাং আরশের উপর আল্লাহর রহমত বিস্তৃত রয়েছে এবং আরশ সমগ্র সৃষ্টিজগৎকে বেষ্টন করে রেখেছে। ফলাফল দাঁড়াল এই– সৃষ্টিজগৎকে আল্লাহর রহমত আচ্ছন্ন করে রেখেছে। অর্থাৎ বান্দাদের সাথে আল্লাহর যে সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে তা হল রহমত ও দয়ার সম্পর্ক, গজবের নয়। যদি আল্লাহর গজব এসে যায়, তবে মাখলুকের নাম-নিশানাও থাকবে না। আল্লাহর রহমতই সকলকে আগলে রেখেছে।

সুতরাং আরশের উপর রহমতের তাজাল্লি বিস্তৃত রয়েছে। এ রহমত থেকেই বিধানাবলি অবতরণ হয়। হিদায়াত ও পথ প্রদর্শন, আসমানী কিতাবসমূহ, আল্লাহর বিধানাবলি এবং আল্লাহর ফয়সালা ও তাকদীর– সবই এখান থেকে প্রবাহমান। রাজত্বের সকল আইনকানুন ও নির্দেশাবলি যেমন রাজসিংহাসন থেকেই প্রবর্তিত হয়ে, আরশে আজিমকেও তদ্রূপ রাজসিংহাসন মনোনীত করা হয়েছে। আরশের নিচে রয়েছে মহাসমুদ্র, যার উপর আরশ প্রতিষ্ঠিত। এই সমুদ্রের নিচে রয়েছে একশত জান্নাত, যার প্রত্যেকটি আসমান জমিন হতে অনেক অনেক বড়। একশত জান্নাতের নিচে রয়েছে একের পর এক আসমানসমূহ, তার নিচে রয়েছে সাত জমিন, একটির নিচে আরেকটি। এ হল সৃষ্টিজগতের বিস্ময়কর ধারাবহিকতা । সর্বনিম্নে জমিন, তার উপর মহাশূন্য, তার উপর একের পর এক আকাশসমূহ, তার উপর একশত জান্নাত, তার উপর রয়েছে মহাসাগর, তার উপর আরশে আজিম। আরশে পৌঁছে সৃষ্টিজগতের ধারাবহিকতা শেষ হয়ে যায়। আরশ এবং জান্নাতসমূহের মধ্যবর্তী স্থানে এ ময়দান অবস্থিত। যার আজমত ও বড়ত্ব হল এই, এখানে আল্লাহর দরবার অনুষ্ঠিত হবে। মধ্যখানে আল্লাহ তাআলার কুরসী বিছানো হবে।

ময়দানে মাযিদে জান্নাতবাসির উপস্থিতি

সকল জান্নাতবাসি এ সমাবেশে উপস্থিত হওয়ার জন্য নিজ নিজ বাহনে আরোহন করে গিয়ে পৌঁছবেন। তার স্বরূপ হবে এমন– কেউ কেউ বাতাসের সিংহাসনে আরোহন করবেন, তাদের আসনগুলো উড়ে গিয়ে সেখানে পৌঁছবে ।

এছাড়া আরো নানা ধরনের বাহন থাকবে, যার দ্বারা জান্নাতবাসি সেখানে গিয়ে পৌঁছবেন। এক সময় এমন একটি সময় আসবে যে, আগামীকাল দরবার অনুষ্ঠিত হবে। সকল জান্নাতবাসি সমবেত হয়েছেন, নবী আ.গণ নিজ নিজ মিম্বরে উপবিষ্ট হয়েছেন আর মধ্যখানে রয়েছে আল্লাহর কুরসী– যখন পূর্ণ মজলিস এভাবে প্রস্তুত হয়ে যাবে তখন বান্দাগণ অনুভব করবেন যে, এখন আল্লাহর তাজাল্লি প্রকাশ হচ্ছে, যেন আল্লাহর তাজাল্লি কুরসীতে সমাসীন হয়েছে।

হাদীসে এসেছে, এ কুরসী এত বিরাট হওয়া সত্ত্বেও এমনভাবে চড়চড় শব্দ হবে, যেমন অত্যধিক বোঝার কারণে কোন জিনিস ভেঙ্গে যাওয়ার উপক্রম হয়। এ হল আল্লাহর হায়বত বা ভয়ভীতির বোঝা, কোন দৈহিক বোঝা নয়।

হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত দাউদ আ.-কে কণ্ঠ মাধুর্যের মুজিযা প্রদান করা হয়েছিল, তাঁর কণ্ঠস্বর এত পবিত্র ও মাধুর্যময় ছিল যে, তিনি যখন মুনাজাত করতেন তখন পশুপক্ষি পর্যন্ত তাঁর আশপাশে সমবেত হয়ে যেত এবং বিভোর হয়ে থাকত। মানুষ তো বটেই, জীবকুল পর্যন্ত এক মত্ততায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ত। সেই সমাবেশে হযরত দাউদ আ.কে বলা হবে উপস্থিত সবাইকে তাঁর সুমধুর লাহান দ্বারা উপকৃত করতে। হযরত দাউদ আ. তাঁর মুজিযাময় মধুর সুরে মুনাজাত এবং আল্লাহর হামদ ও সানা পাঠ করবেন। তখন জান্নাতবাসিদেরকে প্রেমের মত্ততা আচ্ছন্ন করে নেবে, যেভাবে শরাবে তাহুরার ওয়াদা করা হয়েছে। (অর্থাৎ শরাবে তাহুরা যেভাবে জান্নাতিদের আচ্ছন্ন করে নেবে সেভাবে দাউদ আ.-এর কণ্ঠমাধুর্য জান্নাতিদেরকে আচ্ছন্ন করে নেবে।)

(শরাবে তাহুরা সম্পর্কে বলা হয়েছে) ফেরেশতাদেরকে বলা হবে– তোমরা বন্টন কর। এ শরাবে তাহুরা দুনিয়ার শরাবের মত হবে না। দুনিয়ার শরাব তিক্ত থাকে, ঐ শরাব হবে সুমিষ্ট। দুনিয়ার শরাবে জ্ঞান-বুদ্ধি লোপ পায় আর ঐ শরাব দ্বারা জ্ঞান-বুদ্ধি প্রখর হবে এবং আল্লাহর মারেফাত ও বাসিরাত সৃষ্টি হবে। সেই শরাবের নেশা ও মত্ততা এরূপ হবে যেমন অত্যধিক জিকিরের কারণে সুফী সাধকগণের মধ্যে মারেফাতের এক নেশাচ্ছন্নতা তৈরি হয়। যাতে তাঁরা আল্লাহ প্রেমের এক নিমগ্নতায় আত্মহারা হয়ে পড়েন; ইলম, মারিফাত ও আধ্যাত্মিকতার স্তরগুলো উন্মুক্ত হতে থকে।

পৃথিবীতে মারেফাতের যে নেশা ছিল, জান্নাতের শরাবে তাহুরা যেন তার স্বরূপ দৃষ্টান্ত হবে। একইভাবে জ্ঞান-বুদ্ধির উপর বিশেষ অবস্থা তৈরি করবে, রূহের উপর বিশেষ অবস্থা তৈরি করবে, আল্লাহর মারেফাত ও অন্তর্দৃষ্টি বৃদ্ধি পেতে থাকবে।

ময়দানে মাযিদে আলেমগণের মুখাপেক্ষিতা

ময়দানে মাযিদে অবস্থানকালে আল্লাহ তাআলা বলবেন–

سلونی ما شئتم

তোমাদের যা ইচ্ছা তা চাও।

সবার জন্য সাধারণ ঘোষণা দেয়া হবে। তখন সকলে মিলিত হয়ে আরয করবেন, হে আল্লাহ! কোন্ নেয়ামতটি আপনি আমাদেরকে দান করেননি? আমরা সকল নেয়ামত পেয়েছি, এখন আমাদের দরখাস্ত শুধু এই, আপনি আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যান।

আল্লাহ তাআলা বলবেন, এ নেয়ামত তোমরা পেয়েছ, যদি আমি সন্তুষ্ট না হতাম, তবে তোমাদেরকে এখানে প্রবেশ করতে দিতাম না। আমি সন্তুষ্ট হয়েছি এবং এমন সন্তুষ্ট হয়েছি যে, চিরকাল সন্তুষ্ট থাকব– কখনো অসন্তুষ্ট হব না। এ মর্যাদা তোমরা লাভ করেছ, অন্যকিছু প্রার্থনা কর। সকলে পেরেশান হয়ে একে অন্যের মুখের দিকে তাকাবেন, কী জিনিস চাইবেন? এমন কী নেয়ামত রয়েছে যা আমরা পাইনি? তখন সবাই মিলে উলামায়ে কেরামের শরণাপন্ন হবেন। তাঁদের নিকট ফতোয়া চাইবেন যে, কোন জিনিসটি বাকি রয়েছে যা আমরা প্রার্থনা করব? আমাদের জানামতে সকল নেয়ামতই প্রাপ্ত হয়েছি। ইলম ও উলামার প্রয়োজনীয়তা যেন সেখানেও অবশিষ্ট থাকবে। দুনিয়াতে মানুষ উলামায়ে কেরাম থেকে পাশ কাটিয়ে থাকতে চায়, অথচ সেখানেও উলামায়ে কেরামের মুখাপেক্ষিতা বলবৎ থাকবে। কারো ব্যক্তিসত্তার মুখাপেক্ষী তারা হবে না, তারা ইলমের মুখাপেক্ষী হবে। আর মানুষ চিরকালই ইলমের মুখাপেক্ষী থাকবে। এজন্য যে, ইলম হল আল্লাহ তাআলার গুণ। তাঁর সত্তা যেমন অসীম, তাঁর গুণালিও তেমন অসীম। মানুষ যত বৃহৎ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হোক না কেন, তারপরও 'অসীম মর্যাদা'র স্তর থেকে যাবে, যার অন্বেষণ সর্বদা থাকবে।

ইমাম শাফেয়ী রহ.-এর একটি কবিতা রয়েছে যা তিনি মাঝে মধ্যে আবৃত্তি করতেন (কবিতাটির তরজমা হল এই)–

প্রতিনিয়ত সময় আমাকে আদব শিক্ষা দিচ্ছে আর আমি আমার বিবেক বুদ্ধির ত্রুটি বুঝতে পারছি। যখনই আদবের কোন স্তর অতিক্রম করেছি তখনই বুঝতে পেরেছি যে, ইতোপূর্বে আমার জ্ঞান-বুদ্ধি এ স্তরের সন্ধান পায়নি, এ পর্যন্ত আমার জ্ঞান-বুদ্ধি অসম্পূর্ণ ছিল। এরপর যখন পরবর্তী স্তর অতিক্রম করি তখনও বুঝতে পারি যে এ পর্যন্ত আমি এ স্তর সম্পর্কে অজ্ঞ ছিলাম। এভাবে

আদবের যত স্তর অতিক্রম করি, আমার জ্ঞান-বুদ্ধির ত্রুটি আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ইলমের স্তর যতই বৃদ্ধি পাচ্ছে, আমার অজ্ঞতা আমার কাছে ততই স্পষ্ট হচ্ছে। যখনই ইলমের কোন বিশেষ স্তরে পৌঁছেছি, তখনই অনুধাবন করতে পেরেছি যে, এ পর্যন্ত আমি এ বিষয়ে অজ্ঞ ছিলাম। ইলমের দ্বার যতই উন্মুক্ত হচ্ছে, আমার অজ্ঞতার স্তরগুলোও আমার নিকট ততই প্রকাশিত হচ্ছে।

মানুষের অজ্ঞতা সীমাহীন আর জ্ঞান সীমিত। যা কিছু আমাদের জানা আছে তা সীমিত, আর আমাদের জ্ঞান বহির্ভূত যেসব বিষয় রয়েছে তা অসীম। এজন্য যে, ইলম হল আল্লাহর সিফাত, মানুষের ইলম যতই উন্নত হোক, চাই সে ইলমের কোটি কোটি স্তর অতিক্রম করুক, তথাপি অগণিত স্তর বাকি থেকে যাবে। কেননা সে তো অসীমের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। তাই আমি বলছিলাম, ইলমের প্রয়োজন শুধু পৃথিবীতেই নয়, জান্নাতেও এর প্রয়োজনীয়তা থাকবে। কেননা আল্লাহর সিফাত সেখানে গিয়ে সীমিত হয়ে যাবে না। ইলম ও মারেফাতের স্তরসমূহ সেখানেও সীমাহীন থাকবে।

যাই হোক, মানুষ তখন উলামায়ে কেরামের দ্বারস্থ হবেন যে, সকল নেয়ামতই আমরা পেয়েছি, কোন জিনিস অবশিষ্ট রয়েছে যা আমরা প্রার্থনা করব? উলামায়ে কেরাম একত্রিত হয়ে পরামর্শ করবেন যে, একটি জিনিস বাকি রয়েছে, যা আমরা এখনও পাইনি, তা-ই প্রার্থনা কর। আর তা হল এই, আল্লাহ যেন তাঁর জামাল মুবারক আমাদেরকে দেখান, আল্লাহ তাআলার দিদার এখনও আমাদের লাভ হয়নি, এ নেয়ামত আমরা এখনও পাইনি। কুরআন মাজিদে বলা হয়েছে–

وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ إِلٰى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ

অনেক মুখমণ্ডল সেদিন অধিকতর তরতাজা এবং উজ্জ্বল হবে, যারা তাদের প্রভুকে দেখতে থাকবে।

তেমনি কাফেরদের সম্পর্কে সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে–

كَلَّآ إِنَّهُمْ عَنْ رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوْبُوْنَ

(আর কিছু মুখমণ্ডল সেদিন কালো ও মলিন থাকবে) তাদের এবং আল্লাহর মাঝে পর্দা ও অন্তরায় সৃষ্টি করে দেয়া হবে, তাঁর দিদার লাভ থেকে তারা চিরবঞ্চিত থাকবে।

তো এ আয়াতে আল্লাহ তাআলার দিদার বা দর্শন লাভের ওয়াদা দেয়া হয়েছে, এ ওয়াদা সেখানে বাস্তবায়িত হবে। ওলামায়ে কেরাম পরামর্শ দেবেন যে, একটি নেয়ামত বাকি রয়েছে, তা চাও। আর তা হল আল্লাহর দিদার। তখন সবাই মিলে একইভাবে আরয করবেন, আমাদেরকে এ নেয়ামতটি দান করুন, আপনার জামাল মুবারক দর্শনের সুযোগ দিন। এরই আকাঙ্ক্ষায় আমরা ইবাদত করেছি, জীবন কাটিয়ে দিয়েছি, আপনার দিদার লাভই আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। এখন যদি সে দিদার লাভ না হয় তবে কখন আর সে দিদার লাভ হবে? আবেদন কবুল করে নেয়া হবে। হাদীসে বলা হয়েছে, পর্দাসমূহ উঠে যেতে শুরু করবে, শুধু একটি পর্দা– আযমত ও কিবরিয়ার পর্দাটি বাদে অন্য সব পর্দা উঠে যাবে এবং বন্দাগণ স্বীয় আল্লাহকে দেখতে পাবেন। এমনভাবে দেখবেন যে, কোন আকার নেই, দিক নেই, রং নেই– তবু প্রত্যক্ষ হচ্ছেন এবং বান্দা তাঁকে অবলোকন করছেন। এই হল ময়দানে মাযিদের কাজ। এ যেন আল্লাহর দরবার। এ ছিল একটি হাদীস, যার তরজমা ও তাফসীর আমি আপনাদের সামনে আরয করলাম।

পৃথিবীতে ময়দানে মাযিদের দৃষ্টান্ত

এ ময়দানে মাযিদের অবস্থান হল জান্নাতে। প্রতি সপ্তাহে একবার এখানে সমাবেশ হবে। যখন দরবার শেষ হবে তখন আল্লাহ তাআলা জান্নাতবাসীকে বলবেন, নিজ নিজ স্থানে চলে যাও। জান্নাতবাসীগণ প্রত্যাবর্তন করবেন এবং নিজ নিজ প্রাসাদে পৌঁছে যাবেন।

পৃথিবীতে এই দরবারের দৃষ্টান্তরূপে জুমার দিনকে রাখা হয়েছে। এ হল সপ্তাহে একবার অনুষ্ঠেয় ইহজগতের আল্লাহর দরবার। ইমাম ও খতীব আল্লাহ তাআলার প্রতিনিধি, যেভাবে কুরসীর উপর আল্লাহ তাআলার তাজাল্লি হবে, এখানে খতীবও মিম্বরে উপবিষ্ট হন, তিনি আল্লাহর প্রতিনিধি, খুৎবা প্রদানের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার তাজাল্লি প্রকাশ পাচ্ছে। প্রকৃত খতীব হলেন আল্লাহ তাআলা স্বয়ং, তারপর খতীব হলেন আম্বিয়ায়ে কেরাম আ.। তাই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

انا قائدهم وانا خطيبهم

কিয়ামতের দিন আমি সকল উম্মতের নেতা এবং খতীব হব,
আমিই তাঁদের সম্মুখে খুৎবা প্রদান করব।

সুতরাং খুৎবার আকৃতিতে আল্লাহ তাআলার যে তাজাল্লি প্রকাশ পায় তার ব্যাপারে আম্বিয়ায়ে কেরাম হলেন আল্লাহর প্রতিনিধি। স্বয়ং আল্লাহ তাআলা হলেন মূল খতীব, আর এ পৃথিবীতে তাঁর প্রতিনিধি হলেন ইমাম ও খতীবগণ।

সাধারণ খুৎবার চেয়ে জুমার খুৎবার আদব অধিক

এ কারণেই সাধারণ ওয়াজ ও খুৎবার যে আদব রয়েছে তার চেয়ে জুমার খুৎবার আদব অধিক ও পৃথক। বর্ণিত হয়েছে–

إذا خرج الإمام فلا صلوة ولا كلام

অর্থাৎ জুমার খুৎবা প্রদানের জন্য যখন ইমাম নিজ জায়গা হতে উঠে দাঁড়াবেন তখন সালাম-কালাম বা নফল নামায কিছুই জায়িয নয়। কাজ শুধু এই– খতীবকে খুৎবারত অবস্থায় দেখতে থাক। বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি কঙ্কর নিয়ে নাড়াচাড়া করল সে অনর্থক কাজ করল, মাকরূহ কাজে লিপ্ত হল। সাধারণ ওয়াজে কঙ্কর নিয়ে নাড়াচাড়া করা মাকরূহ নয়; কিন্তু জুমার খুৎবা প্রদানকালে যদি কেউ কঙ্কর, চাটাই প্রভৃতি নিয়ে খেলা করাকে নিষেধ করা হয়েছে। খুৎবা আরম্ভ হওয়ার পর নামাযও জায়িয নয়। তিলাওয়াত করাও জায়িয নয়, দুরুদ শরীফের মত পবিত্র ইবাদতও জায়িয নয়। খুৎবা আরম্ভ হওয়ার পর সর্বপ্রধান ও সর্বোত্তম কাজ হল খতীবের চেহারাকে দর্শন করা, মনোযোগ সহকারে খুৎবা শ্রবণ করা। খতীবকে যে ব্যক্তি অধিক পরিমাণে দেখার অভ্যাস করবে, ময়দানে মাযিদে আল্লাহ তাআলার অধিক দিদার তার নসিব হবে। আল্লাহর তাজাল্লি সেখানে সামনে থাকবে।

এজন্য বলা হয়েছে, আযানের পূর্বে প্রথম ওয়াক্তে যে ব্যক্তি জুমার জন্য মসজিদে এসে হাজির হয় এবং প্রথম কাতারে জায়গা পেয়ে যায়, সে এমন– যেন একটি উট আল্লাহর রাস্তায় কুরবানী করল। তারপর এর চেয়ে একটু কম হবে, যেন গরু কুরবানী করল, তারপর যেন বকরী জবাই করল, তারপর যে এল সে যেন মুরগী জবাই করল। যখন খতীব খুৎবা প্রদানের জন্য দাঁড়ান তখন ফেরেশতা আ.গণ তাঁদের কাগজপত্র বন্ধ করে রেখে দেন এবং খুৎবা শোনার জন্য বসে পড়েন। খুৎবা আরম্ভ হওয়ার পর উচ্চ মর্যাদার আর কোন স্তর বাকি থাকে না যে, তাতে কারো নাম লেখা হবে। এখন যে আসবে, তার কেবল ফরয আদায় হবে। যিনি এখানে প্রথম কাতারে থাকবেন, তিনি ওখানেও নবী আ.গণের পর প্রথম কাতারে থাকবেন, এখানে যে যত পিছনে, ওখানেও সে তদনুযায়ী পেছনে থাকবে।

হাদীসে বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি একাধারে তিন জুমা ত্যাগ করে অথচ তার শারীরিক, মানসিক বা শরয়ী কোন অসুবিধা নেই, তবে ধারণা করা যায় যে, জীবনে আর কখনো জুমার নামায পড়ার তাওফীক তার হবে না– যতক্ষণ না সঠিকভাবে তওবা করে ফিরে আসবে। জুমার নামায নিঃসন্দেহে ফরয নামায, কিন্তু অন্যান্য সাধারণ ফরয হতে এর কিছু অতিরিক্ত বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এ খুৎবারও অন্যান্য সাধারণ খুৎবা হতে পৃথক মর্যাদা ও বিশেষত্ব রয়েছে।

ওলামায়ে কেরাম লিখেছেন, যোহরের ফরয চার রাকাত আর জুমার ফরয হল দুই রাকাত। দুই ফরযের স্থলাভিষিক্ত হল এই দুই খুৎবা, যা ইমাম দাঁড়িয়ে পাঠ করেন। এজন্যই এ খুৎবার আদব অন্য সাধারণ খুৎবা হতে ভিন্ন। এভাবে যে, খুৎবা প্রদানকালে খতীবকে দেখতে থাক, তিলাওয়াতও কর না, অন্য ইবাদতও কর না, বড় ইবাদত হল এই– খুৎবা শ্রবণ কর এবং খতীবকে দেখ। এই দুইটি খুৎবা যেন দুই রাকাত নামাযের পরিবর্তে। কাজেই নামায চার রাকাতই হয়ে যাচ্ছে। এভাবে যে, নামায দুই রাকাত আর দুই খুৎবা দুই রাকাতের পরিবর্তে। আল্লাহ তাআলা এই জুমাকে ময়দানে মাযিদের নমুনারূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণ করেছেন। এজন্য শরীয়তের পরিভাষায় জুমার নাম হল ইয়াওমুল মাযিদ। ইয়াওমুল মাযিদ বলা হয়েছে এ কারণে যে, এ হল পৃথিবীতে জান্নাতের ময়দান। জান্নাতে গিয়ে ময়দানে মাযিদ সেখানকার পরিবেশ অনুযায়ী হবে। সুতরাং দুনিয়ার সকল মসজিদ, সকল জুমা মিলে পৃথিবীতে ময়দানে মাযিদের একটি নকশা তৈরি হয়েছে। এই মসজিদ ও জনসমাগমকে একত্র করে পরকালে নিয়ে যাওয়া হবে এবং এ খুৎবাগুলোও জান্নাতে পৌঁছে যাবে। তো সেখানকার আল্লাহর দরবারের এখানেও একটি নমুনা রয়েছে। এজন্যই জুমাকে সাইয়েদুল আইয়াম বলা হয়েছে। অর্থাৎ এ দিনটি হল সকল দিনের সরদার।

আল্লাহ তাআলার নির্বাচন

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন–

وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ

তোমার প্রভু যা ইচ্ছা হয় সৃষ্টি করেন এবং নিজের সৃষ্টি হতে যাকে ইচ্ছা নিজের জন্য নির্বাচিত করে নেন। [কাসাস : ৬৮]

সাতটি আসমান সৃষ্টি করে সপ্তমটিকে পছন্দ করেছেন, নির্বাচিত করেছেন। এটি আল্লাহর মনোনীত এলাকা, জান্নাতের ভিত্তি। সপ্তম আশেই জান্নাত অবস্থিত,

এটিই হল জান্নাতের এলাকা। যা হল 'মাকামে কারীম'।

সহীহ মুসলিম শরীফের একটি হাদীসে রয়েছে যে, 'সিদরাতুল মুনতাহা' সপ্তম আকাশে অবস্থিত, এখানেই হযরত জিবরাঈল আ. অবস্থান করেন। কুরআনে বলা হয়েছে–

عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهٰى ○ عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوٰى ○

'সিদরাতুল মুনতাহার নিকটে জান্নাতুল মাওয়া অবস্থিত। [নাজম : ১৪-১৫]

সিদরাতুল মুনতাহা হল সপ্ত আকাশে। এর নিকটেই হল জান্নাতের অবস্থান। তো জান্নাতীদের এলাকা এখান হতে শুরু হয়েছে। সরকারি মেহমানখানা বা রাজকীয় অতিথি ভবন এখানেই নির্মিত হয়েছে।

এমনিভাবে সাতটি জমিন সৃষ্টি করে উপরের জমিনকে মনোনীত করে নিলেন। সাইয়্যেদুল আম্বিয়া সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও অন্যান্য আম্বিয়া আ.-এর অবস্থানস্থলরূপে উপরের জমিনকে নির্বাচন করলেন। সপ্তম জমিনের নিম্নে রয়েছে দোযখ। জান্নাত যেমন সপ্তাকাশের ঊর্ধ্বে, তেমনিভাবে জাহান্নাম হল সপ্ত জমিনের তলদেশে।

কিয়ামতের দিন সিঙায় ফুৎকার দেয়া হবে। আকাশগুলো ভেঙ্গে দেয়া হলে জান্নাত প্রকাশ হয়ে পড়বে, জমিনগুলো ধ্বংস করে দেয়া হলে জাহান্নাম বেরিয়ে আসবে–

وَإِذَا الْجَحِيْمُ سُعِّرَتْ ○ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ ○

যখন জাহান্নামকে প্রজ্জ্বলিত করা হবে এবং জান্নাতকে নিকটবর্তী করা হবে। [তাকবীর : ১২-১৩]

অর্থাৎ আকাশসমূহ ও জমিনসমূহের মধ্যে যেসব পর্দা ও অন্তরায় রয়েছে সেগুলো ভেঙ্গেচুড়ে একাকার করে দেয়া হবে।

যাই হোক, আল্লাহ তাআলা জমিনগুলোর মধ্য হতে উপরের জমিনকে নিজের জন্য পছন্দ করেছেন এবং আসমানসমূহের মধ্য হতে উপরের আসমানকে পছন্দ করেছেন। সৃষ্টি করলেন সাতটি এবং নির্বাচন করলেন একটি। সাতটি জান্নাত সৃষ্টি করে নিজের জন্য জান্নাতুল ফেরদাউসকে পছন্দ করলেন, যা নবী আ.গণের স্থান এবং সর্বোচ্চ জান্নাত। আল্লাহ তাআলা হাজারো পাহাড় সৃষ্টি করেছেন কিন্তু তুর পাহাড়কে স্বীয় তাজাল্লির ক্ষেত্র করেছেন। পৃথিবীতে লাখ লাখ শহর রয়েছে, কিন্তু 'বালাদে আমিন' অর্থাৎ নিরাপদ শহর হিসেবে মক্কাকে নির্বাচন করেছেন

যেখানে হারাম শরীফ অবস্থিত। ভূমির মধ্যে কোটি কোটি খণ্ড তৈরি করেছেন কিন্তু সর্বাধিক পছন্দনীয় ঐ খণ্ডটি যেখানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শায়িত আছেন।

ওলামায়ে কেরাম লিখেছেন, ঐ ভূখণ্ডটি আরশের চেয়েও উত্তম। কারণ হিসেবে তারা বর্ণনা করেন যে, আরশের সম্পর্ক রয়েছে আল্লাহর সাথে কিন্তু আল্লাহ তাআলা এর উপর বসে নেই। তিনি দেহ ও দৈহিক কাজকর্ম হতে পাক পবিত্র। আর ঐ ভূখণ্ড যেখানে রয়েছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সমাধী, এ মাটির সাথে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দেহ মোবারক সংযুক্ত রয়েছে। আর যে মাটিতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দেহ স্পর্শ করেছে তা আরশ হতে অবশ্যই শ্রেষ্ঠ। কেননা, আল্লাহ তাআলা আরশের সাথে মিলিত নন। তিনি দেহ হতে পাক পবিত্র। আল্লাহর সাথে আরশের একটি সম্পর্ক রয়েছে। আর এখানে সম্পর্ক নয়, সংযুক্ত রয়েছে, স্পর্শ করে রয়েছে। তো আল্লাহ তাআলা বহু ভূখণ্ড সৃষ্টি করেছেন কিন্তু বিশেষভাবে মনোনীত করেছেন ঐ ভূখণ্ডকে।

রাত সৃষ্টি করেছেন সাতটি, কিন্তু পছন্দ করেছেন লাইলাতুল কদরকে। বলেছেন: 'লাইলাতুল কদর হাজার মাস অপেক্ষা উত্তম'। অর্থাৎ হাজার মাস যে ব্যক্তি দিবারাত্র ইবাদতে ব্যস্ত থাকবে, ঐ ব্যক্তি এ পরিশ্রম ও সাধনা দ্বারা যে মর্যাদা লাভ করবে, যদি লাইলাতুল কদর জাগ্রত থেকে কেউ ইবাদতে ব্যস্ত থাকে তবে একরাত্রে ঐ মর্যাদায় পৌছে যাবে। লাইলাতুল কদরকেই আল্লাহ পছন্দ করেছেন। দিন সৃষ্টি করছেন সাতটি, এর মধ্য হতে জুমার দিনকে পছন্দ করেছেন যে, এ হল আমার মাহফিল অনুষ্ঠানের দিন।

জান্নাতের মওসুম

জান্নাতেও এই জুমার দিনেই দরবার অনুষ্ঠিত হবে। অথচ জান্নাতে রাত্রদিন নেই। সেখানো তো সময় একই থাকবে। সেখানে সূর্যের উদয়াস্ত নেই যে, রাতদিন তৈরি হবে। রাত-দিন তৈরি হওয়া, রোদ-ছায়া থাকা– এসব হল সূর্যের আহ্নিক গতির প্রভাব।

হাদীসে বলা হয়েছে, জান্নাতে আরশের আলো থাকবে, আরশের ঔজ্জ্বল্য জান্নাতের সর্বত্র সমভাবে বিস্তৃত থাকবে। আর এ আলোর উদাহরণ ও ব্যাখ্যাও দেয়া হয়েছে যে, গ্রীষ্মকালে সুবহে সাদেকের পর সূর্যোদয়ের পূর্বে যে ঠাণ্ডা ও দুধের ন্যায় শুভ্র আলো হয়, জান্নাতের আলো সেরূপ হবে। আলো এ ধরনের

হবে না যে, তাপের কারণে সে আলোয় মানুষ বসতে পারছে না। আলো হবে ঠাণ্ডা ও আরামদায়ক। তাতে কোন প্রখরতা থাকবে না। খুবই মনোমুগ্ধকর আলো বিরাজ করবে সেখানে। চোখের জন্যও হবে মধুর, প্রখরও হবে না আবার নয়ন ঝলসানোও হবে না। সর্বক্ষণ এক অবস্থা বিরাজমান থাকবে। সেখানে রাত্র নেই, দিন নেই, ঘুম নেই, জাগ্রত হওয়া নেই, ছুটোছুটি করাও নেই। ঘুম-নিদ্রা হল ক্লান্তি ও শ্রমের ফলশ্রুতি, অবসাদের লক্ষণ। সেখানে সবসময় আমোদ-ফুর্তি, আনন্দ-উল্লাস থাকবে। রাত এজন্যই রাখা হয়নি যে, ক্লান্ত হয়ে বিশ্রাম গ্রহণের প্রয়োজন দেখা দেবে না। যদি ক্লান্তি থাকত তবে রাতের ব্যবস্থাও রাখা হত, যাতে মানুষ আরামে ঘুমাতে পারে। যখন ক্লান্তি নেই তখন রাতেরও প্রয়োজন নেই। একারণেই একইভাবে সর্বদা দিন বিরাজ করবে।

সাইয়েদুল আইয়াম

প্রতি সপ্তাপহ একবার আল্লাহর দরবার অনুষ্ঠিত হওয়ার যে কথা বলা হয়েছে তার অর্থ হল এই যে, তোমাদের এখানে এক সপ্তাহে যে পরিমাণ সময় অতিবাহিত হয়, এ পরিমাণ বিরতির পর পর দরবার অনুষ্ঠিত হবে। ধরে নিন সপ্তাহান্তের এ সময়টুকুর নাম রাখা হয়েছে মাযিদ। দুনিয়ার সপ্তম দিনের নাম রাখা হয়েছে ইয়াওমুল মাযিদ। এ হল দুনিয়াতে জান্নাতের নমুনা, এজন্য এ দিনকে সাইয়েদুল আইয়াম বলা হয়েছে। এ দিনটি সবচেয়ে পাক-পবিত্র ও সর্বোত্তম দিন। যত বড় বড় মর্যাদাপূর্ণ কাজ রয়েছে সবই ঐ দিন প্রকাশ লাভ করেছে। বলা হয়েছে যে, ঐ দিন আদমের মাটি একত্রিত করা হয়েছে। فيه جمع طين ادم (এ দিন আদম আ.এর মাটি জমা করা হয়েছে)। জুমা-এর মূল ধাতু হল 'জিম, আইন, মিম'। এজন্য এতে জামেইয়তের (একত্রিত করণ) শান রয়েছে, বিচ্ছিন্ন জিনিসগুলোকে একত্রিত করা, বিশৃংখল বস্তুরাজি সুশৃংখল ও সমবেত করাই হল জুমা শব্দের ধাতুগত অর্থ। বড় বড় যেসব জিনিস বিক্ষিপ্ত ছিল তা এদিনে একত্রিত করা হয়েছে। আদমের দেহ তৈরির মাটি সম্পূর্ণ পৃথিবীতে ছড়ানো ছিল। তা ঐ জুমার দিন একত্রিত করা হেয়েছিল এবং তাঁর দেহ তৈরি করা হয়েছিল।

হাদীসে বলা হয়েছে, যেদিন হযরত আদম আ. জান্নাতে প্রবেশ করলেন সেদিন জুমার দিন ছিল। জান্নাত হতে ভূপৃষ্ঠে যেদিন আনা হল সেদিনও জুমার দিন ছিল। হযরত আদম আ.-এর সহীফাগুলো যেদিন আকাশ হতে পৃথিবীতে অবতীর্ণ করা হল সেদিন জুমা ছিল।

কুরআনের বর্ণনা ও হাদীসের বিস্তারিত ব্যাখ্যা দ্বারা জানা যায় যে, ছয় দিনে আল্লাহ তাআলা সমগ্র সৃষ্টিজগৎ তৈরি করেছেন। আর ঐ ছয় দিন আমাদের ছয় হাজার বছরের সমান ছিল। কুরআনে বলা হয়েছ–

وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّوْنَ.

তোমাদের প্রভুর একদিন তোমাদের গণনার এক হাজার বছরের সমান। [হজ : ৪৭]

কাজেই ছয় হাজার বছরে সম্পূর্ণ বিশ্বজগৎ তৈরি হয়েছে। রবিবার থেকে আরম্ভ হয়ে জুমার দিনে শেষ হয়েছে। এই সময়ে জমিনকে বিস্তৃত করা হয়েছে, আকাশগুলো তৈরি করা হয়েছে, এরপর জমিনের মধ্যে নানাপ্রকার শক্তি সঞ্চয় করা হয়েছে। তারপর জড়পদার্থ ও উদ্ভিদ সৃষ্টি করা হয়েছে, তারপর আকাশে তারকারাজি বা গ্রহ-নক্ষত্র তৈরি করা হয়েছে। হাদীসে এসবের বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে। যখন সম্পূর্ণ সৃষ্টিজগৎ প্রস্তুত হয়ে গিয়েছে, তখন জুমার দিনের শেষ মুহূর্তে হযরত আদম আ.-কে সৃষ্টি করা হয়েছে। জমিনের এই বিছানাকে বিছানো হয়েছে, ছাদ রূপে আকাশকে তৈরি করা হয়েছে, চন্দ্র ও তারকারাজি স্থাপন করা হয়েছে, সাগর-নদী প্রবাহিত করা হয়েছে, খাদ্যদ্রব্যসমূহ সঞ্চয় করা হয়েছে– এসব কার জন্য ছিল?

وان الدنيا خلقت لكم وانكم خلقتم للأخرة

সমগ্র পৃথিবী মানুষের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে আর মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে মাবুদের জন্য।

আপনি যখন কোন মেহমানকে দাওয়াত করেন তখন সর্বপ্রথম তার জন্য গৃহ নির্ধারণ করেন, তাপর সেখানে মেহমানদারীর আসবাবপত্রের ব্যবস্থা করেন। আহার্য, পানীয়, বিশ্রাম ও শয্যা সবকিছুরই ব্যবস্থা করেন। তারপর মেহমানকে বলেন, আসুন! অতঃপর সে আসে। মেহমানখানায় বিদ্যমান সব জিনিসই মেহমানগণ ব্যবহার করে থাকেন।

এভাবে বিশ্বজগতের মেহমান হযরত আদম আ.। তাঁকে নিয়ে আসার পূর্বে সকল ব্যবস্থা পরিপূর্ণভাবে করা হয়েছে। জমিনকে করা হয়েছে শয্যাতুল্য, আকাশকে বানানো হয়েছে তার ছাদ। সূর্য-চন্দ্র ও তারকারাজিকে বানানো হয়েছে উজ্জ্বল প্রদীপ। এরপর জমিনকে করা হয়েছে এক বিস্ময়কর ভাণ্ডার। এ থেকে হরেক রকম খাদ্যদ্রব্য উৎপন্ন হচ্ছে। জমিনকে বানানো হয়েছে পানির কেন্দ্র, সর্বত্র মিঠা পানির ঝর্ণা ও নদীনালা প্রবাহিত হচ্ছে। একটি সিন্দুকও

নির্মাণ করা হয়েছে, এ সিন্দুক থেকে বের হচ্ছে পোশাক পরিচ্ছদ। জমিন হল প্রয়োজনসমূহ মিটানোর কোষাগার। এমন কি জন্ম-মৃত্যুরও কেন্দ্র হল এই জমিন। মানুষ এ থেকে সৃষ্টি হয়ে এতেই পুনরায় মিলিয়ে যায়।

مِنْهَا خَلَقْنٰكُمْ وَ فِيْهَا نُعِيْدُكُمْ وَ مِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرٰى○

তোমাদেরকে মাটি হতে সৃষ্টি করেছি এবং পুনরায় তাতেই তোমাদেরকে ফিরিয়ে নেব, অতঃপর দ্বিতীয়বার সেখান থেকেই তোমাদেরকে বের করে নিয়ে আসব। [ত্বোয়া-হা : ৫৫]

জুমার মধ্যে একত্রিকরণ ও পরিপূর্ণতার শান

পৃথিবী হল আমাদের আবাসভূমি, আমাদের সমাধিস্থল, আমাদের দুনিয়া এবং আমাদের বরযাখ। সবকিছুর সমাবেশ ঘটানো হয়েছে এর মধ্যে। এরপর হযরত আদম আ.কে সৃষ্টি করা হল। সেটি ছিল জুমার দিন। এ দিনের শেষ মুহূর্তে হযরত আদম আ.কে সৃষ্টি করা হয়। এজন্য বলা হয়েছে যে, জুমার দিনে এমন একটি মুহূর্ত রয়েছে যখন কোন দুআ করলে তা আল্লাহর দরবারে কবুল করা হয়। উলামায়ে কেরাম লিখেছেন, এই সেই মুহূর্ত, যে মুহূর্তে হযরত আদম আ.কে সৃষ্টি করা হয়েছিল। যত মহান কার্যাবলি রয়েছে, সব এ দিনেই সংঘটিত হয়েছে। হযরত আদম আ.-এর জন্ম, তাঁর জন্য মাটি একত্রিতকরণ, তাঁকে পৃথিবীতে প্রেরণ করা প্রভৃতি। সুতরাং এই দিনের সাথে মানবজাতির বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে। অন্যান্য দিনগুলোও মানুষের জন্য, কিন্তু মানব জাতির (আদম আ.-এর) জন্ম, মৃত্যু, জীবন, একত্রিকরণ ও জান্নাত হতে অবতরণ প্রভৃতি জুমার দিনে হয়েছে। পৃথিবীতে তাঁর আগমন বাহ্যিক দৃষ্টিতে অধঃপতন মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে তা ছিল ঊর্ধ্বারোহন। এ কারণে যে, পৃথিবীতে তার আগমন না ঘটলে খেলাফত বা আল্লাহর প্রতিনিধিত্বের সৌভাগ্য হত না। বাহ্যিক দৃষ্টিতে নিম্নগামী হয়েছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মানুষ যখন এই আমলের ক্ষেত্রে এসে আমল করা শুরু করল তখন অনেক বড় মর্যাদা ও স্তরে উপনীত হল। সুতরাং প্রকৃত অর্থে মানুষ উন্নত হল। নিম্নাগমন ছিল অনুভূতি প্রসূত আর বাস্তবতা ছিল এই যে, তার মাথায় খেলাফতের মুকুট পরানো হল। আম্বিয়া আ. সৃষ্টি হলেন, উলামায়ে রব্বানী তৈরি হলেন, প্রত্যেকের গুণাবলি প্রকাশ পেল। সুতরাং পৃথিবী

হল কামালাত ও গুণাবলির প্রকাশস্থল। পৃথিবী না হলে কামালাত প্রকাশ পেত না।

আদম আ.-এর এই সন্তানগণ যদি জান্নাতে জন্ম নিত তবে তারা সেখানে রাজা-বাদশাহদের মত জীবন যাপন করত। রাতদিন পানাহার ও আরাম আয়েশে বিভোর থাকত। কিন্তু তাদেরকে পৃথিবীতে এনে বিপদাপদের মুখোমুখি করা হয়েছে, যাতে মানুষ বিপদাপদকে প্রতিহত করার জন্য নিজ অভ্যন্তরে রক্ষিত শক্তিকে প্রকাশ করতে পারে।

বিপদাপদের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে যেন প্রতিরোধের শক্তিকে কাজে লাগাতে পারে, জাতিতে জাতিতে বিরোধ তৈরি করে রাখা হয়েছে যেন বীরত্ব প্রকাশ পেতে পারে, ধৈর্য ও সহ্য ক্ষমতা প্রকাশ পেতে পারে। জান্নাতে যুদ্ধ-বিগ্রহও হত না, লড়াই-প্রতিরোধও হত না। ফলে প্রতিরোধের পন্থাও আবিস্কৃত হত না, সবর ও ধৈর্যশক্তিও কাজে লাগত না। এভাবে মানুষের অন্তর্নিহিত বহু গুণাগুণ অপ্রকাশিতই থেকে যেত। পৃথিবীকে এসবের প্রকাশস্থল করা হয়েছে। সুতরাং আদম আ. বাহ্যিকভাবে জান্নাত হতে নিচে নেমেছেন, যা অধঃপতনের শামিল, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটা ছিল ঊর্ধ্বারোহন। কেননা যে পর্যন্ত পৃথিবী আগমন না হত সে পর্যন্ত কামালাত বা অন্তর্নিহিত গুণাবলির বিকাশ হত না।

কিয়ামতও সংগঠিত হবে জুমার দিনে। যেখানে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল মানব জাতিকে সমবেত করা হবে। এ দ্বারা বোঝা গেল জুমার দিনের মধ্যে জামিয়াতের (একত্রিকরণ ও পূর্ণাঙ্গতার) শান রয়েছে। আদম আ.-এর বিক্ষিপ্ত মাটি ঐ দিন একত্রিত করা হয়েছে। যে সকল কামালাত ও গুণাবলি গোপন ছিল, সব একত্রিত হয়ে জুমার দিন প্রকাশ লাভ করল। কিয়ামত যখন হবে তখন কোটি কোটি মানুষ মাটির মধ্যে লুকায়িত থাকবে, সকলেই নিজ নিজ কবর হতে উঠে ময়দানে মাহশারে সমবেত হবেন। ঐ জুমার দিনেই তাদেরকে একত্রিত করা হবে। মোটকথা, এতে একত্রিকরণ ও পূর্ণাঙ্গতার শান রয়েছে।

পৃথিবীতেও জুমার দিন রাখা হয়েছে যেন মানুষ তার সৃষ্টিমূলে যে পূর্ণতা রয়েছে তা স্বেচ্ছায় নিজেদের মধ্যে প্রতিফলিত করতে পারে। অর্থাৎ একত্রিত হওয়ার শিক্ষা নেয়, অন্তরে একতা পয়দা হয়, পরস্পর আন্তরিকভাবে মেলামেশা করে, একতার শিক্ষা গ্রহণ করে, মতবিরোধ হতে বেঁচে থাকে, দলাদলির পথ পরিহার করে। এসবের জন্য জুমাকে নমুনা বা আদর্শ বানানো হয়েছে। এভাবে যে, আকার-আকৃতি ভিন্ন, বিবেক-বুদ্ধি ভিন্ন, শরীরের রং ও আচার-আচরণ ভিন্ন-কিন্তু সবাই এসে জুমাতে একত্রিত হয়ে যায়।

গ্রামগঞ্জের শহর বন্দরের হাজার-হাজার, লক্ষ লক্ষ মানুষ একত্রিত হচ্ছেন, তাদের মানসিকতা, সামাজিকতা, রীতিনীতি সবই ভিন্ন ভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও তাদের মধ্যে একতা সৃষ্টি হয়ে যায়। এ হল জুমার বরকত। যখন সপ্তাহের একদিনে সমবেত হওয়া শিখে নেয়, তখন অন্যান্য দিনগুলোতেও একত্রিত হওয়া তাদের জন্য সহজ হয়ে যায়। তাদের মধ্যে একত্রিত হওয়ার অভ্যাস তৈরি হয়ে যায়।

বর্তমানে সব মানুষ জাহান্নামে রয়েছে– এ থেকে উত্তরণের পদ্ধতি

জুমার দিনটি সবাইকে একতাবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানায়, যেন পরস্পরের মধ্যে মিল-মুহাব্বত সৃষ্টি হয়, আপনত্বের বন্ধন তৈরি হয় এবং একতার জন্ম নেয়। কিন্তু তার মাধ্যম কী?

وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيْعًا

তোমরা সম্মিলিতভাবে আল্লাহর রজ্জুকে আকড়ে ধর। [আলে ইমরান : ১০৩]

ইমাম সাহেব খুৎবা প্রদান করেন, কুরআন তিলাওয়াত করেন, নামাযেও কুরআন পড়া হয়। এ কুরআনই হল আল্লাহ তাআলার রজ্জু বা রশি, যাকে অবলম্বন করার দ্বারা মানুষ ঊর্ধ্বারোহণ করবে।

হাদীসে এসেছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কুরআন হল আল্লাহ তাআলার রজ্জু, যাকে আকাশ হতে পৃথিবী পর্যন্ত ঝুলিয়ে দেয়া হয়েছে। (যেন আল্লাহ বলছেন) যে ব্যক্তি আমার পর্যন্ত পৌঁছতে চায় সে ঐ রজ্জুকে শক্তভাবে ধারণ করুক। আমি যখন রজ্জুকে উপরে টান দেব, তখন যে ব্যক্তি একে ধরে ঝুলে থাকবে, ঝুলন্ত অবস্থায় সে আমার নিকট পৌঁছে যাবে।

শায়খ মহিউদ্দীন ইবনুল আরাবী রহ. লিখেছেন, আকাশের নিচের সমস্ত এলাকা, যাতে সাত জমিনও অন্তর্ভুক্ত– সবই জাহান্নামের এলাকা। কিয়ামতের দিন এই এলাকাই জাহান্নামের রূপ ধারণ করবে। এর মধ্যেই আগুনের দহন, সাপ-বিচ্ছুর দংশনসহ অন্যান্য সকল প্রকার আযাব থাকবে। সুতরাং আপনি-আমি সবাই যেন এখন জাহান্নামে অবস্থান করছি। কুরআনের রশি টাঙিয়ে দেয়া হয়েছে। যে ব্যক্তি এ জাহান্নাম থেকে দৌড়ে পালাতে চায়, সে যেন ঐ রশিকে শক্তভাবে

আঁকড়ে ধরে। যে ব্যক্তি ঐ রজ্জুকে ধারণ করবে না তাকে জাহান্নামে প্রেরণ করার প্রয়োজন হবে না, সে নিজেই জাহান্নামে অবস্থান করছে। এখান থেকে বের হওয়ার একটি মাত্র পথ রয়েছে। আর তা হল আল্লাহ তাআলার রজ্জু– আল্লাহ তাআলার কিতাব। এ রজ্জু কখনো ছিঁড়তে পারে না। অবশ্য কেউ যদি শক্তভাবে ধারণ না করে তবে ছুটে যেতে পারে। সুতরাং সম্পূর্ণ শক্তি দিয়ে একে ধারণ করা কর্তব্য।

আজকের এই জুমার দিনেও সমগ্র শহরের সামনে কুরআন পড়া হচ্ছে, যেন লোকজন আল্লাহর পয়গাম শুনে তার সাথে সংযুক্ত হয়ে যায় এবং নিজের মধ্যে একতার শান সৃষ্টি করে।

জুমা হল পরীক্ষার দিন

জুমার দিন হল শিক্ষা গ্রহণের দিন, উপদেশ গ্রহণের দিন এবং একটি পরীক্ষার দিনও। এ উম্মত জুমার দিনের বরকতেই পরীক্ষায় পাস করেছে। পরীক্ষায় পাসের মর্যাদা লাভ করেছে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ তাআলা সকল উম্মতের পরীক্ষা নিলেন, ইহুদীদেরকে বললেন, তোমরা শুধু ইবাদত করার জন্য একটি দিন নির্ধারণ কর যা আমার নিকটও নির্ধারিত রয়েছে। তারা শনিবারকে নির্ধারণ করল। শনিবার ইবাদত বন্দেগী ব্যতীত অন্য কোন কাজ করতে পারবে না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও ইহুদীগণকে বলেছেন, হে ইহুদী সম্প্রদায়! শনিবারের সম্মান কর, যখন তোমরা দাবি করছ যে, এ দিনটি পবিত্র দিন। কাজেই পবিত্রতা রক্ষা কর। খ্রিস্টানদেরকে বলা হল যে, তোমরাও একটি দিন নির্দিষ্ট করে নাও। আমার ইলমেও তা নির্দিষ্ট রয়েছে, দেখা যাক তোমরা সেটিকে নির্ধারণ করতে পার কি না? খ্রিস্টানগণ ইবাদতের জন্য রবিবারকে নির্দিষ্ট করল, ঐ দিন তাদের জন্য ইবাদত ফরজ করে দেয়া হল।

মুসলমানদেরকে বলা হল তোমরাও একটি দিন নির্বাচন কর, তখন আমাদের রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুমার দিনকে নির্বাচন করলেন। আল্লাহ বললেন, আমার নিকট এ দিনই নির্ধারিত ছিল। এ সময়ের গভীর সম্পর্ক রয়েছে আল্লাহ তাআলার ওহীর সাথে। এখন সম্পূর্ণ উম্মত নবীর স্থলবর্তী হিসেবে সঠিক দিন ও তারিখ পেয়ে গেল, যা আল্লাহর ইলমে ছিল।

উমর ফারুক রা.-এর সাথে হক ঘুরতে থাকে

যেমন হযরত উমর রা.-এর ফযিলতে বলা হয়েছে যে, পূর্বযুগের উম্মতের মধ্যে কিছু মুহাদ্দাস (আল্লাহর ইঙ্গিতপ্রাপ্ত) ব্যক্তি থাকতেন– যাদের সাথে আল্লাহ তাআলা কথা বলতেন। আমার উম্মতের মধ্যে সেই ব্যক্তি হলেন উমর। বলা হয়েছে, উমর রা. যে দিকে ঘোরেন হকও সেদিকে ঘোরে। এ কথা বলা হয়নি হক যে দিকে ঘোরে উমরও সেদিকে ঘোরেন। হযরত উমর রা. হক ও সততার এমন স্তরে পৌঁছেছেন যে, তিনি যেদিকে ঘোরেন হকও সেদিকে থাকে। এজন্য বার তেরটি মাসআলা সম্পর্কে হযরত উমর রা.-এর যে রায় ছিল আসমান থেকে সে অনুযায়ী ওহী এসেছে। এ কারণে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

لو كان بعدى نبيًا لكان عمر.

অর্থাৎ নবুয়াতের ধারা যদি শেষ না হয়ে যেত, আমার পরও যদি কোন নবী আসতেন, তবে উমর রা. নবী হতেন। কিন্তু যেহেতু দুনিয়ার জন্য নবুওয়াতের ধারা অবশিষ্ট নেই, তাই তাঁকে নবী বানানো হয়নি। কিন্তু তাঁর মধ্যে যোগ্যতা রয়েছে। অর্থাৎ তাঁর চেতনার সাথে নবুওয়াতের চেতনার সম্পর্ক ছিল, ওহীর সাথে সম্পর্ক ছিল। তিনি এমন রায় প্রকাশ করতেন, যে অনুযায়ী ওহী আসন্ন প্রায় থাকত। তাঁর মতের স্বপক্ষে ওহী অবতরণ করত, বিপক্ষে অবতরণ করত না। হযরত উমর রা.-এর ফযিলাতের মধ্যে এ ছিল এক বিরাট ফযিলাত যে, তাঁর চেতনার সাথে ওহীর পূর্ণ সামাঞ্জস্য ছিল।

সমগ্র উম্মতের মধ্যে নবুওয়াতের চেতনা বিদ্যমান

সমষ্টিগতভাবে এ উম্মত স্বীয় পয়গাম্বরের স্থলাভিষিক্ত। সুতরাং সমগ্র উম্মতের মধ্যে নবুওয়াতের এক বিশেষ যওক বা চেতনা বিদ্যমান রয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মৌলিক শরীয়ত নিয়ে আগমন করেছেন। উম্মতগণ ইজতিহাদ বা গবেষণা দ্বারা কুরআন ও হাদীস থেকে মাসাইল বের করেছে এবং আইন ও বিধানরূপে উপস্থাপন করেছেন। পূর্বে এসব মাসায়িল সংকলিত ছিল না, উম্মতের মুজতাহিদীন কুরআন ও হাদীস থেকে বের করে ফুলের মালার মত মাসআলাগুলোকে গ্রথিত করে রেখেছেন। নবীগণের উপর যেভাবে ওহী অবতরণ হত এ উম্মতের মুজতাহিদীনের উপর সেভাবে আল্লাহর পক্ষ হতে ইলহাম অবতীর্ণ হয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মূল

শরীয়ত নিয়ে আগমন করেছেন, আর তাঁরা সে শরীয়ত থেকে বিস্তৃত বিধানাবলী উপস্থাপন করেছেন। তো তাঁরা যেন নবীগণের স্থলাভিষিক্ত হলেন। নবীগণ যেমন শরীয়ত নিয়ে আসতেন, এ উম্মতের মুজতাহিদগণ তদ্রূপ শরীয়ত পেশ করেছেন। তবে তাঁদের শরীয়ত মৌলিক নয়, মূল শরীয়তের প্রতিচ্ছবি। এজন্য উলামায়ে কেরাম লিখেছেন–

القياس مظهر لا مثبت

অর্থাৎ মুজতাহিদগণ কিয়াস বা গবেষণার মাধ্যমে ইজতিহাদ করেন, কিয়াস কোন কোন মাসআলা তৈরি করে না, বরং প্রকাশ করে। মাসআলাটি শরীয়তে পূর্ব হতেই প্রমাণিত রয়েছে, মুজাতাহিদের ইজতিহাদ একে শরীয়তের মধ্য থেকে বের করে নিয়ে আসে। আমাদের মধ্যে এ পরিমাণ জ্ঞান-বুদ্ধি নেই যে, আমরা বের নেব, মুজতাহিদগণকে সে জ্ঞান-বুদ্ধি দেয়া হয়েছে যে, তাঁরা মাসাইলগুলো বের করে উপস্থাপন করেন।

এর উদাহরণ হল এমন, যেমন পানির কূপ, এতে পানি ভর্তি রয়েছে, যার হাতে রশি ও বালতি রয়েছে সেই পানি উত্তোলন করবে।

মুজতাগিদগণের ইজতিহাদ রশি ও বালতির ন্যায়, মুজতাহিদ নিজ শক্তিবলে রশি দ্বারা বালতি টেনে সর্বত্র পানি পৌঁছিয়ে দেন। যার দ্বারা ক্ষেত খামার সিক্ত হয়ে যায়।

উম্মতে মুহাম্মাদীর উদাহরণ

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমার আনীত শরীয়তের উদাহরণ হল এমন, যেমন আকাশ থেকে প্রবল বৃষ্টিপাত হল, মুষলধারে বৃষ্টি জমিনে বর্ষিত হতে লাগল। বৃষ্টির পানিতে জমি তিন ভাগে বিভক্ত হয়ে গেল। একখণ্ড জমি অত্যন্ত উর্বর ও উপযোগী ছিল, সে ঐ পানিকে তার ভেতরে শুষে নিল এবং নানা ফলমূল, বাগান-উদ্যান, রবিশস্য উৎপন্ন করে পৃথিবীকে শস্যশ্যামল করে দিল। অন্য একখণ্ড জমি ছিল এমন, যা কোনকিছু উৎপন্ন করতে পারেনি বটে, কিন্তু বৃষ্টির পানিকে জমা করে রেখে দিয়েছে এবং পুকুরের রূপ ধারণ করেছে। মানুষ এখান থেকে পানি সংগ্রহ করে, পানি পান করে তৃপ্ত হয়। এ জমিখণ্ড যদিও ফল-ফুল শস্য উৎপন্ন করতে পারেনি, কিন্তু পানি জমা করে রেখেছে।

তৃতীয় একখণ্ড জমি ছিল অনাবাদি খোলা মাঠ, পানিকে আটকিয়েও রাখতে পারিনি, নিজের ভিতরে শুষেও নিতে পারেনি। বৃষ্টির পানি এসেছে এবং ভেসে চলে গিয়েছে, জমিখণ্ড যেমন ছিল তেমনই রয়েছে গেছে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, এমনিভাবে ওহীর পানি বর্ষিত হলে মানুষের আত্মা তিনভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ল। এক– সেইসব আত্মা যারা ওহী ও ইলমের পানিকে আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছে। এ হল ফকীহ ও উলামায়ে রব্বানীগণের জামাত। দ্বিতীয়– সেইসব আত্মা যারা ঐশি ইলমের পানিকে আকর্ষণ করতে পারেনি, কিন্তু পানি জমা করে রেখেছেন। তাঁরা হলেন মুহাদ্দিসীন ও হাফেজগণ। তৃতীয়– সেইসব আত্মা যাদের উপর ওহীর কোন প্রভাব পড়েনি, তাদের হৃদয় ওহীর প্রভাব হতে সম্পূর্ণ মুক্ত, তারা হল কাফের-মুশরিকের দল।

উলামায়ে উম্মতে মুহাম্মাদীর খেদমত

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মূল শরীয়ত নিয়ে আগমন করেছেন এবং এ উম্মতের মুজাদ্দিদ ও মুজতাহিদ (সংস্কারক ও গবেষক)গণ সে শরীয়ত থেকে বিস্তারিত মাসাইল বের করেছেন। তাঁদের উপর ওহী অবতরণ হত না ঠিক, কিন্তু তাঁদের অন্তরে ইলহাম হত। নবীগণের দ্বারা মুজিযা প্রকাশ পেত, তাঁদের থেকে কারামত প্রকাশ পেয়েছে।

এ বিষয়টি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক হাদীসে বর্ণনা করেছেন। হাদীসটি যদিও সনদ হিসেবে দুর্বল, কিন্তু উলামায়ে কেরাম এ হাদীস দ্বারা বিভিন্ন স্থানে দলিল পেশ করেছেন। হাদীসটি হল এই: 'আমার উম্মতের উম্মতের আলেমগণ বনী ইসরাঈলের নবীগণের সমতুল্য'। অর্থাৎ তাঁরা নবী হবেন না, কিন্তু কাজ তাই করবেন যা নবীগণ করেছেন। তাদের কাজের ধরণ হবে নবীগণের কাজের মত। অর্থাৎ একজন নবী যে ভূখণ্ডে আগমন করতেন সে ভূখণ্ডকে ঈমানের নূরে আলোকিত করে দিতেন, তাদের প্রচেষ্টায় মানুষ মুমিন হয়ে যেত। আলেম এবং আরিফবিল্লাহ হয়ে যেত।

এ উম্মতের উলামায়ে রব্বানী ও মুজতাহিদগণও এমন ছিলেন যে, একজন আলেমে রব্বানী যেখানে অবস্থান নিয়েছেন সেখানকার হাজার হাজার মানুষকে ঈমানের রঙে রঙিন করে তুলেছেন। তাঁদের দ্বারা হাজার হাজার মানুষের ঈমান রক্ষা পেয়েছে। ইমাম আবু হানিফা রহ.কে দেখুন, সম্পূর্ণ ভারতবর্ষ শুধু নয়, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, আফগানিস্তান এবং পুরো তুর্কিস্তান তাঁরই মাজহাবের

অনুসারী। একজন আলেম, একজন মুজতাগিদ কোটি কোটি মানুষকে ঈমানদার বানিয়েছেন। কোটি কোটি মানুষকে জান্নাতে পৌছিয়েছেন। ইমাম শাফেয়ী রহ. মক্কায় জন্মগ্রহণ করেন, প্রাথমিক জীবন মক্কায় অতিবাহিত করেন, শেষ জীবনে মিসর চলে গিয়েছিলেন এবং সেখানেই ইন্তেকাল হয়। হিজায প্রায় সম্পূর্ণই শাফেয়ী মাজহাবের অনুসারী। একজন আলেমে রব্বানী অবতরণ করেছেন এবং এক দেশকে ঈমানের নূরে আলোকিত করে দিয়েছেন, শরীয়তের লক্ষ লক্ষ অনুসারী সৃষ্টি করে দিয়েছেন।

পশ্চিমা দেশগুলোতে মালিকী মাজহাবের অনুসারী রয়েছেন সর্বাধিক। ইমাম মালিক রহ. এর প্রকাশ ও প্রচার সেদিকে হয়েছে। হাজার হাজার উলামা হয়েছেন। ইমাম বুখারী, ইমাম আব্দুল্লাহ ইবনুল মোবারক, ইমাম নববী, ইমাম ইসহাক রহ.– এরা এমন মহামানব ছিলেন যে, তাঁদের প্রত্যেকের মাজহাব ছিল। এ কথা ভিন্ন বিষয় যে, আজকাল সেসব মাজহাবের বিলুপ্তি ঘটেছে। চারটি মাজহাবই ব্যাপকভাবে জনসমর্থন লাভ করেছে। এ কোন ইচ্ছাকৃত জিনিস ছিল না, এ ছিল আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে প্রাপ্ত বিষয়। যেমন সুফিয়ায়ে কেরামের অনেক সিলসিলা ও তরিকা রয়েছে, কিন্তু ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা ও জনসমর্থন পেয়েছে চারটি সিলসিলা– চিশতিয়া, সোহরাওর্দিয়া, কাদিরিয়া ও নকশ্‌বন্দিয়া। এ কবুলিয়াত হল আল্লাহর পক্ষ হতে। সারকথা হল, এ উম্মতে হাজারো চন্দ্র-সূর্য জন্মগ্রহণ করেছেন, যাদের আলোয় দুনিয়া আলোকিত হয়েছে, উপকৃত হয়েছে। যেখানেই একজন অবস্থান নিয়েছেন সেখানেই কোটি মানুষের ঈমান দুরস্ত হয়ে গিয়েছে।

বিশ্বের আলোকোজ্জ্বল সূর্যের আগমন

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমার উম্মতের আলেমগণ বনী ইসরাঈলের নবীগণের অনুরূপ। অর্থাৎ পূর্বের উম্মতদের মধ্যে যে কাজ নবীগণের দ্বারা সম্পাদিত হত এ উম্মতে নবুওয়াত শেষ হয়ে যাওয়ার কারণে সেই কাজই মুজাদ্দিদ, মুজতাহিদ ও উলামায়ে কেরাম দ্বারা চালু থাকবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নবুওয়াত এত শক্তিশালী ও প্রবল যে, এর আগমনে অন্যান্য নবুওয়াতের শক্তি অবশিষ্ট থাকেনি। যেমন রাতের বেলা আকাশে অগণিত তারকারাজি উদিত হয়, যেদিকে দৃষ্টি যায় শুধু তারা আর তারা। সবার মধ্যেই আলো রয়েছে কিন্তু সে আলো দ্বারা রাতের অন্ধকার দূর হয়ে কখনোই দিনের মত হয় না। এত অধিক তারা থাকা সত্ত্বেও রাত রাতই

থেকে যায়; অন্ধকার সম্পূর্ণ দূরীভূত হয় না।

তারকারাজি আলো ছড়ায়, এতে কিছু মানুষ কাজকর্মও করে; কিন্তু প্রদীপ বা লাইটের প্রয়োজন থেকেই যার; রাত কখনো দিনের মত হয় না। কিন্তু যখনই বিশ্বের আলোক মিনারে সূর্য উদিত হওয়ার পূর্বাভাস প্রকাশ পায়, এখনও সূর্য উদিত হয়নি; সুবহে সাদিক সংবাদ দিয়েছে মাত্র যে, আলোর বাদশাহ সূর্য আসছে। এই আগমন বার্তার সাথে সাথে তারকারাজি অদৃশ্য হয়ে যায়, রাত অদৃশ্য হয়ে যায়। দিন তার উজ্জ্বল চেহারা নিয়ে আত্মপ্রকাশ করতে শুরু করে। যখন সূর্য এসে পড়ে তখন তারকারাজি আলোহীন, নিস্প্রভ হয়ে পড়ে। তারকাদের আলো ছিনিয়ে নেয়া হয় না কিন্তু সে আলো এতই নিস্তেজ হয়ে পড়ে যে মনে হয় আলোহীন হয়ে পড়েছে। সূর্যের আলোর সামনে কারো আলো প্রকাশ হতে পারে না। তখন যদি সূর্য একথা বলে যে আমার আগমনের পর আর কোন রক্ষত্র নেই, তখন তার অর্থ হবে আমিই আলোকের পরিসমাপ্তিকারী, জ্যোতির মহাকেন্দ্র। আমার আগমনের পর কোন তারকার প্রয়োজনীয় অবশিষ্ট থাকেনি, দিনভর আমার আলোই যথেষ্ট হবে। মাঠে ময়দানে আমার রৌদ্র রয়েছে তা দ্বারা কাজ কর। যদি কেউ মাঠে আসতে না পারো তবে ঘরের দরজা খুলে দাও, আলো সেখানে পৌঁছে যাবে, এর দ্বারা কাজ করতে পারবে। অন্ধকার হতে অন্ধকার কুটিরে আমার আলো পৌঁছবে। দিনের বেলা প্রদীপের প্রয়োজন হবে না। কেবল তারা ব্যতীত, যাদের চোখ জ্যোতিহীন হয়ে যায়, দিনেও লাইট জ্বালিয়ে রাখে; তবে এর তো কোন চিকিৎসা নেই। নতুবা সূর্য সকল আলো থেকে অমুখাপেক্ষী করে দেয়।

এভাবে নবীগণ হলেন নবুওয়াতের আকাশের নক্ষত্ররাজি। একের পর এক আম্বিয়া আ. উদিত হয়েছেন, কখনো কখনো হাজার হাজার নবী দুনিয়াতে ছিলেন। বনী ইসরাঈলে একসাথে চার হাজার নবী এসেছিলেন। নবুওয়াতের আকাশে আদম আ.-এর সিতারা উদিত হয়েছে, নূহ আ.-এর সিতারা উদিত হয়েছে, ইবরাহীম আ., মুসা আ., ঈসা আ. এসেছেন, কিন্তু রাতই থেকে গেছে, সার্বিকভাবে অন্ধকার দূর হয়নি, দিন হয়নি। যখনই নবুওয়াতের সূর্য উদিত হওয়ার সুসংবাদ দেয়া হল, সুবহে সাদিক হয়ে গেল। অর্থাৎ (সুবহে সাদিকরূপে) হযরত ঈসা আ. পাঁচশত বছর পূর্বে আগমন করত ঘোষণা করলেন–

مُبَشِّرًا بِرَسُوْلٍ يَأْتِىْ مِنْ بَعْدِى اسْمُه أَحْمَدُ.

আমি এমন একজন রাসূলের সুসংবাদ প্রদানকারী, যিনি আমার পর আগমন করবেন, তাঁর পবিত্র নাম হবে আহমাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। [সফ : ৬]

সুবহি সাদিক উদিত হওয়ার সাথে সাথে মানুষের মৃতপ্রায় আত্মাগুলো সজীব হয়ে উঠতে লাগল। সেই জাহিলিয়াত ও মূর্খতার যুগেও তাওহীদ ও রিসালাতের দিকে আত্মাগুলো ঝুঁকতে শুরু করল, মূর্খতার অন্ধকার দূরীভূত হতে লাগল। যখন হেরার শৃংগ হতে নবুওয়াতের সূর্য উদিত হল তখন যে হৃদয়ে সামান্যতম যোগ্যতাও ছিল তার মধ্যে নূর ও জ্যোতি প্রবেশ করল এবং ধীরে ধীরে আত্মাগুলো আলোকোজ্জ্বল হতে লাগল।

এ সূর্য উদিত হওয়ায় যে দিবসটি তৈরি হয়েছে তা এত দীর্ঘ যে, কিয়ামত পর্যন্ত বিদ্যমান থাকবে। এ দিনটি হবে হাজার হাজার বছরের। আমাদের দিন যেমন বার ঘণ্টা হয়, তার সুবহে সাদিক এক ঘণ্টা-সোয়া ঘণ্টায় হয়। দিন যত দীর্ঘ হবে, তার সুবহে সাদিকও সে অনুপাতে দীর্ঘ হবে। এ দিনটি যেহেতু হাজার হাজার বছরের হবে, তাই এ দিনের সুবহে সাদিকও ছিল পাঁচশত বছরের। অর্থাৎ হযরত ঈসা আ.-এর যুগ থেকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগ পর্যন্তই তার সুবহে সাদিক। এরপর হবে কিয়ামতের দিন। কিয়ামতের সুবহে সাদিক অন্যদিন হবে। কিয়ামতের সুবহ না হওয়া পর্যন্ত এ সূর্যের আলোই যথেষ্ট। অন্য কোন তারকার প্রয়োজন নেই, এই এক সূর্যই সম্পূর্ণ বিশ্বকে আলো ও তাপ দেয়ার জন্য যথেষ্ট, সর্বাদা দিচ্ছে এবং দিতে থাকবে।

একই জ্যোতির বিভিন্ন রূপ

এ আলো নানা আকৃতিতে প্রকাশ লাভ করেছে। এ আলো মুজাদ্দিদগণের মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে, উলামায়ে রব্বানীর মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে, সুফী সাধকদের মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে। কেউ জাহিরী আমলকে, কেউ বাতেনী আমলকে, কেউ দৈহিক আমল ও কার্যাবলিকে, কেউ আধ্যাত্মিক ও নৈতিক গুণাবলিকে প্রকাশ করেছেন। কেউ শরীয়তের মাসআলা-মাসাইল বর্ণনা করেছেন, কেউ আধ্যাত্মিক বিষয়াদি বর্ণনা করছেন, কেউ নফস ও প্রবৃত্তির প্রতারণা ও প্রবঞ্চনা বর্ণনা করত প্রশান্ত আত্মা গঠনের চেষ্টা করেছেন, নিয়ম কানুন বর্ণনা করেছেন। কেউ আবার চরিত্র গঠন ও নৈতিক উৎকর্ষ সাধনের পন্থা বর্ণনা করেছেন, চারিত্রিক অসাধুতা ও নৈতিক অধঃপতন হতে মানুষকে উদ্ধার করেছেন। একই আলো, একই

জ্যোতি, কিন্তু বিভিন্ন রূপে বিভিন্ন আকার আকৃতিতে বিভিন্নতার মধ্যে কাজ করে যাচ্ছেন। এ উম্মত সবাই মিলে নিজেদের নবী সা.-এর স্থলাভিষিক্ত।

এ উম্মত হতে হক ও সত্য কখনো বিছিন্ন হবে না

হাদীসে বলা হয়েছে–

لا تجتمع امتى على ضلالة

আমার সম্পূর্ণ উম্মত একত্রি হয়ে গোমরাহী ও পথভ্রষ্টতার উপর একমত হবে না।

বিভিন্ন দল উপদল হবে, কিন্তু হক ও সত্য সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হবে না, একটি দল হবে নাজী– মুক্তিপ্রাপ্ত হবে। তারা ঐসব কাজ করবে যা আমি করছি, ঐসব কথাই বলবে, যা আমি বলছি। ঐসব কথাবার্তা পেশ করবে, প্রচার কবে যা আমি করছি।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, এ উম্মতে প্রত্যেক শতাব্দীতে একজন না একজন মুজাদ্দিদ আসতে থাকবেন, তা জামাআতের রূপে অথবা একক ব্যক্তি হিসেবেও আসতে পারেন। বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন মুজাদ্দিদ থাকবেন, যারা দীনকে পরিষ্কা রপরিচ্ছন্ন করতে থাকবেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, এ উম্মত ধ্বংস হবে কেমন করে যার প্রথমে রয়েছি আমি এবং শেষাংশে রয়েছেন হযরত ঈসা আ. (আকাশ হতে অবতরণ করবেন) এবং মধ্যভাগে রয়েছেন ইমাম মাহদী। এ উম্মত ধ্বংস হবে কেমন করে, যাদের মধ্যে এত মহান মুজাদ্দিগণ জন্মগহণ করবেন? প্রতি শতাব্দিতে মুজাদ্দিদের ওয়াদা করা হয়েছে, এর অর্থ দাঁড়াল এই যে, পূর্ণ উম্মত গোমরাহ হবে না, সমষ্টিগতভাবে গোমরা হওয়া থেকে রক্ষা করার ওয়াদা করা হল।

তারপর শতাব্দির মধ্যে প্রতিদিনের জন্যও ওয়াদা করা হয়েছে। বলছেন, সর্বদা এ উম্মতের উত্তরসূরিগণ পূর্বসূরিদের থেকে ইলম ও জ্ঞান অর্জন করতে থাকবেন, উত্তরসূরিদের মধ্যে যারা সৎপথ প্রাপ্ত হবেন তারা সূর্বসূরিদের থেকে ইলম অর্জন করতে থাকবেন। এবং যারা ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি করে, ধর্মের নামে অধর্ম চালিয়ে দিতে চায়, তাদের বিভ্রান্তির মুখোশ উন্মোচিত করে দিবেন। তাদের বাড়াবাড়িকে সপ্রমাণ ভ্রান্ত বলে প্রকাশ করে দিবেন। মূর্খ, অজ্ঞ ও স্থূল বুদ্ধির মানুষ যে সকল বিভ্রান্তির বেড়াজালে আবদ্ধ হয়ে পড়বে সে সবকে

দূরীভূত করে কুরআন হাদীসের প্রকৃত রূপ, প্রকৃত চেহারা প্রকাশ করে দিবেন। তাদের প্রচেষ্টায় দীন প্রত্যহ উজ্জ্বল ও পরিচ্ছন্ন হতে থাকবে। সমষ্টিগত ও সামগ্রিকভাবে উম্মত হকের উপর ঐকমত্য থাকবে। প্রতি শতাব্দিতে মুজাদ্দিদ আসবেন আর সর্বদা উলামায়ে কেরাম তৈরি হতে থাকবেন, উম্মত ধ্বংস ও পথভ্রষ্ট হবে না। সম্পূর্ণ উম্মত সমষ্টিগতভাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উত্তরসূরি হবে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যেসব দায়িত্ব ছিল, সম্পূর্ণ উম্মতের উপর সেগুলো বন্টন করে দেয়া হয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আয়াত তিলাওয়াত করতেন, হাফেজগণ এ দায়িত্ব পালন করছেন। তারা কিতাব তিলাওয়াত করছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এক দায়িত্ব ছিল তালিমে কিতাব, উলামা ও ফুকাহা এ দায়িত্ব আদায় করছেন, তাঁরা কিতাবের তালিম দিচ্ছেন। অন্য দায়িত্ব ছিল তালিমে হিকমাত ও উত্তম আদর্শ পেশ করা। সে দায়িত্ব সুফিয়ায়ে সম্পাদন করছেন। তাঁরা বিশ্বের সামনে নববী আখলাক, উত্তম চরিত্র ও নিষ্কলুষ নৈতিকতা পেশ করছেন। মানুষকে শিক্ষা দিয়েছেন এ তরিকা। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আত্মসংশোধন ও নৈতিক উৎকর্ষ সাধন করিয়েছেন। রিয়াযত মুজাহাদা বা চেষ্টা সাধনার মাধ্যমে নফসসমূহকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করেছেন, অসৎ ও মন্দ স্বাভাব হতে পাকপবিত্র করেছেন। উম্মতের মধ্যে সুফি সাধকগণ এ কাজ করছেন। কুরআন-হাদীসের আলোকে রিয়াযত-মুজাহাদা ও সাধনার নীতি নির্ধারণ করেছেন। উম্মতের প্রশিক্ষণ, আত্মশুদ্ধি ও চরিত্র সংশোধন ও গঠন করেছেন।

যেসব দায়িত্ব রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ছিল, তার সবই আজও হুবহু বিদ্যমান রয়েছে। এ হতে পারে যে, উলামায়ে কেরামের অনেক ভুল-ভ্রান্তি রয়েছে, যেহেতু তাঁরা মাসুম ও নিষ্পাপ নন, কিন্তু হক থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে তা হবে না, হতে পারে না। জনগণের কাজ হল উলামায়ে কেরামের বর্ণিত মাসাইলের উপর আমল করা। তাদের ব্যক্তিগত কার্যাবলির প্রতি দৃষ্টিপাত করবে না। যদি মন্দ কোন কিছু দৃষ্টিগোচর হয় তবে তা তার ব্যক্তিগত বিষয় বলে বিবেচনা করবে।

হযরত শায়খুল হিন্দ রহ.-এর সোনালী উপদেশ

শায়খুল হিন্দ হযরত মাওলানা মাহমুদ হাসান সাহেব রহ. বলতেন, পৃথিবীতে নবী আ.গণ ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তি এমন নেই, যার মধ্যে শুধুই খায়র বা

কল্যাণ রয়েছে, আর এমনও কেউ নেই যার মধ্যে শুধুই শার্ বা মন্দ রয়েছে। সবার মধ্যেই ভাল ও মন্দ উভয়ই রয়েছে। নেকীও রয়েছে, বদীও রয়েছে। কাজেই বুদ্ধিমান হল ঐ ব্যক্তি, যে প্রত্যেকের ভাল দিকটি হতে উপকৃত হয় এবং মন্দকে এই বলে তার জন্য ত্যাগ করে যে, এ ব্যাপারে তুমি জানো এবং তোমার আল্লাহ জানেন। তাহলে সম্পূর্ণ উম্মত ফেরেশতা হয়ে যাবে। এমন মনে হবে, যেন সবার মধ্যে শুধুই কল্যাণ আর কল্যাণ রয়েছে। কিন্তু আজ আমরা প্রত্যেকের মন্দ দিকটিই কেবল গ্রহণ করছি এবং ভাল বিষয়াবলিকে ত্যাগ করছি। মনে হয় যেন সম্পূর্ণ উম্মতের মধ্যে শুধু মন্দই ছড়িয়ে রয়েছে, তারা সবাই কল্যাণশূন্য হয়ে পড়েছে। সুতরাং বুদ্ধিমানের কাজ হল এই, প্রত্যেক ব্যক্তির ভাল ও কল্যাণ কর কাজ হতে উপকৃত হবে, তার মধ্যে যদি কোন মন্দ দিক থাকে তবে তা আল্লাহ হাওলা করে দেবে। তার মন্দ কাজের জন্য তোমাকে জবাবদিহি করতে হবে না, তাকেই প্রশ্ন করা হবে এবং সেই তার উত্তর দেবে। তুমি তার ভালটুকু গ্রহণ কর (এবং সম্ভব হলে তার জন্য দুআ কর।)

এ তো হল নবীগণের গুণ যে, তাঁদের চালচলন, কথাবার্তা সবই অনুকরণীয়। সকল গুনাহ, সকল মন্দ হতে তাঁরা মাসুম। নবীগণ আ. ব্যতীত অন্য কেউ মাসুম নন। আল্লাহর ওলীগণ মাহফুজ (রক্ষিত) হয়ে থাকেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁদের ভুলভ্রান্তি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। সুতরাং আপনার কাজ এ নয় যে, আপনি তাঁদের দুর্বলতা খুঁজে বেড়াবেন। আপনার কাজ হচ্ছে উত্তরাধিকারী হিসেবে তাঁদের ইলম ও জ্ঞানকে গ্রহণ কবেন, তাঁদের মন্দ কাজগুলো (যদি থাকে) ত্যাগ করবেন। আর যদি কল্যাণকামী হন, তবে নির্জনে আদবের সাথে তাঁদেরকে বলে দিন– আপনার এ ভুল হচ্ছে, আপনি তা সংশোধন করে নিন। এতে তাঁরা কৃতজ্ঞ হবেন।

সুধারণা পোষণ করার প্রয়োজনীয়তা

কিন্তু প্রত্যেক ব্যক্তির মন্দকে অনুসন্ধান করার অর্থ হল সম্পূর্ণ জাতিকে অপদস্ত করা। বলা হয়েছে– ظنوا بالمؤمنين خيرا 'মুমিনদের প্রতি সুধারণা পোষণ কর।'

অন্যের প্রতি সুধারণা পোষণ করতে কোন প্রমাণের প্রয়োজন হয় না। যথার্থ প্রমাণ ছাড়া মন্দ ধারণা পোষণ করার অনুমতি নেই। সুধারণা পোষণ করা প্রত্যেকের উপর ফরজ ও কর্তব্য। তবে যদি এমন প্রমাণাদি মিলে যায় যে, সত্যিই তার মধ্যে খারাবী তৈরি হয়ে গেছে তা হলে ভিন্ন কথা।

এ ক্ষেত্রে মন্দকে দূরীভূত করার পন্থা এ নয় যে, একে প্রচার করে বেড়াবেন। আপনি তাকে নসীহত করুন, তাকে বোঝান। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আশ্রয় প্রার্থনা করেছেন, তিনি বলেছেনঃ 'হে আল্লাহ, আমি প্রতারক বন্ধু হতে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি, যার চক্ষুগুলো সর্বদা আমার কাজকর্মের প্রতি লক্ষ্য রাখে, আমার সকল কথাবার্তা ও কাজকর্মের পাহারাদার হয়ে থাকে। যদি আমার কোন মন্দ দেখতে পায়, তা প্রচার করে বেড়ায়, আর কোন নেকী দেখতে পেলে তাকে দাফন করে দেয়। এ জাতীয় প্রতারক ও ধোঁকাবাজ বন্ধুর প্রতারণা হতে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি।'

এমন বন্ধু হওয়া আপনার-আমার জন্য উচিত নয়, বরং যদি কারো কোন নেকী ও সৎকাজ দেখতে পান, তা প্রচার করুন। মন্দ দেখতে পেলে তা প্রচার না করে অন্যভাবে তার ব্যাখ্যা করুন এবং ভালবাসা দিয়ে তাকে বোঝান, তাকে উপদেশ দিন। যদি সে গ্রহণ না করে তবে আল্লাহর হাওলা করে দিন। আল্লাহই ব্যবস্থা করবেন। এতসব সত্ত্বেও তার মধ্যে যদি কোন নেকী থাকে, ইলমের কথা থাকে, তবে আমরা তা থেকে উপকৃত হওয়ার চেষ্টা করব।

সকল জায়গা থেকে মানুষ ভালটুকু গ্রহণ করে

মাওলানা হাবিবুর রহমান ছিলেন হযরত মাওলানা আহমাদ আলী সাহারানপুরী রহ.-এর ছোট ছেলে এবং মাওলানা খলিলুর রহমান ছিলেন বড় ছেলে। তিনি জমিয়াতে উলামায়ে হিন্দ-এর সাধারণ সম্পাদকও ছিলেন। তিনি অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন, তার মেধা ও বুদ্ধিমত্তা প্রবাদের ন্যায় সমাজে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। তার মেধা ও বুদ্ধিমত্তা আশ্চর্যজনক ছিল। যৌবনকাল এমন কোন মন্দকাজ নেই যা তিনি করেননি। জুয়া খেলেছেন, ডাকাতি করেছেন, অন্যের মাল হরণ করেছেন। এটা বাস্তব ঘটনা। তার ইলমী যোগ্যতা এত উচ্চাঙ্গের ছিল যে, যখনই দেওবন্দে আগমন করতেন, ছাত্ররা দল বেঁধে তার সাথে ঘুরত। তার ইলম ও জ্ঞান-বুদ্ধির উপর সবাই আসক্ত ছিলেন। স্টেশন থেকে শহরের দিকে আসছেন, ছাত্রদের হাতে হিদায়া কিতাব রয়েছে, হাঁটছেন, হিদায়ার দরসও হচ্ছে, ছাত্ররা পিছুপিছু আসছে। দেওবন্দ পৌঁছলেন, বিল্লা নামে বাজারে এক বানিয়া ছিল, যে ছিল খুব বড় জুয়াড়ি, সর্বদা জুয়াখেলায় মত্ত থাকত; তার ঘরের নিকট গিয়ে তাকে ডাক দিলেন, সে এল। তাকে বললেন, তুমি জুতার উপরের দিক নেবে, না নিচের দিক নেবে? সে বলল আমি উপরের দিক নেব। জুতা মেরে দিলেন, জুতা গিয়ে পড়ল উল্টোভাবে– নিম্নভাগ উপর দিকে। দশ

হাজারের শর্ত ছিল, দশ হাজার টাকা নিয়ে সামনে অগ্রসর হলেন, বানিয়া হেরে গেল। ছাত্ররা সাথেই রয়েছে, সবক পাঠও হচ্ছে।

একবার এক ব্যবসায়ীর নিকট থেকে বিশ হাজার টাকা ধার নিলেন এবং লিখিত দলিল দিলেন, দলিলে নিজের দস্তখতও করে দিলেন। এক বছর পর ঋণ পরিশোধ করার কথা ছিল, সময় অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার পর ঐ ব্যবসায়ী তার টাকার জন্য তাগাদা করতে লাগল। তিনি বললেন, তোমার কিসের টাকা? সে বলল, জনাব আপনি যে ধার এনেছিলেন, সেই টাকা। তিনি বললেন, ধোঁকাবাজ! আমি কখন তোর থেকে টাকা ধার এনেছিলাম? সে বলল, আপনি তো দলিল লিখে দিয়েছেন। তিনি বললেন, আমি কোন দলিল লিখে দেইনি। মিথ্যা কথা, চলে যা এখান থেকে।

সে গিয়ে আদালতে মামলা দায়ের করে দিল। মাওলানার দস্তখত করা দলিল তার কাছে ছিল। ব্যবসায়ী দাবি করল, মাওলানা আমার নিকট থেকে বিশ হাজার টাকা ধার নিয়েছেন, এই তার দলিল। একথা বলতে বলতে দলিলটি বিচারকের টেবিলের উপর রেখে দিল। মাওলানা বললেন, হুজুর দলিলটি আমি দেখতে পারি? বিচারক বললেন, হ্যাঁ দেখতে পারেন। আপনার বিরুদ্ধেই তো এটা হল প্রমাণ। তিনি কাগজটি এমনভাবে ধরলেন যে, কাগজের উপরের অংশ বিচারকের হাতে এবং নিচের অংশ মাওলানার হাতে, যেখানে তার দস্তখত ছিল। আল্লাহ জানেন আঙ্গুলের মাথায় কী মেডিসিন লাগিয়ে গিয়েছিলেন! দস্ত খতের উপর দিয়ে আঙ্গুল বুলিয়ে নিলেন। কাগজটি যখন টেবিলের উপর রাখল, দেখা গেল দস্তখত গায়েব হয়ে গিয়েছে, সাদা কাগজ পড়ে রয়েছে। মাওলানা বিচারককে বললেন, এ দলিল আপনাকে ঐ ব্যবসায়ী দিয়েছে? বিচারক বললেন হ্যাঁ। মাওলানা বললেন, মনে হয় দলিলটি জাল, এতে কোন দস্তখত নেই, নামদস্তখতবিহীন দলিল।

বিচারকসহ সবাই দেখলেন, দলিলে কোন দস্তখত নেই। বিচারক রাগান্বিত হয়ে ব্যবসায়ীকে বললেন, নাম-দস্তখতবিহীন দলিল নিয়ে এখানে এসেছ? সে বলল, হুজুর! দস্তখত ছিল, আমি শপথ করে বলছি। বিচারক বললেন, ছিল তো গেল কোথায়? কোন জিনে খেয়ে ফেলেছে? কেউ নিয়ে গিয়েছে? কোথায় গিয়েছে দস্ত খত? ব্যবসায়ী মাথায় হাত দিয়ে বসে রইল। শেষে মাওলানার পক্ষে রায় হল। তিনি নির্দোষ প্রমাণিত হলেন। মাওলানা মানহানির মামলা করে আরো বিশ হাজার টাকা দাবি করলেন– আমার মান-সম্মানের হানি হয়েছে। এভাবে ব্যবসায়ীর নিকট থেকে আরো বিশ হাজার টাকা আদায় করে নিলেন। এই ছিল তার অবস্থা।

বিয়ে উপলক্ষ্যে দশ পনের হাজার টাকার অলংকার লাগবে বলে একবার এক স্বর্ণকারকে অলংকার নিয়ে বাড়িতে আসতে বললেন। স্বর্ণকার নিয়ে এল। মাওলানা বললেন, যদি অনুমতি দাও তবে ভেতরে নিয়ে মহিলাদেরকে দেখিয়ে নিয়ে আসি, সে বলল, নিশ্চয় দেখিয়ে আনুন, আপনাকে অবিশ্বাসের কী আছে? সেখান থেকে গিয়ে আধা ঘণ্টার মধ্যে এ কাজ করলেন– অংলংকারের সব পাথর খুলে ছোট ছোট কাগজের টুকরা দস্তখতসহ নিচে রেখে দিয়ে পাথরগুলো যথাস্থানে বসিয়ে দিয়ে স্বর্ণকারের হাতে ফেরৎ দিলেন। স্বর্ণকার তার অলংকার নিয়ে ফিরে গেল।

এদিকে মাওলানা গিয়ে আদালতে মামলা দায়ের করলেন, অমুক স্বর্ণকার আমার ঘর থেকে পনের হাজার টাকা মূল্যের অলংকার চুরি করে নিয়ে গেছে। এখন সে কোথায় আত্মগোপন করেছে জানি না। দ্রুত সমন জারি হল। স্বর্ণকার এসে কোর্টে উপস্থিত হল। মাওলানার দাবি ছিল পনের হাজার টাকার অলংকার নিয়ে গিয়েছে। স্বর্ণকার বলছে আমি কারো অলংকার আনিনি, আমি তাকে দেখানোর জন্য নিয়ে গিয়েছিলাম। মাওলানা বললেন, সে মিথ্যুক। চুরি করে নিয়ে গিয়েছে, এখন মিথ্যা কথা বলছে যে, আমি দেখানোর জন্য নিয়ো গিয়েছিলাম। আমার তাকে বাড়িতে ডাকার কী প্রয়োজন ছিল? আমি দোকানে গিয়ে দেখতে পারিনি? দুজনই তর্ক করতে লাগলেন। জজ বললেন, আপনার কোন প্রমাণ আছে? মাওলানা বললেন, তার সকল অলংকার আদালতে তলব করা হোক, আমি আমার অলংকার চিনতে পারবো। সেমতে সব অলংকার আদালতে উপস্থিত করা হল। মাওলানা পূর্বে যে অলংকারগুলো দেখেছিললেন, সেসব পৃথক করে বললেন, এগুলো আমার অলংকার। স্বর্ণকার চিৎকার করতে লাগল– এগুলো আমার দোকানের, মাওলানার নয়।

জজ বললেন, মাওলানা! প্রমাণ কোথায়? মাওলানা বললেন, যে কোন একটি অলংকারের পাথর উঠিয়ে দেখুন, এর নিচে আমার দস্তখতের কাগজ রয়েছে। এখন যে পাথরই উঠানো হয়, তার নিচে মাওলানার দস্তখতের কাগজ রয়েছে। পনের হাজারের সকল অলংকারে মাওলানার দস্তখত ছিল, মাওলানা ডিক্রি পেয়ে গেলেন এবং সব অলংকার নিয়ে বাড়ি ফিরলেন। এ ছিল তার অবস্থা। এর সাথে ইলমী যোগ্যতা ছিল এ পরিমাণ যে, তিনি পথ চলছেন তো ছাত্ররা সাথে সাথে কিতাব নিয়ে চলছে, দরস চলছে।

যাই হোক, শেষজীবনে আল্লাহ তাআলা তওবা নসীব করেছিলেন এবং এমন স্ত রে পৌঁছেছিলেন যে, সম্পূর্ণ রাত নফল নামাযে কাটিয়ে দিতেন, তিলাওয়াত, দুরুদ শরীফ পাঠ তাঁর সর্বক্ষণের কাজ ছিল। তার সাধারণ অভ্যাস ছিল যে,

শুক্রবারে সম্পূর্ণ রাত্রি দুরুদ শরীফ পাঠে অতিবাহিত করতেন, ঘুমাতেন না। যেমন ইমাম সুফিয়ান সাওরী বলেছেন, আমি দুনিয়া অর্জনের উদ্দেশ্যে ইলম হাসিল করেছিলাম, কিন্তু ইলম বললো, আমি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো জন্য থাকব না। ইলমই আমাদেরকে আল্লাহর সাথে মিলিয়ে দিয়েছে। মাওলানাও ইলম হাসিল করেছিলেন, তাই ইলম তাকে শেষ পর্যন্ত নিজের দিকে সজোরে আকর্ষণ করেছে। এসব অপকর্ম ছেড়ে দিয়েছেন, শেষজীবন তার অত্যন্ত পাক পবিত্র অবস্থায় কেটেছে। আমি আরয করেছিলাম যে, এতসব মন্দকাজ থাকা সত্ত্বেও তার নিকট ইলম ছিল বিধায় ছাত্রগণ তার পিছু পিছু কিতাব নিয়ে ঘুরেছে, তারা জুয়ার পিছনে ঘোরেনি। তার জুয়া-প্রতারণা তার সাথে রয়েছে– তিনি জানেন আর তার আল্লাহ জানেন।

সমগ্র উম্মতের মধ্যে কিভাবে কল্যাণ প্রকাশ পেতে পারে

সম্পূর্ণ উম্মতের মধ্যে যদি এ জযবা ও উৎসাহ সৃষ্টি হয়ে যায় যে, প্রত্যেক ব্যক্তির ভালটুকু গ্রহণ করে তা থেকে উপকৃত হব এবং তার মন্দগুলো তার নিজে দায়িত্বে থাকবে, তবে সম্পূর্ণ উম্মতকে নেককার বলে মনে হবে। আর যদি উম্মতের প্রতিটি মানুষের মন্দ কার্যাবলি নিয়ে ঘাটাঘাটি করতে থাকেন এবং ভাল কাজগুলোকে দাফন করতে থাকেন, তখন মনে হবে সম্পূর্ণ উম্মত মন্দকাজে ডুবে রয়েছে, এ উম্মতের মধ্যে কোন ভাল ব্যক্তি নেই। এই ভুল দৃষ্টিভঙ্গির কারণে আমরা সম্পূর্ণ উম্মতকে মন্দভাবে উপস্থাপন করছি। আমাদের মধ্যে না আছে দলবদ্ধতা অবশিষ্ট আছে, না একতা আছে, না আছে অন্তরের মিল মুহাব্বত। তাই আমরা একে অন্যের মন্দটাই দেখি। নিজের দিক থেকে প্রত্যেকেই মনে করে যে, আমিই সর্বোত্তম এবং অন্যরা নিকৃষ্ট। অন্যজনও এই মনে করে যে, আমিই শ্রেষ্ট এবং অন্যরা তুচ্ছ। সাত দরবেশ একটা কম্বলের নিচে ঘুমাতে পারেন, কিন্তু দুজন বাদশাহ একটা দেশে একত্রে থাকতে পারেন না (সম্পূর্ণ একটা দেশে মাত্র দুজন মানুষের সংকুলান হয় না)। এজন্য যে, দরবেশদের মধ্যে রয়েছে বিনয় ও নম্রতা এবং বাদশাহদের মধ্যে রয়েছে অহংকার। তাদের অহংকার অন্যদের সাথে মিলিত হতে তাদেরকে বাধা প্রদান করে। প্রতিটি মানুষ যেন অহংকার ও অন্যের প্রতি ঘৃণা করাকে পেশা বানিয়ে নিয়েছে। এ কারণেই ঝগড়া-ফাসদ ও কলহ হচেছ।

যদি সকলের অন্তরে বিনয় ও নম্রতা সৃষ্টি হয়ে যায়, তবে সকল ফাসাদ কলহ শেষ হয়ে যাবে। আপনি যখন অন্যকে এ কথা বলবেন– আপনি শ্রেষ্ঠ, আপনি

মহৎ, আমি আপনার চেয়ে ছোট, তখন সেও বলবে, না আপনি বড়, আমি আপনার চেয়ে ছোট। তখন ঝগড়া কলহ হবে কেমন করে? লাড়াই ঝগড়া তখনই হয়, যখন আপনি বলেন আমি সম্মানিত, মর্যাদাশীল এবং তুমি তুচ্ছ, হীন, অসম্মানের। তখন সেও বলবে, আমি সম্মানিত, ভদ্র, তুমিই অভদ্র, সম্মানহীন, তুচ্ছ। তখনই প্রয়োজন দেখা দিবে লাঠিসোটার। যখন প্রত্যেকেই এ কথা বলবে– আপনিই উচ্চ মর্যদাশীল, আমি আপনার খাদেম মাত্র, তখন আর কোন কলহ থাকবে না। পায়ের নিচের সাপকেও কেউ হত্যা করে না। মোটকথা, উম্মতের মধ্যে আপনি যেখানে দেখবেন ঝগড়া কলহ রয়েছে, মনে করবেন সেখানে কোন অহংকারী ঢুকে পড়েছে, এমন কেউ রয়েছে যে নিজেকে সর্বোত্তম মনে করে, যার মধ্যে রয়েছে ক্ষমতার লোভ, যার ভেতর বাসা বেঁধেছে সম্মানের মোহ। এখানেই আরম্ভ হয়ে যায় ঝগড়া-বিবাদ।

দুটি মাত্র জিনিস রয়েছে যা উম্মতের ধ্বংস ডেকে আনে। একটি হল সম্মানের মোহ, অপরটি হল সম্পদের মোহ। সম্মানের বস্তু হল আল্লাহর দীন, তদনুযায়ী আমল করতে হবে, এ নিয়ে গর্ব করা যাবে না। সম্পদ হল আল্লাহ দান, তাঁর বর্ণিত খাতসমূহে একে ব্যয় করতে হবে। ধন-সম্পদ এমন বস্তু নয় যে, একেই আল্লাহ বানিয়ে মানুষ তার সামনে সিজদায় মাথা ঝুঁকিয়ে দেবে। সম্পদ হল ব্যবহার কারার বস্তু। মানুষ যখন আল্লাহর ইবাদত বন্দেগী করেন তখন তাকে সম্মানিত করা হয়, যখন পরিশ্রম করে তখন তাকে সম্পদ দেয়া হয়। এ দুটো জিনিসই আল্লাহ প্রদত্ত, তা আল্লাহর জন্যই ব্যবহার করা উচিত। এ জন্য যে, এগুলোকে যদি আমরা মানুষের কল্যাণে ব্যবহার করি, নিজের শ্রেষ্টত্ব প্রমাণের উপকরণ না বানাই, তাহলে সম্পূর্ণ উম্মতের মধ্যে খায়র ও কল্যাণের অপূর্ব বিকাশ ঘটবে।

সমষ্টিগতভাবে উম্মতও মাসুম

আমি এ কথা আরয করছিলাম যে, সম্পূর্ণ উম্মত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর স্থলাভিষিক্ত। যেভাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাসুম ছিলেন, সমষ্টিগতভাবে উম্মতও মাসুম। উম্মতের মধ্যে ব্যক্তি খারাপ হতে পারে, কোন একটি স্তর খারাপ হয়ে যেতে পারে, কিন্তু সমষ্টিগতভাবে উম্মত মাসুম বা নিষ্পাপ। অর্থাৎ দীন ধ্বংস হয়ে যেতে পারে না। এমন হবে না যে, দীন বিলীন হয়ে গিয়ে ব্যাপক ভিত্তিতে গোমরাহী ছড়িয়ে পড়েছে, হিদায়াতের প্রদীপ নির্বাপিত হয়ে পড়েছে। হিদায়াত তার প্রকৃত রূপ নিয় বিদ্যমান থাকেব।

সুতরাং সমষ্টিগতভাবে এ উম্মত মাসুম ও নিষ্পাপ। এভাবে যে, এ উম্মত ধ্বংস ও নিঃশেষ হয়ে গিয়ে অন্য কোন উম্মতের আবির্ভাব হবে– এমন হবে না। যেমনটি পূর্বযুগে হত। তখন এক উম্মত নিঃশেষ হয়ে যেত এবং অন্য উম্মতের গোড়াপত্তন হত, এক নবুওয়াত শেষ হয়ে অন্য নবুওয়াত আত্মপ্রকাশ করত। এখন একই নবুওয়াত যা কিয়ামত পর্যন্ত থাকেব, সুতরাং উম্মতও একই যা কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে। এ কারণেই এ উম্মতের সাথে হকও বিদ্যমান থাকবে। এমন হবে না যে, হক বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে এবং গোমরাহী ছড়িয়ে পড়বে।

সর্বদা যেন আল্লাহর ধ্যান থাকে

সকল হিদায়াত জুমার তোফায়েলে একত্রিত হয়েছে। জুমাই আদম আ.-এর পৃথিবীতে আগমনের মাধ্যম হয়েছে। এখানে আগমনের পরই সন্তান হয়েছে, নবুওয়াত প্রকাশ পেয়েছে, নবুওয়াতের ধারার সৃষ্টি হয়েছে, ইলম ও কামাল স্পষ্ট হয়েছে, পবিত্র আখলাকেরও প্রকাশ ঘটেছে এবং এখন পর্যন্ত এ ধারা বজায় রয়েছে। জুমার দিনই হল এসব কামালাতের সমন্বয় সাধনকারী মাধ্যম। এ দ্বারা আমাদের উপকৃত হওয়া কর্তব্য।

আমরা মসজিদে যেভাবে রয়েছি বাইরে গিয়ে যদি সেভাবে থেকে যেতাম, ভাই ভাই হিসেবে জীবন যাপন করতাম, দেহের ন্যায় অন্তরেও যদি একতা ও মিল-মুহাব্বত সৃষ্টি হয়ে যেত; মসজিদে এবং বাইরে কোন পার্থক্য না হত, তবে কতই না কল্যাণময় পরিবেশ হয়ে যেত। আমরা যখন মসজিদের বাইরে যাই তখন আমাদের সামনে থাকে দুনিয়া, আর যখন মসজিদে আসি তখন লক্ষ্য থাকে আল্লাহ এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি। বোঝা গেল আল্লাহকে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টিকে উদ্দেশ্য স্থির করা হলে একতা সৃষ্টি হয়, ভালবাসা সৃষ্টি হয়। আর যদি উদ্দেশ্য হয় দুনিয়া, তবে বিশৃংখলা ও মতপার্থক্য সৃষ্টি হয়।

ইসলাম একথা বলেনি যে, দুনিয়াকে ত্যাগ কর। হালাল পন্থায় সম্পদ উপার্জনকে ফরয করা হয়েছে। ইসলাম বলে যে, দুনিয়াকে নিজের অধীনে এনে তার প্রতি ভালবাসাকে ত্যাগ কর, দুনিয়াকে ব্যবহারের বস্তু হিসেবে গণ্য কর (তুমি দুনিয়ার জন্য ব্যবহৃত হয়ো না)। তোমার শান হবে এই–

دل بیار دوست بکار

হাত-পা কাজে রত আর অন্তর বন্ধুর প্রেমে বিভোর। অন্তর যেন স্বীয় প্রতিপালকের সাথে কথা বলছে।

মোটকথা, ইসলামে দুনিয়াকে বর্জন করার অর্থ এ নয় যে, শহর ত্যাগ কর, জন-বসতি ত্যাগ কর, স্বাদ-আহ্লাদকে বিসর্জন দাও। বরং ইসলাম ঘোষণা করেছে–

كُلُوْا مِنَ الطَّيِّبٰتِ وَعْمَلُوْا صَالِحًا ط

পবিত্র বস্তু আহার কর এবং সৎ কাজ কর। [মুমিনুন : ৫১]

আরো বলা হয়েছে–

فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنٰى وَ ثُلٰثَ وَ رُبٰعَ.

সেসব নারীর মধ্য থেকে যাদের ভাল লাগে বিয়ে করতে পার, প্রয়োজনে দুই জন, তিনজন কিংবা চারজন পর্যন্ত। আর যদি এরূপ আশঙ্কা কর যে, তাদের মধ্যে ন্যায়-সঙ্গত আচরণ বজায় রাখতে পাবে না, তবে একটিই করবে। [নিসা : ৩]

গৃহ নির্মাণ সম্পর্কে কুরআনে আল্লাহ তাআলা তাঁর অনুগ্রহের কথা বলেছেন–

আল্লাহ তোমাদের জন্য তোমাদের গৃহগুলো বসবাস ও শান্তির জায়গা বানিয়েছেন। [নাহল : ৮০]

কাপড় দ্বারা নির্মিত গৃহ (তাঁবু) দান করেছেন, চামড়া দ্বারা নির্মিত গৃহ (চামড়ার তাঁবু) দান করেছেন,। গৃহে বসবাস করানো যদি আল্লাহর মনজুর না হত, বনে-জঙ্গলে, পাহাড়ে-পর্বতে বসবাস করানো যদি উদ্দেশ্য হত, তবে ইহসান বলে তা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন কেন? এমনিভাবে আল্লাহ তাআলা আহার করা ও পান করার অনুমতি দিয়েছেন এবং বলেছেন–

হে নবী! আপনি বলে দিন, এমন ব্যক্তি কে? যে আল্লাহর দানকৃত পবিত্র খাদ্য ও নেয়ামতগুলোকে, শোভা বর্ধনকারী বস্তুগুলোকে হারাম করে দেয়। [আরাফ : ৩২]

এ অধিকার কারো নেই। হালার পন্থায় কামনা বাসনাকে পূরণ কর, আল্লাহর শুকরিয়া আদায় কর এবং ভাল আমল কর।

ইসলামে দুনিয়া বর্জনের অর্থ

ইসলামে দুনিয়া বর্জনের এ অর্থ নয় যে, মানুষ শহর-বন্দর-জনবসতি ত্যাগ করে, সকল বৈধ কামনা বাসনাকে বিসর্জন দিয়ে পাহাড়-পর্বত, গিরি-গুহায় গিয়ে অবস্থান করবে; বরং অর্থ হল এই, সম্পদ উপার্জন কর, শহর আবাদ কর, সবার সাথে মিলেমিশে থাকবে তবুও আল্লাহর সাথে সম্পর্ক বজায় রাখবে।

মাবুদ মাত্র একজনই। এইসব বস্তুকে উপাস্য বানিও না, অর্থ-সম্পদকে মাবুদ বানিও না। আল্লাহ তাআলা ধন-সম্পদকে তোমাদের খাদেম ও সেবক বানিয়েছেন, তোমাদের উপাস্য বানাননি যে, তোমরা এদের উপাসনায় ব্যস্ত হয়ে পড়বে। মানুষকে মান-সম্মান, প্রভাব-প্রতিপত্তি আল্লাহ তাআলা এ জন্য দিয়েছেন যে, এ দ্বারা বাতিলকে প্রতিহত করবে, ক্ষমতা দ্বারা বাতিলকে প্রতিরোধ করবে। এজন্য দেয়া হয়নি যে, মানুষ অহংকার ও আত্মগর্বে লিপ্ত হয়ে ধ্বংস হয়ে যাবে, বড় বড় বুলি আওড়াবে অহংকারী হয়ে যাবে। আল্লাহ বুদ্ধি বিবেচনার জন্য সম্পদ দিয়েছেন। ঐ সকল সম্পদ সঞ্চয় কর যা উপকারী। মান-সম্মান ও প্রভাব-প্রতিপত্তি দ্বারা ঐসব জিনিস প্রতিহত কর, যা তোমার জন্য ক্ষতিকর। উদ্দেশ্যকে ত্যাগ করে উপায়-উপকরণের পিছনে ছোটা বুদ্ধিমত্তা বিরুদ্ধ।

জুমার শিক্ষা

মোটকথা, জুমা আমাদেরকে শিক্ষা দেয় যে, আমরা এক স্থানে সমবেত হব। আর সমবেত হওয়ার ধরণ হবে এই– সকলের মুখ আল্লাহ তাআলার দিকে থাকবে, কিবলার দিকে মুখ করে থাকব। সবাই যখন একমুখী হয়ে বসব তখন একতার সৃষ্টি হবে। আর যদি মুখোমুখি হয়ে বসি তবে সংঘাত তৈরি হবে। সকলের মুখ একদিকে হলে সংঘাতের কোন কারণ থাকবে না।

আপনাদের মধ্যে যাঁরা হজ করতে গিয়েছেন তাঁরা জানেন, তাওয়াফ করার জায়গায় কয়েক লক্ষ মানুষ তাওয়াফ করেন। বাইতুল্লাহ শরীফের পাশে একই স্থানে লক্ষ লক্ষ মানুষ সমবেত হন। মহিলা-পুরুষের ভিড়, কাঁধে কাঁধ লাগছে। কিন্তু কোন সংঘাত হচ্ছে না। এজন্য যে, সকলে একই দিকে ঘুরছেন। যদি কিছু এক দিকে কিছু অন্য এদিক হত তবে ধাক্কাধাক্কি হয়ে যেত। সংঘাত তৈরি হত। একদিকে মুখ হওয়ার কারণে লাখ লাখ মানুষ হওয়া সত্ত্বেও কোন সংঘাত নেই, কোন ঘাত-প্রতিঘাত নেই।

আপনারা যখন জামে মসজিদে আসবেন তখন সবার মুখ একদিকে থাকবে। তাতে সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হবে। কোন প্রকার দ্বন্দ্ব ও বিরোধ হবে না। যখন মসজিদ হতে বেরিয়ে যাবেন তখন কারো মুখ দোকানের দিকে, কারো মুখ অফিসের দিকে– প্রত্যেকেই পরস্পর বিরোধী পথের পথিক। এতে পারস্পরিক সংঘাত ও সংঘর্ষ শুরু হয়ে যাবে।

বাহ্যিকভাবে এখানে যেমন রয়েছেন, মসজিদের বাইরেও যদি আন্তরিকভাবে আল্লাহর দিকে মুখ করে নেন, তবে সেখানেও একই অবস্থার সৃষ্টি হবে। সুতরাং জুমার দিন আমাদেরকে বলছে– বাহ্যিকভাবে তোমরা যেমন একত্রিত হয়েছ, আন্তরিকভাবেও আমি তোমাদেরকে একত্র করে দিলাম। তোমরা যখন বাইরে যাবে তখন অন্তরের মুখ আল্লাহর দিকে রেখ, আল্লাহর সাথে সংযুক্ত করে রেখ, তোমাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি হবে না।

মোটকথা, জুমা একটি পরীক্ষারও দিন, এ পরীক্ষায় উম্মত সফল হয়েছে। জুমা একত্রিত করণেরও দিন, এ দিনে বিক্ষিপ্ত সকল জিনিসকে একত্রিত করা হয়েছে। জুমা ফযিলতেরও দিন, এ দিনে মানুষ ফযিলত লাভ করেছে। জুমা ইয়াওমে মাযিদও, এ দ্বারা আল্লাহর দরবারে উপস্থিত হওয়ার অভ্যাস গড়ে উঠছে। এজন্যই সর্বোচ্চ আগ্রহ ও আন্তরিকতায় জুমা আদায় করা কর্তব্য। আযান হওয়ার পূর্বেই মসজিদে গিয়ে প্রথম কাতারে বসা কর্তব্য। যেন সকল ফযিলত ও বরকত হাসিল হয়।

এই সংক্ষিপ্ত সময়ে জুমার এই আলোচ্য বিষয় সামনে ছিল, সে সম্পর্কে আমি কিছু কথা আলোচনা করলাম। আল্লাহ তাআলা কবুল করুন।

اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين، برحمتك يا ارحم الراحمين، امين.

বয়ান : ১৩

সুন্নাতে খলীল

আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালাম

যেভাবে বিশ্বজগতের প্রতিটি বস্তুর মধ্যে আকৃতি এবং রূহ রয়েছে, ঠিক তদ্রূপ শরীয়তের আমলসমূহেরও একটি রূহ রয়েছে। ওখানে যেমন প্রত্যেক আকৃতির জন্য নির্দিষ্ট রূহ রয়েছে, যা অন্যের মধ্যে প্রবেশ করতে পারে না, তদ্রূপ এখানেও একটি রূহ রয়েছে যা অন্যের মধ্যে প্রবেশ করতে পারে না। সুতরাং এবার বুঝে নিন যে, শরীয়তের সকল আমলের উদ্দেশ্য হল তাকওয়া। যেমন নামায দ্বারা মিনতি ও হীনতা প্রকাশের মাধ্যমে তাকওয়া অর্জিত হয়, রোযা দ্বারা আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে, জিহাদে বীরত্বের মাধ্যমে, সদকায় সম্পদ ব্যয়ের মাধ্যমে এবং কুরবানীতে আত্মোৎসর্গের মাধ্যমে তাকওয়া অর্জিত হয়। এখন যদি আপনি কুরবানীর পরিবর্তে নামায পড়ে নেন, তবে নামায দ্বারা বিনয় ও বন্দেগীর তাকওয়া তো অর্জিত হবে; কিন্তু কুরবানীর মাধ্যমে অর্জনযোগ্য তাকওয়া অর্জিত হবে না। কাজেই কোন ব্যক্তি যদি কুরবানী না করে সদকা করে দেয় তবে সে কিয়ামতের দিন সদকার সাওয়াব পাবে, কিন্তু তার উপর কুরবানীর প্রশ্ন থেকে যাবে এবং তাকে জবাবদিহি করতে হবে যে, কেন কুরবানী করেনি?

– হযরত হাকীমুল ইসলাম রহ.



اَلْحَمْدُ لله نَحْمَدُه وَنَسْتَعِيْنُه وَنَسْتَغْفِرُه وَنُؤْمِنُ به وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِالله مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّاٰتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَّهْدِه اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَه، وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلا هَادِىَ لَه، وَنَشْهَدُ أَنْ لاَّ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَه لاَ شَرِيْكَ لَه، وَنَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَمَوْلاَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُه وَرَسُوْلُه، أَرْسَلَهُ اللهُ إِلىٰ كَافَّـــةً لِّلنَّاسِ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا وَّدَاعِيًا إِلَيْهِ بِإِذْنِه وَسِرَاجًا مُّنِـــيْرًا.

أَمَّـــابَعْدُ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: مَا عَمل ابن ادم من عمل يوم النحر احب إلى الله من اهراق الدّم وانه ليأتى يوم القيامة بقرونها وأشعارها و أظلافها وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل ان يقع بالأرض فطيبوابها نفسًا.

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছন– কুরবানীর ঈদের দিন মানুষের সমস্ত নেক আমলের মধ্যে সর্বাধিক প্রিয় ও পছন্দনীয় আমল হল কুরবানী করা। কুরবানীর এ পশু কিয়ামতের ময়দানে তার শিং, পশম ও পায়ের খুরাসহ সম্পূর্ণ সুস্থ-সবল অবস্থায় এসে হাজির হবে এবং নিশ্চয়ই কুরবানীর রক্ত মাটিতে পড়ার পূর্বেই আল্লাহর দরবারে কবুলিয়াতের মর্যাদা লাভ করে। সুতরাং প্রফুল্ল চিত্তে কুরবানী কর।

বুযুর্গানে মুহতারাম!

আপনাদের সামনে এখন আমি যে হাদীসখানা তিলাওয়াত করলাম তাতে কুরবানীর আহকাম সংক্রান্ত বিষয় বর্ণিত হয়েছে, যা এখনকার এই সভারও আলোচ্য বিষয়। বয়ান হবে সংক্ষিপ্ত। কেননা প্রথমত কুরবানীর মাসয়ালাটি হল একটি জুযি মাসয়ালা বা শাখা মাসয়ালা। আর শাখা বিষয়ের অধিক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ হয় না। কেননা, ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ হয় উসুল ও বা মূললনীতির ক্ষেত্রে।

এ ছাড়া এটি হল একটি সাধারণ মাসয়ালা। এমন কোন মুসলমান নেই, যে এ বিষয় সম্পর্কে অবহিত নয়। কুরবানীর আমলটি শুধু এক বছরের জন্য নয় বরং বহু শতাব্দি ধরে এ আমলটি চলে আসছে। এজন্য এর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণর নিষ্প্রয়োজন। সুতরাং মূল মাসআলাটি সার্বজনীন হওয়ায় ব্যাখ্যা করার অবকাশও রাখে না, প্রয়োজনও নেই।

তিনটি প্রাকৃতিক মূলনীতি

প্রথম মূলনীতি : কুরবানীর মাসআলাটির ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের পূর্বে একটি মূলনীতি বুঝে নিন। এ নীতিটি যেমন তাকবীনি (প্রাকৃতিক) তেমনি শরীয়ত সমর্থিতও বটে। নীতিটি হল এই– আল্লাহ তাআলা এ বিশ্বজগতের সবকিছুকে, প্রতিটি অণু-পরমাণুকে দুটি জিনিসের সমন্বয়ে সৃষ্টি করেছেন। একটি হল রূহ, আরেকটি হল দেহ। অর্থাৎ প্রত্যেকটি বস্তুর একটি হল তার আকৃতি আর অপরটি হল তার হাকিকত বা মূলতত্ত্ব, কিংবা একটি হল তার আকৃতি আর অপরটি হল তার মৌল প্রকৃতি। অথবা এমনও বলতে পারেন যে, একটি হল জাহিরী বা বাহ্যিক অংশ অপরটি হল বাতেনী বা অভ্যন্তরীণ অংশ। মোটকথা, মানবজাতি, প্রাণীজগৎ, উদ্ভিদ এবং জড় পদার্থদের যেমন একটি আকৃতি রয়েছে, তেমন একটি হাকিকত বা মৌলপ্রকৃতি রয়েছে। একটি হল দেহ, আরেকটি হল রূহ। আল্লাহ তাআলা প্রতিটি দেহকে তার উপযোগী রূহ বা জীবনীশক্তি দান দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা যখন সৃষ্টিকুলের শক্তি ও দেহ সৃষ্টির প্রতি মনোনিবেশ করলেন তখন এ নীতিই কার্যকর ছিল।

সর্বাগ্রে মানবজাতিকেই দেখুন, প্রথমে মানুষের দেহ তৈরি হয়, যার সূচনা হয় 'নুতফা' বা শুক্রকীট থেকে, অর্থাৎ এক অপবিত্র পানির ফোঁটা থেকে শুরু হয়। যার বর্ণনা কুরআনে এভাবে এসেছে–

> আমি মানুষকে মাটির নির্যাস থেকে সৃষ্টি করেছি। অতঃপর আমি শুক্রবিন্দুরূপে এক সংরক্ষিত আধারে স্থাপন করেছি।

> এরপর আমি শুক্রবিন্দুকে জমাট রক্তরূপে সৃষ্টি করেছি, অতঃপর জমাট রক্তকে মাংসপিণ্ডে পরিণত করেছি, এরপর সেই মাংসপিণ্ড থেকে অস্থি সৃষ্টি করেছি, অবশেষে তাকে এক নতুন রূপে দাঁড় করিয়েছি। নিপুণতম সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ কত কল্যাণময়। [মুমিনুন : ১২-১৪]

সুতরাং রূহ সঞ্চার করার পূর্বে কাঠামো তৈরি করা হয়, যার প্রস্তুতিতে মাটির শক্তিগুলোও ব্যবহৃত হয়, আকাশেরও শক্তিও ব্যবহৃত হয়, সূর্যের শক্তিও ব্যবহৃত হয় এবং বাতাসের শক্তিও ব্যবহৃত হয়।

মোটকথা, কায়েনাতের সকল শক্তির সমন্বয়ে কাঠামো তৈরি করে তারপর এর মধ্যে রূহ সঞ্চার করা হয়। এই পদ্ধতিই সকল জড় বস্তু, উদ্ভিদ ও প্রাণিকুলে কার্যকর রয়েছে।

দ্বিতীয় মূলনীতি: উপরোক্ত বিষয়টি অনুধাবন করার পর এ কথাটিও বুঝে নিন যে, দেহ ও রূহ যদি সংযুক্ত না থাকে তবে এ বিশ্বের কোন কিছুই টিকে থাকতে পারবে না। যেন দেহের উপর রূহের টিকে থাকা নির্ভর করে এবং রূহের উপর দেহের টিকে থাকা নির্ভর করে। আপনি যদি দেহকে ক্ষত-বিক্ষত করে ধ্বংস করে দেন অথবা প্রাকৃতিকভাবে যদি নষ্ট হয়ে যায় এবং তাতে চেতনাশক্তি বাকি না থাকে তবে রূহ টিকতে পারবে না, উড়ে যাবে। এজন্য যে, দেহই রূহকে আগলে রাখে।

মোটকথা, মানুষের মধ্যে যতক্ষণ রূহ বিদ্যমান থাকে ততক্ষণ সে মানুষ, অন্যথায় তা শবদেহ। যা সম্পূর্ণ বেকার, অর্থহীন। এরপর সার্বিক দেহের জন্য যেমন একটি সর্বাঙ্গীন রূহ রয়েছে, তদ্রূপ দেহের প্রতিটি অংশের জন্য পৃথক পৃথক রূহ রয়েছে, যা ঐ অঙ্গের সাথেই অবস্থান করতে পারে। যদি এ অংশকে ধ্বংস করে দেয়া হয় তবে ঐ রূহও থাকবে না। এমন হতে পারবে না যে, একটি অংশকে শেষ করে দেবেন আর সে অংশের রূহ অন্য অংশে চলে যাবে। যেমন ধরুন চোখ। এ অঙ্গটির রূহ হল দৃষ্টিশক্তি। যদি চোখকে নষ্ট করে দেয়া হয় তবে এমন হবে না যে, দৃষ্টিশক্তি উদাহরণত নাকে চলে যাবে; বরং এ শক্তিটিই আর টিকে থাকতে পারবে না। এমনিভাবে নাকের মধ্যে রয়েছে ঘ্রাণ শক্তি, কানে আছে শ্রবণ শক্তি প্রভৃতি।

মূল কথা দাঁড়াল এই, আল্লাহ তাআলা শক্তির যত আধার সৃষ্টি করেছেন, তাদের সাথে সাথে সেগুলোর জন্য রূহও সৃষ্টি করেছেন। আর এ উভয় অংশ মিলেই তা কায়েনাতের অংশ হয়। যদি উভয়টি পৃথক করে দেয়া হয় তাহলে তাকে মৃত্যু

বলা হয় এবং এ ধরনের বিচ্ছিন্নতা দ্বারা সৃষ্টিকুলের সবকিছুই শেষ হয়ে যায়। আনুসঙ্গিক আরও একটি নীতি বুঝে নিন যে, দেহাভ্যন্তরে যেসকল শক্তি নিহিত রয়েছে তাদের পরিচয় লাভ হয় দেহের মাধ্যমে। যেমন দৃষ্টিশক্তির পরিচয় পাওয়া যায় চোখের মাধ্যমে, শ্রবণশক্তির পরিচয় লাভ হয় কানের মাধ্যমে। মোটকথা, এ অঙ্গগুলো ঐ সকল শক্তিরই মাধ্যম ও পরিচায়ক। যদি এ অঙ্গগুলো না থাকে তবে পরিচিতিও শেষ হয়ে যাবে। এ মৌলনীতির সারাংশ হল এই, দেহ আত্মার পরিচয় লাভের মাধ্যম।

তৃতীয় মূলনীতি: এখন তৃতীয় নীতিটিও বুঝে নিন– আপনি যদি রূহের মধ্যে কোন কিছুর প্রভাব বিস্তার করতে চান তবে তা দেহের মাধ্যমে করতে হবে। এ জগতে সরাসরি রূহকে প্রভাবান্বিত করার কোন উপায় নেই।

উদাহরণত, আপনি যদি রূহের মধ্যে তাপ পৌঁছাতে ইচ্ছা করেন তবে দেহকে আগুনের কাছে নিতে হবে। দেহ উত্তপ্ত হয়ে যাওয়ার পর তাপ রূহে পৌঁছবে। যদি ঠাণ্ডা পৌঁছাতে ইচ্ছা করেন তবে শরীরে পানি ঢালতে হবে অথবা বরফ ঘষতে হবে বা অজু করতে হবে ইত্যাদি। মোটকথা রূহের মধ্যে সর্বপ্রকার প্রভাব বিস্তারের মাধ্যম হল শরীর। শরীর ব্যতীত রূহকে প্রভাবান্বিত করা সম্ভবপর নয়।

শরীয়তের মূলনীতিত্রয়

তিনটি মূলনীতি জানা গেল যে, দেহ দ্বারা তিনটি কাজ সম্পাদিত হয়– এক. রূহের অবস্থান গ্রহণ, দুই. রূহের পরিচয় অর্জন, তিন. রূহকে প্রভাবান্বিত করণ। এ তিনটি কথা এতই স্পষ্ট যে, এর জন্য কোন প্রকার দলিল প্রমাণের প্রয়োজন নেই।

এ তিনটি নীতি যেমন তাকবীনি বা প্রাকৃতিক, তেমনি তাশরীয়ি বা শরীয়ত সমর্থিতও। অর্থাৎ শরীয়তের আমলসমূহের মধ্যেও একটি আকৃতি ও একটি রূহ রয়েছে। আকৃতি বিহীন অবস্থায় রূহের টিকে থাকা সম্ভব নয়। তেমনিভাবে রূহ পর্যন্ত কোন প্রভাব ও ক্রিয়া পৌঁছাতে চাইলে তা আকার-আকৃতির মাধ্যমেই পৌঁছানো সম্ভব হবে। শরীয়তে এ বিষয়ের অজস্র উদাহরণ রয়েছে। উদাহরণত অজুকে দেখুন– এর একটি আকৃতি রয়েছে, একটি রূহও রয়েছে। তার আকৃতি হল– ঐ বিশেষ অবস্থা ও কাজকর্ম যা অজু করার সময় মানুষ করে থাকে। অর্থাৎ বিশেষ পদ্ধতিতে বসে বিশেষ বিশেষ অঙ্গগুলোকে ধৌত করা। এ অবস্থা ও আকৃতিই তাকে পরিচয় করানোর মাধ্যম। আপনি যদি অজু করতে থাকেন,

তবে সবাই আপনাকে দেখেই পরিচয় পাবে যে, আপনি অজু করছেন, খাবার খাচ্ছেন না। কেননা আহারকারীর আকার ও অবস্থা অন্যরকম হয়। এ হল অজুর আকার-আকৃতি। আরেকটি হল তার রূহ, অর্থাৎ পবিত্রতা অর্জন করা যা দ্বারা মানুষ আল্লাহর দরবারে উপস্থিত হওয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত হবে। অন্য আরেকটি হল অজুর ক্রিয়া ও প্রভাব, অর্থাৎ বিশেষ ধরনের আধ্যাত্মিক আনন্দ অনুভূতি যা অজুর পর অন্তরে সৃষ্টি হয়। এ পবিত্রতা ও আধ্যাত্মিক আনন্দানুভূতি অজুর বাহ্যিক আকার আকৃতি গ্রহণ ব্যতীত কখনো লাভ করা যাবে না। এভাবে গোসলেরও একটি আকৃতি রয়েছে। অর্থাৎ পুরো শরীরকে ধোয়া। আরেকটি হল তার রূহ অর্থাৎ পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা অর্জন করা। আর ক্রিয়া ও প্রভাব হল আত্মার আনন্দ ও সন্তুষ্টি লাভ। এখন যদি কোন ব্যক্তি জীবনভর গোসল না করে, তবে সে আনন্দ ও সন্তুষ্টির ঐ বিশেষ অনুভূতিকে কখনো লাভ করতে পারবে না। মোটকথা প্রত্যেক বস্তুর রূহকে হাসিল করতে হলে তার আকার আকৃতিকে অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে। এভাবে নামাযকে মনে করুন, তার আকৃতি হল নিয়ত করে হাত বেঁধে দাঁড়ানো, রুকু সিজদা প্রভৃতি আদায় করা, আর নামাযের রূহ হল আল্লাহর নৈকট্য অর্জন এবং নিজের বন্দেগী ও দাসত্বের প্রকাশ। আপনি যদি নামাযের আকৃতিকে গ্রহণ না করেন, তবে বন্দেগীর এ বিশেষ ধরণ কখনো হাসিল হবে না। এভাবে যাকাত, রোযা ও অন্যান্য ইবাদতগুলোকে মনে করুন– প্রত্যেকটির এক একটি রূহ ও এক একটি আকৃতি রয়েছে।

নফসের প্রিয় বস্তুর কুরবানী

আমরা যে কুরবানী করি, এরও একটি আকৃতি ও একটি রূহ রয়েছে, আকৃতি হল পশু জবাই করা, আর হাকিকত হল অন্তরে আত্মোৎসর্গ করার আবেগ সৃষ্টি করা এবং আল্লাহ তাআলার নৈকট্যশীলতা অর্জন করা। সুতরাং স্পষ্ট কথা যে, পশু জবাই ব্যতীত এ রূহ কিভাবে হাসিল হবে? কেননা এ কথা পথমেই জানা হয়েছে যে, প্রত্যেকটি আকৃতিতে তার উপযোগী রূহ প্রদান করা হয়। নামাযের মধ্যে নামাযের উপযোগী রূহ প্রদান করা হয়, যাকাতে যাকাতের উপযোগী রূহ এবং কুরবানীতে কুরবানীর উপযোগী রূহ প্রদান করা হয়। সুতরাং আল্লাহ তাআলা যে আকৃতি নির্ধারণ করে দিয়েছেন, তা-ই গ্রহণ করতে হবে। তাহলেই কেবল তদনুযায়ী রূহ প্রদান করা হবে। তিনি যদি কোন কিছুর কুরবানী কামনা করেন তবে কুরবানীই করতে হবে। কুরআনে বলা হয়েছে–

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ.

তোমরা স্বীয় প্রিয়তম বস্তুকে আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় ব্যয় করা ব্যতীত পূর্ণাঙ্গ কল্যাণ অর্জন করতে পারবে না। [আলে ইমরান : ৯২]

আর সম্পদ হল মানুষের প্রিয়তম জিনিস। আবার সম্পদের মধ্যে পশু হল সর্বাধিক প্রিয়। কেননা 'প্রাণ বিশিষ্ট' হওয়ার কারণে এর সাথে অধিক মুহাব্বত হয়ে থাকে। কারণ, কোন প্রাণহীন বস্তু ধ্বংস হয়ে গেলে মানুষ অন্যটি তৈরি করে নিতে পারে। কিন্তু কোন প্রাণী যদি ধ্বংস হয়ে যায় তবে দ্বিতীয়টি তৈরি করা যায় না। আর সম্পদ তো হল এমন জিনিস যা নিজে ধ্বংস হয়ে আপনাকে উপকৃত করবে। কারো নিকট যদি এক কোটি টাকাও গচ্ছিত থাকে তবে তার কোন উপকার হবে না যে পর্যন্ত একে ব্যয় করা না হবে। পার্থিব উপকারই যখন ব্যয় না করে লাভ করা যায় না, তখন 'আল্লাহর সন্তুষ্টি' যা সর্বোচ্চ ও সর্বোত্তম মুনাফা ও উপকার, তা প্রিয়তম বস্তু কুরবানী না করে হাসিল হবে কেমন করে?

প্রিয় জিনিস কী কী? তা হল প্রাণ, ধন-সম্পদ, সন্তান, মান-সম্মান ইত্যাদি। এজন্যই ইরশাদ হয়েছে–

إِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ أَنْفُسَهُمْ وَ أَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ.

নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা মুমিনদের প্রাণ ও ধন-সম্পদকে জান্নাতের বিনিময়ে ক্রয় করে নিয়েছেন। [তাওবা : ১১১]

মোটকথা, আপনাকে উপরোল্লিখিত প্রত্যেকটি বস্তু উৎসর্গ করতে হবে, কুরবানী করতে হবে। তবেই পরিপূর্ণ বন্দেগীর প্রকাশ ঘটবে। প্রকৃতপক্ষে জান্নাত লাভ হবে ঈমানের বিনিময়ে, আর আমলগুলো হল ঈমান পরিচয়ের মাধ্যম মাত্র। যেমন, সোনা যদি খরিদ করা হয়, তবে কষ্টিপাথরে ঘষে দেখা হয়। ভাল হলেই কেবল খরিদ করা হয়, মূল্য পরিশোধ করা হয়, নতুবা করা হয় না। এ ক্ষেত্রে মূল্য দেয়া হয় স্বর্ণের, কষ্টি পাথরের উপর পতিত রেখাগুলোর মূল্য দেয়া হয় না।

ঠিক এভাবে পরকালের বাজারে জান্নাতের বিনিময়ে ঈমানের মূল্য পরিশোধ করতে হবে। আমাদের আমলগুলো হল ঐ রেখাগুলোর ন্যায় আমাদের ঈমানের পূর্ণতার আলামত। এজন্য জান্নাত লাভের বিনিময়ে 'প্রাণের প্রিয়' জিনিসগুলোকে কুরবানী করা আবশ্যক। যদি মাল ব্যয় করার নির্দেশ দেয়া হয়

তবে মাল ব্যয় কর, যদি প্রাণ উৎসর্গ করার আদেশ হয় তবে প্রাণ উৎসর্গ কর, যদি মান-সম্মানের প্রয়োজন হয় তবে তাও কুরবানী কর। এটাই সত্যিকারের ভালবাসার নিদর্শন।

একজন সাহাবী রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমতে হাজির হয়ে আরয করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার সাথে আমার অগাধ ভালবাসা রয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যা বলছ ভেবেচিন্তে বল। তিনি পুনরায় সেই একই কথা আরয করলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও তাই বললেন– যা বলছ চিন্তা করে বল। তিনি তৃতীয়বার সেই কথাই আরয করলেন যে, আপনার সাথে আমার মুহাব্বত রয়েছে। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'তাহলে অভাব-অভিযোগ সহ্য করার জন্য, আপদ-বিপদ সহ্য করার জন্য, অনাহারে-অর্ধাহারে জীবিকা নির্বাহের জন্য প্রস্তুত হয়ে যাও।' এ কথা স্পষ্ট কথা যে, আশিক তার ভালবাসার প্রমাণ ঐ সময় পর্যন্ত উপস্থাপন করতে পারে না, যে পর্যন্ত বিপদাপদ সহ্য করে দেখাতে না পারে। তাই ইরশাদ করা হয়েছে–

اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُّتْرَكُوْا اَنْ يَّقُوْلُوْا اٰمَنَّ وَهُمْ لَا يُفْتَنُوْنَ○
وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا وَ لَيَعْلَمَنَّ
الْكٰذِبِيْنَ○

মানুষ কি মনে করে যে, শুধু 'ঈমান গ্রহণ করেছি' বললেই তারা অব্যাহতি যাবে? এবং তাদের পরীক্ষা করা হবে না? অথচ আমি তাদের পূর্ববর্তীদেরকেও পরীক্ষা করেছি। আল্লাহ অবশ্যই জেনে নেবেন যারা সত্যবাদী এবং নিশ্চয়ই জেনে নেবেন মিথ্যুকদেরকে। [আনকাবুত : ২-৩]

কুরবানীর রূহ এবং সংশয়ের অবসান

মূল বয়ান এই হচ্ছিল যে, আমলের যেমন রূহ আবশ্যক তদ্রূপ তার আকৃতিও কাম্য। এজন্য যে, দুনিয়াতে আকৃতি হল মূল এবং রূহ হল তার অধীন। আর পরকালে হবে এর বিপরীত। সেখানে রূহ হবে মূল এবং দেহ-আকৃতি হবে তার অধীন। এখন এ কথাটি স্পষ্ট হয়ে গেল যে, দুনিয়াতে প্রত্যেকটি জিনিসের রূহের অস্থানের জন্য যেমন দেহের প্রয়োজন রয়েছে, তদ্রূপ আমলে শরীয়ার রূহের টিকে থাকার জন্য তার দেহের প্রয়োজন রয়েছে।

যদি কোন ব্যক্তি বলে যে, আমলের মধ্যে তো মূল হল রূহ, কাজেই রূহকে গ্রহণ এবং আকৃতিকে বর্জন কর। তাহলে তার উচিত প্রথমে নিজের উপর এ আমল প্রয়োগ করা, এভাবে যে, নিজ দেহকে খতম করে দিক, আত্মহত্যা করুক, তারপর বলুক– আমি টিকিয়ে রাখব। কিন্তু নিজে যখন দেহ বিহীন অবস্থায় থাকতে না পারে, তখন শরয়ী আমলগুলোর উপর কেন এ অস্ত্রোপচার করা হচ্ছে?

আলোচনার শুরুতেই আমরা জেনেছিলাম যে, সার্বিক দেহের জন্য যেমন একটি সর্বাঙ্গীন রূহ রয়েছে, তদ্রূপ দেহের প্রতিটি অংশের জন্য পৃথক পৃথক রূহ রয়েছে, যা ঐ অঙ্গের সাথেই অবস্থান করতে পারে। যেমন, চোখের মধ্যকার দৃষ্টিশক্তি হল চোখের রূহ ইত্যাদি। ঠিক এভাবেই শরীয়তের সার্বিক আমলের জন্য একটি রূহ রয়েছে, আবার প্রত্যেকটি আমলের জন্যও পৃথক পৃথক রূহ রয়েছে। আর এ রূহের নাম হল তাকওয়া। যেমন কুরবানী সম্পর্কে বলা হয়েছে–

لَنْ يَّنَالَ اللّٰهَ لُحُوْمُهَا وَلَا دِمَآؤُهَا وَلٰكِنْ يَّنَالُهُ التَّقْوٰى مِنْكُمْ.

কুরবানীর গোশত ও রক্ত আল্লাহর কাছে পৌছে না, কিন্তু তাঁর কাছে পৌছে কেবল তোমাদের মনের তাকওয়া ও আল্লাহভীতি। [হজ : ৩৭]

বোঝা গেল, কুরবানীর রূহ হল তাকওয়া। সুতরাং কেউ যদি এ কথা বলে যে, যেহেতু কুরবানী দ্বারা উদ্দেশ্য হল তাকওয়া, কাজেই কুরবানী করার কী দরকার? তার চেয়ে বরং তাকওয়া গ্রহণ কর, তাতেই যথেষ্ট হয়ে যাবে। তাহলে এর অর্থ দাঁড়াবে এই যে, সম্পূর্ণ ইসলামকেই ত্যাগ করে শুধু তাকওয়া গ্রহণ করে নাও। কেননা রোযা সম্বন্ধে বলা হয়েছে–

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ○

হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর রোযা ফরজ করা হয়েছে, যেরূপ ফরজ করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের উপর, যেন তোমরা পরহেজগারী অর্জন করতে পার, তাকওয়া অর্জন করতে পার। [বাকারা : ৯৩]

সুতরাং রোযার মূল উদ্দেশ্যও হল তাকওয়া। এমনিভাবে নামায সম্পর্কে বলা

হয়েছে–

اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ

নামায অশ্লীল ও গর্হিত কাজ হতে বিরত রাখে।

এরও মূল কথা হল তাকওয়া, কাজেই নামাজ-রোযাও ছেড়ে দাও। তারপর ইরশাদ হয়েছে–

لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ...الى قوله تعالى: وَاُولٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ○

সৎকর্ম শুধু এই নয় যে, পূর্ব কিংবা পশ্চিমদিকে মুখ করবে, বরং বড় সৎকাজ হল এই যে, ঈমান আনবে আল্লাহর উপর, কিয়ামত দিবসর উপর, ফেরেশতাদের উপর এবং সমস্ত নবী-রাসূলের উপর। আর সম্পদ ব্যয় করবেতাঁরই মহব্বতে আত্মীয়-স্বজন, এতীম-মিসকিন, মুসাফির-ভিক্ষুক ও মুক্তিকামী ক্রীতদাসদের জন্যে। আর যারা নামায প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত দান করে এবং যারা কৃত প্রতিজ্ঞা সম্পাদনকারী এবং অভাবে রোগে-শোকে ও যুদ্ধের সময় ধৈর্যধারণকারী, তারাই হল সত্যাশ্রয়ী। আর তারাই হল মুত্তাকীন। [বাকারা : ১৭৭]

দেখুন, সম্পূর্ণ ইসলামেরই মূল কথা দাঁড়াচ্ছে তাকওয়া, কাজেই (উপরোক্ত দাবি মেনে নেয়ার অর্থ হল) সবকিছু ত্যাগ করে শুধু তাকওয়া নিয়েই বসে থাকুন– এ হল সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ধারণা। এজন্য যে, যেমনিভাবে প্রত্যেক অংশের ভিন্ন ভিন্ন রূহ রয়েছে, তেমনিভাবে প্রত্যেক ইবাদতের পৃথক পৃথক তাকওয়া রয়েছে। সুতরাং যে তাকওয়া রক্ত-মাংস দ্বারা অর্জিত হয় তা অন্য কোন ইবাদত যথা দান-সদকা ইত্যাদি দ্বারা কিভাবে অর্জন হওয়া সম্ভব? উদাহরণত যায়েদের রূহকে যদি স্থানান্তর করে গাধার দেহে দিয়ে দেয়া হয়, তবে সে যায়েদ হয়ে যাবে না, বরং গাধাই থেকে যাবে। এভাবে সদকা সদকাই থেকে যাবে, কুরবানীর স্থলাভিষিক্ত হতে পারবে না। সুতরাং দুনিয়াতে যেহেতু দেহ ছাড়া কোন গত্যন্তর নেই, সেহেতু কুরবানী করতেই হবে। হ্যাঁ, পরকালে গিয়ে আপনি কুরবানী করবেন না, কেননা সেখানে দেহ আবশ্যক নয়। কিন্তু আপনি যদি দুনিয়ায় অবস্থানকালে আমলের আকার আকৃতিকে ত্যাগ করে দেন, তবে নিশ্চিৎ জানবেন, আপনি আমলের রূহকেও ধ্বংস করে দিয়েছেন। এজন্যই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন–

الإيمان سرٌّ والإسلام علانية.

ঈমান হল অদৃশ্য বস্তু, আর ইসলাম হল প্রকাশ্য ।

যেহেতু সদকা অথবা অন্য কোন ইবাদত কুরবানীর স্থলাভিষিক্ত হতে পারে না, তাই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছনঃ

ما عمل إبن ادم يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم.

কুরবানীর দিনে আল্লাহর নিকট কুরবানী অপেক্ষা প্রিয় কোন আমল নেই ।

কাজেই এ দিনে অন্য কোন আমল কেমন করে এর স্থলাভিষিক্ত হবে? হাদীসে বর্ণিত রয়েছে যে, সাহাবায়ে কেরাম আরয করলেন–

ما هذه الأضاحى يا رسول الله؟

হে আল্লাহর রাসূল! এই কুরবানীর তাৎপর্য কী?

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন–

سنة ابيكم إبراهيم

তোমাদের জাতির পিতা হযরত ইবরাহীম আ.-এর সুন্নত ।

সাহাবায়ে কেরাম রা. পুনরায় জানতে চাইলেন–

فما لنا فيها يا رسول الله؟

হে আল্লাহর রাসূল! এতে আমাদের কী লাভ?

হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন–

بكلّ شَعرة حسنة

প্রতিটি পশমের বিনিময়ে একটি করে নেকী মিলবে ।

কাজেই এ প্রতিদান ও সাওয়াব সদকা ইত্যাদি দ্বারা কি করে লাভ হবে? কেননা সদকায় পশম কোথায়? কাজেই প্রকৃত কথা হল এই, প্রত্যেক দেহে তদনুযায়ী রূহ প্রদান করা হয় ।

কুরবানীর তাৎপর্য

প্রকৃতপক্ষে কুরবানীর তাৎপর্য ছিল এই যে, স্বয়ং আশিক (প্রেমিক) স্বীয় প্রাণকে আল্লাহর দরবারে পেশ করবে। কিন্তু আল্লাহ তাআলার রহমাত দেখুন, তিনি একে পছন্দ করলেন না, তাই আদেশ করেছেন, তোমরা পশু জবাই কর, আমি ধরে নেব যে, তোমরা নিজেদেরকে কুরবানী করেছ। সেমত হযরত ইবরাহীম আ.-কে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে স্বপ্নে সুসংবাদ দেয়া হল, আপনি আপনার একমাত্র ছেলে হযরত ইসলামাঈল আ.-কে কুরবানী করুন। লক্ষ্য করুন, প্রথমত এ আদেশ দেয়া হল সন্তান সম্পর্কে। আর সন্তানও কেমন সন্তান, কুপুত্র নয়– সুপুত্র এবং মাসুম। আবার একমাত্র ছেলে। এমন ছেলেকে কুরবানী করা অত্যন্ত দুরূহ ও কঠিন ব্যাপার। নিজ জীবনকে কুরবানী করে দেয়া সহজ। নিজের সন্তানকে নিজ হাতে কুবারণী করে দেয়া অত্যন্ত কঠিন কাজ। কিন্তু আল্লাহ তাআলার আদেশ ছিল, তাই হযরত ইবরাহীম আ. একমাত্র ছেলের স্নেহ-মমতাকে পশ্চাতে ফেলে আল্লাহ তাআলার আদেশ অবনত মস্তকে মেনে নিলেন এবং হযরত ইসমাঈল আ.-কে সাথে নিয়ে মিনায় মানহারে (জবাই করার স্থান) তাশরিফ নিয়ে গেলেন এবং বললেনঃ 'বৎস! আল্লাহ তাআলা আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, আমি যেন তোমাকে জবাই করে দেই...'। সাথে সাথে হযরত ইসমাঈল আ. বললেন–

إِفْعَلْ مَا تُؤْمَرْ.

আপনাকে যা আদেশ করা হয়েছে আপনি তাই করুন।

যদি আমার প্রাণের প্রয়োজন তাঁর হয়, তবে এক জান কেন? হাজারো জান হলেও তাঁর জন্য উৎসর্গীত থাকবে। হযরত ইবরাহীম আ. তাঁর হাত-পা রশি দিয়ে বেঁধে ফেললেন, ছুরি ধার করলেন। এবার ছেলে আনন্দিত যে, 'আমি আল্লাহর রাস্তায় কুরবান হচ্ছি'। পিতা আনন্দিত যে, 'আমি আল্লাহ রাস্তায় একমাত্র ছেলেকে কুরবানী পেশ করছি'। সেমতে আল্লাহর আদেশ পালনার্থে তিনি প্রাণপ্রিয় পুত্রের গলায় ছুরি চালালেন, কিন্তু ছুরি নিষ্ক্রিয় হয়ে রইল। তখন আদেশ দেয়া হল–

قَدْ صَدَّقْتَ الرُّءْيَا ۚ إِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ ○

নিশ্চয়ই আপনি আপনার স্বপ্নকে বাস্তবে পরিণত করে দেখালেন। আমি এভাবেই সৎকর্মীদেরকে প্রতিদান দিয়ে থাকি। [সাফফাত : ১০৫]

এখন আমি তাঁর পবিবর্তে জান্নাত হতে একটি ভেড়া পাঠিয়ে দিলাম এবং আপনার ছেলের পরিবর্তে অন্য একটি প্রাণীর কুরবানী নির্ধারিত করে দিলাম। অতএব, ঐ দিন থেকে প্রাণের পরিবর্তে গরু, বকরী, ভেড়া কুরবানীর জন্য নির্দিষ্ট হয়ে গেল।

কুরবানী ও সদকার মধ্যে পার্থক্য

এ ঘটনা দ্বারা বোঝা গেল যে, জবাই করার প্রকৃত উদ্দেশ্য আল্লাহর রাস্তায় প্রাণ উৎসর্গ করা। যেন এ দ্বারা মানুষের মধ্যে আত্মোৎসর্গী হওয়ার মন মানসিকতা সৃষ্টি হয় এবং এটাই হল কুরবানীর রূহ। এই রূহ কিভাবে সদকা দ্বারা লাভ হবে? কেননা কুরবানীর রূহ হল প্রাণ উৎসর্গ করা, আর সদকার রূহ হল মাল দান করা। তারপর কুরবানী করা সদকা হতে পৃথক ইবাদত। তা এভাবে বোঝা যায় যে, সদকার জন্য কোন দিন তারিখ নির্দিষ্ট নেই, কিন্তু কুরবানীর জন্য বিশেষ একটি দিন নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে এবং এ দিনের নামকরণ করা হয়েছে 'ইয়াওমুন্নাহার' ও 'ইয়াওমুল আযহা'।

কুরবানীর মাসআলা পূর্বাপর সকল যুগে সকল কালে এভাবেই চলে আসছে। হযরত আম্বিয়া আ. ও উম্মতগণ এ বিষয়ে একমত ছিলেন। বনী ইসরাঈলের সকল নবী আ.-এর শরীয়তে কুরবানী ছিল। ফিকাহ'র ইমামগণও এতে একমত রয়েছেন। একথা অবশ্য ভিন্ন যে, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল এবং ইমাম আবু ইউসুফ রহ.-এর নিকট কুরবানী করা সুন্নাত। ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর মাযহাবে কুরবানী করা ওয়াজিব। এ হল কুরবানীর হুকুমের ইখতিলাফ বা মত পার্থক্য। কিন্তু কুরবানী শরীয়তের দৃষ্টিতে একটি ইবাদত– এতে সকলে একমত। যদি কুরবানী শরীয়ত বিরোধী কোন কাজ হত, তবে হাদীসে কুরবানীর পশুর গুণাবলি বর্ণনা করা হয়েছে কেন?

অতএব, সাহাবায়ে কেরাম রা. বলেন, আমাদেরকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিদায়াত করেছেন, আদেশ দিয়েছেন–

ان نستشرف العين والأذن وان لانضحى بمقابلة ولا مدابرة

ولا شرقاء ولا خرقاء.

আমরা কুরবানীর পশুর নাক, কান, চক্ষু ইত্যাদি যেন ভাল করে দেখে নেই। আমরা যেন এমন পশু কুরবানী না করি, যার কানের সামনের অংশ অথবা পিছনের অংশ কাটা থাকে।

অথবা কান ফাটা থাকে অথবা কানে ছিদ্র থাকে।

এগুলো ব্যতীত আরো অন্যান্য গুণাবলিও বর্ণনা করা হয়েছে, যা দ্বারা অতি সহজেই বোঝা যায় যে, কুরবানীর আহকাম সদকা-খয়রাত হতে সম্পূর্ণ পৃথক। এজন্য কুরবানীর আহকাম সদকার আহকাম হতে পৃথক থাকা ও পরহেজ করা প্রয়োজন। তারপর সম্পূর্ণ উম্মত কোন মতবিরোধ ব্যতীত দীর্ঘকাল ধরে এর উপর আমল করে আসছেন। উম্মতের একবাক্যে আমল করাই সর্বোত্তম ও সর্ববৃহৎ প্রমাণ।

কুরবানী বিরোধীদের প্রতিউত্তর– এক

কুরবানী সম্পর্কে বয়ান হল, কিন্তু যদি কেউ বলে আপনি হাদীস দ্বারা প্রমাণ দিচ্ছেন, অথচ আমরা হাদীসকে প্রমাণ হিসেবে স্বীকার করি না। তবে এ জাতীয় লোকদের সাথে কুরবানী সম্পর্কে কোন কথাই থাকে না। বরং প্রথমে হাদীসের প্রমাণ ও দলিল হওয়া না হওয়া স্পর্কে আলোচনা করতে হবে। এ হল একটি মৌলিক মতবিরোধ। এ জাতীয় লোকদেরকে প্রশ্ন করা হবে যে, আপনারা কুরআনকে আল্লাহর কালাম বলে যে স্বীকারোক্তি করছেন, সে কুরআন আল্লাহর কালাম বলে আপনারা জানলেন কেমন করে?

যদি বলে যে, একথা আমরা স্বয়ং কুরআন দ্বারা জানতে পেরেছি, তবে একে বলা হয় 'মুকাবারা' অর্থাৎ যা দাবি করা হচ্ছে তা দিয়েই তার সপক্ষে দলিল দেয়া হচ্ছে। আর এ হল সুস্পষ্ট ভুল। দাবি ও দলিল একই জিনিস হতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে যে ব্যক্তি হাদীসকে অস্বীকার করছে, সে কুরআনকে আল্লাহর কালাম বলে অস্বীকার করছে। কেননা হাদীস ব্যতীত কুরআনও দলিল হতে পারে না। কোন মানুষ যেমন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পরিহার করে আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছতে পারবে না, তদ্রূপ রাসূলের কালাম ব্যতীত আল্লাহর কালামের ভিতর পৌঁছতে পারবে না। এজন্য যে, যদি অভিধানের মাধ্যমে আল্লাহর কালামের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করা হয় তবে সে ব্যাখ্যা আল্লাহর উদ্দেশ্যর সাথে সংগতিপূর্ণ হবে না, বরং তা হবে তার নিজের উদ্দেশ্য। যতক্ষণ পর্যন্ত নবী অথবা নবীর উত্তরসূরীগণ কোন আয়াতের উদ্দেশ্য বর্ণনা করে না দেন, সে পর্যন্ত এ ব্যাখ্যা শরীয়ত বলে পরিগণিত হবে না। কেননা আল্লাহর কালামের এমন কিছু বিশেষত্ব রয়েছে যা কাগজ পৃষ্ঠে বর্ণনা করা যায় না, বরং উচ্চারণ ভঙ্গি, অঙ্গভঙ্গির সাথে সম্পর্কিত।

কুরবানী বিরোধীদের প্রতিউত্তর– দুই

অন্য আরেকটি জিনিস হল 'উরফ' (প্রচলন বা পরিভাষা)। অর্থাৎ প্রত্যেক ভাষায় এমন কিছু জিনিস থাকে, যেগুলো ঐ ভাষাভাষীদের সংশ্রবে থেকে শেখা যেতে পারে। নতুবা সম্ভব নয়। আমাদের দেওবন্দে কালেক্টরের একজন ক্লার্ক ছিলেন। কালেক্টর ছিল ইংরেজ, কিন্তু তার এ ধারণা ছিল যে, আমি উর্দু ভাষায় খুবই পারদর্শী। অতএব, সে প্রায়ই তার ক্লার্ককে বলত, আমি তোমার চেয়ে উত্তম ও অধিক উর্দু ভাষা জানি, আমি অধিক অভিজ্ঞ।

যেহেতু তার অধিনে চাকুরি করে তাই ক্লার্ক তার কথা সহ্য করে যেতেন। একদিন সেই ইংরেজ টেবিল চাপড়িয়ে বলল, হে মুন্সী! আমি তোমার চেয়ে অধিক উর্দু ভাষা জানি। এবার মুন্সীও উত্তেজিত হয়ে পড়লেন, তিনিও টেবিল চাপড়িয়ে বললেন, 'সাহেব! আপনার উর্দু ভাষা সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞানও নেই'। একথা শুনে সাহেব পেরেশান হয়ে পড়লেন এবং বললেন, তুমি আমাকে পরীক্ষা কর। মুন্সী বললেন, আমি যদি পরীক্ষা গ্রহণ করি, তবে সাহেব বাহাদুর (بغلیں جھاڑیں) 'বগল ঝাড়তে থাকবেন'। এ কথা শুনে কালেক্টর সাহেব চিন্তিত হয়ে পড়লেন যে, এ বাক্যের অর্থ কি? বহু চিন্তাভাবনা করলেন, কিন্তু কিছুই বুঝতে পারলেন না। শেষপর্যন্ত বললেন, আমাকে তিন দিনের সময় দাও। মুন্সী বললেন সাত দিন সময় দেয়া হল। ইংরেজ সাহেব অভিধান তালাশ করতে লাগলেন, কিন্তু অভিধানে কিছুই নেই। অভিধানে 'বগল' এবং 'ঝাঁকনা' শব্দ দু'টি পৃথক পৃথক রয়েছে, কিন্তু একত্রিতভাবে সম্পূর্ণ বাক্য অভিধানে ছিল না। শেষ পর্যন্ত সাতদিন পর সাহেব বললেন, এর অর্থ হল হাত উঠিয়ে বগলের নিচে দিয়ে দেখা। একথা শুনে মুন্সী হেসে দিলেন। তখন ইংরেজ সাহেব বলতে লাগলেন তাহলে এ বাক্যের অর্থ কী? মুন্সী বললেন, এই শর্তে বলব যে, আর কখনো এ জাতীয় আস্ফালন করবেন না। ইংরেজ স্বীকারোক্তি করলেন। তখন মুন্সী বললেন, এ বাক্যের অর্থ হল, পেরশানি ও চিন্তিত হয়ে যাওয়া। অর্থাৎ আমি যদি পরীক্ষা নেই তবে সাহেব পেরেশান হয়ে যাবেন।

মোটকথা এ জাতীয় ভুল-ভ্রান্তির অনেক ঘটনা রয়েছে। প্রত্যেক কালামের এমন কিছু বিশেষত্ব থাকে, যা উরফ ও প্রচলনের সাথে সম্পর্কিত, এ সমাজ ও এ ভাষাভাষী ব্যতীত অন্য কেউ তা বুঝতে পারবে না। যেমন আমাদের ভাষায় বিশেষ পরিভাষা, প্রবাদ রয়েছে, তেমনি কুরআনেরও বিশেষ পরিভাষা রয়েছে, যা ঐ সকল মানুষই বুতে পারেন যারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহচর্য লাভ করেছেন। এখনও যারা কুরআন বুঝতে চায় তাদেরকেও সেই

কুরবানী বিরোধীদের প্রতিউত্তর– দুই

অন্য আরেকটি জিনিস হল 'উরফ' (প্রচলন বা পরিভাষা)। অর্থাৎ প্রত্যেক ভাষায় এমন কিছু জিনিস থাকে, যেগুলো ঐ ভাষাভাষীদের সংশ্রবে থেকে শেখা যেতে পারে। নতুবা সম্ভব নয়। আমাদের দেওবন্দে কালেক্টরের একজন ক্লার্ক ছিলেন। কালেক্টর ছিল ইংরেজ, কিন্তু তার এ ধারণা ছিল যে, আমি উর্দু ভাষায় খুবই পারদর্শী। অতএব, সে প্রায়ই তার ক্লার্ককে বলত, আমি তোমার চেয়ে উত্তম ও অধিক উর্দু ভাষা জানি, আমি অধিক অভিজ্ঞ।

যেহেতু তার অধিনে চাকুরি করে তাই ক্লার্ক তার কথা সহ্য করে যেতেন। একদিন সেই ইংরেজ টেবিল চাপড়িয়ে বলল, হে মুন্সী! আমি তোমার চেয়ে অধিক উর্দু ভাষা জানি। এবার মুন্সীও উত্তেজিত হয়ে পড়লেন, তিনিও টেবিল চাপড়িয়ে বললেন, 'সাহেব! আপনার উর্দু ভাষা সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞানও নেই'। একথা শুনে সাহেব পেরেশান হয়ে পড়লেন এবং বললেন, তুমি আমাকে পরীক্ষা কর। মুন্সী বললেন, আমি যদি পরীক্ষা গ্রহণ করি, তবে সাহেব বাহাদুর (بغلیں جھاڑیں) 'বগল ঝাড়তে থাকবেন'। এ কথা শুনে কালেক্টর সাহেব চিন্তিত হয়ে পড়লেন যে, এ বাক্যের অর্থ কি? বহু চিন্তাভাবনা করলেন, কিন্তু কিছুই বুঝতে পারলেন না। শেষপর্যন্ত বললেন, আমাকে তিন দিনের সময় দাও। মুন্সী বললেন সাত দিন সময় দেয়া হল। ইংরেজ সাহেব অভিধান তালাশ করতে লাগলেন, কিন্তু অভিধানে কিছুই নেই। অভিধানে 'বগল' এবং 'ঝাঁকনা' শব্দ দু'টি পৃথক পৃথক রয়েছে, কিন্তু একত্রিতভাবে সম্পূর্ণ বাক্য অভিধানে ছিল না। শেষ পর্যন্ত সাতদিন পর সাহেব বললেন, এর অর্থ হল হাত উঠিয়ে বগলের নিচে দিয়ে দেখা। একথা শুনে মুন্সী হেসে দিলেন। তখন ইংরেজ সাহেব বলতে লাগলেন তাহলে এ বাক্যের অর্থ কী? মুন্সী বললেন, এই শর্তে বলব যে, আর কখনো এ জাতীয় আস্ফালন করবেন না। ইংরেজ স্বীকারোক্তি করলেন। তখন মুন্সী বললেন, এ বাক্যের অর্থ হল, পেরশানি ও চিন্তিত হয়ে যাওয়া। অর্থাৎ আমি যদি পরীক্ষা নেই তবে সাহেব পেরেশান হয়ে যাবেন।

মোটকথা এ জাতীয় ভুল-ভ্রান্তির অনেক ঘটনা রয়েছে। প্রত্যেক কালামের এমন কিছু বিশেষত্ব থাকে, যা উরফ ও প্রচলনের সাথে সম্পর্কিত, এ সমাজ ও এ ভাষাভাষী ব্যতীত অন্য কেউ তা বুঝতে পারবে না। যেমন আমাদের ভাষায় বিশেষ পরিভাষা, প্রবাদ রয়েছে, তেমনি কুরআনেরও বিশেষ পরিভাষা রয়েছে, যা ঐ সকল মানুষই বুতে পারেন যারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহচর্য লাভ করেছেন। এখনও যারা কুরআন বুঝতে চায় তাদেরকেও সেই

ভাষাভাষী অর্থাৎ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরাম রা.-এর দ্বারস্থ হতে হবে। তাঁরা যে আয়াতের যে অর্থ ও উদ্দেশ্য বর্ণনা করেন, সেই অর্থকেই একমাত্র সঠিক অর্থ ও উদ্দেশ্য বলে গ্রহণ করতে হবে। এজন্যই কুরআনে ইরশাদ করা হয়েছে–

هُوَالَّذِىْ بَعَثَ فِى الْاُمِّيّٖنَ رَسُوْلاً مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِه وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ ۗ وَاِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ○

আল্লাহ তাআলা স্বীয় দয়াগুণে নিরক্ষরদের মধ্যে একজন রাসূল পাঠিয়েছেন, যিনি তাদেরই একজন, যেন তিনি তাদেরকে আল্লাহর আয়াতগুলো পড়ে শুনান এবং তাদের আত্মশুদ্ধি করেন, তাদেরকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেন। ইতোপূর্বে তারা ছিল ঘোর পথভ্রষ্টতায় লিপ্ত। [জুমুআ : ২]

লক্ষ করুন, এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা নবীগণের তিনটি দায়িত্বের কথা বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ তিলাওয়াত, তাযকিয়া (আত্মশুদ্ধি) ও তালিম। এ দ্বারা বোঝা গেল, নবীর দায়িত্ব শুধু আয়াতগুলো পড়ে শুনানোই নয়, বরং তিলাওয়াতের সাথে সাথে অর্থ ও উদ্দেশ্য শিক্ষা দেয়াও তাদের দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত ছিল।*

কুরআনুল কারীমের অর্থ ও উদ্দেশ্য যা আমাদের পর্যন্ত পৌঁছেছে, তা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবীগণের মাধ্যমেই পৌঁছেছে। এ কারণেই পূর্ব যুগে প্রত্যেক ব্যক্তি কুরআনের মুফাসসির হতে পারতেন না। যে পর্যন্ত এমন কোন উস্তাদের শিষ্যত্ব গ্রহণ না করেছেন, যিনি কুরআন শরীফ অথবা হাদীসের তাফসীর বা ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করতেন, তাঁকে তাঁর সনদ সম্পর্কে জজ্ঞেস করা হত। যদি তাঁর বিশ্বস্ত সনদ বিদ্যমান থাকত, তবেই তাঁর তাফসীর ইত্যাদি গ্রহণযোগ্য হত, নতুবা প্রত্যাখ্যান করা হত।

কিন্তু আজকাল যেহেতু অজ্ঞতার যুগ এবং মানুষের অন্তরে আল্লাহর ভয়ভীতি কম, এজন্য সামান্য আরবী জানা ব্যক্তিই মুফাসসিরে কুরআন হওয়ার দাবি করছে, আর মানুষও কোন প্রকার তাহকীক করা ব্যতীত তাদের অনুসরণ করতে

---

* পরবর্তী কিছু আলোচনা অত্র গ্রন্থের বয়ান–১ এ 'কুরআন মাজিদের হিফাযত' এবং 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রেরণের উদ্দেশ্যাবলি' শিরোনামে একবার আলোচিত হয়েছে বিধায় পুনরায় উল্লেখ করা হল না। –অনুবাদক।

প্রস্তুত হয়ে যাচ্ছে। অথচ কুরআনের অর্থ, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ কেবল ঐ সকল মানুষ থেকেই গ্রহণ করা উচিত, যারা শুদ্ধ-সঠিকভাবে বুঝতে পেরেছেন। অর্থাৎ আলেমগণের শিষ্যত্ব ও বুযুর্গানের সাহচর্য লাভ করেছেন। যেন তাযকিয়ায়ে নফসের ঐ গুনাবলি তাদের মধ্যে বিদ্যমান থাকে যার জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রেরিত হয়েছে।

সমগ্র উম্মতের মধ্যে উত্তম হলেন হযরত সাহাবায়ে কেরাম। তাঁদের এ শ্রেষ্ঠত্ব প্রকৃতপক্ষে সাহচর্যের কাণে অর্জিত হয়েছে। কারণ জনাব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মত ব্যক্তিত্বের সাহচর্য তাঁদের নসিব হয়েছে। যদ্বারা তাঁদের অন্তর এভাবে পরিচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছে যে, তাতে কেবল হক ও সত্যই প্রবেশ কতে পারত। অতঃপর তাঁরা তাঁদের শিস্যদেরকে একই ছাঁচে গড়ে তুলেছেন এবং তাঁদের অন্তরকে পরিচ্ছন্ন ও পরিশুদ্ধ করেছেন।

কুরাআনুল কারিমের অর্থের মধ্যে ব্যাপকতা থাকার কারণে তা থেকে একাধিক অর্থ গ্রহণের সুযোগ রয়েছে। সুতরাং কোন্ অর্থটি প্রযোজ্য তা বোঝার জন্য একমাত্র মাধ্যম হল হাদীস। এ কারণেই পূর্বযুগে যখনই কোন বাতিল দল মাথাচাড়া দিয়েছে, দীনকে বিকৃত করার অপচেষ্টা করেছে, তখন তারা সর্বপ্রথম হাদীসকে অস্বীকার করেছে। কেননা হাদীস বিদ্যমান থাকা অবস্থায় দীনের মধ্যে কোনরূপ তাহরিফ বা বিকৃতি ঘটানোর সম্ভাবনা নেই। এজন্য তারা সর্বপ্রথম এই 'বাধার প্রাচীর'কে রাস্তা থেকে সরিয়ে দিয়েছে। কিন্তু বিশ্ববাসী অবগত রয়েছে যে, আজ ঐ সকল বাতিলস্থী তাদের ভ্রান্ত ও বাতিল মতবাদসহ দুনিয়া থেকে নিঃশেষ হয়ে গিয়েছে কিন্তু হাদীসের অনুসারীগণ আজও টিকে আছেন এবং কিয়ামত পর্যন্ত থাকবেন। মোটকথা, হাদীসকে বিসর্জন দিয়ে কুরআন বোঝা যাবে না। আশ্চর্যের বিষয়, আলেম-উলামা, পীর-দরবেশ ও নেক বান্দাদের কথা গ্রহণযোগ্য ও প্রমাণযোগ্য কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কথা প্রমাণযোগ্য নয়!

আমার বয়ানের আলোচ্য বিষয় ছিল কুরবানীর মাসআলা। বিষয়টি বেশি বিস্তৃত ছিল না, কিন্তু মধ্যভাগে কিছু মৌলিক কথাবার্তা এসে যাওয়াতে আলোচনা সামান্য দীর্ঘ হয়ে গিয়েছে। যদিও মৌলিক বিষয়ের আলোচনা অতি সংক্ষিপ্ত হয়েছে। তথাপি আলহামদুলিল্লাহ প্রয়োজনীয় কথাগুলো আলোচিত হয়েছে এবং এ কথা পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে যে, হাদীসের উপরও ঈমান গ্রহণ করা আবশ্যক। এখন পুনরায় মূল বিষয়ের আলোচনায় প্রত্যাবর্তন করছি।

কুরবানী সংক্রান্ত বিষয়াবলির প্রতি আলোকপাত

কুরবানীর বিষয়ে একটি সন্দেহ সৃষ্টি হতে পারে যে, এভাবে কুরবানী করা হতে থাকলে পশু নিঃশেষ হয়ে যাবে।

এ সন্দেহ নিরসনে প্রথমত এ কথা বলা যায় যে, এ ধারণাটাই একটি ভ্রান্ত ধারণা। কেননা প্রত্যহ যে লাখ লাখ পশু জাবাই করা হচ্ছে, ঈদের দিন (এবং এর পূর্বাপর আরো কয়েকদিন) সে প্রাত্যাহিক জবাই বন্ধ থাকে, এভাবে হিসাব করা হলে খুব সামান্যই তারতম্য পরিলক্ষিত হবে, যা কোনক্রমেই উল্লেখযোগ্য কিছু নয়। তাছাড়া এ দিনে এমন সব মানুষের ঘরে গোশত পৌঁছে যায়, যারা বছরে এক-আধবেলাই কেবল খেতে পারে। তারপর কুরবানীর চামড়াগুলো দরিদ্র ও অসহায়দের মধ্যে বণ্টিত হয়। মোটকথা এ দ্বারা বহু উপকার সাধিত হয়।

কেউ কেউ এমন কথাও বলে থাকে যে, কুরবানীতে যে টাকা ব্যয় হয়, এ টাকাগুলো মুহাজিরদের সাহায্যে ব্যয় করা হোক। নিশ্চয় মুহাজিরদের সাহায্য করা দরকার, কিন্তু সকল কাজের জন্য ইসলামের গলায় ছুরি চালানো হয় কেন? নিজ প্রবৃত্তির কামনার উপরও ছুরি চালান এবং শরীয়ত পরিপন্থী ব্যয় বন্ধ করে মুহাজিরদের সাহায্য করুন। যেমন সিনেমা আছে, মদ আছে, অন্যান্য অপব্যয় আছে।

আমার আলোচনার সার-সংক্ষেপ হল এই: একথা সম্পূর্ণ স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে যে, যেভাবে বিশ্বজগতের প্রতিটি বস্তুর মধ্যে আকৃতি এবং রূহ রয়েছে, ঠিক তদ্রূপ শরীয়তের আমলসমূহেরও একটি রূহ রয়েছে। ওখানে যেমন প্রত্যেক আকৃতির জন্য নির্দিষ্ট রূহ রয়েছে, যা অন্যের মধ্যে প্রবেশ করতে পারে না, তদ্রূপ এখানেও একটি রূহ রয়েছে যা অন্যের মধ্যে প্রবেশ করতে পারে না।

সুতরাং এবার বুঝে নিন যে, শরীয়তের সকল আমলের উদ্দেশ্য হল তাকওয়া। যেমন নামায দ্বারা মিনতি ও হীনতা প্রকাশের মাধ্যমে তাকওয়া অর্জিত হয়, রোযা দ্বারা আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে, জিহাদে বীরত্বের মাধ্যমে, সদকায় সম্পদ ব্যয়ের মাধ্যমে এবং কুরবানীতে আত্মোৎসর্গের মাধ্যমে তাকওয়া অর্জিত হয়। এখন যদি আপনি কুরবানীর পরিবর্তে নামায পড়ে নেন, তবে নামায দ্বারা বিনয় ও বন্দেগীর তাকওয়া তো অর্জিত হবে; কিন্তু কুরবানীর মাধ্যমে অর্জনযোগ্য তাকওয়া অর্জিত হবে না। কাজেই কোন ব্যক্তি যদি কুরবানী না করে সদকা করে দেয় তবে সে কিয়ামতের দিন সদকার সাওয়াব পাবে, কিন্তু তার উপর কুরবানীর প্রশ্ন থেকে যাবে এবং তাকে জবাবদিহি করতে হবে যে, কেন কুরবানী

করেনি? ঠিক এভাবে যদি কেউ নামায পড়েছে, কিন্তু রোযা রাখেনি, তবে রোযার জন্য জবাবদিহি করতে হবে যে, কেন রেখেছিলে না? এ বিষয়টি একটি উদাহরণ দ্বারা বুঝে নিন, মনে করুন আপনি একজন কাজের লোক রাখলেন। খানা তৈরি করা ও পরিবেশন করার দায়িত্ব তাকে দিলেন। সে লোকটি খানা পাক করল না, কিন্তু ঘরটিকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে আয়নার মত ঝকঝকে করে তুলল। প্রত্যেকটি জিনিস যথারীতি পরিপাটি করে সাজাল, বিছানাপত্র ধুয়ে পরিষ্কার করল, দরজা জানালা ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করল। আপনি যখন বাড়িতে পৌঁছে দেখলেন যে, বাড়ি-ঘর অত্যন্ত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে রেখেছে, তখন নিশ্চয়ই আপনি খুশি হবেন। কিন্তু খাবার গ্রহণের সময় যখন আপনি জানতে পারবেন যে, সে খাবার তৈরি করেনি, তখন নিশ্চয়ই আপনি তাকে জিজ্ঞেস করবেন যে, খানা তৈরি করেনি কেন? তখন সে কি এ উত্তর দিতে পারবে যে আমি ঘর-বাড়ি সব পরিষ্কার করেছি, এখন খাবারের কথা বলছেন কেন? স্পষ্ট কথা, তখন তাকে বলা হবে, তোমার দায়িত্বে যে কাজ দেয়া হয়েছিল তা তুমি করনি। একটি কাজ করেছ বটে, যা ভাল কাজ, কিন্তু এ কাজ করা তোমার দায়িত্ব ছিল না। খানা পাকানো ও পরিবেশন করার পর যদি তুমি এ কাজ করতে তবে ভাল হত। ঠিক এভাবে সদকা খয়রাত হল নফল ইবাদত আর কুরবানী হল ওয়াজিব, নফল ইবাদত আদায় করার পরও ওয়াজিবের দাবি থেকে যাবে।

মোটকথা, আপনি ইবাদতের যে আকৃতি গ্রহণ করবেন, সে অনুযায়ী রূহ দেয়া হবে। যেভাবে মানবদেহে মানবীয় রূহ এবং জীবজন্তুর দেহে জৈবিক রূহ দেয়া হয়। তাহলে কুরবানীর রূহ সদকার মধ্যে কি করে আসবে? এজন্য যে, কিয়ামতের দিন প্রতিটি আমলের ভিন্ন ভিন্ন আকৃতি হবে। উদাহরণত যে ব্যক্তি মসজিদ নির্মাণ করে জান্নাতে তাকে বাড়ি দেয়া হবে, রোযাদারের জন্য কিয়ামতের দিন দস্তরখানা বিছিয়ে দেয়া হবে। এভাবে কুরবানী সম্পর্কে বলা হয়েছে–

إنه ليأتى يوم القيامة بقرونها واشعارها واظلافها.

> কিয়ামতের দিন কুরবানীর পশু তার শিং, পশম এবং চামড়াসহ উপস্থিত থাকবে।

এখানে ঐসব অঙ্গের কথা বলা হয়েছে যেগুলোকে আমরা অপ্রয়োজনীয় মনে করে ফেলে দেই। অর্থাৎ কুরবানীর পশুর তুচ্ছ অঙ্গগুলোর উপরও সাওয়াব দেয়া হবে। কাজেই যা মূল জিনিস অর্থাৎ গোশত, তার উপর কেন সাওয়াব দেয়া

হবে না? তারপর ইরশাদ করা হয়েছে–

إن الدم ليقع من الله بمكان قبل ان يقع بالأرض، فطيبوا بها نفسا.

কুরবানীর রক্ত মাটিতে পড়ার পূর্বেই আল্লাহর দরবারে কবুল হওয়ার মর্যাদা লাভ করে নেয়। সুতরাং তোমরা এ আমলটি করে নিজের আত্মাকে তৃপ্ত করে নাও।

এ মাকবুলিয়াতও কুরবানীর সাথেই খাস।

মাসআলার আলোচনা তো করা হল। কিন্তু এ জাতীয় শাখাগুলো, যেগুলোর উপর উম্মতের ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত রয়েছে, এতে সন্দেহ পোষণ করা ধর্মীয় চরম অবনতি ও অধঃপতনেরই লক্ষণ। ইতোপূর্বে ওলামাগণের শুধু মূলনীতিগুলো প্রমাণ দ্বারা সাব্যস্ত করার প্রয়োজন দেখা দিত, কিন্তু পরিতাপের বিষয় হল, আজ শাখা মাসয়ালা মাসায়িল ও উম্মতের ঐকমত্যে গ্রহণকৃত বিষয়াবলীকেও প্রমাণ দ্বারা সাব্যস্ত করতে হচ্ছে। এ কথা বলার দ্বারা আমার উদ্দেশ্য এটা নয় যে, প্রমাণ করা উলামায়ে কেরামের দায়িত্ব নয়; এটা তো অবশ্যই আমাদের কর্তব্য যে, এগুলো আমরা প্রমাণ করে দেব। কিন্তু আমার উদ্দেশ্য হল এই, যদি আমাদের এ ধারা অব্যাহত থাকে তবে কোন পর্যন্ত শাখা মাসয়ালাগুলো প্রমাণ করতে থাকব? সর্বজন সিদ্ধ কিছু মাসয়ালাও থাকতে দিন। এমন যেন না হয় যে, প্রতিটি বিষয়কে প্রমাণ দ্বারা বর্ণনা করতে হয়। এ হল অত্যন্ত অধঃপতন ও অবনতির পরিচায়ক। এর কারণ হল ইলমে দীন হতে উদাসীনতা ও গাফিলতি। এর একমাত্র চিকিৎসা হল আপনারা ইলমে দীন শিক্ষার প্রতি মনোনিবেশ করুন, অন্য কিছু দ্বারা এ সমস্যার সমাধান হবে না। আমার এ উদ্দেশ্য নয় যে, আপনি অন্য কোন বিষয় শিক্ষা গ্রহণ করবেন না, বরং আমি চাই আপনারা অন্যান্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাথে দীনি ইলমও শিক্ষা করুন, যেন দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় মাসআলাতে আপনাদের কোন সন্দেহ সংশয় দেখা না দেয় এবং প্রত্যেকে যেন আপনাকে তার ইচ্ছার গোলাম করতে সক্ষম না হয়। আপনার মধ্যেও যেন হক ও বাতিলের মাঝে পার্থক্য করার কিছুটা সামর্থ্য থাকে। কোন আলেমের নিকট থেকে কুরআন মাজিদের তরজমারও তালিম নিন। নিজে নিজে দেখে নেয়ার মধ্যে হাজারো ভুল-ভ্রান্তির সম্ভাবনা রয়েছে।

কোন মাসআলায় যদি আপনার সন্দেহ হয় এবং তা জানা আবশ্যক হয় তবে নিজের বিবেক-বুদ্ধি দ্বারা কোন রায় দেয়ার পরিবর্তে উলামায়ে কেরামের দ্বারস্থ

হোন। মনে রাখবেন, দীন সম্পূর্ণ দ্বিধা সংশয় মুক্ত। তবে শর্ত হল আপনার মধ্যে সত্য বোঝার ইচ্ছা থাকতে হবে এবং আপনার আলোচনা ও তর্কবিতর্কে গঠনমূলকতা ও অনুসন্ধিৎসা থাকতে হবে। সামান্যতম জিদ, একগুঁয়েমী ও কপটতা থাকতে পারবে না।

এখন আমি শেষ করছি, দুআ করুন আল্লাহ আমাদেরকে যেন সকল প্রকার অন্যায় ও ফিতনা থেকে হিফাযত করেন, সিরাতে মুস্তাকীমের উপর কায়েম রাখেন এবং ঈমানের সাথে মৃত্যু নসীব করেন।

امين يا رب العالمين، والصلوة والسلام على سيد المرسلين محمد واله واصحابه واتباعه اجمعين، برحمتك يا ارحم الراحمين.

বয়ান : ১৪

বিবাহের হাকিকত

পৃথিবীতে মানুষে মানুষে সংযোগ স্থাপনের সর্ববৃহৎ মাধ্যম হল বিবাহ বন্ধনের পবিত্র সিলসিলা। যা দ্বারা অপরিচিত দুজন মানুষ, যাদের মধ্যে পূর্বে কোন সম্পর্ক ছিল না, তারা এমন বিস্ময়করভাবে আন্তরিকতার সাথে মিলে যায় যে, এখন থেকে তাদের উপকার-অপকার, লাভ-ক্ষতি সবই এক ও অভিন্ন। তাদের পারস্পরিক মিল ও একতার কারণে দু'টি খান্দানের মধ্যে এমন একতা ও সম্প্রীতি সৃষ্টি হয়ে যায় যে, এত গাঢ় সম্পর্ক ও সম্প্রীতি এর পূর্বে তাদের মধ্যে কখনোই পরিদৃষ্ট হয়নি। বিবাহ হল জুড়ে দেয়ার সিলসিলা। এ কারণে নবী আ.গণ হলেন এ সিলসিলার ধারক-বাহক।

– হযরত হাকীমুল ইসলাম রহ.





اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُه وَنَسْتَعِيْنُه وَنَسْتَغْفِرُه وَنُؤْمِنُ بِه وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّاٰتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَّهْدِه اللّٰهُ فَلاَ مُضِلَّ لَه، وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلا هَادِىَ لَه، وَنَشْهَدُ أَنْ لاَّ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَه لاَ شَرِيْكَ لَه، وَنَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَمَوْلاَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُه وَرَسُوْلُه، أَرْسَلَهُ اللّٰهُ إِلٰى كَافَّـةً لِّلنَّاسِ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا وَّدَاعِيًا إِلَيْهِ بِإِذْنِه وَسِرَاجًا مُّنِـيْرًا.

أَمَّـابَعْدُ:

فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ○ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ○ وَمِنْ اٰيٰتِه أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ط إِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ○

তরজমা: আল্লাহর কুদরতের নিদর্শনাবলির মধ্যে এও একটি নিদর্শন যে, তিনি তোমাদের মধ্য হতে তোমাদের জন্য পত্নীগণকে সৃষ্টি করেছেন, যেন তার নিকট গিয়ে তোমরা শান্তি ও সান্ত্বনা লাভ করতে পার। আর তোমাদের মধ্যে সৃষ্টি করে দিয়েছেন পারস্পরিক সম্প্রীতি ও দয়া। নিশ্চয়ই এতে চিন্তাশীলদের জন্য নিদর্শনাবলী রয়েছে। [রূম : ২১]

বাস্তব অবস্থাসমূহ

বুযুর্গানে মুহতারাম!

এখনই আপনাদের সম্মুখে একটি বিবাহ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়েছে এবং তাতে আপনাদের প্রিয়জনদের একজনের বিয়ে হয়েছে। এ অনুষ্ঠানের দাবি হল এই, আমিও যেন বিবাহ বিষয়ক এমন কিছু আলোচনা উপস্থাপন করি, যা হবে বিবাহের আহকাম ও উপকারিতা সম্পর্কে। কেননা কোন বয়ান যখন সময়োপযোগী হয় তখন তা উপকারী হয়, কাজেই সময়ের চাহিদ অনুযায়ী কিছু আলোচনা করা হবে। এ অনুষ্ঠানই যেন আলোচনার বিষয়বস্তু নির্ধারণ করে দিয়েছে। এ বিষয়বস্তুর উপরই কিছু আলোচনা করা হবে।

এখন আমি দু'তিনটি বিষয় সম্পর্কে আলোকপাত করব। একটি হল এই যে, বিয়ের তাৎপর্য কী? দ্বিতীয়তটি হল বিয়ের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কী? তৃতীয়তটি হল বিবাহের আহকাম কী? এ তিনটিই হল আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু।

জান্নাত ও জাহান্নামের সমন্বয়ে পৃথিবী গঠিত

উক্ত বিষয় তিনটি বোঝার পূর্বে ভূমিকাস্বরূপ সংক্ষিপ্ত একটি কথা বুঝে নিন, তাহলে এ বিষয় তিনটি বোঝা সহজ হবে।

তা হল এই, এ বিশ্বজগতে আল্লাহ তাআলা দুটি ধারা সৃষ্টি করেছেন। একটি হল খায়র বা কল্যাণের ধারা, আরেকটি হল শার্ বা মন্দের ধারা। একটি ধারা কল্যাণ, সৌন্দর্য ও সাওয়াবের, আরেকটি ধারা মন্দ, অন্যায় ও পাপের। প্রত্যেক মূলের মোকাবিলায়, যা উত্তম মূল, তার বিপরীত কোন না কোন বিষয় সংযুক্ত রয়েছে। এ দুনিয়া একমুখি নয়, বরং এতে রয়েছে ভালমন্দের সংমিশ্রণ। যে খায়র বা কল্যাণ আপনার সম্মুখে আসবে তার বিপরীতে কোন না কোন মন্দ ও অকল্যাণ অবশ্যই থাকবে, যাকে এর যিদ (বিপরীত বিষয়) বলা হয়। আল্লাহ পৃথিবীতে যেমন ইসলামকে সৃষ্টি করেছেন, তার মোকাবিলায় কুফরকেও সৃষ্টি করেছেন। দুনিয়াতে যেমন সত্যের আগমন ঘটেছে, তার বিপরীতে মিথ্যাও আগমন করেছে। দুনিয়াতে যেমন আলো দেয়া হয়েছে, এর মোকাবিলায় অন্ধকারকেও রাখা হয়েছে। তাকওয়া ও পবিত্রতার মোকাবিলায় পাপাচার ও অন্যায়কেও রাখা হয়েছে। মোটকথা, প্রত্যেক জিনিসের মূলের মোকাবিলায় তার বিপরীত বিষয় অবশ্যই রয়েছে। দিন আছে তো তার বিপরীতে রাতও রয়েছে। এ এক ভাল-মন্দের ধারাবাহিকতা। আপনি যদি শুধু কল্যাণের প্রত্যাশী হন, যেখানে মন্দের চিহ্নমাত্র থাকবে না, তা একমাত্র জান্নাতে পাবেন, সেখানে খায়র

ও কল্যাণ ব্যতীত অন্য কিছুই নেই। আর যদি শুধুই মন্দ আর মন্দ দেখতে চান, যেখানে কল্যাণের চিহ্ন পর্যন্ত থাকবে না, তবে তা রয়েছে জাহান্নামের জগতে। সেখানে মন্দ, যাতনা ও দুঃখ-কষ্ট ছাড়া অন্য কিছু নেই। পৃথিবীকে আল্লাহ তাআলা জান্নাত ও জাহান্নামের সমন্বয়ে সৃষ্টি করেছেন। কিছু খায়র ও কল্যাণ জান্নাত থেকে এবং কিছু শার্ ও অকল্যাণ জাহান্নাম থেকে আনা হয়েছে। দু'টির সংমিশ্রণে এক আলম বা জগৎ বানানো হয়েছে। যার নাম হল দুনিয়া। এখানে ভাল-মন্দ, কল্যাণ-অকল্যাণ উভয়ই রয়েছে। পুণ্যও রয়েছে, পাপ-পঙ্কিলতাও রয়েছে। ইসলামও রয়েছে, কুফর আর শিরকও রয়েছে। আলোও রয়েছে, অন্ধকারও রয়েছে। সুখও রয়েছে, অশান্তি আর দুঃখও রয়েছে। ইসলামও রয়েছে, কুফরও রয়ছে। আলোও রয়েছে, অন্ধকারও রয়েছে। অশান্তি আর দুঃখও রয়েছে। প্রতিটি মূলের বিপরীতে একটি বিপরীত বিষয় সংযুক্ত রয়েছে।

অদৃশ্য জগতে ভাল-মন্দের সিলসিলা

এ বিশ্বের উর্ধ্ব হতে নিম্ন পর্যন্ত সর্বত্র এই একই সিলাসিলা। অদৃশ্যের জগৎকে যদি দেখা হয়, অর্থাৎ ঐ মাখলুক যা মানব দৃষ্টির অন্তরালে, সেখানেও এই উভয় সিলসিলা বিদ্যমান। একদিকে রয়েছেন ফেরেশতাগণ, যারা শুধুই কল্যাণময়তায় পূর্ণ, তাদের বিপরীতে রয়েছে শয়তান, যারা শুধুই শার্ বা মন্দে নিমজ্জিত। ফেরেশতাগণ প্রতিটি ক্ষেত্রে খায়রের দিকে চলেন আর শয়তানের প্রতিটি পদক্ষেপ শার্-এর দিকে। ফেরেশতাদের সম্পর্কে কুরআনে বলা হয়েছে–

بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُوْنَ○ لَايَسْبِقُوْنَه بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِاَمْرِه يَعْمَلُوْنَ○

তারা হলেন আল্লাহ তাআলার পবিত্র ও সম্মানিত বান্দা। তারা আগে বেড়ে কথা বলতে পারেন না এবং আল্লাহর আদেশেই কাজ করেন। [আম্বিয়া : ২৬-২৭]

আরো বলা হয়েছে– لَايَعْصُوْنَ اللهَ مَا اَمَرَهُمْ অর্থাৎ তাদের নীতি হল এই– আল্লাহ তাআলার নির্দেশের সামান্যতম অবাধ্যতাও তাদের মধ্যে নেই। আল্লাহর আনুগত্য করা ও পবিত্রতা ঘোষণাই তাদের কাজ। তারা আল্লাহর মনোনীত বান্দা। তো ফেরেশতাদের সম্পর্কে বলা হল যে, তাদের মধ্যে অবাধ্যতার চিহ্ন পর্যন্ত নেই। আর শয়াতনদের সম্পর্কে বলা হয়েছে–

وَكَانَ الشَّيْطٰنُ لِرَبِّه كَفُوْرًا○

শয়তার স্বীয় পালনকর্তার প্রতি অতিশয় অকৃতজ্ঞ। [বনী ইসরাঈল : ২৭]

শয়তানের কাজই হল কুফরী করা এবং নেয়ামতের অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা।

ফেরেশতা আ.গণ যেখানেই থাকবেন, সুগন্ধির দিকে ছুটবেন, আর শয়তান যেখানেই থাকবে দুর্গন্ধের দিকে ধাবিত হবে। হাদীসে বলা হয়েছে, মসজিদগুলোতে, জিকিরের মাহফিলে ফেরেশতাদের কোলাহল থাকে। আর যতসব অপবিত্র দুর্গন্ধময় জায়গা রয়েছে সেখানে শয়তানদের কোলাহল থাকে। ফেরেশতাদের ওটা পছন্দ আর শয়তানদের এটা পছন্দ। তাঁরা খায়র ও কল্যাণের দিকে ছুটে যান আর এরা শার্ ও অকল্যাণের দিকে ধাবিত হয়।

ফেরেশতা আ.গণের কাজ কী? প্রত্যেক মাখলুকের কল্যাণ কামনা করা, প্রত্যেকের জন্য দুআ করা, প্রত্যেকের জন্য মঙ্গল প্রার্থনা করা। শয়তানদের কাজ হল প্রত্যেকের জন্য অকল্যাণ কামনা করা, প্রত্যেককে কষ্ট দেয়া, প্রত্যেকের জন্য কষ্টের ব্যবস্থা করা। ফেরেশতা আ.গণের অবস্থা কুরআনে এভাবে বর্ণিত হয়েছে–

اَلَّذِيْنَ يَحْمِلُوْنَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَه يُسَبِّحُوْنَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُوْنَ بِه وَيَسْتَغْفِرُوْنَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا.

আরশ বহণকারী ফেরেশতাগণ এবং যারা তাঁদের আশপাশে রয়েছেন তাঁরা তাঁদের প্রতিপালকের প্রশংসার তাসবীহ পাঠ করেন। এবং তাঁর উপর বিশ্বাস স্থাপন করেন। আর তাঁরা ঈমানদারদের জন্য মাগফেরাত কামনা করেন। [মুমিন : ৭]

যেসব ফেরেশতা আল্লাহর আরশকে বহণ করছেন, তাদের চেয়ে আল্লাহর অধিক নৈকট্যপ্রাপ্ত অন্য কে হতে পারবে? তারা আল্লাহ তাআলার এত নিকটবর্তী যে, অন্য কোন ফেরেশতা এত অধিক নৈকট্য লাভ কতে পারেননি। তাঁদের আশেপাশে যে কোটি কোটি ফেরেশতা রয়েছেন, তাঁদের কাজ কী? তাদের কাজ হল: 'আল্লাহ তাআলার তাসবীহ পাঠ করেন এবং পৃথিবীবাসীর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন'। শুধু আমাদের জন্য নয়, আমাদের সন্তানদের জন্য, স্ত্রীগণের জন্য, পরিবার পরিজনের জন্য দুআ করেন, হে আল্লাহ! তাদেরকে ইহকাল ও পরকালে কল্যাণ দান করুন। এ হল তাদের কাজ।

আর শয়তানরা কী করেছে? সর্বপ্রথম বড় শয়তান আল্লাহ তাআলার সম্মুখেই বলেছে–

قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ○

আপনার ইজ্জতের কসম করে বলছি, অবশ্যই আমি সকল মানুষকে বিপথগামী করে দেব ।[সোয়াদ : ৮২]

এক একটি মানুষকে সৎপথ হতে দুরে সরিয়ে দেবে। কখনো ভাল পথে আসতে এবং সৎকাজ করতে দেব না।

তার উত্তরে আল্লাহ তাআলা বললেন, আমিও আমার ইজ্জতের কসম করে বলছি, তোমার এক-একজন অনুসারীকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করতে থাকব এবং জাহান্নামকে পূর্ণ করে তুলব। তো ফেরেশতাগণ বলেন, হে আল্লাহ! সবাইকে জান্নাত দান করুন, কল্যাণের ব্যবস্থা করুন। আর শয়তান বলছে আমি গোমরাহ করব, প্রত্যেককে জাহান্নামী করে ছাড়ব। তো তাঁরা হলেন সর্বোচ্চ কল্যাণকামী আর এরা হল সর্বোচ্চ অনিষ্টকামী। তাঁরা নিয়ে যান নেকীর দিকে, এরা পাপের দিকে।

হাদীস শরীফে জনাব রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, প্রত্যেকটি মানুষের কলবের ডান পাশে ফেরেশতা বসে আছেন এবং বাম পাশে শয়তান বসে আছে। ফেরেশতার কাজ কী? কল্যাণের পথ দেখিয়ে দেন। কলবে এ ধারনা জাগ্রত করেন– এ নেকীটি করে নাও, ঐ নেকীর কাজটি করে নাও। শয়তান বলে– এ খারাপ কাজটি কর, ঐ পাপকর্মটি করে নাও, এতে অনেক মজা রয়েছে; ব্যভিচারে লিপ্ত হও, তাতে অনেক আনন্দ উপভোগ করবে; চুরি কর, অনেক সম্পদের মালিক হয়ে যাবে। সে পাপকর্মকে সুসজ্জিত করে পেশ করে, যেন মানুষের মন প্রলুব্ধ হয় এবং অপকর্মে লিপ্ত হয়ে পড়ে। ফেরেশতা নেকী ও পুণ্যের পথ দেখান এবং বলেন যে, গুনাহের স্বাদ তো (সাময়িকভাবে) পেয়ে যাবে, কিন্তু পরিণতি চিন্তা কর, জাহান্নামে দগ্ধ হতে হবে। গুনাহ দ্বারা নফস অত্যন্ত মজা পায় কিন্তু তা সামান্য সময়ের জন্য। এরপর বিষণ্নতা, দুঃখকষ্ট ও দুশ্চিন্তা এসে যায়, অন্তরে ঘৃণার সৃষ্টি হয়। আর নেকীর কাজ করতে প্রথম দিকে কষ্ট হয়, কিন্তু শেষ পর্যন্ত অন্তরে প্রশান্তি, স্থিরতা, প্রফুল্লতা এবং এক জ্যোতির্ময়তা সৃষ্টি হয়। যাই হোক, ফেরেশতা নেকীর পথ দেখান; আর শয়তান পাপাচারের পথ দেখায়। ফেরেশতা নেকীর আগ্রহ তৈরি করে আর শয়তান পাপের কুমন্ত্রণা দেয়।

আপনারা লক্ষ্য করে থাকবেন যে, কখনো কখনো মানুষ দোটানায় পড়ে যায়। একবার মন চায়– চল নেক কাজ করি, আবার অলসতা এসে ভর করে– পরে

দেখা যাবে। কোন সময় মন চায় যে, তাহাজ্জুদের নামায পড়ে নেব, তারপর আবার খেয়াল হয়, শেষ রাতের মিষ্টি ঘুম ছেড়ে উঠব, আজ থাক, আগামীকাল দেখা যাবে; কখনো মন এদিক যায় কখনো সেদিক যায়। এ হল ফেরেশতা ও শয়তানের যুদ্ধ, যার কারণে মানুষ অস্থির ও দ্বিধাগ্রস্থ হয়ে পড়ে। যে পক্ষ জয়ী হয় মানুষ সে অনুযায়ী কাজ করতে থাকে থাকে। মনও সেদিকে ধাবিত হয়।

শয়তানের প্রেরণায় কৃত নেকীও সঠিক নয়

এ কারণেই বলা হয়েছে, শয়তান মানুষের চরম শত্রু। তার চাহিদামত নেকীও কর না। নিজের অন্তরের প্রেরণায় নেকী কর। শয়তান যদি নামায পড়তেও বলে, মনে করবেন এতেও কোন না কোন প্রতারণা ও খারাবী লুকিয়ে আছে।

একবার হযরত মুয়াবিয়া রা. ঘুমাচ্ছিলেন, ঘটনাক্রমে শয়তান এসে কুমন্ত্রণা দিল। তিনি তো আর নবী ও মাসুম ছিলেন না। সাহাবায়ে কেরামেরও পরীক্ষা হতে পারে। যাই হোক, শয়তানের কিছু ক্রিয়াকৌশল ও হস্তক্ষেপে তাঁর তাহাজ্জুদ নামায কাযা হয়ে গেল। শয়তান অত্যন্ত খুশি হল যে, একজন মহান সাহাবীর তাহাজ্জুদ কাযা করিয়ে দিয়েছি। সাহাবী ছিলেন, তাঁদের ফরয নামায তো কাযা করানো সম্ভবপর ছিল না। নফল নামায ছুটে যাওয়া সম্ভব ছিল। শয়তানের কারণে তা ছুটেও গেল। কিন্তু হযরত মুয়াবিয়া রা.-এর অত্যন্ত অনুতাপ হল যে, কত বছরের আমল ছুটে গেল! সমস্ত দিন কাঁদলেন, ইস্তিগফার করলেন, অনেক নফল নামায পড়লেন, তওবা করলেন। পরের রাতে কঠিন সংকল্প করে ঘুমালেন– আজ ইনশাআল্লাহ অবশ্যই উঠব, আজ যেন নিদ্রা আমার উপর প্রাধান্য বিস্তার করতে না পারে।

এদিন শেষ রাতে তিনি জেগে ওঠার পূর্বেই এক ব্যক্তি এসে পা ধরে নাড়া দিল– আমির মুয়াবিয়া! উঠুন, উঠুন, তাহাজ্জুদের সময় হয়ে গেছে। তিনি তার হাত ধরে ফেললেন– এই ভেবে যে, আমাকে উঠানোর জন্য অন্দর মহলে এই রাতের বেলায় এ অপরিচিত ব্যক্তি কে এল? হাত ধরে বুঝতে পারলেন, এ হল শয়তান। তিনিও তো সাহাবী, সুদৃঢ় ঈমান ছিল তাঁর। বললেনঃ বিতাড়িত শয়তান, তুই কেন এখানে এসেছিস? সে বলল, আপনার মঙ্গল ও খায়রখাহীর জন্য এসেছি। আপনার তাহাজ্জুদ গতকাল কাযা হয়ে গিয়েছিল, তাই মনে করলাম আজ আমিই জাগিয়ে দেই, আপনাকে কষ্ট দিলাম। হযরত মুয়াবিয়া রা. বললেন, হতভাগা! তুই এবং খায়রখাহী? আল্লাহ বলেছেন–

إِنَّ الشَّيْطٰنَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوْهُ عَدُوًّا.

শয়তান তোমাদের চরম শত্রু। অতএব তাকে শত্রু রূপেই গ্রহণ কর। [ফাতির : ৬]

তুই বন্ধুত্ব করবি আর কল্যাণ কামনা করবি? সত্য কথা বল! তুই আমাকে নামাযের জন্য জাগ্রত করলি কেন? অবশ্যই এতে কোন ধোঁকাবাজি লুকিয়ে আছে, কোন না কোন খারাবী নিশ্চয় রয়েছে। সে বলল, না, খায়রখাহীই একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। তিনি বললেন, তুই আর কল্যাণকামিতা? আল্লাহর ওয়াদা সত্য। তিনি বলে দিয়েছেন যে, তুই শত্রু। তুই বন্ধুত্ব করবি এটা সম্ভব নয়।

আমিও রাসূলের সাহাবী, আমারও রূহানিয়াত মজবুত। আজ তোকে আমি কঠিন মার দেব, নতুবা বলে দে প্রকৃত বিষয় কী? হাত ধরা ছিল, ছুটতে পারছিল না, সে ছিল প্রকৃতিগতভাবে সূক্ষ্ম আর তিনি ছিলেন আধ্যাত্মিক শক্তিতে বলীয়ান, তাঁর মধ্যেও সূক্ষ্মতা ছিল। আমাদের মত কেউ হলে শয়তান ধাক্কা দিয়ে ভেগে যেত। এবার মুখ খুলল। বলতে লাগল– গতকাল আমি কিছু কারসাজি করেছিলাম বলে আপনার তাহাজ্জুদ কাযা হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু আপনি তওবা ইস্তিগফার করেছেন, বহু নফল নামায পড়েছেন। তাতে আপনি এতো সাওয়াব পেয়েছেন, যা তাহাজ্জুদের তুলনায় অনেক বেশি। তাই ভাবলাম, আজ না হয় আমিই উঠিয়ে দেই, তাহলে সাওয়াবের পরিমাণ কিছুটা হ্রাস পাবে। তা নাহলে আপনি তো দিনভর পরিশ্রম করবেন। তার চেয়ে বরং পঞ্চাশ রাকাতের পরিবর্তে চার রাকাত পড়া হয়ে যাক। হযরত মুয়াবিয়া রা. বললেন, এখন তুই ঠিক কথা বলেছিস। তারপর তাকে ছেড়ে দিলেন– ভাগ মালাউন শয়তান! তোর উপর অভিশাপ।

যাইহোক, শয়তান কখনো খায়রখাহী করতে পারে না। সে সবসময় মন্দ ও অমঙ্গলই কামনা করবে। সে যদি সৎ পথও প্রদর্শন করে, এতেও কোন অমঙ্গল রয়েছে। তার কথায় ভাল কাজও করা উচিত নয়। যখন অন্তরে সৎ প্রেরণা উদিত হয় তখনই মানুষ সৎ কাজ করবে। সারকথা, ফেরেশতাগণ অত্যন্ত হিতাকাঙ্খী আর শয়তান অত্যন্ত অকল্যাণকামী।

যাই হোক, আলমে গায়ব বা অদৃশ্য জগতেও উভয় সিলসিলা বিদ্যমান রয়েছে। একটি হল খায়র বা কল্যাণের ধারা, তাঁরা হলেন ফেরেশতা, অন্যটি শার্ বা মন্দের ধারা, এরা হল শয়তানের দল।

পৃথিবীতে কল্যাণ ও অকল্যাণের দু'টি ধারা

পৃথিবীতে আগমনের পরও এ দু'টি ধারা বিদ্যমান রয়েছে। মানব জাতির মধ্যে পবিত্রতম জামায়াত হল নবীগণের জামায়াত। তাদের মধ্যে রয়েছে শুধু খায়র ও কল্যাণ। শার্ ও মন্দের লেশমাত্র তাঁদের মধ্যে নেই। প্রতিটিকাজেই তারা খায়র ও কল্যাণ কামনা করেন। প্রতিটি জিনিস, প্রতিটি মানুষের জন্য কল্যাণ কামনা করেন। আর সে খায়রখাহী এত অধিক যে কখনো কখনো আল্লাহ তাআলাকে বাধা প্রদান করতে হয়েছে যে, এত অধিক খায়রখাহী করবেন না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রহমাতুললিল আলামীন। তিনি হেদায়াত করতেন, কিন্তু কেউই হেদায়াত মানত না। তখন বসে বসে দুঃখ করতেন, চিন্ত াভাবনা করতেন; আল্লাহর সৃষ্টির প্রতি মুহাব্বত ও খায়রখাহীর কারণে হৃদয় মুবারকে এত কষ্ট হত– কেন এরা সৎপথে আসছে না, কেন অসৎ পথ ত্যাগ করছে না। কেন সামান্য সময়ের আনন্দ ও স্বাদ লাভের কারণে নিজের পরকালকে ধ্বংস করছে! কেন তাদের বুদ্ধি বিবেক তাদের বাধা প্রদান করছে না! যখন তারা মানত না তখন দুঃখে তাঁর প্রাণ বিগলিত হয়ে যেন। তখন আল্লাহ বাধা প্রদান করে বললেন–

لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ اَنْ لاَّيَكُوْنُوْا مُؤْمِنِيْنَ○

তারা বিশ্বাস করে না বলে আপনি হয়ত মর্মব্যথায় আত্মঘাতী হবেন। [শুআরা : ৩]

আপনি হিদায়াতের পথ দেখিয়ে দিয়েছেন, এখন যদি কেউ না মানে তো জাহান্নামে যাবে। আপনি কেন এ জন্য দুশ্চিন্তা ও মনোকষ্টে ভুগছেন?

অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বাধা দিয়েছেন। কেননা, খায়রখাহী ছিল সর্বোচ্চ পর্যায়ের। তিনি চাইতেন প্রত্যেকে যেন ঈমানদার হয়ে যায়, জান্নাতী হয়ে যায়। এ কারণে কেউ তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করলে তাঁর খুব কষ্ট হত। তো আম্বিয়া আ. ছিলেন একনিষ্ঠ কল্যাণের আধার। উম্মতের প্রতি ছিল তাঁদের অসীম ভালবাসা। এবং তাঁরা পৃথিবীতে ভালবাসারই বিস্তার ঘটিয়েছেন।

পৃথিবীতে নবী আ.গণের বিরোধিতাকারীদেরকে বলা হয় দাজ্জাল। প্রত্যেক নবীর বিরুদ্ধে কোন না কোন দাজ্জালের আগমন ঘটেছে। দাজ্জালের মূল ধাতু 'দাজলুন'-এর অর্থই হল বাইরে এক আর অন্তরে আরেক। তারা প্রতারণা করে বাইরে নবুওয়াতের দাবি করে; অথচ তাদের অন্তর কুফরীতে পরিপূর্ণ। এভাবে প্রতারণার মাধ্যমে দুনিয়াবাসীকে কুফরের দিকে নিয়ে যায়। সুতরাং নবীর মূল প্রতদ্বন্দ্বী হল দাজ্জাল। নবীর আপাদমস্তক খায়র ও মঙ্গল, আর দাজ্জালের পশমে

পশমে রয়েছে পাপ ও মন্দ কাজ। প্রত্যেক নবীর বিপরীতে কোন না কোন দাজ্জালের উপস্থিতি ছিল। নবী খায়রের প্রতি ও দাজ্জাল শার্-এর প্রতি আহ্বান করতে থাকে।

যেহেতু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বশেষ নবী এবং তাঁরই পবিত্র সত্তার উপর নবুওয়াত, ইলম এবং ঈমানের পূর্ণতা– মোটকথা নবুওয়াতের সকল স্তরের পরিসমাপ্তি ঘটেছে, সেহেতু তাঁর চেয়ে অধিক পূর্ণাঙ্গ ঈমানের অধিকারী অন্য কেউ নেই। তাঁর চেয়ে পরিপূর্ণ পথপ্রদর্শক অন্য কেউ নেই। খায়র ও কল্যাণের সকল স্তর তাঁর উপর সমাপ্ত হয়ে গিয়েছে। এ জন্যই তিনি খাতামুন নাবিয়্যিন। অর্থাৎ নবুওয়াতের সকল স্তর তাঁর বরকতময় সত্তার উপর খতম হয়ে গিয়েছে। এজন্য তাঁর উম্মতে যে দাজ্জালের আগমন ঘটবে সে এতই মারাত্মক যে, অন্য কোন দাজ্জাল তার সমকক্ষ হতে পারবে না। এমন কোন দাজ্জালের ইতোপূর্বে আগমনও ঘটেনি। মহানবীর সাথে মোকাবিলা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার দাজ্জালও সে অনুপাতে হবে। এজন্যই বিভিন্ন সময়ে দাজ্জালগণ নবুওয়াতের দাবি করেছে এবং ইসলামের শেষ যুগে যে দাজ্জালের নাগমন ঘটবে সে নিজেকে আল্লাহ বলে দাবি করবে। তার উপর শার্ ও অকল্যাণের সকল স্তর শেষ হয়ে যাবে। অকল্যাণের কোন স্তর আর অবশিষ্ট থাকবে না।

তার পৃষ্ঠ মুবারকে মোহরে নবুওয়াত বিদ্যমান থাকার এই ছিল কারণ। আর এ চিহ্ন ছিল তাঁর খাতামুন নাবিয়্যিন হওয়ার নিদর্শন। এই মোহর-এর মধ্যে লেখা ছিল–

سر حيث شئت فإنك منصور

যেখানেই যান, আল্লাহর সাহায্য আপনার সাথে রয়েছে।

খায়র ও মঙ্গল রয়েছে আপনার সাথে, সকল প্রকার খায়র ও মঙ্গলের পরিসমাপ্তি ঘটেছে আপনারই উপর। আপনার জন্য মোহর দেয়া হয়েছে, এ দ্বারা প্রকাশ করা হয়েছে– স্বয়ং আপনিই খায়র, আপনিই ঈমান। পক্ষান্তরে দাজ্জালের কপালে 'কুফর' শব্দটি লেখা থাকেব। সে হল মূর্তিমান কাফের। ওখানে ছিল নবুওয়াতের মোহর, এখানে রয়েছে কুফুর-এর মোহর। ওখানে ঈমানের সকল স্তর নিঃশেষ হয়ে গিয়েছে, এখানে কুফর-এর সর্বনিম্ন স্তর শেষ হয়ে গিয়েছে। যাইহোক, আম্বিয়ায়ে কেরাম আ.-এর প্রতিদ্বন্দ্বিতা রয়েছে দাজ্জালের সাথে। আম্বিয়ায়ে কেরাম খায়র ও ভালবাসা নিয়ে আগমন করেন, আর দাজ্জালগণ হিংসা, বিদ্বেষ ও শত্রুতা নিয়ে আগমন করে। অদৃশ্য জগতে রয়েছে ফেরেশতা ও শয়তানদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা, আর এ জগতে রয়েছে নবীগণ ও দাজ্জালগণের

প্রতিদ্বন্দ্বিতা।

আম্বিয়ায়ে কেরাম আ.-এর অনুসারীদের মধ্যে যারা মর্যাদার শীর্ষে পৌঁছে যান, তাদেরকে ইমাম বলা হয়। যেমন কুরআনে বলা হয়েছে–

وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ اَئِمَّةً يَّهْدُوْنَ بِاَمْرِنَا.

আমি এসব মহা মনীষীগণকে ইমাম বানিয়েছি তারা আমার নির্দেশিত পথের দিকে হেদায়াত করেন। [সাজদা : ২৪]

দাজ্জালদের সর্বোচ্চ অনুসারী যারা হয় তাদের আইম্মায়ে কুফর বলা হয়। কুরআনে বলা হয়েছে–

وَجَعَلْنٰهُمْ اَئِمَّةً يَّدْعُوْنَ اِلَى النَّارِ.

আমি এমন ইমামও বানিয়েছি, যারা জাহান্নামের দিকে আহ্বান করে। মানুষকে আগুনের দিকে নিয়ে যায়। [কাসাস : ৪১]

এ সব ইমাম শার্ (কুফরী)-এর দিকে নিয়ে যায়, আর ঐসব ইমাম খায়র (ঈমান)-এর দিকে নিয়ে যান। ওরা কুফর-এর ইমাম, এঁরা ঈমান ও নেক আমলের ইমাম। তারপর এসব ইমামগণের অনুসারী রয়েছেন। হিদায়াতের ইমামগণের অনুসারীবৃন্দকে 'আউলিয়াউর রহমান' নামে ভূষিত করা হয়। আর আইম্মায়ে কুফর এর অনুসারীদেরকে 'আউলিয়াউশ শায়তান' বলা হয়। একদল হল হিযবুল্লাহ (আল্লাহর দল), আরেক দল হল হিযবুশ শয়তান। প্রথম দল সম্পর্কে বলা হয়েছে, নিশ্চয় আল্লাহর দলই পরিণামে সফলতা লাভ করবে, অপর দল সম্পর্কে বলা হয়েছে শয়তানের দলই পরিণামে ক্ষতিগ্রস্থ, বিপদগ্রস্থ, সম্বলহারা ও শূন্যহস্ত হয়ে পড়বে।

মোটকথা, ঊর্ধ্বজগৎ হতে নিম্নজগৎপর্যন্ত দুটি সিলসিলা রয়েছে। একটি কল্যাণ ও ঈমানের, অপরটি অকল্যাণ ও কুফরের।

কল্যাণ ও অকল্যাণ– এ উভয় সিলসিলার কাজ

খায়রের সিলসিলার কাজ কী? এ সিলসিলা ভগ্ন হৃদয়কে জোড়া দেয়। যাদের মধ্যে শত্রুতা রয়েছে তাদের মধ্যে ভালবাসা সৃষ্টির চেষ্টা করে। যাদের মধ্যে লাড়াই থাকে তাদের মধ্যে সন্ধি করিয়ে দেয়ার চেষ্টা করে। ফেরেশতা, আম্বিয়া ও আউলিয়াদের সিলসিলা কামনা করে যে, জগতে সাবাই এক প্লাটফর্মে

একত্রিত হয়ে যাক। সবার হৃদয়াত্মা এক হয়ে যাক। সকলেই পরস্পর স্নেহ-মমতা ও ভালবাসার ব্যবহার করুক। পরস্পরের মাঝে দেখাসাক্ষাৎ হোক, একে অন্যের কল্যাণ কামনা ও মঙ্গল প্রার্থনা করুক। শয়তান, দাজ্জাল ও শয়তানের বন্ধুগণ কামনা করে যে, যারা মিলেমিশে রয়েছে, যারা এক পতাকা তলে রয়েছে তাদের মধ্যে বিভেদ বিচ্ছেদ সৃষ্টি হোক, তাদের মধ্যে দলাদলি সৃষ্টি হয়ে যাক। যাদের মধ্যে স্নেহ মুহাব্বত রয়েছে তাদের মধ্যে হিংসা-বিদ্বেষ ও শত্রুতা সৃষ্টি হোক। যারা একে অন্যের কল্যাণ কামনা ও মঙ্গল প্রার্থনা করছেন, তারা একে অন্যের অকল্যাণ ও দুঃখ-কষ্ট কামনায় ব্যস্ত হয়ে পড়ুক, একে অন্যের পথে কাঁটা বিছায়ে রাখুক, একে অন্যকে অপমান ও অপদস্ত করায় সদা সচেষ্ট থাকুক, দুনিয়াতে ফেৎনা ও ফাসাদ প্রসারিত করবে। এসব হল দাজ্জাল, শয়তান ও আইম্মায়ে কুফরের কাজ। আম্বিয়া আ. স্নেহ-মমতা ও ভ্রাতৃত্ব সৃষ্টির জন্য এসেছেন, আর দাজ্জালরা শত্রুতা, হিংসা-বিদ্বেষ সৃষ্টি করার জন্য এসেছে।

নবীদের কাজ হল এই যে, যারা আল্লাহ হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে যান তাদেরকে আল্লাহর সাথে মিলিয়ে দেন, মানুষের মাঝে পরস্পর যেসব বিভেদ-বিচ্ছেদ সৃষ্টি হয়ে যায়, তাদেরকে পরস্পর মিলিত করে দেন। আর শয়তানরা চায়, আল্লাহর সাথে বান্দার যে সম্পর্ক বিদ্যমান রয়েছে তা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাক, বান্দাদের পরস্পরের মধ্যে শত্রুতা, বিভেদ-বিচ্ছেদ সৃষ্টি হোক। ভাইয়ে ভাইয়ে লাড়াই হোক, ঘরে ঘরে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হোক।

এ কারণে মিল-মুহাব্বত, স্নেহ-মমতার যত পরম্বরা রয়েছে, এগুলোর বাহক হলেন আম্বিয়ায়ে কেরাম আ.। আর যুদ্ধবিগ্রহ, ফেতনা ফাসাদের যতগুলো সিলসিলা রয়েছে এসবের বাহক হল শয়তান ও তার সাঙ্গপাঙ্গ।

মানবজাতিকে একত্রিত করণের সর্ববৃহৎ সিলসিলা

পৃথিবীতে মানুষে মানুষে সংযোগ স্থাপনের সর্ববৃহৎ মাধ্যম হল বিবাহ বন্ধনের পবিত্র সিলসিলা। যা দ্বারা অপরিচিত দুজন মানুষ, যাদের মধ্যে পূর্বে কোন সম্পর্ক ছিল না, তারা এমন বিস্ময়করভাবে আন্তরিকতার সাথে মিলে যায় যে, এখন থেকে তাদের উপকার-অপকার, লাভ-ক্ষতি সবই এক ও অভিন্ন। তাদের পারস্পরিক মিল ও একতার কারণে দু'টি খান্দানের মধ্যে এমন একতা ও সম্প্রীতি সৃষ্টি হয়ে যায় যে, এত গাঢ় সম্পর্ক ও সম্প্রীতি এর পূর্বে তাদের মধ্যে কখনোই পরিদৃষ্ট হয়নি। বিবাহ হল জুড়ে দেয়ার সিলসিলা। এ কারণে নবী আ.গণ হলেন এ সিলসিলার ধারক-বাহক। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম বলেন–

النكاح من سنتى فمن رغب عن سنتى فليس منى

বিবাহ হল আমার সুন্নাত, যে ব্যক্তি আমার সুন্নাতের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করবে সে আমার জামাত বহির্ভূত; আমার উম্মত নয়।

এজন্য যে, বিবাহ ইত্তেহাদ ও একতা সৃষ্টির মাধ্যম। আর নবীগণের আগমনের উদ্দেশ্য এই– পরস্পরে একতা, মিল-মুহাব্বত সৃষ্টি হোক।

অপরদিকে শয়তান চায় যে, বিবাহ শাদী না হোক, অথবা হয়ে থাকলে ভেঙ্গে যাক। এমন বিভেদ সৃষ্টি হোক, যেন শেষপর্যন্ত বিবাহ ভেঙ্গে যেতে বাধ্য হয়। তালাক হয়ে যাক, পরস্পরে বিভেদ বিচ্ছেদ সৃষ্টি হয়ে যাক, এসবের ধারণ ও বাহক হল শয়তান ও তার দল।

এ কারণেই নবী আ.গণ বিবাহকে ভালবাসেন, তালাক প্রদান যদিও জায়িয, অপারগ হয়ে গেলে দেয়া যায়, কিন্তু জায়িয হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহর নিকট অপছন্দনীয়। বলা হয়েছে–

ابغض المباحات عند الله الطلاق.

জায়িয কাজগুলোর মধ্যে আল্লাহর নিকট সবচেয়ে অপছন্দনীয় ও ঘৃণ্য কাজ হল তালাক।

এজন্য যে, তালাক বিবাহকে ভঙ্গ করে দেয়, যা দ্বারা মানুষ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে, শত্রুতার সৃষ্টি হয়। আর তা হল নবীগণের উদ্দেশ্যের পরিপন্থী। এজন্য নবী আ.গণ বিবাহকে ভালবাসেন, আর শয়তান তালাক দেয়াকে ভালবাসে। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কাছে তালাক অপ্রিয়, গর্হিত কাজ। কেবল অপারগ ও বাধ্য হলে তালাক দেয়ার অনুমতি রয়েছে, কিন্তু সেক্ষেত্রেও তা অপ্রিয় বলেই গণ্য হবে। বিবাহ সম্পর্কে বলা হয়েছে, বিবাহ-শাদী করা আমার সুন্নত, তালাক সম্পর্কে বলা হয়নি যে, তালাক প্রদান আমার সুন্নাত। এ হল অপারগতার জিনিস, কেউ যদি বাধ্য হয়ে পড়ে তবে অনুমতি দেয়া হয়।

এই হল কারণ যে, তালাক বিবাহকে ভেঙ্গে দেয়। প্রথমত তালাককে ঘৃণ্য আখ্যায়িত করা হয়েছে। তারপর তালাকের শ্রেণী বিন্যাস করা হয়েছে– একটি হল তালাকে সুন্নাত, আরেকটি হল তালাকে বিদআত। সুন্নত তালাক হল এই, একসাথে যেন তিন তালাক প্রদান না করে প্রত্যেক তালাক পৃথক পৃথকভাবে দিবে, যেন প্রতিটি তালাকের পর ইচ্ছা হলে রুজু (স্ত্রীকে পুনরায় গ্রহণ) করতে

পারে, পুনরায় বিবাহ করার দরকার না হয়। এ হল তালাক প্রদানের সুন্নত পদ্ধতি। এজন্য যে, যদি কোন কারণবশত স্ত্রীকে পুনরায় রেখে দিতে বাধ্য হয়, তবে তিনটি তালাকই যেন হাত ছাড়া না হয়। ঐ এক তালাকই ইদ্দতান্তে বাইন তালাকে পরিণত হবে। সাবধান ও সতর্ক করার জন্য যদি দিতেই হয় তবে এক তালাক দিবে, যেন ইদ্দত শেষ হওয়ার পূর্বে রুজু করার অধিকার থেকে যায়। এরপরও যদি দিতে হয় তবে আরেকটি দিবে, তারপও প্রায় তিন চার মাস সুযোগ থাকবে রুজু করে নেয়ার। একত্রে তিন তালাক প্রদান করাকে বিদআত বলা হয়েছে। আর তালাক প্রদানের সুন্নত তরিকা হল প্রতি তুহুরে (পবিত্র কালে) এক-একটি করে দিবে, তাহলে রুজু করারও সুযোগ থাকবে। মোটকথা হল নবীগণ আ. এমন তরিকা পছন্দ করেন যা দ্বারা আত্মীয়তা বহাল থাকে, সম্পর্ক টিকে থাকে, যেহেতু এ হল ইত্তেহাদ ও একতা সৃষ্টির মাধ্যম।

নারীগণের মাধ্যমে গোত্রে গোত্রে ভালবাসা প্রতিষ্ঠিত হয়

একজন মহিলা এক-দু'জনের একতারই মাধ্যম মাত্র নয় যে, স্বামী-স্ত্রী মিলে যাবেন, বরং তাদের মিলনে একজনের প্রিয়জন অন্যের প্রিয় হয়ে যাবে। উভয়ের প্রিয়জন ও আপনজন পরস্পরে মিল-মুহাব্বত হয়ে যাবে। এ যেন দু'জনের মিলন নয়, অনেকের মিল-মুহাব্বতের কারণ। দুই গোত্রের মিলন মাধ্যম, এক গোত্র অন্য গোত্রের সাথে মিলিত হয়ে যায়, এক গোত্রের উপর অন্য গোত্রের হক ও অধিকার প্রতষ্ঠিত হয়ে যায়, মুহাব্বত-ভালবাসা হয়ে যায়।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিয়ে করেছেন, তাঁর নয়জন পাক-পবিত্র স্ত্রী ছিলেন। এত বেশি শাদীর উপকার ও দূরদর্শিতা এই ছিল যে, বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপিত হয়ে যাবে, ফলে তাবলীগে দীনের কাজে সহায়তা হবে। যখন বিভিন্ন গোত্রের সাথে বিবাহ শাদী হয়ে গেছে, তাদের সাথে সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে, তখন তারা পৃথক ও বিচ্ছিন্ন হতে পারবেন না। এ দ্বারা তিনি তাবলীগে দীনের সাহায্য পেয়েছেন, এ বিবাহগুলোর বরকতে বিভিন্ন গোত্রে ইসলাম প্রবেশ করেছে। এ জন্য যে, আরব দেশে আত্মীয়তার বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হত। বংশ পরম্পরায় তা বিদ্যমান থাকত। তাদের অধিকারগুলোকে সংরক্ষণ করা হত।

যখন মিসর জয় করা হল, তখন মিসর হতে যে যুদ্ধবন্দী আনা হল এদের মধ্যে পুরুষ ও মহিলাগণ ছিলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর স্ত্রী হযরত সাফিয়্যা রা.কে মিসর থেকে আনা হয়েছিল।* তিনি ইসলাম গ্রহণ করে

নিলেন এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বিয়ে করলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, দেখ মিসরের সাথে আমার শ্বশুরালয়ের সম্পর্ক স্থাপিত হয়ে গেল, এর প্রতি লক্ষ্য রেখ। সম্পূর্ণ উম্মতের উপর হক ও অধিকার প্রতিষ্ঠা করে দিলেন যে, মিসরবাসীদের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রেখ। কেননা মিশর আমার শ্বশুরালয় হয়ে গিয়েছে। শ্বশুর-জামাতার সম্পর্ক এতই গাঢ় ও নিবিড় যে, দুই গোত্র ও দুই দেশকে এক করে দিতে সমর্থ হয়। অতএব, নবী আ.গণের নিকট বিবাহ বন্ধন অত্যন্ত প্রিয় ছিল, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

حبب إلىّ من دنياكم ثلاث

তোমাদের পৃথিবীর তিনটি জিনিস আমার কাছে অত্যন্ত প্রিয় ও পছন্দনীয়।

এ তিনের মধ্যে একটি হল নারী। নারীগণকে এ জন্য পছন্দ করেননি যে, তারা হলেন (আল্লাহ মাফ করুন) কামোদ্দীপনা চরিতার্থ করার মাধ্যম, বরং এ জন্য যে, তারা হলেন সম্পর্ক ও ভালবাসা প্রতিষ্ঠার মাধ্যম। নারীদের মাধ্যমেই স্নেহ-মমতা, ভালবাসার পথ সুগম হয়। পুরুষগণতো নিজ নিজ কাজকর্মে ব্যস্ত থাকনে, কেউ দোকানে, কেউ অফিসে, কেউ ক্ষেতে-খামারে ব্যস্ত থাকনে। এসব আত্মীয়তা যা সুপ্রতিষ্ঠিত রয়েছে, আত্মীয়তার হকগুলো আদায় হচ্ছে, সে সবের অধিকাংশই নারী সমাজের দ্বারা সম্পাদিত হয়। কিন্তু নারীরা যদি অসদাচারিনী হয়, তবে আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করে দেবে। তার মধ্যে রীতিমত জ্ঞান থাকতে হবে, তবেই সে দুই গোত্রকে মিলিয়ে দিতে পারবে। নারী সমাজই প্রকৃত পাত্র মুহাব্বত ও ভালবাসার। এজন্য যে, তাদের মাধ্যমেই ভালবাসা অগ্রসর হয়, বিস্তার লাভ করে। মুহাব্বতের ধারা সচ্ছল থাকে। তাই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তোমাদের পৃথিবীর তিনটি জিনিসই আমার নিকট সর্বাধিক পচন্দনীয়। তিনি যে তিনটি জিনিসকে পছন্দ করেছেন তা হল– সুগন্ধি, নামায ও নারী। এ জন্য যে, সুগন্ধির কারণে ফেরেশতাদের সমাগম হবে। এও পরস্পরে ভালবাসা সৃষ্টি হওয়ার মাধ্যম। নারীর আগমন, গোত্রগুলোর মুহাব্বত ও ভালবাসার বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে যাওয়ার মাধ্যম। এ দ্বারা মুহাব্বত ও একতা প্রতিষ্ঠিত হল। সুতরাং বিবাহ-শাদীর প্রধানতম উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হল পরস্পরের মাঝে একতা, ভালবাসা ও শান্তির পরিবেশ সৃষ্টি হয়ে যাওয়া।

বিবাহের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

এ কারণেই কুরআনে বিবাহের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য পরস্পর সান্ত্বনা লাভকে বলা হয়েছে আর বংশ বৃদ্ধি স্বাভাবিক নিয়মে হতে থাকবে। প্রকৃত উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হল এই–

وَمِنْ اٰيٰتِهٖ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً.

আল্লাহর কুদরতের নিদর্শনাবলির মধ্যে এও একটি নিদর্শন যে, তিনি তোমাদের মধ্য হতে তোমাদের জন্য পত্নীগণকে সৃষ্টি করেছেন, যেন তার নিকট গিয়ে তোমরা শান্তি ও সান্ত্বনা লাভ করতে পার। আর তোমাদের মধ্যে সৃষ্টি করে দিয়েছেন পারস্পরিক সম্প্রীতি ও দয়া। [রূম : ২১]

আল্লাহ বলেন, এ হল আমার কুদরতের নিদর্শন যে, তোমাদের মধ্য হতে তোমাদের জোড়া সৃষ্টি করেছি। যদি মহিলা সমাজ মানব জাতি হতে না হত, ফেরেশতাদের অথবা জ্বিনদের মধ্য হতে হত, তবে কখনো পরস্পর ভালবাসা প্রেম-প্রীতি প্রতিষ্ঠিত হত না, অন্য জাতির প্রতি মনের আকর্ষণই হত না। প্রাণিজগতের প্রত্যেক শ্রেণীর মধ্যে হাজার হাজার মাদী রয়েছে, বাঘ-এর সাথে বাঘিনী রয়েছে, সিংহের সাথে তার বিপরীত লিঙ্গও রয়েছে। কিন্তু মানুষ এদিকে ধাবিত হয় না, যেহেতু সেগুলো অন্য জাতি তাই সেদিকে মনের আকর্ষণ হয় না। আকর্ষণ হয় স্বজাতির প্রতি। তাই আল্লাহ বলেছেন, আমার কুদরতের নিদর্শন হল এই যে, তোমাদের স্বজাতি হতে তোমাদের জোড় সৃষ্টি কেরছি। তাহলে যখন তেমাদের জোড়া মিলানো হবে তখন যেন প্রেম ও ভালবাসা স্থাপিত হয়। যদি অন্য জাতিকে জোড়া বানিয়ে দিতেন, পরীকে স্ত্রী বানিয়ে দিতেন, তবে মধুর সম্পর্ক স্থাপিত হত না। উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য পণ্ড হত। কাজেই তোমাদের মধ্য হতে সৃষ্টি করেছি তোমাদের জোড়াকে। কেন করলাম? এ জন্য যে, তোমরা যেন শান্তি ও সান্ত্বনা লাভ করতে পার এবং তোমাদের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মুহাব্বত ও ভালবাসা, দয়া ও অনুরাগের সৃষ্টি হয়, তোমরা একে অন্যের শুভাকাঙ্ক্ষী হয়ে যাও। পরস্পরের মধ্যে মিল মুহাব্বত হয়। এজন্যই আমি জোড়া বানিয়েছি। তারপর বলেছেন, যে সকল মানুষ চিন্তা ও গবেষণা করে, তারা এর সঠিক মূল্যায়ন করতে সক্ষম হবেন যে, আমি কী বলছি। আর যারা স্থূলবুদ্ধি, উদাসীন প্রকৃতির ও বিবেকহীন, তারা কি বুঝবে এতে কতটা

উপাকারিতা ও মঙ্গল রয়েছে? কিন্তু তোমরা যখন জীবনযাপন করবে এবং এ স্থানে এসে উপনীত হবে তখন এর মূল্য বুঝবে যে, কত মহা নেয়ামত দান করেছি। তোমাদের জোড় তোমাদের মধ্য হতে সৃষ্টি করেছি, যেন তোমরা শান্তি তে বসবাস করতে পার, সান্ত্বনা লাভ করতে পার।

বিবাহ আল্লাহর কুদরতের নিদর্শন

বিবাহকে 'আয়াত' বলা হয়েছে। আয়াত বলা হয় কুদরতের নিদর্শনকে। যা জিনিস একমাত্র আল্লাহই করতে পারেন, অন্য কেউ তা করতে পারে না, তাকেই বলা হয় আয়াত। যেমন কুরআনের আয়াত– আয়াতুল কুরসী, আয়াতে ইস্তে খলাফ, আয়াতুর রহমান, আয়াতে রহমত– এসবই আল্লাহর আয়াত, তাঁর কুদরতের বিশেষ নিদর্শন। অন্য কেউ এমন আয়াত উপস্থাপন করতে পারবে না। এভাবে তাঁর কাজকর্মের মধ্যে অনেক আয়াত রয়েছে। তিনি বলেন–

وَاٰيَةٌ لَّهُمُ الْاَرْضُ الْمَيْتَةُ اَحْيَيْنٰهَا.

অর্থাৎ এ হল আমার কুদরতের নিদর্শনাবলির অন্তর্গত। জমি আমিই সৃষ্টি করছি, অন্য কেউ তা করতে পারে না। জমি মরে যায়, আমি বৃষ্টির বর্ষণ করে তাকে পুনরুজ্জীবিত করি। অন্যত্র বলেছেন, চন্দ্র ও সূর্য আল্লাহর কুদরতের দু'টি নিদর্শন। কুরআন মাজিদের আয়তসমূহের ন্যায় আয়াত কেউ যেমন বলতে পারেনি, এসব নিদর্শনের জবাবও কেউ দিতে পারবে না যে, সূর্যের ন্যায় আরেকটি সূর্য তৈরি করে দেবে, চন্দ্রের ন্যায় আকেটি চন্দ্র তৈরি করবে। পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য সবাইকে আয়াত ও নিদর্শন বলা হয়েছে। আরো বলেছেন, রাতও আমার কুদরতের নিদর্শন, রাতের ভিতর হতে দিনকে বের করি, অন্ধকারের মধ্যে আলো এসে যায়, কিছুক্ষণ পূর্বে সম্পূর্ণ পৃথিবী অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল, আলোর কোন চিহ্নও ছিল না, অসহায় মানুষ চেষ্টা পরিশ্রম করে, কৃত্রিম লাইট, লক্ষ লক্ষ বাল্ব লাগিয়েছিল। কিছুটা আলো হয়েছিল বটে কিন্তু রাত্র যথারীতি দণ্ডয়মান ছিল, দিন হয়নি। আমার কুদরত ও শক্তি দেখ, যখন দিনকে বের করতে ইচ্চা করি, সূর্য আগমনের সময় নিকটবর্তী হয়ে আসে, সাথে সাথে রাত্রি উধাও হয়ে যায়। সম্পূর্ণ জগৎ অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল, হঠাৎ করে আলোকময় হয়ে গেল। আলোর রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল, সাথে সাথে সম্পূর্ণ বিশ্বে আলো বিস্তার লাভ করল, এ হল আমার কুদরত ও মহাশক্তির নিদর্শন।

এভাবে বিবাহ শাদীকেও কুদরতের নিদর্শন বলা হয়েছে। আপনি বলতে পারেন বিবাহে কুদরতের নিদর্শন কী থাকতে পারে? যা আল্লাহই করতে পারেন, অন্য

কেউ নয়। একজন পুরুষ ও একজন মহিলাকে শাদী করিয়ে দিলাম, এতে কুদরতের কী রয়েছে? একজন খুৎবা পাঠ করবে, ইজাব-কবুল হয়ে যাবে, এতে কুদরতের নিদর্শন কী রয়েছে? এতে নিদর্শন হল এই, দুটি শব্দ উচ্চারণের পূর্বে পুরুষ ও মহিলার মধ্যে কোন সম্পর্ক ছিল না। একজন অন্যজনের নিকট সম্পূর্ণ অপরিচিত ছিল। যদি কোন আত্মীয়তা থেকেও থাকে তবে এ জাতীয় অনেক আত্মীয়তাই থাকে, কিন্তু এ পুরুষ ও মহিলার মধ্যে আন্তরিক কোন সম্পর্ক ছিল না, পরস্পরের মাঝে কোনরূপ আন্তরিকতা ছিল না। একে অন্যের জন্য সম্পূর্ণ অপরিচিত, একজনের অন্তর অন্য জনের ভালবাসা হতে পাক পরিষ্কার ছিল, কিন্তু কয়েকটি অক্ষর উচ্চারিত হল, সাথে সাথে হয়ে গেল অভ্যন্তরীণ বিপ্লব। এখন এ পুরুষের আন্তরিক সম্পর্ক স্থাপিত হল ঐ মহিলার সাথে। এ মুহূর্তে যদি তাকে সংবাদ দেয়া হয় যে, তোমার স্ত্রী কোন কষ্টে রয়েছে, তবে অন্তর ব্যথিত হবে, দুঃখ পাবে। কিন্তু এ অক্ষরগুলো উচ্চারণের পূর্বে যদি খবর দেয়া হত, তবে সে বলত কত মহিলাইতো কষ্টে আছেন, তাতে আমার কী। দেখুন কয়েকটি অক্ষরের কারণে আন্তরিকতার সম্পর্ক স্থাপিত হয়ে গেল। মহিলাকে যদি সংবাদ দেয়া হয় যে, যার সাথে তোমার বিবাহ হয়েছে সে কষ্টে আছে। মহিলা পেরেশান হয়ে পড়বে, ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়বে। কিন্তু বিবাহ পড়ানোর পূর্বে পঞ্চাশ খবর এলেও সে বলত, হাজারো পুরুষ কষ্টে রয়েছেন, আত্মীয় স্বজন ও প্রিয়জনের মধ্যেও রয়েছেন, এতে আমার পেরেশান হওয়ার কী রয়েছে? এ দু'টি শব্দ উচ্চারণের পর যে মহাবিপ্লব সূচিত হল, তা কি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কে করতে পারে? হৃদয়কে মোমের মত বিগলিত করে প্রেম-প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ করে দিয়েছেন, তখন ছিল বেগানা বা সম্পর্কহীন, আর এখনই হয়ে গেল এগানা বা নিবিড় সম্পর্কে জড়িত। এক মিনিট পূর্বে ছিল সম্পর্কহীন, এক মিনিট পর স্থাপিত হয়ে গেল মধুর সম্পর্ক। এমতাবস্থায় স্ত্রী সম্পর্কে যদি কোন আনন্দের খবর আসে তবে স্বামীর প্রাণ ভরে উঠবে, সাহস ও প্রীতি বৃদ্ধি পাবে– যাকে বিবাহ করেছি তার সম্পর্কে কেমন আনন্দদায়ক সংবাদ শুনলাম। স্বামীর পক্ষ থেকে কোন সুখবর যদি স্ত্রীর কাছে পৌঁছে, তারও অন্তর আনন্দে ভরে যাবে, যার সাথে আমার সম্পর্ক হয়েছে তার জন্য এটা সম্মান ও গৌরবের বিষয়। নারী সমাজে তার মাথা উঁচু হবে, তার জন্য হল গর্বের কারণ, স্বামীর পুরুষ মহলে উঁচু শির হবে। কিন্তু এ কয়েকটি অক্ষর উচ্চারণের পূর্বে কারো শির উঁচু হচ্ছিল না, কারো জন্য কোন গর্বের বস্তুও ছিল না। এ যে বিরাট বিপ্লব হয়ে গেল তা আল্লাহ তাআলা ব্যতীত অন্য কে করতে পারে? আমার-আপনার কাজ এ নয়, এই হল নিদর্শন হওয়ার অর্থ যে, রূহের মধ্যে আত্মার মধ্যে বিপ্লব হয়ে

গিয়েছে। এখন কিছুই ছিল না আবার এখনই কিছু হয়ে গেল। এজন্যই আল্লাহ বলেছেন, তাঁর মহা কুদরতের নিদর্শন হল যে, তোমাদের মধ্য হতে তোমাদের জোড়া সৃষ্টি করেছেন। তাঁর এও নিদর্শন যে, কয়েকটি অক্ষর পাঠ করিয়ে বৈপ্লবিকভাবে প্রেম-প্রীতি, শান্তি ও সান্ত্বনা সৃষ্টি করে দিয়েছেন।

আল্লাহ তাআলা এ বিষয়কে তাঁর দান ও উপহার বলে উল্লেখ করেছেন। এতে বোঝা যাচ্ছে যে, আল্লাহও স্বামী-স্ত্রীর প্রেম-প্রীতি ও ভালবাসাকে পছন্দ করেন, এ যেন তাঁর কাছেও প্রিয়। স্বামী-স্ত্রীর মিলন মধুর হোক, তাদের অন্তরে প্রেম ও প্রীতি সৃষ্টি হোক। একেই বিবাহের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বলে উল্লেখ করা হয়েছে। যখন আল্লাহই চাচ্ছেন যে, যে পাত্র ও পাত্রীর বিবাহ হচ্ছে, তারা আন্তরিকতা ও ভালবাসার সাথে পরস্পর মিলিত হোক। তবে নীবগণ আ. কেন তা পছন্দ করবেন না? নবীগণ তাই পছন্দ করেন, যা আল্লাহ তাআলা পছন্দ করেন। তাঁরা আল্লাহ তাআলার দোভাষী হয়ে আগমন করেছেন। কাজেই তাঁদের নিকটও ইহা পছন্দনীয় যে, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মুহাব্বত হোক, ভালবাসা ও সম্প্রীতি হোক।

পারিবারিক জীবনে সান্ত্বনা লাভের রহস্য

এ কারণেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন কোন সময় এমন কাজও করতেন যা দ্বারা মুহাব্বত ও ভালবাসা বৃদ্ধি পায়। হাদীসে বলা হয়েছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন সময় হযরত আয়েশা রা.-এর সাথে একই পাত্র খানা গ্রহণ করতেন এবং তাও এমন দিনে যখন হযরত আয়েশা রা. নামায আদায় করা হতে বিরত থাকতেন। জাহিলিয়াতের যুগে এ প্রথা ছিল যে, ঋতুস্রাবকালে মহিলাগণকে অচ্ছুৎ মনে করা হত, তার ছায়াকেও অপবিত্র মনে করা হত। পৃথক একটি ঘরে আবদ্ধ করে রাখা হত, রুটি-পানিও দেয়া হত তবে বাঁশের নলী দিয়ে দেয়া হত যেন তার ছায়া পড়ে না যায়। সে সম্পূর্ণ অপবিত্র হয়ে গিয়েছে। ইসলাম এসে এ প্রথাকে উৎখাত করেছে। এ হল অত্যন্ত নীচতা। মহিলা অপবিত্র হয়নি, তার অপবিত্রতা হল হুকমী বা আদেশ সাপেক্ষ অপবিত্রতা। আল্লাহ আদেশ করেছেন তাই। তাদের দেহ-অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও মন মানসিকতা অপবিত্র হয়নি। এ হল এমন, কেউ যদি ইস্তেনজা করে আসে, তবে অজু করবে। এ হল হুকমী অপবিত্রতা। আল্লাহ আদেশ করেছেন তাই অপবিত্র। এর অর্থ এ নয় যে শরীরে নাপাক বস্তু লেগে রয়েছে, হুকমী অপবিত্রতা। অর্থাৎ হুকুম করা হয়েছে যে, পাক হয়ে যাও। এভাবে ঋতুস্রাবকালে যে অপবিত্রতার সৃষ্টি হয় তা হল হুকমী। এর অর্থ এই নয় যে, শরীরে নাজাসাত লেগে রয়েছে,

তাকে পরিষ্কার করতে হবে। আল্লাহর আদেশ তাই অপবিত্র মনে করে পবিত্রতা হাসিল কর। কিন্তু জাহিলিয়াতে এ অপবিত্রতাকে অত্যন্ত মারাত্মক মনে করা হত যে, মহিলাকে অস্পৃশ্য মনে করা হত। তার বসবাস ও পানাহার পৃথক করে দেয়া হত, তাদের ছায়া হতেও দূরে থাকত। ইসলাম এসে এই করল যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঠিক ঐ সময় যখন স্রাব হচ্ছিল হযরত আয়েশা রা.-এর সাথে এক পাত্রে আহার করতেন। এতটুকুই কেবল নয়, হাদীসে রয়েছে, হযরত আয়েশা রা. এক টুকরা রুটি মুখে দিতে যাচ্ছেন, এ সময় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থাবা মেরে নিয়ে এসেছেন এবং নিজেই তা আহার করেছেন, যেন উম্মত বুঝতে পারে যে, মহিলা স্বয়ং নাপাক নয়, তার সত্তায় কোন অপবিত্রতা নেই। তার সাথে ভালবাসাকে ছিন্ন করে দেয়া, তাকে অস্পৃশ্য মনে করা– এ হল মানবতা বিরোধী কাজ। বিবাহ এবং মহিলাদের সৃষ্টি ছিল এজন্য যে, এ দ্বারা সম্পর্ক উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে, সুদৃঢ় ও মধুর হবে। এজন্যই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ জাতীয় কাজ স্বয়ং করে দেখিয়েছেন।

হাদীসে বলা হয়েছে, একবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আয়েশা রা.কে বললেন– এসো, আমি ও তুমি দৌড় প্রতিযোগিতা করি, দেখি কে অগ্রগামী হতে পারে। প্রতিযোগিতায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিজয়ী হলেন এবং হযরত আয়েশা রা. হলেন পরাজিত। শেষ বয়সে যখন শরীর ভারি হয়ে গিয়েছিল, তখন আবার প্রতিযোগিতা হল, এবার হযরত আয়েশা রা. হলেন বিজয়িনী। যেহেতু বার্ধক্য হেতু তাঁর শরীর ভারি হয়েগিয়েছিল তাই তিনি পেছনে পড়ে গেলেন। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সমান সমান হয়ে গেলাম, একবার আমার একবার তোমার বিজয় হল।

কেউ হয়ত বলতে পারে প্রতিযোগিতামূলক দৌড়ের সাথে একজন নবীর কী সম্পর্ক? প্রকৃত কারণ হল স্ত্রীর মনে ফুর্তি প্রদানের জন্য, তার মন রক্ষার জন্য এ সখ করেছেন। আর তিনি বলেছেন, প্রত্যেকটি খেলাধূলা ও নিরর্থক কর্ম যা শরীয়তে হারাম, স্ত্রীর সাথে তা জায়িয। যেন তার মন রক্ষা হয়, মন জয় করা যায়। উদ্দেশ্য হল তাকে শান্তি ও সান্ত্বনা দান করা, তার সাথে প্রেম ও ভালবাসাপূর্ণ ব্যবহার করা। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন–

ان اكرم المؤمنين احسنكم أخلاقا الطفكم اهلا.

তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক সম্মানের পাত্র ঐ মুমিন ব্যক্তি যার স্বভাব চরিত্র পাক পবিত্র এবং স্ত্রীর সাথে প্রেম ও প্রীতিপূর্ণ মধুর ব্যবহার করে।

কঠোর ব্যবহার ও কর্কশ ভাষা ব্যবহার কর না। চেহারাকে তিক্ত করে রেখ না। সদা-সর্বদা হুমকী ধমকী প্রদান করতে থেক না। যেমন বোকা স্বামীগণের অভ্যাস নিজের শক্তি সামর্থ্য, ঔদ্ধত্য দেখানো ও ক্ষমতা কায়েম রাখার জন্য কঠোর ব্যবহার করা। তাদের মুখের ভাষা সবসময় থাকে কর্কশ। যখনই ঘরে আসে, নাসিকা কপালে তুলে রাখে, যেন স্ত্রী আতংকগ্রস্ত হয়ে যায় যে, ঘরে কোন বাঘ প্রবেশ করেছে। এ হল অত্যন্ত অন্যায় ও অনুচিত কাজ। মানবতা, প্রেম-প্রীতি ও ভালবাসাসুলভ ব্যবহার করা উচিত।

একবার সাহাবী হযরত আনজাশা রা. কারণবশত তার স্ত্রীকে প্রহার করলেন। এতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ক্রুদ্ধ হলেন, চেহারা মুবারক লাল হয়ে গেল এবং বললেন, হে আনজাশা! কাঁচের শিশিকে ভেঙ্গে ফেলা কোন বীরত্বের কাজ নয়। মহিলার উপর হাত উঠিয়েছ? যুদ্ধ করার ইচ্ছে থাকলে কোন প্রতিপক্ষের সাথে যুদ্ধ করে নিতে। তোমার শক্তি ও বীরত্ব প্রদর্শন যদি উদ্দেশ্য ছিল তবে নিজের সমকক্ষ কারো সাথে যুদ্ধ করে নিতে, স্ত্রীকে প্রহার করলে কেন? দুর্বল সমাজের প্রতি আঘাত করলে কেন? তোমার বীরত্ব দেখানোর জন্য কি? তোমার বীরত্ব প্রকাশ হবে, তুমি বীর মহাবীর সাব্যস্ত হবে এজন্য কি? স্ত্রীকে প্রহার করেছ এবং গর্বও করছ যে, আমি প্রহার করেছি। অন্য কোন বীরকে প্রহার করতে, কোন শক্তিশালী ব্যক্তির সাথে মোকাবিলা করতে, তাহলে তোমার এক আঘাতের প্রত্যুত্তরে সে চারটি আঘাত করত, তাতে বীরত্বের পরীক্ষা হয়ে যেত। নারীদের সাথে বীরত্ব দেখনো যে, আমি সাহসী, আমি বীর; এ হল নীচতা ও অসভ্যদের কাজ, এ কোন ভদ্রলোক ও ভদ্রতার কাজ নয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অসন্তুষ্ট হলেন, রাগান্বিত হলেন। তাঁর ব্যবহার তো এই ছিল– এক পাত্রে আহার করেছেন, দৌড় প্রতিযোগিতা করেছেন, যেন স্ত্রীর অন্তর আকৃষ্ট হয়, মন সন্তুষ্ট হয়, তার সাথে দয়া, বিনম্রতা ও মিষ্টি মধুর সম্পর্ক বজায় থাকে। আর হযরত আনজাশা রা. করলেন বিপরীত ব্যবহার, এতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অসন্তুষ্ট হলেন, রাগ করলেন, তাকে ধমকালেন।

এ দ্বারা বোঝা গেল, নবী আ.গণের উদ্দেশ্য হল, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ভদ্রতা ও ভালবাসার ব্যবহার হবে। এর কারণ হল এই, তারা যদি এরূপ ব্যবহারে অভ্যস্ত

হয়ে যায়, পারিবারিক জীবন শান্তিপূর্ণ হবে। পরিবারে যখন স্বামী-স্ত্রী একমন, একহৃদয় হয় তখন সন্তানদের মধ্যে মুহাব্বত পয়দা হবে, প্রিয়জনদের ও আত্মীয় স্বজনের মধ্যেও ভালবাসা সৃষ্টি হবে।

আর যে পরিবারে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ-কলহ হতে থাকে, একজন অন্যজনের মুখ দেখলে মনে হয় যেন তেঁতুল মুখে দিচ্ছে, তাহলে তার ফল দাঁড়ায় এই, সন্তানদের মধ্যেও এ গুণ সৃষ্টি হবে। এতে ঘরটি হয়ে উঠবে জাহান্নামতুল্য। স্বামীর চেহারা একদিকে আর স্ত্রীর চেহারা অন্য দিকে– এ কোন বাসগৃহ নয়, একটি দোযখ। জান্নাত তখনই হবে যখন একজনকে দেখে অন্যজন আনন্দিত হয়, খুশি হয়, মনে প্রশান্তি আসে।

উত্তম স্ত্রী মানুষের সৌভাগ্যের লক্ষণ

হাদীসে বলা হয়েছে, মানুষের সৌভাগ্যের লক্ষণ তিনটি। প্রথমত নিজ দেশে রিজিক (প্রয়োজনীয় সম্পদ) প্রাপ্তি, রিজিকের তালাশে দুনিয়া ব্যাপী যেন ঘুরে বেড়াতে না হয়। যেখানে আবাস, আল্লাহ সেখানেই রিজিকের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। এই হল সৌভাগ্যশীল হওয়ার প্রথম লক্ষণ।

দ্বিতীয় লক্ষণ প্রশস্ত বাসগৃহ। ছোট ঘর যেন না হয়, এতে মনও সংকীর্ণ হয়ে পড়ে। আঙিনা যেন প্রশস্ত হয়, গৃহখানা কিছুটা উন্নত হয়, প্রশস্ত সুন্দর গৃহে বাস করলে মনও প্রশস্ত হয়। গৃহের অপ্রশস্ততায় মন-মানসিকতাও আঁটসাঁট হয়ে পড়ে; অন্তর হয়ে যায় সংকীর্ণ। অতএব, ভাগ্যবান হওয়ার দ্বিতীয় লক্ষণ হল উন্নত ও প্রশস্ত বাসগৃহ।

তৃতীয় লক্ষণ হল সৎ স্বভাবের স্ত্রী প্রাপ্তি। তার চেহারা দর্শনে মন প্রফুল্ল হয়ে যায়, আনন্দি হয়ে যায়। যখন স্ত্রীকে বাড়িতে রেখে বাইরে কোথাও যায়, তখন স্বামীর মান-সম্মান, ইজ্জত-আবরু হেফাযত করে। এমন নেককার স্ত্রী, যে আল্লাহর হকও আদায় করে স্বামীর হকও আদায় করে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ঐ ব্যক্তি ভাগ্যবান যান নিকট এ তিনটি নেয়ামতই রয়েছে। এর মধ্যে নেক বখ্‌ত স্ত্রী সর্ববৃহৎ লক্ষণ। যখন তাকে দেখবে, অন্তর খুশিতে ভরে যাবে; যখন তার সাথে আলাপ-আলোচনা করবে, তার বুদ্ধিমত্তা দেখে আনন্দিত হবে। তাকে ঘরে রেখে যখন বাইরে যায়, তখন এতো নিশ্চিন্ত থাকে যে, আমার গৃহে কোন মন্দ আসতে পারবে না; আমার স্ত্রী বুদ্ধিমতী, ভাগ্যবতী। প্রকৃতই স্ত্রীর বুদ্ধিমত্তা, যোগ্যতা, তীক্ষ্ণ জ্ঞান, ভবিষ্যতের চিন্তা অত্যন্ত মূলবান নেয়ামাত এবং আনন্দের বিষয়, এতে অনেক আনন্দ লাভ হয়।

ইয়াহইয়া ইবনে আকসাম নাহু শাস্ত্রের (আরবী ব্যাকরণ) একজন ইমাম ছিলেন। তার ঘটনাবলির মধ্যে বর্ণিত রয়েছে, তিনি বিরাট আলেম ছিলেন, কিন্তু আকার আকৃতি ছিল নেহায়েত খারাপ ও কুৎসিত। রঙ কালো, ঠোঁট মোটা, চক্ষু হলদে, দাঁতও ছিল হলুদ রঙের। মোটকথা, কুৎসিত হওয়ার সকল উপকরণই তার মধ্যে ছিল, কিন্তু তার স্ত্রী ছিলেন অত্যন্ত সুন্দরী। পুরো এলাকার মধ্যে তার প্রতিদ্বন্দ্বী কেউ ছিল না। শোভা-সৌন্দর্যের যত উপকরণ হতে পারে সবই তার মধ্যে ছিল। যেন পূর্ণিমার চাঁদ। যখন স্বামী-স্ত্রী বসতেন মনে হত রৌদ্র এবং ছায়া। একদিকে রৌদ্র, আরেক দিকে অন্ধকার রাত্রি। যখন একত্রে বসতেন তখন ইয়াহইয়া স্ত্রীকে লক্ষ্য করে বলতেন, নিশ্চয়ই তুমিও জান্নাতী আমিও জান্নাতী। কেন? এজন্য যে, তোমার মত সুন্দরী স্ত্রী আমি পেয়েছি, যা পাওয়ার ছিল না, কাজেই আমি প্রতিটি মিনিট শোকর আদায় করছি, আমার কোন মিনিট শোকর বিহীন নয়, তাই শোকরগোজারী করে আমি জান্নাতে পৌঁছে যাব। আর তুমি আমার মত কুৎসিত স্বামী পেয়েছ, তোমার একটি মিনিটও সবর ও ধৈর্য হতে খালি নয়, কাজেই তুমিও সবরের পথ ধরে জান্নাতে পৌঁছে যাবে। আমিও জান্নাতী তুমিও জান্নাতী।

প্রকৃত কথা হল, স্ত্রী যদি নেককার হয়, সুশ্রী ও সুন্দরী হয় তবে স্বামী স্ত্রী উভয়ই ভাগ্যবান। একে অন্যকে দেখে খুশি হবে, আনন্দ পাবে। আর পরস্পর মমতা ও ভালবাসা হওয়াই উদ্দেশ্য।

স্ত্রী নির্বাচনের মাপকাঠি

এসব কথার সাথে সাথে এ বিষয়ও লক্ষণীয় যে, স্ত্রীর সাথে ভালবাসা যেন রূপ-লাবণ্যের কারণেই না হয়। রূপ-লাবণ্য হল চলমান রৌদ্র, আজকের রূপ-লাবণ্য কালকে চলে যাবে, বার্ধক্যের কারণে নষ্ট হয়ে যাবে। মাত্র তিনদিনের জ্বরে চেহারা বিকৃত হয়ে যায়। রং-রূপ-লাবণ্য, যৌবন নষ্ট হয়ে যায়। গোলাপের ন্যায় মনোরম রং শেষ হয়ে যায়। আর যদি জ্বর নাও হয় তবে বার্ধক্য কোথাও যায়নি, বার্ধক্য এসে রং রূপ লাবণ্য– সবই বিকৃত করে দেবে। যদি বার্ধক্যও না আসে তবে মৃত্যু কোথাও সফর করতে যায়নি, মৃত্যুই সবকিছু নষ্ট করে দেবে। রূপ-লাবণ্য অস্থায়ী ও সাময়িক জিনিস। এজন্য স্ত্রীর প্রতি প্রেম-প্রীতি ভালবসা যদি রূপের কারণে কেউ করে থাকে, তবে এ প্রেম নিঃশেষ হয়ে যাবে, হারিয়ে যাবে। এজন্য যে, যখন রূপ লাবণ্য নষ্ট হয়ে যাবে, ভালবাসাও নষ্ট হয়ে যাবে।

এজন্য কার সাথে কিভাবে ভালবাসা হবে, তার মাপকাঠি হাদীসে রাসূল

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন–

تنكح المرأة لأربع: لمالها ولنسبها ولجمالها ولدينها.

চারটি জিনিসের দিকে লক্ষ্য রেখে নারীগণকে বিবাহ করা হয়– তার সম্পদ, তার বংশ মর্যাদা, তার সৌন্দর্য এবং তার দীনদারি।

সাধারণভাবে বিবাহের সময় এ চারটি দিকের যে কোন একটিকে প্রাধান্য দিয়ে বিবাহ করা হয়। কখনো তার রূপ-লাবণ্য দেখে, যেহেতু সুন্দরী তাই একজনের মনে আগ্রহ সৃষ্টি হয়, বিবাহ করে নেয়। কখনো ধন-সম্পত্তি দেখে বিবাহ করা হয়, বিবাহ করলে অনেক সম্পত্তি হাতে এসে যাবে, আমিও বিত্তশালী হয়ে যাব। কখনো বংশ ও খান্দান দেখে বিবাহ করা হয়, উঁচু বংশের মেয়ে, তার মাতা-পিতা ও বংশের সুনাম ও সুখ্যাতি রয়েছে, এমন নারীকে বিয়ে করলে আমারও সম্মান বৃদ্ধি পাবে। আর কখনো দীনদারি ও ধার্মিকতার কারণে বিবাহ করা হয় যে, মেয়েটি অত্যন্ত ধর্মপরায়ন, ধর্মীয় মর্যাদা তাঁর শীর্ষে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন–

فاظفر بذات الدين.

রূপ-লাবণ্য দেখ না, বংশ মর্যাদা দেখ না, ধন-সম্পদ দেখ না, দীন ও ধর্মপরায়ণতা দেখ।

এজন্য যে, দীনদারি ও ধর্ম পরায়নতার কারণে যদি মুহাব্বত প্রতিষ্ঠিত হয়, তবে আজীবন তা অটুট থাকবে, এতে ভাটা দেখা দেয়ার কোন সম্ভাবনা থাকবে না। কিন্তু যদি মুহাব্বত ও ভালবাসা রূপ-লাবণ্যের কারণে হয়ে থাকে তবে যৌবনের সাথে সাথে ভালবাসাও হ্রাস পেতে শুরু করবে, পরস্পরে আরম্ভ হবে ঝগড়া কলহ। যদি ধন-সম্পদের কারণে বালবাসা হয়, তবে ধন-দৌলত-সম্পদের উপর রাতদিন বিপদ আসতে থাকে, দুর্ঘটনা ঘটতে থাকে। আল্লাহ না করুন, যদি সম্পত্তি নষ্ট হয়ে যায়, তবে সাথে সাথে ভালবাসা ও মমতায় দেখা দেবে বিদায়ের পালা, শুরু হবে নির্যাতন ও জুলুম-অত্যাচার। যখন ভালবাসার মূল কারণটিই বিদ্যমান নেই, তখন স্বাভাবিকভাবেই তাদের মধ্যে হৃদ্যতা থাকবে না। আর যদি সমাজিক মান-মর্যাদা, পভাব প্রতিপত্তির কারণে ভালবাসা ও মুহাব্বত হয়ে থাকে, তবে এসব হল সাময়িক জিনিস, কখনো আসে কখনো চলে যায়, কখনো মর্যাদার শীর্ষে আবার কখনো চরম অবমাননাকর অবস্থায়, কখনো প্রভাব প্রতিপত্তির উচ্চাসনে আবার কখনো ক্ষমতাহীন– প্রভাব প্রতিপত্তি

শূন্যের কোঠায়। তখনই আপনার ভালবাসাও নেমে যাবে শূন্যের কোঠায়। কিন্তু যদি মুহাব্বত ও ভালবাসা দীনের কারণে হয়, প্রেমের ভিত্তি থাকে ধর্মপরায়নতার উপর, তবে মনে করুন কালো কুৎসিতও যদি হয়, তবে স্বামী মনে করবে, আল্লাহ তাআলা আমার উপর এর হক ও অধিকার কায়েম করে দিয়েছেন। আমার দায়িত্ব ও কর্তব্য হল তার হক আদায় করা, অধিকার দিয়ে দেয়া। দীনের কারণে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক সদা বসন্ত, সর্বদা সজীব থাকবে। তাই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, বিবাহ কর দীনকে ভিত্তি করে, যেন তোমাদের ভালবাসা স্থায়ী হতে পারে। সর্বদা একে অন্যের হক সঠিকভাবে আদায় করে যেতে পার।

নবী আ.গণ-এর নিকট বিবাহ করা সুন্নত, কারণ বিবাহ পরস্পর মুহাব্বত, ভালবাসা ও একতার কারণ হয়ে থাকে। শয়তান বিবাহকে ঘৃণা করে, অপছন্দ করে, কারণ এর দ্বারা আন্তরিকভাবে একতা সৃষ্টি হয়ে যাবে, আর শয়তানের দল চায় সর্বক্ষণ যেন ঝগড়া ও কলহ হতে থাকে, বিভেদ বিচ্ছেদ সৃষ্টি হয়। এজন্য তারা বিবাহ চায় না, বিবাহের পথ কণ্টকাকীর্ণ করে দিতে সদা সচেষ্ট থাকে। বিবাহ তাদের অপছন্দনীয় বস্তু। তারা চায় মানুষ ব্যভিচারে লিপ্ত হোক। কারণ এসবের পরিণাম ঝগড়া-কলহ, অন্তরের ঘৃণা ও বিদ্বেষ, সর্বোপরি পেরেশানী ও বিষণ্নতা। এসবের কারণে মানুষ আল্লাহ হতে দূরে অনেক দূরে চলে যায়।

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার কলহ মহাফিৎনার পূর্বাভাষ

এ কারণেই হাদীসে বলা হয়েছে যে, শয়তান প্রত্যহ আসরের নামাযের পর সাগর পারে অথবা পানির উপর তার সিংহাসন পেতে বসে। পানির উপর সিংহাসন স্থাপন করে এজন্য যে, সে আল্লাহর সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে চায়। আল্লাহর আরশ রয়েছে পনির উপর, তাই আমিও আমার হিংহাসন বসাব পানির উপর। পার্থক্য হল এই, আল্লাহর আরশ পাক পবিত্র ও তরলতম পানির উপর প্রতিষ্ঠিত, আর এ পানি হল লবণাক্ত, তিতা ও গাঢ়। কোন কোন সময় এ দ্বারা অনেক কষ্ট ও দুর্গতি পোহাতে হয়। এ পানি হল জড়পদার্থ জাতীয় পানি। আর ঐ পানি হল রূহানী ও আধ্যাত্মিক জাতীয় বস্তু। কিন্তু শয়তান বাহ্যিক সাদৃশ্য গ্রহণ করে। আল্লাহ যদি আরশের উপর থাকেন তবে আমিও আরশ (সিংহাসন)-এর উপর রয়েছি। তাঁর আরশ যেমন পানির উপর, আমার আরশও পানির উপর রয়েছে, এ হল আল্লাহ তাআলার মোকাবিলা। হতভাগা এখানেও মোকাবিলা করছে। যদিও তার মোকাবিলা বাহ্যিক ও আকার আকৃতিগত, প্রকৃত

নয়। প্রত্যহ সাগরের উপর সিংহাসন স্থাপন করে এর উপর বসে। কেন বসে? তার সন্তান-সন্ততি ও ভক্তবৃন্দ সমস্ত দিনে মানুষ দ্বারা যেসব বদকারী ও অপকর্ম করিয়েছে, সকলেই উপস্থিত হয়ে এসবের রিপোর্ট প্রদান করে। একজন উপস্থিত হয়ে বলে, আমি অমুকের নামায কাযা করিয়ে দিয়েছি। তখন শয়তান বলে, কাজ ভালই করেছ কিন্তু এমন বিরাট কিছু করোনি যে তোমাকে পুরস্কৃত করা হবে, ধন্যবাদ দেয়া হবে। দ্বিতীয়জন এসে বলে, আমি অমুককে দিয়ে ব্যভিচার করিয়েছি। শয়তান বলে, ঠিক ও উপযুক্ত কাজ করেছ, কিন্তু এত বিরাট কিছু করনি। আরেকজন উপস্থিত হয়ে বলে, আমি অমুকের দ্বারা মিথ্যা কথা বলিয়েছি, মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করেছে। শয়তান বলে, তুমিও ভাল কাজ করেছ কিন্তু তেমন কিছু না। আরেকজন উপস্থিত হয়ে বলে আমি আজ স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ ও কলহ সৃষ্টি করে দিয়েছি। হাদীসে বলা হয়েছে, তখন শয়তান একে বুকের সাথে জড়িয়ে ধরে এবং বলে, তুমিই আমার সুসন্তান, তুমি বিরাট কাজ করেছ, তোমার প্রতি আমি সন্তুষ্ট ও আনন্দিত। তোমার চেয়ে উত্তম আমার অন্য কোন সন্তান নেই। তাকে জড়িয়ে ধরে ধন্যবাদ দেয়, আশীর্বাদ করে।

বাহ্যিক দৃষ্টিতে মনে হয় ব্যভিচারই সর্বনিকৃষ্ট কাজ, এর উপর ধন্যবাদ দেয়া উচিত ছিল, এতো স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়া বাধিয়ে দিয়েছে, এসব তো হয়েই থাকে। ঝগড়াও হয় সন্ধি-আপোষও হয়।

কিন্তু প্রকৃত পক্ষে সে আনন্দিত হয় কেন? এজন্য যে, স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়া-কলহ শুধু দুজনেরই কলহ নয়, বরং শতজনের কলহের নামান্তর। কেননা, যখন স্বামী-স্ত্রী ঝগড়া করবে তখন স্বামীর আপনজন সবাই তার পক্ষাবলম্বন করবে, তার সহায়তা করবে, আবার স্ত্রীর আত্মীয়-স্বজন সবাই তার সহায়তা করবে। এ লড়াই দু'জনের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি, বরং দু'পরিবারে, দু'গোত্রে ছড়িয়ে পড়বে। এখন দু'টি পরিবার ও গোত্র পরস্পর বিমুখ হয়ে যাবে। পরস্পর একে অন্যের মোকাবিলা ও প্রতিদ্বন্দ্বী হবে। তারপর প্রত্যেক পরিবারের মানুষ ভাগাভাগি হয়ে যাবে, অর্ধেক এদিকে অর্ধেক ঐদিকে। স্ত্রীর পরিবার পরিজন তার পক্ষে, স্বামীর পরবার পরিজন তার পক্ষে। কাজেই এ কলহ দু'ব্যক্তির নয়, দু'পরিবারের, দু'গোত্রের।

স্বামী-স্ত্রী উভয়ে যদি প্রভাবশালী হন যেমন, রাজা-রাণী বা শাদশাহ-বেগমের মধ্যে যদি লাড়াই হয়ে যায়, তবে তা দু'দেশের মধ্যেও হতে পারে। তখন উভয় দেশের সেনাবাহিনীকে অকাতরে প্রাণ বিসর্জন দিতে হয়। তখন এটা বিরাট যুদ্ধের রূপ ধারণ করবে। কাজেই এটা স্বামী-স্ত্রী দু'জনের লাড়াই নয়, বরং লক্ষ

লক্ষ মানুষের লড়াই ও যুদ্ধের পূর্বলক্ষণ। যখন স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে লড়াই হয়ে যায়, তারপর কী হয়? আরম্ভ হয়ে যায় মন্দ বলা। একে অন্যের মন্দ বলতে শুরু করবে, গীবত ও নিন্দাবাদে গুনাহ হতে থাকবে, একে অন্যের কষ্ট ও ক্ষতি সাধনের চেষ্টায় থাকবে ব্যস্ত, এ হল কষ্ট দেয়ার গুনাহ। তারপর আরম্ভ হবে মামলা-মোকদ্দমা, উভয় পক্ষ হবেন অসম্মানিত, উভয় পক্ষের অজস্র টাকা পয়সার হবে শ্রাদ্ধ, উভয়ে লাখ লাখ টাকা ব্যয় করবেন, সম্পত্তি নিঃশেষ হবে। একটি গুনাহের মধ্যে হাজারো গুনাহ নিহিত রয়েছে। যখন স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়া হবে তখন উভয় পক্ষ থেকে গীবত ও নিন্দা হতে থাকবে, পরিবাগুলোর সম্মানহানি হবে, গ্রামে ও শহরে সমালোচনার ঝড় বইবে। মানুষ বলবে, মিয়া দেখেছ; অমুক অমুক দু'জন বড়লোক হচ্ছিলেন, এখন কেমন জুতা পেটা হচ্ছে। দেখেছেন কেমন ঝগড়া বিবাদ হচ্ছে? মানুষ কেমন তুচ্ছতাচ্ছিল্য করবে। সমালোচনা ও নিন্দাবাদ করবে। কুখ্যাতি হবে, টাকা পয়সা ব্যয় হবে, সম্মানের হানি হবে, আত্মার শান্তি হবে বিদূরিত। স্বামী-স্ত্রীর কলহ-বিবাদ শুধু একটি গুনাহ নয়, বরং এর মধ্যে নিহিত রয়েচে শতসহস্র গুনাহ। এজন্যই শয়তান আনন্দিত হয়। এ দ্বারা ফিৎনা-ফাসাদ বিস্তার লাভ করে। শতসহস্র গুনাহের দ্বার উন্মুক্ত হয়। যদি কেউ মিথ্যা কথা বলে, তবে একটি গুনাহ হল। কিন্তু ঐ গুনাহে গীবতও রয়েছে, সম্মানহানিও রয়েছে, ধন সম্পদের ক্ষতি রয়েছে ইত্যাদি ইত্যাদি। শয়তানের অত্যন্ত আনন্দিত হওয়ার ব্যাপার নয় কি?

আম্বিয়ায়ে কেরাম আ. বিবাহ ভঙ্গের উপর অসন্তুষ্ট হন, রাগান্বিত হন। আর শয়তানগণ বিবাহ ভঙ্গ হয়ে গেলে অথবা দুর্বল হয়ে পড়লে আনন্দিত হয়, খুশি হয়। এজন্য যে, বিবাহ ভঙ্গ হলে ফিৎনা-ফাসাদ বিস্তার লাভ করবে। আর যদি বিবাহ বহাল থাকে তবে শান্তি, আমানতদারী ও বিশ্বস্ততা প্রসার লাভ করবে। নবী আ.গণ আমানত ও শান্তির বাহক আর শয়তান ফিৎনা-ফাসাদের বাহক। শয়তান ফিৎনা-সাফাদে খুশি ও আনন্দিত, নবী আ.গণ আমানতদারীর উপর সন্তুষ্ট ও আনন্দিত। নবী আ.গণের প্রিয় হল বিবাহ বহাল থাকা আর শয়তানের প্রিয় হল বিবাহ বিচ্ছেদ।

স্বামীর চরম আনুগত্য স্ত্রীর উপর ওয়াজিব

এজন্য স্বামীকে বলা হয়েছে যে, তুমি স্ত্রীর সাথে বিনম্র ও দয়াদ্র আচরণ কর আর স্ত্রীকে বলা হয়েছে, তুমি স্বামীর চরম আনুগত্য প্রদর্শন কর। হাদীসে বলা হয়েছে– স্বামী যদি কোন কাজের নির্দেশ দেয় এবং স্ত্রী তা অমান্য করে, তবে

যে দিন বা রাতে সে নির্দেশ অমান্য করল ঐ দিনে বা রাতে সমস্ত ফেরেশতা ঐ স্ত্রীর উপর লানত করতে থাকেন। এজন্য যে, সে স্বামীর অবাধ্য হয়েছে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমি যদি আল্লাহ তাআলা ব্যতীত অন্য কাউকে সিজদা করার আদেশ করতাম, তবে স্ত্রীগণকে আদেশ করতাম যে, নিজ স্বামীকে সিজদা কর। ইসলামী শরীয়ত স্ত্রীর জন্য স্বামীকে এতখানি সম্মানযোগ্য সাব্যস্ত করেছে যে, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে সিজদা করা যদি হারাম না হত, তবে স্ত্রীগণকে অনুমতি দিয়ে দিতেন স্বামীদেরকে সিজদা করার জন্য। বোঝা গেল, স্ত্রীর উপর স্বামীর চরম আনুগত্য করা কর্তব্য।

মনে করুন বিষয়টা যেন এমন যে, একজন হলেন প্রকৃত রব বা প্রতিপালক এবং তিনি হলেন আল্লাহ রব্বুল ইজ্জত, আর স্ত্রীর বেলায় তার স্বামীও রূপক অর্থে বর; যে তার তত্তাবধান ও ভরণ-পোষণ করে, পরিশ্রম করে উপার্জন, উপার্জিত সম্পদ স্ত্রীর হাতে তুলে দেয়। কাজেই স্ত্রীর বেলায় স্বামী যেন এক রূপক প্রতিপালক। এজন্যই স্ত্রীর কর্তব্য হল সে তার স্বামীর আনুগত্য করবে, যে স্বামী তার রূপক প্রতিপালক, যার উপর প্রকৃত প্রতিপালক আল্লাহর ছায়া রয়েছে।

এ কারণেও স্বামীর আনুগত্য করা আবশ্যক যে, বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর নারীদের উপর পিতা-মাতার কোন হক অবশিষ্ট থাকে না; শুধু এটুকু হক থাকে যে, তাদেরকে সম্মান ও শ্রদ্ধা করবে। কিন্তু স্বামীর বিপরীতে কোন কিছু আদেশ করার অধিকার পিতা-মাতার অবশিষ্ট থাকে না। নারী যখন স্বীয় পিতা-মাতার ঘর থেকে চলে এল এবং সে ঘর তার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল, পিতা-মাতার অধিকার শেষ হয়ে গেল, তখন সে স্বামীর দয়া ও অনুগ্রহের মধ্যে রয়েছে। যদি স্ত্রী আনুগত্য করে তবে স্বামীও দয়া ও অনুগ্রহ করবে; ঘর সংসার নিজের নিজের হয়ে যাবে। আর যদি সে ঝগড়া আরম্ভ করে দেয়, স্বামীও কঠোর ব্যবহার করতে শুরু করে তখন তার অবস্থা কেমন হবে? পিতা-মাতার ঘর তো আগেই বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে, সেখানে গিয়ে আশ্রয় নেয়ার আর সুযোগ নেই, এদিকে স্বামীকেও নারাজ করে তুলল। এখন সে না এখানের না ওখানের। সুতরাং বিবেক-বুদ্ধিরও দাবি হল এই যে, স্বামীর আনুগত্য করবে। অবাধ্য হলে তার জন্য না স্বামীর ঘর থাকবে, না পিতা-মাতার ঘর থাকবে। তো একদিকে স্ত্রীকে বলা হয়েছে তুমি চরম আনুগত্য কর, যদি তা না কর তবে ফেরেশতাগণ তোমার উপর অভিশাপ দিতে থাকবে। অপর দিকে স্বামীকে বলা হয়েছে, তুমিও পরম আদর-যত্ন, স্নেহ-মমতা কর, দয়া ও মেহেরবানী কর। তুমি যদি সামান্যতম ত্রুটি কর তবে কিয়ামতের দিন তোমার গর্দান অবনত করা হবে। তোমাকে জবাবদিহিতার মুখোমুখি করা হবে যে, আমি তোমাকে বাদশাহ

(ক্ষমতাবান) করেছিলাম তুমি অধিনস্তের সাথে জুলুম কেন করেছ? স্ত্রী তোমার অধিনস্ত ছিল, তোমার পোষ্য ছিল, তার উপর নিষ্ঠুরতা প্রদর্শন করার কি অধিকার তোমার ছিল?

তা ছাড়া এ মহিলাকে তোমার জন্য দাসী বানিয় দেয়া হয়নি যে, সে তোমার আজ্ঞাবহ চাকরানী হয়ে থাকবে। সে তো জীবনের সমঅংশীদার। তোমার যে হক ও অধিকার রয়েছে, তারও সেই হক ও অধিকার ছিল। সে কোন ক্রীতদাসী, কর্মচারী বা চাকরানী নয়। তাকে তুচ্ছ বা মর্যাদাহীন মনে করার কী অধিকার তোমার আছে? সুতরাং স্বামীকে বলা হল যে, তুমি তাকে পরম মর্যদা কর, অত্যন্ত মুহাব্বত কর, স্ত্রীকে বলা হল, চরম আনুগত্য কর। যখন এদিক থেকে ভালবাসা এবং ওদিক থেকে আনুগত্য থাকবে, তখন পারিবারিক জীবনের গাড়ি নির্বিঘ্নে চলতে থাকবে। আর যদি এদিক থেকে ভালবাসা এবং ওদিক থেকে আনুগত্য না থাকে তবে পরিবারের গাড়ি চলতে পারে না; পরিবার ধ্বংস হয়ে যায়। সন্তান হয়ে থাকলে তারাও ধ্বংস হয়ে যায়। আত্মীয়স্বজন ও মা বাবা সবাই পেরেশান হয়ে পড়ে। এজন্য বলা হয়েছে, উভয়ে মিলে সংসার পরিচালনা কর। যেমন গরুর গাড়ি হয়ে থাকে। সম্মুখে দু'টি ষাড় বেঁধে দেয়া হলে গাড়ি চলে, যদি একটি ষাঁড় জোয়াল ফেলে দেয় তবে গাড়ি চলবে না। তো পরিবার নামক গাড়িও চলতে পারে না যদি স্বামী-স্ত্রী ভালবাসা ও সৌজন্যতা বজায় রেখে না চলে। এরই জন্য শরীয়তের বিভিন্ন স্থানে তাকিদ করা হয়েছে।

স্বল্প ব্যয়ের বিয়েতে বরকত দেয়া হয় বেশি

কিন্তু এ সম্পর্কে একটি কথা স্মরণ রাখতে হবে, তা হল এই– উপরোক্ত অবস্থা তখনই হবে যখন বিয়েতে বরকত হবে। আল্লাহ না করুন, বিয়েতে যদি বরকত না হয়, তবে মন্দ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। বিয়েতে বরকত কখন হয়? বলা হয়েছে, যে বিয়েতে ব্যয় অল্প হবে সে বিয়েতে বরকত অধিক হবে। আর যে বিয়েতে খরচ অধিক হবে সে বিয়ে হতে বরকত উঠিয়ে নেয়া হবে। এজন্য যে, সাধারণত গর্ব-গৌরব প্রদর্শণার্থে অত্যধিক ব্যয় করা হয়। এই ভেবে যে, এতে করে স্বজনসমাজে নাক কাটা যাবে না (মর্যাদাহানি হবে না), আমি উচ্চমর্যাদাশীল বলে গণ্য হব। এ কারণে মানুষ নিজ সামর্থ্যের অধিক ব্যয় করে থাকে। আর এটা হল ভুল। কেননা, যাদেরকে স্বজনসামাজ বলা হয়, তারা সর্বাবস্থায় নাক কাটার চিন্তাতেই ব্যস্ত থাকে। মানুষ যতই ব্যয় করুক না কেন, নাক রক্ষা হয় না। এজন্য যে, এরা সর্বদা এই চিন্তায়ই থাকে যে, সামান্য ত্রুটি

পেলেই তা নিয়ে ঘাটাঘাটি করবে। কাজেই যাকে সম্মান বলা হয় তা কোন অবস্থায়ই থাকছে না। সুতরাং সম্পদও গেল, নাকও গেল, উপকার কী হল?

কোন এক মহাজন তার মেয়েকে বিয়ে দিল। সে এ চিন্তা করল যে, আমি এত বেশি খরচ করব যা পৃথিবীতে আজ পর্যন্ত কেউ করেনি। যেন দুনিয়াতে আমার সুনাম হয়। সে একহাজার বরযাত্রীকে দাওয়াত করল; চল্লিশ-পঞ্চাশ প্রকারের খাবার তৈরি করল, কামরাগুলো খাবারে ভর্তি হয়ে গেল। প্রত্যেক মেহমানের জন্য বিছানা-বালিশ ইত্যাদি সর্বপ্রকার সাজ-সরঞ্জামের ব্যবস্থা করল। বিদায়কালে প্রত্যেক মেহমানকে উপহারস্বরূপ দশটি করে স্বর্ণমুদ্রা ও দশটি করে পাউন্ড দিল, যা এপর্যন্ত কেউ দেয়নি। উদ্দেশ্য ছিল এই যে, আমার সুনাম ছড়িয়ে পড়বে, লোকজন বলাবলি করবে যে, মহাজন অত্যন্ত আড়ম্বরপূর্ণ বিয়ে দিয়েছে। এসব করার পর যখন বরযাত্রীগণ বিদায় নিলেন তখন লাখো টাকার আসবাবপত্র মেয়েকে দিল। মহাজন এক মাইল পথ সামনে চলে গেল এবং একটি জঙ্গলে আত্মগোপন করে রইল। এ আশায় যে, মানুষ আমার প্রশংসা করতে করতে যাবে। বলবে, মহাজন বিরাট কাজ করেছে, তার মেয়েকে লাখ লাখ টাকার যৌতুক দিয়েছে। এসব শুনে আমার প্রাণ জুড়াবে। এজন্য বরযাত্রীদেরকে বিদায় দিয়ে ঘোড়ায় চড়ে অন্যপথ দিয়ে এক মাইল সম্মুখে গিয়ে যে পথে বরযাত্রী যাবে সে পথের পাশে এক জঙ্গলে আত্মগোপন করে রইল। ভাবল, লোকজন আমার প্রশংসা করতে করতে যাবে, শুনে আমার মন জুড়িয়ে যাবে, আমার শ্রম সার্থক হবে। আমি সম্পদ নষ্ট করেছি, তাতো গেছেই, মন অন্তত শান্তি পাক।

বরযাত্রীগণ যখন সে স্থানে পৌঁছল তখন ঘটনাক্রমে ঐ রাস্তাটি অসমতল ছিল এবং অনেক মাটি জমা হয়ে গিয়েছিল। এ অবস্থায় গাড়িগুলো দুর্ঘটনায় পতিত হওয়ার আশংকা ছিল। অধিকন্তু মানুষও পড়ে যেতে পারে। তাই সিদ্ধান্ত হল, মাটি কেটে রাস্তা ঠিক কর, তারপর গাড়ি পার কর। উঁচু মাটি কেটে রাস্তার পাশে ফেলে দাও। মাটি কাটার জন্য কোদালের তালাশ আরম্ভ হল। তাদের সাথে কোদাল ছিল না। তাছাড়া কার জানা ছিল যে, তাদেরকে রাস্তায় মাটি কাটতে হবে? যদি জানতেন তাহলে না হয় কোদাল সাথে রাখতেন। তখন তারা বলাবলি করতে লাগল, তালাশ কর, যৌতুকের মধ্যে থাকতে পারে। তালাশ করা হল, কিন্তু কোদাল পাওয়া গেল না। তখন লোকজন বলতে শুরু করল, পাজিটা কিই-বা দিয়েছে? একটি কোদাল পর্যন্ত দেয়নি। মহাজন একথা শুনে উঠে পড়ল এবং বলতে লাগল, অভিশাপ এই বরযাত্রীর উপর, অভিশাপ এই অধিক ব্যয়ের উপর। সকল সম্পদ নষ্ট করলাম, তারপরও আমি পাজিতে

পরিণত হলাম! যা কিছু দিয়েছিলাম সবই মূল্যহীন হয়ে পড়ল।

সুতরাং যাকে নাক (সম্মান) বলা হয়, আত্মীয়স্বজনের কেউই সে নাককে থাকতে দেয় না; তারা নাক কাটতেই থাকে। তথাপি মানুষ কি অকারণে নিজের সর্বস্ব নষ্ট করবে এবং নাকও কাটাবে? যথাস্থানে মধ্যমপন্থা অনুযায়ী খরচ করবে। মেয়েকে দিতে চাইলে সমস্ত জীবনেই দিতে পারবে। কী এমন প্রয়োজন যে আজকেই দিতে হবে? আজ যা দেয়া হচ্ছে তা সুনাম লাভের জন্যই দেয়া হচ্ছে। এ ক্ষেত্রে মেয়েকে দান করা মুখ্য উদ্দেশ্য না; মুখ্য উদ্দেশ্য হয় সুনাম ও সুখ্যাতি। শরীয়ত বলে যে, যদি কিছু দিতে চাও মেয়েকে দাও, নাক রক্ষার্থে কিছুই দিও না। নাক তো থাকবে না, কাটা যাবে। মেয়েকে যদি দান করতে হয় তবে সারা জীবন করতে পারবে, কিন্তু তাও নিজের অবস্থার সাথে সামঞ্জস্য রক্ষা করে মধ্যমভাবে কর। যদি একটিই মেয়ে হয়ে থাকে তবে না হয় অনেক কিছু দিয়ে দিলে, কিন্তু যদি অন্য মেয়েও থাকে তবে অন্যান্য সন্তানেরও হক রয়েছে। এমন সুখ্যাতি লাভের জন্য এক মেয়েকে দান করে ঘর সংসার সবই নষ্ট করে দিলে আগামীতে অন্য মেয়ের যখন বিয়ে হবে তখন হাতে কিছুই থাকবে না। তখন সবাই বলবে, লোকটি অত্যন্ত বেওকুফ। প্রথম মেয়ের বিয়েতে সবই ব্যয় করে দিয়েছে, অন্যরা কি বৈপিত্রেয় সন্তান, তার নিজের সন্তান নয় কি? এদের জন্য কিছুই করল না? তখন নাক রক্ষা হলেও এবার কিন্তু কাটা যাবে। এজন্যই সম্পদ খরচ করার সময় ইনসাফের সাথে করতে হবে। হাদীসে বলা হয়েছে, ঐ বিয়েতে বরকত দান করা হয় যে বিয়েতে খরচ হয় অল্প এবং যে বিয়েতে অধিক খরচ করা হয় তা থেকে বরকত উঠিয়ে নেয়া হয়, অথবা হ্রাস করে দেয়া হয়।

লেনদেনের মধ্যে বিবাহ সর্বাধিক সহজ বিষয়

বরকতহীনতার ভিত্তি হল এই যে, অত্যধিক ব্যয় গর্বের জন্য করা হয়, সুনাম ও লোকদেখানোর জন্য করা হয়। এগুলোই হল সর্বনাশের কারণ। নতুবা মুয়ামালাত বা লেনদেনের মধ্যে বিয়েকে আল্লাহ তাআলা সর্বাধিক সহজ করে দিয়েছেন, কিন্তু একে আমরা সর্বাধিক কঠিন বানিয়ে রেখেছি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে বিয়ে কেমন সহজ ও সাধাসিধা ছিল দেখুন– হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রা. অত্যন্ত মর্যাদাবান সাহাবী ছিলেন। এমনই মর্যাদাবান ছিলেন যে, কখনো কখনো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সফরে যাত্রাকালে তাঁকে তাঁর নায়েব বা স্থলাভিষিক্ত বানিয়ে যেতেন। এমনই ছিল তাঁর মর্যাদাগত অবস্থান। যে দশজন সাহাবীকে রাসূল সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুনিয়াতে বসে (একত্রে) জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছিলেন সেই 'আশারায়ে মুবাশশারা'র একজন ছিলেন তিনি। তো পৃথিবীতেই তিনি ছিলেন জান্নাতী। এমনই মর্যাদাবান ছিলেন তিনি। একদিন তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মজলিসে উপস্থিত হলেন, তাঁর চেহারা ও পোশাকে হলুদ রং ছিল। ঐ যুগে বিয়ে উপলক্ষে জাফরান দ্বারা বিশেষ ধরণের এক আতর তৈরি করে ব্যবহার করা হত এবং এতে কাপড়ে হলুদাভ দাগও লেগে যেত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আবদুর রহমান! ব্যাপার কী? হলুদ রং কিসের?

আরয করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি বিয়ে করেছি এবং সে উপলক্ষ্যে সুগন্ধি লাগিয়েছিলাম। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, কুমারী না বিধবা? তিনি আরয করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! বিধবা। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, কেন? আরয করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার প্রথম স্ত্রী মারা গিয়েছেন, তাঁর কিছু সন্তান রয়েছে, কুমারী বিয়ে করলে এদের লালন-পালন করতে সক্ষম হত না। বিধবা মহিলা এদের যত্ন ও লালন-পালন করতে পারবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বরকতের দুআ করলেন।

লক্ষ্য করুন, আবদুর রহমান ইবনে আউফ রা.-এর চেয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অধিক আশিক আর কে হতে পারে? একজন উচ্চ মর্যাদাশীল সাহাবী, যার দুনিয়া ও আখিরাত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ভালবাসার মধ্যেই নিহিত রয়েছে। ঈমানের অর্থই হল মুহাব্বত। তো হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ রা.-এর মত সত্যিকারের আশিক এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মত কামিল মাহবুব, অথচ বিয়ে করেছেন কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দাওয়াত পর্যন্ত করেননি। আর আমাদের এখানের বিয়েতে যে পর্যন্ত লোকজনের সমাবেশ না হয়, আত্মীয়-স্বজন ও জ্ঞাতি-গোষ্ঠীর সকল মাথা একত্রিত না হয়, সে পর্যন্ত কিছুই হবে না। এ হল নাকের মসিবত, যেন এটা কাটা না পড়ে। চাই ঘরে কিছু থাক বা না থাক, কিন্তু নাক রক্ষার্থে সবাইকে জমা করতে হবে। আর সেখানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পর্যন্ত দাওয়াত দেননি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও খারাপ মনে করেননি। একথাও বলেননি, তুমি তো আমাকে দাওয়াতই করলে না। কোন অভিযোগ নেই। বোঝা গেল, বিয়ের মত সরল-সহজ জিনিস ইসলামে আর কিছু ছিল না। বিয়ে করছেন আর রাসূল

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খবর পর্যন্ত পাচ্ছেন না। বোঝা গেল, বাড়িতে বসে বিয়ে করে নিয়েছেন। এতই সহজ জিনিস ছিল।

বিয়েতে নগণ্য দু'টি খরচ রয়েছে

বিয়ের প্রধান ব্যয় মাত্র দু'টি। একটি হল মোহরের খরচ, অন্যটি ওলিমার খরচ। স্বামীর দায়িত্ব এতটুকু– মোহর আদায় করবে আর ওলিমা করবে। আর ওলিমাও এত সহজ যে, ওলিমা সম্পর্কে বলা হয়েছে– أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ অর্থাৎ যদি বেশি সামর্থ্য না থাকে তবে একটি বকরী জবাই করে খানা খাইয়ে দাও। বকরীও যদি না থাকে তবে হাতে যা আছে তাই দিয়ে খাইয়ে দাও।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে হযরত উম্মে হাবীবা রা.-এর বিয়ে হল। ওলিমা করা মত ঘরে কিছুই ছিল না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘরে বসা ছিলেন, ভাবছিলেন কী খাওয়াবেন। ঘরে তো অভাব ও উপবাস চলছে। এ সময় এক ব্যক্তি হাদিয়া স্বরূপ কিছু খেজুর নিয়ে এলেন। অন্য একজন এক মশক শরবত নিয়ে এলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খেজুরের দানা বের করে মশকের ভেতর ঢেলে দিলেন। তারপর বের করে চামড়ার তৈরি দস্তারখানায় রাখলেন এবং উপস্থিত ব্যক্তিদেরকে বললেন, খাও, এ হল আমাদের ওলিমা। এখানে বকরী জবাই করতে হয়নি, কাছে যা ছিল খাইয়ে দিলেন, ওলিমা হয়ে গেল। বিয়েতে এক ব্যয় ছিল এই, যা অত্যন্ত সহজ সরল। আরেক ব্যয় হল মোহর। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যদি কারো নিকট দশটি দিরহাম থাকে তবে বিয়ে হয়ে যাবে। দশ দিরহামের মূল্য ভারতীয় আড়াই রূপি। তো দশ দিরহাম হলেই শরীয়তের বিধি অনুযায়ী বিয়ে হতে পারে।

বিয়েতে অত্যধিক ব্যয়ের পরিণতি

বিয়ে-শাদীতে মানুষ এই যে নিজ সামর্থ্যের অধিক ব্যয় করে থাকে, তাতে বিয়ে তো হয়ে যায় এবং কমবেশি ধন্যবাদও পেয়ে থাকে, কিন্তু পরিণাম ফল দাঁড়ায় এই– সংসারের বরবাদ হয়ে যায়।

আমাদেরই প্রিয়জনদের মধ্যে মরহুম শায়খ জাফর হুসাইন ছিলেন বিরাট জমিদার। তাদের আলিশান বাসভবন এখনো দেওবন্দে দাঁড়িয়ে আছে। মনে হয় শাহী দুর্গ। হাতি প্রবেশ করার জন্য বিরাট বিরাট দরজা এবং অন্যান্য বড়

বড় জিনিস রয়েছে। তিনি তাঁর বড় ছেলেকে বিয়ে করালেন। ওলিমা যখন করলেন তখন শুধু দেওবন্দই নয় বরং আশেপাশে যত গ্রাম ছিল সবাইকে দাওয়াত করলেন। হাজারো গ্রামবাসী। এরপর এক বেলা নয় বরং এক সপ্তাহ ব্যাপী চললো দাওয়াত। পূর্ণ সাত দিন অর্থাৎ চৌদ্দ বেলা খাবার খাওয়ালেন।

একথাও ঘোষণা করে দেয়া হল যে, গ্রামবাসীদের আসতে কষ্ট হবে। কেউ দশ মাইল দূর থেকে আসবে, কেউ বিশ মাইল দূর থেকে আসবে। তাই খাবার পাক করে গ্রামে গ্রামে পৌঁছিয়ে দেয়া হবে এবং বণ্টন করে দেয়া হবে। এক সপ্তাহ পর্যন্ত গ্রামে গ্রামে খানা পৌঁছতে থাকল। অত্যন্ত সুনাম হল। দুনিয়াতে সম্ভবত এমন ওলিমা আর কেউ করেনি। দুনিয়ার মানুষ এক বেলার ওলিমা করেন, তিনি চৌদ্দ বেলার ওলিমা খাওয়ালেন। তবে ফল হল এই, বিয়ে তো হয়ে গেছে কিন্তু আজ গিয়ে দেখুন, তার সন্তানগণ ভিক্ষা করে জীবিকা নির্বাহ করছেন (আল্লাহ হেফাযত করুন)। কেউ আল্লাহর ওয়াস্তে কিছু দিলে খাচ্ছেন, না দিলে না খেয়ে থাকছেন। এমন বিয়ে দ্বারা কী লাভ? এ খানা 'আবাদী' খানা নয়, এতো 'বরবাদী' খানা।

বিবাহের শুভফল কখন প্রকাশ পায়

আমি এ কথা আরজ করছিলাম যে, শুভ ফলাফল তখনই লাভ হয়, যখন বিবাহের বরকত হয়। আর বরকত তখনই হয় যখন ব্যয় অল্প হয়। এজন্য সময়ের প্রচলন অনুযায়ী মোহর সাব্যস্ত কর। বিশেষ ধরনের মোহর তালাশ করা, যৌতুকের জন্য সীমার বাইরে অত্যধিক ব্যয় করা– এসবই ভুল। মুসলমানদের বিষয় সম্পত্তি এসব কাজেই ধ্বংস হয়েছে। হয়ত আনন্দ উৎসবের রুসুম পালনে নয়ত শোকের রুসুম পালনে।

ব্যক্তি মারা যাওয়ার পর সে তো চলে যায়, এরপর শুরু হয় আত্মীয়স্বজনকে খাওয়ানোর পালা। তিনদিনে খাওয়ানো হচ্ছে, দশদিনে পৃথকভাবে খাওয়ানো হচ্ছে, চল্লিশা হচ্ছে, বার্ষিকী হচ্ছে। যদি সামর্থ্য না থাকে তবে ঋণ করেও এসব করছে। এসব নাজায়িয কাজেই মুসলমানদের বিষয় সম্পত্তি ধ্বংস হয়েছে, রাষ্ট্র হাতছাড়া হয়েছে। বিবাহ অনুষ্ঠান অথবা শোকপ্রকাশের ব্যয় নির্বাহের রুসুম রক্ষা করতে গিয়ে মুসলমানগণ বরবাদ হয়েছেন। কিন্তু এখনো তাদের হুশ হয়নি, এসব করেই চলছেন।

যাক, আমি আরয করছিলাম বিবাহের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হল পারস্পরিক মিল মুহাব্বত ও শান্তি। ভালসাবা তখনই প্রতিফলিত হবে যখন বিবাহে হবে বরকত,

আর বিবাহ বরকতময় তখনই হয়, যখন তাতে খরচ কম করা হয়। সুনাম-সুখ্যাতি ও গর্ব-গৌরবের আবেগ হতে অন্তর মুক্ত থাকে। দায়িত্ব সম্পাদন হয় লক্ষ্য হয়ে থাকে। অর্থাৎ সন্তানের দায়িত্ব রয়েছে, আল্লাহর আদেশ পালনের দায়িত্ব রয়েছে এগুলো আদায় করছি। এ ক্ষেত্রে লক্ষ্য থাকে দ্বীনি। স্বামীর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য থাকবে এই– আমি পাত্রীকে তার ধর্মপরায়ণতার কারণে বিয়ে করছি, সে সুশ্রী হোক বা কুৎসিত হোক, দীনদারির কারণে তার সাথে সম্পর্ক স্থাপন করব। আমার উপর তার হক রয়েছে, আমৃত্যু তা আদায় করতে হবে। সে সম্পদশালী হোক বা সম্পদহীন হোক, তার হক আদায় করা আমার দায়িত্ব। আল্লাহ তাআলা যখন তাকে আমার অংশীদার সাব্যস্ত করেছেন তখন দায়িত্ব আদায়ের প্রতি আমাকে লক্ষ্য থাকবে। যখন আল্লাহ আমাকে আদেশ করেছেন যে, তার সাথে স্নেহ-ভালবাসার সম্পর্ক স্থাপন কর, তখন আমার উপর কর্তব্য হল স্ত্রীর অন্তরকে আমার মুঠোয় রাখব, তাকে আদর যত্ন করব, তার সাথে উত্তম আচরণ করব। তাহলে এ বিয়েতে এমন বরকত হবে যে, সন্তানে বরকত হবে, বাড়ি-ঘরে বরকত হবে, লেনদেনেও বরকত হবে।

এদিকে স্ত্রীর কর্তব্য হল এই– সে মনে করবে যে, আমার উপর স্বামীর অধিকার অর্পিত হয়েছে। সে সুশ্রী বা কুৎসিত যাই হোক, আমার কর্তব্য হল তার হক আদায় করে যাওয়া। আমার জন্য তো তাকে রূপক প্রতিপালক (ভরণ পোষণের দায়িত্বশীল) নির্ধারণ করা হয়েছে। হোক না সে অত্যন্ত কুৎসিত, কিন্তু আমার জন্য তো সে মাথার তাজ। আমার দায়িত্ব ও বতর্তব্য হবে তার হকগুলো আদায় করে যাওয়া। এ জাতীয় আগ্রহ-আবেগ যদি উভয়পক্ষে বিদমান থাকে তবে আজীবন হক আদায় হতে থাকবে। ঘরটি হয়ে যাবে জান্নাততুল্য। আর যদি অস্থায়ী জিনিসগুলোকে বিবাহের ভিত্তি ও লক্ষ্য সাব্যস্ত করা হয়, যেমন ধন-সম্পদ, মান-সম্মান, প্রভাব প্রতিপত্তি এসব হল ক্ষণিকের বস্তু। আসে আবার চলে যায়। এগুলোকে যদি ভিত্তি করা হয়, লক্ষ্য যদি এগুলোই হয়, তবে ভালবাসাও হবে অস্থায়ী ও সাময়িক। কিছু দিন পর শেষ হয়ে যাবে। কাজেই বিবাহের প্রকৃত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হবে আল্লাহর এই বাণী–

لِتَسْكُنُوْا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً.

> এজন্যই তিনি তোমাদের মধ্য হতে তোমাদের জন্য পত্নীগণকে সৃষ্টি করেছেন যে, তার নিকট গিয়ে তোমরা যেন শান্তি ও সান্ত্বনা লাভ করতে পার। আর তোমাদের মধ্যে সৃষ্টি করে দিয়েছেন পারস্পরিক সম্প্রীতি ও দয়া। [রূম : ২১]

বিবাহের আহকাম

বিবাহের এ উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য স্থির করা হয়েছে এবং এ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের অধীন এমন কিছু আহকাম (আদেশ-নিষেধ) রাখা হয়েছে যা দ্বারা ভালবাসা ও আন্ত রিকতা সৃষ্টি হবে। কোন কোন সময় এমনও হয় যে, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ক্ষণিকের জন্য ঝগড়াও হয়ে যায়। ফেরেশতা নন, মানুষই তো, কাজেই এসবে ক্ষতি নেই। কখনো কখনো স্বামী অসন্তুষ্ট হয়ে যায়, বকাঝকা দেয়, আর স্ত্রী চুপ থাকে। কখনো স্ত্রী অসন্তুষ্ট হয়ে যায়, সেও অভিমান করে, সেও স্বামীকে দু'চার কথা শুনিয়ে দেয়। পরিবারে এমনই হয়। যেহেতু মানুষ, তাই এমন কিছু হবেই। এ ক্ষেত্রে এই হিদায়াত করা হয়েছে যে, এমতাবস্থায় হিকমতের সাথে কাজ করতে হবে।

হাদীসে ইরশাদ করা হয়েছে যে, নারীদেরকে বাম পাঁজর হতে সৃষ্টি করা হয়েছে। হযরত আদম আ.-এর বাম পাঁজর-এর সর্বনিম্ন হাড় যা অধিক বাঁকা– এ থেকেই সৃষ্টি করা হয়েছে। তাদের স্বভাবে বক্রতা রয়েছে, তবে অল্প। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, এদেরকে সম্পূর্ণ এ অবস্থায় ছেড়ে দিও না, তাহলে আরো অধিক বাঁকা হয়ে যাবে। আর সম্পূর্ণ সোজা করে নেয়ার চিন্ত াও কর না, তাহলে ভেঙ্গে যাবে। কাজেই এভাবে ছেড়েও দিওনা আবার সম্পূর্ণ সরল সোজা করার চেষ্টাও কর না। কিছুটা কোমলতা, কিছুটা কঠোরতা, কিছুটা সোহাগ, কিছুটা শাসন, কিছুটা ভালবাসা, কিছুটা বুঝানো উভয়বিধ বিষয় থাকা উচিত।

درستی ونرمی بہم دوبہ است

কঠোরতা ও বিনম্রতার সমন্বিত রূপই উত্তম বলা হয়েছে। সম্পূর্ণ স্বাধীন ছেড়ে দিও না তাহলে আরো বাঁকা হয়ে যাবে, আর এত কঠোরও হয়ো না, ভেঙ্গে যাবে। মধ্যমপন্থা অবলম্বন কর।

এজন্যই কুরআন মাজিদে সহ্য ও ধৈর্যের ব্যবহার করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে–

فَالصّٰلِحٰتُ قٰنِتٰتٌ حٰفِظٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّٰهُ.

সৎকর্মশীল স্ত্রীলোকগণ হয়ে থাকে অনুগতা এবং আল্লাহ যা হেফাযতযোগ্য করে দিয়েছেন লোকচক্ষুর অন্তরালেও তার হেফাযত করে। [নিসা :৩৪]

নেককার স্ত্রী কে? নেককার নারী কে? তারাই যারা সালেহা, অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার ইবাদতগুজার। যারা তাদের নামায-রোযা এবং দীনদারী ও আমানতদারীতে সদা সচেষ্ট, তারাই সালেহা। তোষামদমূলক কথাবার্তা ও বাকচাতুর্যের অধিকারীগণ সালেহা নয়, হক আদায়কারীগণ সালেহা। حٰفِظٰتٌ لِّلْغَيْبِ 'যারা গায়বের হিফাযত করে তারা সৎকর্মশীল'– গায়বের দ্বারা উদ্দেশ্য হল স্বামীর গোপন রহস্যাবলি ও বিষয়াবলি। এগুলো তারা কারো নিকট প্রকাশ করে না।

স্বামীর অমর্যাদা করার পরিণাম

কিছু কিছু মহিলার এ অভ্যাস রয়েছে, যখন কোন স্থানে একত্রি হয় তখন একজন বলে তোমার স্বামী এমন মন্দ, অন্যজন বলে তোমার স্বামীও তেমন মন্দ। দিবারাত্র এসব দোষারোপে ব্যস্ত। আমার যেসব বোনেরা এ আলোচনা শুনছেন, তারাও মনোযোগের সাথে শুনে রাখুন। আমি যেমন স্বামীদেরকে বলেছি যে, তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য হল স্ত্রীদেরকে স্নেহ-মমতা করবে, ভালবাসবে, তাদের হক আদায় করবে, এই করবে সেই করবে। স্ত্রীদের উপরও তাদের কিছু হক রয়েছে। তাদের মধ্যেও কিছুটা বক্রতা রয়েছে, তারাও নিজেদের সংশোধন করবে, স্বামীর অধিকার রক্ষা করবে।

হাদীসে বলা হয়েছে, ঈদের দিন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মহিলাদের উদ্দেশ্যে নসিহত করলেন। পুরুষগণ একদিকে ছিলেন, মহিলাগণ অন্য দিকে ছিলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাশরীফ আনলেন এবং মহিলাগণের সমাবেশকে লক্ষ্য করে বললেন:

تصدقن يا معشر النساء، فإني اريتكن اكثر اهل النار.

হে নারী সমাজ! তোমরা অধিক পরিমাণে সদকা প্রদান কর। এজন্য যে, জাহান্নামে আমি অধিক পরিমাণে মহিলাদেরকে দেখেছি।

সদকা প্রদান করলে বিপদাপদ দূর হবে। অন্য হাদীসে রয়েছে–

الصدقة تطفئ غضب الرب كما يطفئ الماء النار.

সদকা এভাবে আল্লাহর গজবকে মিটিয়ে দেয় যেভাবে পানি আগুনকে নির্বাপিত করে।

তাই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, অধিক পরিমাণে সদকা কর, আমি জাহান্নামে নারীদেরকে অধিক দেখছি। হাদীসে রয়েছে, তখন একজন মহিলা দাঁড়ালেন, তার আকৃতিও বর্ণিত হয়েছে– রং কালো ছিল, ঠোঁট মোট ছিল, সম্ভবত হাবশী নারী হবেন– বলতে লাগলেন, لم يا رسول الله؟ হে আল্লাহর রাসূল! আমরা অধিক হারে জাহান্নামে যাব, এর কারণ কী? এর অর্থ হল এই যে, দুনিয়াতেও আমরাই চুলা ফুঁকছি, এখানেও আগুন ওখানেও আগুন। উভয় জগতে আমাদের মুসিবত, এমন হল কেন?

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার কারণ বললেন, এ কারণটি আমার বোনদের শোনা দরকার এবং অন্তরে বদ্ধমূল করে নেয়া দরকার। এজন্য যে, তারা অথবা পুরুষরা আমাকে এ চেয়ারে বসিয়েছেন। এ চেয়ার হল চিকিৎসকের চেয়ার, যিনি আত্মার চিকিৎসা করেন। চিকিৎসক রোগ-ব্যাধিগুলো খুঁজে খুঁজে বের করেন– এ হল তোমার তোমার সমস্যা, এ হল তোমার রোগ, যেন চিকিৎসা করা যায়। ঐ চিকিৎসক অত্যন্ত খেয়ানতকারী বিবেচিত হবে, যে প্রশংসাসূচক কথাবার্তা বলে চলে গেল, রোগ-ব্যাধিকে প্রকাশ করল না। সে চিকিৎসক নয়, সে চিকিৎসা করতে পারবে না। এজন্য আমার যে সকল বোন উপস্থিত রয়েছেন তারা খারাপ মনে করবেন না। যাই হোক, মূল কথা বলে দেই, যেন চিকিৎসার প্রতি মনোযোগী হতে পারেন। আর এগুলো আমার কথাও নয়; এসব তো আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আমি নকল করছি মাত্র। এজন্য আমাকে মন্দ বলার দরকার নেই। আমি হলাম উদ্ধৃতিকারী। শরীয়তের আদেশ পৌঁছিয়ে দিচ্ছি। এখন আপনারা ভালমন্দ যাই বলেন। ঐ মহিলা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করল, আমাদের জন্য আগুনই কেন? এখানেও আগুন, ওখানেও আগুন। আমাদের ভাগ্যে আগুনই রয়ে গেল কেন? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দু'টি কারণ বললেন–

تكثرون اللعن وتكفرون العشير.

তোমরা অধিক তিরস্কারকারী এবং স্বামীর প্রতি অধিক অকৃতজ্ঞ।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমাদের মধ্যে দু'টি ব্যাধি রয়েছে, একটি হল: تكثرون اللعن অর্থাৎ তোমরা অধিক পরিমাণে অভিশাপ ও তিরস্কার করে থাক। কোন মজলিসে মহিলাগণ সমবেত হলে তিরস্কার ও বিদ্রূপের পালা শুরু হয়ে যায়। নাম বিকৃতি ও নানারূপ সমালোচনা– তোমার

অলঙ্কার ভাল না, আমারটা ভাল; এর চেহারা ভাল ও সুন্দর নয়, আমার চেহারা ভাল; ওর পোশাক ভাল নয়, আমার পোশাক ভাল ও উন্নত। রাজ্যের কথা তাদের মজলিসে আলোচিত হবে কিন্তু তা অমুকে মন্দ এবং আমি ভাল– এর মধ্যে সীমিত থাকবে। আমার আকার-আকৃতি ভাল; আমা রূপ-লাবণ্য উন্নত, আমার অলঙ্কারের মান উন্নত। মোটকথা, যে ভাষায়ই তারা ব্যক্ত করুক না কেন তার মূল কথা দাঁড়াবে এই যে, বড়ত্ব ও মাহাত্ম্য আমার, আর সকল মন্দ অন্যের। এ হল বিদ্রূপ ও ভর্ৎসনা। যার অভ্যাস তোমাদের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে রয়েছে। অন্যকে বিদ্রূপ করা হল মূর্খের কাজ। কেননা তার মধ্যে অজ্ঞতার আধিক্য থাকে বলে অন্যকে তিরস্কার করে। নিজের দোষগুলো দৃষ্টিগোচর হলে অন্যকে তিরস্কার করার সাহস হয় না। নিজের অবস্থা মানুষের কাছে বিবেচ্য হয়, অন্যেরটা হয় না। অজ্ঞতার কারণে নিজের দোষগুলো যখন দৃষ্টিগোচর হয় না তখন অন্যেরটা চোখে পড়ে। চোখের সামনে আয়না আছে বলে চেহারা তো সুন্দর দেখাচ্ছে, কিন্তু অন্তরকে দেখার কোন আয়না নেই যে, তা দ্বারা অন্তরের অবস্থা অবলোকন করবে। এজন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এক দোষ হল তোমাদের এই– তোমরা অধিক পরিমাণে বিদ্রূপ ও তিরস্কার করে থাক, এ হল তোমাদের একটি ব্যাধি।

দ্বিতীয়ত বললেন: وتكفرون العشير অর্থাৎ স্বামীর কদর না করা এবং নেয়ামতের অকৃতজ্ঞতা তোমাদের মধ্যে বেশি। এসব কথা আমি বলছি না, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমি তা উদ্ধৃত করছি মাত্র। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বয়ং বলেছেন– একজন স্বামী জীবনভর সদাচরণ করল, অলংকার চাইলে তাও এনে দিল, কিন্তু যখন স্বামীর সাথে ঝগড়া বেধে যায় তখন কী বলবে? এই বলবে– ما رأيت منك خيرا قطّ 'তোমার কাছে কখনোই আমি ভাল কিছু দেখিনি'। সর্বদা মসিবতেই রয়েছি। স্বামী যা কিছু করেছিল সেসবের উপর পানি ঢেলে দিল। সারা জীবন সে যে উত্তম আচরণ করেছে তা এক বাক্যে শেষ করে দিল– আমি এ ঘরে কখনেই ভাল কিছু দেখিনি। পালকিতে চড়ে এসেছিলাম আর খাটে শুয়ে বেরিয়ে যাব। আর মধ্যবর্তী সময়ে আমার ভাগ্যে রয়েছিল এসব মসিবত। এ হল অকৃতজ্ঞতার অবস্থা। দরিদ্র স্বামী নিশ্চুপ শুনছে। আমি মাথার ঘাম পায়ে ফেলে তার ফরমায়েশী জিনিস যোগাড় করে দিয়েছি, আর সে এসবের মূল্য প্রদান করল এই, কৃতজ্ঞতা স্বীকার কলল এই বলে– আমি এ ঘরে এসে জীবনে কোন সুখ-শান্তি পেলাম না। এখন ঐ গরীব যদি উত্তর দিতে চায়, তবে কি উত্তর দিবে? নিরবে বেরিয়ে যাবে অথবা রাগ করবে। তারপর শুরু হবে ঝগড়াঝাটি। সবর করা ব্যতীত কোন উপায়

থাকে না, এ মহিলার সাথে কে লাড়াই করবে? গরীব স্বামী বের হয়ে যায়।

আমাদের মরহুম মাওলানা আবদুর রব সাহেব নারীদের মানসিকতাকে ফুটিয়ে তোলার জন্য খুব সুন্দর কথা বলেছেন। বলেছেন– স্বামী যদি স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করে, ঘরে তোমার কি কাপড়চোপড় কিছু আছে? তবে উত্তর দিবে, দু'চারটি যা নিয়ে এসেছিলাম, পুরানো ও ছেঁড়া পড়ে রয়েছে। আমার জন্য কি পোশাক তৈরি করে দিয়েছিলেন? যদি জিজ্ঞেস করেন তোমার জুতা আছে? তবে উত্তর দিবে, যে জুতা পরে এসেছিলাম, সে দু'টি ছিঁড়া গিয়ে ঘরে পড়ে আছে, তুমি কি আমাকে জুতা এনে দিয়েছিলে? যদি জিজ্ঞেস করেন, ঘরে থালাবাটি কিছু কি আছে? কিছু উঠিয়ে রেখেছিলাম তাই কয়েকটি আছে। বাপের বাড়ি হতে অনেক এনেছিলাম, সেগুলো দ্বারাই কাজ চলছে, তুমি কি দিয়েছিলে? এভাবে গরীবের অর্জনের উপর পানি ঢেলে দিল। সে পরিশ্রম করেছে, সারা জীবন উপার্জন করে দিয়েছে, তার মূল্যায়ন হল– চারটি ছেঁড়া কাপড়, দু'টি ছেঁড়া জুতা, দু'চারটি বাসন-কোসন। এই হল তার মূল্যায়ন। স্বামীদের অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করাই তোমাদের অভ্যাস। এজন্যই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

تكثرون اللعن وتكفرون العشير.

তারা এত অকৃতজ্ঞ যে, সমস্ত জীবনের ইহসানকে দু'শব্দে পরিশোধ করে দেয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের অধিক পরিমাণে দোজখে যাওয়ার এ হল দ্বিতীয় কারণ। এর ওষুধ হল অধিক পরিমাণে সদকা দেয়া, যেন আল্লাহর গজব ঠাণ্ডা হয়ে যায়। যেহেতু বিদ্রূপ ও ভর্ৎসনার কারণে আল্লাহর গজব উত্তেজিত হয়ে পড়ে। অকৃতজ্ঞতার কারণে আল্লাহর গজব উত্তেজিত হয়, সদকা করলে তা ঠাণ্ডা হবে। দান-সদকার মাধ্যমে অসহায় দরিদ্রদের যত সাহায্য করবে, সে অনুপাতে তোমাদের মধ্যকার মন্দ স্বভাবের প্রায়শ্চিত্ত হবে। এ কথা শোনার পর উক্ত নারী রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কথা মেনে নিলেন।

মহিলারা যেন পুরুষদেরকে পরিচালনা না করে

এ হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ কথাও বলে দিয়েছেন যে, তোমারা কি ত্রুটিপূর্ণ বিবেকবুদ্ধির অধিকারী নও? এ কথা শুনে ঐ মহিলা দাঁড়িয়ে বলেছিলেন, আমাদের কী ত্রুটি রয়েছে? নিজেকে যেন সে মাহাজ্ঞানী– প্লেটো ও এরিস্টেটল জ্ঞান করত, আমিই সর্বাধিক বুদ্ধিমান। আর কোন মহিলা এ দাবিও করে থাকেন যে, পুরুষদের কি বুদ্ধি রয়েছে, বুদ্ধি হল আমাদের

মধ্যে। আর তাদের একথা এক পর্যায়ে সঠিকও বটে। হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

ما رايت من ناقصات عقل ودين اذهب للبّ الرجل الحازم من احداكن.

মহিলাগণ ত্রুটিপূর্ণ বুদ্ধি বিবেচনার অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান-বুদ্ধির অধিকারী পুরুষদের বিবেক-বুদ্ধিকে ছিনে নেয় এবং তাদেরকে পাগল বানিয়ে ছাড়ে।

এমন উত্তেজনাপূর্ণ মধুর আলাপ জুড়ে দিবে যে, পূর্ণাঙ্গ বুদ্ধিমান ব্যক্তি বোকা বনে যাবে, যা তারা বলবে, তাই করতে হবে। যেমন কোন প্রচলন বা রুসুম পালনকারী পুরুষকে যদি বলা হয়, ভাই তুমি বুদ্ধিমান হয়ে একি করছ? তিনি উত্তর দিবেন, মহিলাদেরকে মানানো যাচ্ছে না, তাই করছি। যেন মহিলারাই নির্দেশদাতা কর্তা, তাদের নিকট থেকেই অর্ডার আসছে আর পুরুষ সম্প্রদায় তাদের মুখাপেক্ষী ও গোলাম, নির্দেশ পালন করা তার অবশ্য কর্তব্য, তাই এমন জবাব দিচ্ছে।

সুতরাং তাদের দাবি এক পর্যায়ে সঠিকও বটে যে– আমরাই বুদ্ধিমান। যখন বুদ্ধিমানদেরকে বোকা বানিয়ে ছেড়ে দেয়ার শক্তি তাদের রয়েছে, তখন এর চেয়ে অধিক বুদ্ধিমত্তা আর কী হতে পারে?

কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তাদের দীন ত্রুটিপূর্ণ, বিবেক ত্রুটিপূর্ণ। এ কথা শুনে জনৈক মহিলা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের দীনের ত্রুটি কী? এবং আমাদের বুদ্ধির ত্রুটি কী?

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, প্রতি মাসে বিশ দিন নামায পড় এবং দশ দিন ঘুমিয়ে কাটাও। এত দিন না নামায, না রোযা। এগুলো দীন হতে বঞ্চিত থাকা নয় কি? এটাই দীনের ত্রুটি। আর বুদ্ধির ত্রুটি হল এই, যদি আদালতে সাক্ষ্য প্রদান করতে হয় তবে দু'জন মহিলাকে একজন পুরুষের সমান গণ্য করা হয়। যেন একজন মহিলা অর্ধ পুরুষের সমান; বোঝা গেল বুদ্ধিও অর্ধেক।

আর প্রকৃত বিষয় হল এই, নারীগণ সৃষ্টিগতভাবেই পুরুষ অপেক্ষা দুর্বল। যেমন তাদের বাহ্যিক শক্তি কম, তদ্রূপ তাদের অভ্যন্তরীণ শক্তিও কম (বুঝ ও বিবেক-বুদ্ধি প্রভৃতি)। কিন্তু ভাই! এ বলছি সামগ্রিকভাবে নারী জাতির কথা। নতুবা এমন বুদ্ধিমতি ও জ্ঞানী মহিলাও হতে পারেন (এবং হয়েছেনও) যে, হাজার

হাজার পুরুষও তার বুদ্ধি বিবেচনার মোকাবিলা করতে পারবে না। এ হল ব্যক্তি বিশেষের কথা, আর ঐ কথা ছিল জাতিগতভাবে মহিলা জাতির জন্য প্রযোজ্য। জাতি হিসেবে পুরুষ জাতি সবল, আর নারী জাতি দুর্বল। এখন ঘটনাক্রমে যদি কোন নারী পাহলোয়ান হয়ে যায়, হতে পারে। সেটা হবে ব্যক্তি পর্যায়ের ব্যাপার। কিন্তু তাতে জাতির মধ্যে কোন তারতম্য হবে না, জাতি হিসেবে তারা যথাস্থানেই থাকবে।

যেমন আমাদের ভারতে হামিদা বানু নামের এক মুষ্টিযোদ্ধা রয়েছে। বড় বড় বীরদের সে পরাজিত করেছে। তার দাবি হল, আমাকে কেউ পরাজিত করতে পারবে না। প্রত্যেক মুষ্টিযুদ্ধে সে বিজয়ী হয়। এ ক্ষেত্রে তার এই বীরত্ব ব্যক্তি পর্যায়ের বিষয় বলে বিবেচিত হবে এবং তার জাতি (নারী জাতি) দুর্বলই বিবেচ্য হবে; ত্রুটিপূর্ণ বুদ্ধি-বিবেচনার অধিকারী বলে গণ্য হবে। ঘটনাক্রমে এমন কিছু নারীও অতিবাহিত হয়েছেন যারা রাজ্য পরিচালনা করেছেন। পুরুষদের বুদ্ধি-শক্তি এত প্রখর ও তীক্ষ্ণ ছিল না, যা ছিল তাদের মধ্যে। কিন্তু এসব হল ব্যক্তি পর্যায়ের বিষয়, সাধারণ অবস্থার বাইরের ব্যতিক্রমধর্মী ঘটনা। ব্যক্তিগতভাবে তারা জ্ঞানী, কবি, সাহিত্যিক, মুহাদ্দিস, মুফাসসির প্রভৃতি হয়েছেন। কিন্তু জাতি সর্বদা ত্রুটিপূর্ণই রয়েছে। এজন্য হাদীসে বলা হয়েছে–

لن يفلح قوم ولوا امرهم امرأةً

যে জাতি তাদের রাজ্য পরিচালনার দায়িত্ব কোন মহিলার হাতে অর্পণ করেছে তারা কখনো সফলকাম হতে পারবে না।

অর্থাৎ তার বিবেক বুদ্ধির উপর ছেড়ে দিয়েছে। তখন সে পূর্ণ দেশ ও জাতিকে ডুবিয়ে দেবে। সে তার বুদ্ধি অনুযায়ী পরিচালিত হবে। পুরুষের তুলনায় মহিলাদের বিবেক-বুদ্ধি দুর্বল, অসম্পূর্ণ। যদি ঘটনাক্রমে কোন মহিলা পরম বুদ্ধিমতি হয়ে যায় তবে তা হবে বিশেষ ব্যক্তির ব্যাপার, সমাজ ও জাতির নয়। যেমন পুরুষের জাত ও সমাজ বুদ্ধিমান; কিন্তু তাদের মধ্যেও এমনসব বোকা ও আহম্মক থাকে যে, এর চেয়ে অধিক বোকা হতে পারে না। কারো কারো বিবেক-বুদ্ধি গর্দভের চেয়েও কম থাকে এমন পুরুষও পাওয়া যায়। তথাপি এ কথা বলা যাবে না যে, পুরুষ সমাজ নির্বোধ। পুরুষজাতি বুদ্ধিমান, মহিলা জাতি স্বল্প বুদ্ধির অধিকারী। ব্যক্তি বিশেষের জন্য ব্যতিক্রম হতে পারে। মোটকথা, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের বুদ্ধির ত্রুটি রয়েছে; দীনের ত্রুটি রয়েছে। এজন্যই তোমাদের কর্তব্য যে, পুরুষদের হিদায়াত অনুযায়ী জীবন অতিবাহিত কর। তাদেরকে তোমাদের হিদায়াত অনুযায়ী

পরিচালিত করো না। যদি সে তোমাদের নির্দেশিত পথে ও মতে পরিচালিত হয় তবে স্বামী যেমন ডুবে যাবে, পূর্ণ পরিবারও তদ্রূপ ডুবে যাবে।

স্ত্রীর উপর স্বামী কিভাবে দয়াশীল হতে পারে

যাই হোক, আমি কয়েকটি কথা আপনাদের সামনে আরয করলাম। একটি হল এই যে, বিবাহের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কী? তাহল এই– পারস্পরিক প্রশান্তি ও ভালবাসা। বংশ বিস্তার নিজে নিজেই হতে থাকবে। আমি আরেকটি বিষয় আলোচনা করেছি যে, বিবাহের আহকাম কী? আহকাম হল এই– পুরুষের উপর স্নেহ-ভালবাসা ওয়াজিব, আর নারীর উপর আনুগত্য করা ওয়াজিব। স্বামীর কাজ হল নিজে স্ত্রীর সাথে দয়া ও মেহেরবানীর ব্যবহার করবে। স্ত্রীর কাজ হল পরিপূর্ণ আনুগত্য করবে; নিজের মতের বিরুদ্ধে হলেও স্বামীর কথা মেনে নেয়ার অভ্যাস করবে। এমন যেন না হয় যে, নিজ মর্জির খেলাফ স্বামীর কোন কথা হয়ে গেলে নাক ছিটকাবে, প্রত্যুত্তরে দু'চাররটি কথা বলে দিবে। এতে অপ্রীতিকর অবস্থা সৃষ্টি হয়ে যাবে। বাস্তব অবস্থা হল এই, পরিবারের গাড়ি সুচারুরূপে তখনই চলমান থাকতে পারে, যখন স্ত্রী স্বামীর অনুগত হয়ে যাবে এবং স্বামী হয়ে যাবে অনুগত। কিন্তু অনুগত কখন হবে? যখন স্ত্রীর প্রতি পরম প্রীতি ও ভালবাসার ব্যবহার করবে। আনুগত্য আনুগত্যকে আকর্ষণ করে। অবাধ্যতা ও ঔদ্ধত্য দেখালে স্বামীর অন্তরেও বিদ্বেষ ও ঘৃণার সৃষ্টি হবে। কোন মহিলা যদি কামনা করে যে, আমার স্বামী আমার আজ্ঞাবহ হয়ে যাক, কৃতদাস হয়ে যাক। তবে প্রথমে তুমি নিজে আজ্ঞাবহ কৃতদাসী হয়ে যাও, তারপর বাধ্য হয়ে সে কৃতদাস হয়ে যাবে। অন্যকে দাসে পরিণত করতে হলে প্রথমে নিজে দাস হয়ে যেতে হয়। প্রথমে তুমি কার্যক্রমের মাধ্যমে দাসী হয়ে দেখিয়ে দাও, স্বামী আপনাআপনি দাসে পরিণত হবে। আনুগত্যেই রয়েছে প্রকৃত শান্তি। যতই স্বামীর আনুগত্য করা হবে সে অনুপাতে স্বামীও অনুগত হবে। কাজেই স্ত্রীর কর্তব্য ও দায়িত্ব হল সর্বক্ষণ এই চিন্তায় থাকবে যে, কী কী জিনিসে আমার স্বামী অসন্তুষ্ট হন, আমি সেসব করব না। যে সকল কাজে তিনি সন্তুষ্ট হন, আমি ইচ্ছাকৃতভাবে সেসব কাজ করতে থাকব, যেন তার অন্তর সন্তুষ্ট ও আনন্দিত থাকে। স্বামী যে পরিমাণ আমার প্রতি রাজী ও সন্তুষ্ট থাকবে, সে অনুপাতে দয়া ও মেহেরবানী করবে; আমার পরিবার শান্ত পরিবেশে সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে চলতে থাকবে। আর স্বামীর কর্তব্য হল এই– সে লক্ষ্য করবে স্ত্রীর মান-মানসিকতা কিরূপ, কী কী জিনিসে সে আনন্দিত হয়, এসব সে করবে। স্ত্রীকে খুশি ও আনন্দিত রাখার জন্য তার বাসনা পূর্ণ করে দেয়া কোন বড় কথা নয়। তারও

এতা কিছু হক রয়েছে, অধিকার রয়েছে। সে তোমার গৃহে আসে, সেও কিছু ইৎসাহ-উদ্দীপনা, আশা-আকাঙ্ক্ষা, আবেগ-আগ্রহ নিয়ে আসে। স্বামী যদি এসবের প্রতি লক্ষ্য না করে তবে কি গ্রামবাসী লক্ষ্য করবে? এসব হল স্বামীর দায়িত্ব। উভয়পক্ষ থেকে যখন এসব হবে, তখন পরিবারের গাড়ি সঠিকভাবে চালু থাকবে। এছাড়া প্রশান্তি ও ভালবাসা এবং পারস্পরিক হৃদ্যতা তৈরি হবে।

স্ত্রীর অবাধ্যতার প্রতি শাসনের স্তরসমূহ

এ অবস্থায় হঠাৎ যদি কোন অনাকাঙ্খিত মতবিরোধ দেখা দেয়, তবে উভয়ের সহ্য ও ধৈর্যধারণ করা উচত। এমন যেন না হয় যে, নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়ে। এ বিষয়ে কুরআন মাজিদ পথ নির্দেশ করেছে; বলা হয়েছে–

فَالصّٰلِحٰتُ قٰنِتٰتٌ حٰفِظٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّٰهُ.

সৎকর্মশীল স্ত্রীলোকগণ হয়ে থাকে অনুগতা এবং আল্লাহ যা হেফাযতযোগ্য করে দিয়েছেন লোকচক্ষুর অন্তরালেও তার হেফাযত করে। [নিসা : ৩৪]

নেককার কারা? যারা 'কানিতাত' বা অনুগত এবং ইবাদত গুজার। এজন্য যে, যারা আল্লাহর হক আদায় করে তারা স্বামীর হকও আদায় করতে পারে। যারা আল্লাহ তাআলার অবাধ্য, তারা কারো অনুগত হতে পারে না। এরপর আল্লাহ তাআলা বলেন– لِّلْغَيْبِ حٰفِظٰتٌ 'তারা গায়েবের হিফাযত করে'। স্বামীর গোপনীয় বিষয়াদি ও রহস্যাবলিকে সংরক্ষণ করে। কোন কোন তাফসীরকারক লিখেছেন, 'গায়েব' দ্বারা উদ্দেশ্য হল স্বামীর ধন-সম্পদের হেফাজত করে। তারা মনে করে যে, আমি এ ঘরের দায়িত্বশীল-সংরক্ষক। যদি স্বামী বাইরে যায় তবে এসব আমার দায়িত্বে থাকবে, আমি পূর্ণাঙ্গভাবে সংরক্ষণ করব। তারপর আল্লাহ বলেন–

وَالّٰتِيْ تَخَافُوْنَ نُشُوْزَهُنَّ فَعِظُوْهُنَّ

আর যাদের মধ্যে অবাধ্যতার আশঙ্কা কর তাদের সদুপদেশ দাও। [নিসা : ৩৪]

যেসব মহিলাদের সম্পর্কে তোমাদের আশংকা হয় যে, এরা অবাধ্য হবে; এরা উগ্র স্বভাবের। সম্ভাবনা আছে যে, কলহ-বিবাদ শুরু করে দেবে এবং প্রতিপক্ষ

হয়ে দাঁড়াবে। সে সম্পর্কেও পথ-নির্দেশ দিয়েছেন– তুমি এ মনে করো না, স্ত্রীর ক্রোধ বেড়ে গিয়েছে, তাই তুমিও দু'চারবার তাকে অসন্তুষ্ট করে দিলে। বলা হয়েছে, যে স্ত্রী অবাধ্য হয়ে যাওয়ার আশংকা থাকে, স্ত্রী রাগান্বিত হয়ে পড়েছে, কিছু কথাও বলছে, প্রলাপও করছে এবং আশংকা দেখা দিয়েছে যে, দুর্ঘনা ঘটে সবকিছু এলোমেলো হয়ে যেতে পারে; তবে প্রাথমিক কাজ এ নয় যে, তাকে গালমন্দ করে ঘর থেকে বের করে দেয়া; বরং فَعِظُوْهُنَّ 'তাকে উপদেশ দাও'। এবং এ কথাও বল, ভদ্রলোকের মেয়েদের এ রীতি ও নিয়ম নয়, ভদ্র পরিবারের স্ত্রীদের কর্তব্য হল ভদ্রতা রক্ষা করে চলবে। এভাবে স্নেহ মমতার সাথে প্রবোধ দিলে ভদ্র স্বভাবের মহিলা হলে সাথে সাথে তার হৃদয় গলে যাবে। রাগ স্তিমিত হয়ে পড়বে। চার শব্দের উপদেশ ফলপ্রসূ হয়ে যাবে। ঝগড়া-ফাসাদ দূর হয়ে গিয়ে ঘরটি জান্নাতে পরিণত হবে।

কিন্তু কেউ যদি এমনই নির্বোধ হয় যে, উপদেশে তার কোনই কাজ হয় না, তখনও এ কথা বলা হয়নি যে, তাকে পৃথক করে দাও, অথবা (আল্লাহ না করুন) তালাক দিয়ে দাও। না তা বলা হয়নি, বরং বলা হয়েছে, উপদেশ যদি কার্যকর না হয় তবে ওষুধ হল এই–

وَاهْجُرُوْهُنَّ فِى الْمَضَاجِعِ

তার শয্যা পৃথক করে দাও। [নিসা : ৩৪]

তাকে এক থাকতে দিয়ে তুমি পুরুষদের ঘরে ঘুমাতে শুরু কর। যে সম্ভ্রান্ত পরিবারের কন্যা, যার স্বভাবে সহনশীলতা রয়েছে, সে বুঝতে পারবে স্বামীর মন মেজাজ পাল্টে যাচ্ছে; তাকে সন্তুষ্ট করার জন্য চেষ্টা করা কর্তব্য; তিনি তো ঘর ছেড়ে দিয়েছেন, অন্যত্র রাত্রিযাপন করছেন; এখন ঘরে আসছেন না। এমন যেন না হয় যে, আমার প্রতি সম্পূর্ণভাবে অসন্তুষ্ট হয়ে যান। তবে পরিবারটি ধ্বংস হয়ে যাবে। তখনই সালাম ও পয়গাম পাঠানো শুরু হয়ে যাবে; লোক পাঠিয়ে খবর দেবে– ঘরে আসুন; একটু কথাবার্তা বলুন। তখন দু'জনের মধ্যে যে দূরত্ব তৈরি হয়েছিল তা আর থাকবে না।

তো প্রথম স্তর হল এই যে, উপদেশ দেবে, যদি উপদেশ গ্রহণ না করে তবে ঘরে একা রেখে অন্যত্র রাত্রিযাপন করবে। একটি রাতও অতিবাহিত হবে না, মাথা ঠিক হয়ে যাবে।

কিন্তু কেউ যদি এতই নির্বোধ হয় যে, উপদেশও কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি, শয্যা ত্যাগেরও কোন প্রভাব পড়েনি বরং সে বলে গৃহত্যাগ করে অন্যত্র

রাত্রিযাপনে আমার কিছুই হবে না। আবার ফিরে আসবে। দু'দিন পরেই আসবে, চারদিন পরেই ফিরবে, বোকামী বুঝতে পেরে ফিরে আসবে। এমন নির্বোধ সম্পর্কে বলা হয়েছে–

وَاضْرِبُوْهُنَّ.

তাদেরকে প্রহার কর।

কিছুটা সতর্ক করা, কিছুটা প্রহার করাও এ অবস্থায় জায়িয। কিন্তু শরীয়ত প্রহারের নিয়ম পদ্ধতিও বলে দিয়েছে। এ নয় যে, লাঠি নিয়ে তার পিছনে লেগে যাও, হাত পা ভেঙ্গে ফেল।

ইমাম শাফেয়ী রহ. প্রহার করার এই ব্যাখ্যা করেছেন যে, তার ওড়না পাকিয়ে এ দ্বারা দু'চারটি আঘাত কর। এ দ্বারা একথা প্রকাশ করা তোমার উদ্দেশ্য যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে আমাকে এ ক্ষমতা ও অধিকার প্রদান করা হয়েছে; মারা উদ্দেশ্য নয়। থাপ্পড় মারবে না, লাঠি দ্বারা প্রহার করবে না। ওড়না দ্বারা দু'চারটি আঘাত করবে, কষ্ট দেয়া উদ্দেশ্য নয়। স্ত্রী তখন বুঝে নেবে, তার স্বামী এ কাজও করতে জানে। কাল যদি সে হাতের কাছে লাঠি পেয়ে যায় তবে কি অবস্থা হবে? এতে করে সে ভয় পাবে। কিন্তু এ হল ঐ মেধাহীন বোকার ওষুধ যার উপর উপদেশ কোন ক্রিয়া করেনি, শয্যা ত্যাগেও সতর্ক হয়নি, এমন বিকৃত মস্তিষ্কের চিকিৎসা তো এরূপই হতে পারে। এতসব সত্ত্বেও তাকে ত্যাগ করা বা বিবাহ বিচ্ছেদ করার অনুমতি দেয়া হয়নি। তারপর বলা হয়েছে–

فَاِنْ اَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوْا عَلَيْهِنَّ سَبِيْلاً.

যদি তাতে তারা বাধ্য হয়ে যায়, তবে আর তাদের জন্য অন্য কোন পথ অনুসন্ধান কর না। [নিসা : ৩৪]

কিন্তু যদি কোন মহিলা এমনই নির্বোধ হয় যে, না উপদেশ কোন ক্রিয়া করে; না স্বামী তাকে ছেড়ে অন্যত্র চলে যাওয়ার কোন প্রভাব তার মধ্যে পড়ে; না ওড়নার প্রহারে সতর্ক হয়। তাহলে বোঝা যাবে যে, সে চরম আহাম্মক। তার অন্তরে শত্রুতা ও বক্রতা ভর্তি রয়েছে এবং তার মস্তিষ্ক বিকৃত। তার জন্য এখন চতুর্থ চিকিৎসার ব্যবস্থা রয়েছে। এ কথা বলেনি যে, একে এখন বিবাহ বন্ধন থেকে ছিন্ন করে দাও, এ অনুমতি এখনও দেয়া হয়নি। চিকিৎসা হল, সালিস বৈঠকের ব্যবস্থা কর। একজন সালিস হবে স্ত্রীর পক্ষের, একজন হবে স্বামীর পক্ষের, দু'জন সালিস নিজ নিজ পক্ষের অভিযোগ উত্থাপন করবে। স্ত্রীর সালিস বলবে, স্ত্রীর এই এই অভিযোগ রয়েছে, স্বামীর সালিস বলবে স্বামীর এই অভিযোগ

রয়েছে। আল্লাহ বলেন–

وَاِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوْا حَكَمًا مِّنْ اَهْلِه وَحَكَمًا مِّنْ اَهْلِهَا ۚ اِنْ يُّرِيْدَا اِصْلَاحًا يُّوَفِّقِ اللّٰهُ بَيْنَهُمَا ۗ.

যদি তাদের মধ্যে সম্পর্কচ্ছেদ হওয়ার মত পরিস্থিতিরই আশঙ্কা কর, তবে স্বামীর পরিবার থেকে একজন এবং স্ত্রীর পরিবার থেকে একজন সালিস নিযুক্ত করবে। তারা উভয়ের মীমাংসা চাইলে আল্লাহ তাআলা অবশ্যই সংশোধন ও সুরাহা করে দিবেন। [নিসা : ৩৫]

উভয় সালিস যদি নেক নিয়তে আলাপ-আলোচনা করেন, তবে আল্লাহ অবশ্যই ফয়সালা করে দেবেন। তাদের অন্তর পরিষ্কার করে দিবেন। যে মনোমালিন্য তৈরি হয়েছিল তা দূরীভূত হয়ে যাবে।

প্রয়োজনে তালাক প্রদানের পদ্ধতি

যদি পরিস্থিতি এমনই জটিল রূপ ধারণ করে যে, উপদেশ, শয্যাবর্জন এবং প্রহারও ফলপ্রসু না হয়, সালিসগণও কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণে অকৃতকার্য হন; তবে স্পষ্ট হয়ে গেল যে, উভয়ের স্বভাব বিরোপূর্ণ। একত্রে বাস সম্ভব নয়, সারা জীবন এদের অমিল থাকবে, ঝগড়া-কলহ হতে থাকবে। এখন অনুমতি দেয়া হল– এত দীর্ঘ পথ অতিক্রম করার পর; এখন তালাক দিতে পার। কিন্তু তালাক প্রদানেও যেমন আমি আরয করেছি– দু'টি পদ্ধতি রয়েছে; একটি হল সুন্নত, অপরটি হল বিদআত। তালাকে বিদআত হল নিষিদ্ধ। আর সুন্নত তরিকা হল এই– এক তালাক দাও, যেন ইদ্দতের মধ্যে রুজু (প্রত্যাহার) করার অধিকার থাকে। যদি একসাথে তিন তালাক প্রদান কর এবং হয়ে যায়, তবে একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল, ক্ষমতা হাতছাড়া হয়ে যাবে, পরে হয়ত আক্ষেপ করতে পার যে, এমন ঝগড়া তো হয়েই থাকে; কেন আমি আমার স্ত্রীকে তালাক দিয়েছি! তারপর আক্ষেপ করে নিরবে অশ্রু বিসর্জন দিবে। এ জন্য বলা হয়েছে, যদি তালাক প্রদানে বাধ্য হয়ে যাও এবং তালাক দিতেই হয়, তবে সুন্নত তরিকায় তালাক দাও। এক তালাক দাও, তারপর উদ্দত অতিবাহিত হোক। ইদ্দতের মধ্যে বিনা বিবাহে রুজু করতে পারবে, তালাক প্রদানের পর অন্তরে অনুশোচনা হতে পারে। নিজের ভুল ধরা পড়তে পারে যে, আমি তালাক দিয়ে ভুল করেছি, বিষয়টা মিমাংসা হতে পারত– এমতাবস্থায় নতুন করে বিবাহ

পড়ানোর প্রয়োজন নেই। শুধু রুজু করে নিবে, স্ত্রীর সাথে স্বাভাবিক বসবাস শুর করে দিবে। সে তার স্ত্রী। এক তালাক দেয়ার পরও যদি সম্পর্ক স্বাভাবিক করা না যায় তাহলে দ্বিতীয় তলাক দেয়ার অধিকার অদিকার আছে। পুনরায় ইদ্দত পালনের ব্যবস্থা রয়েছে, সে ইদ্দতের মধ্যেও রুজু (তালাক প্রত্যাহার) করার সুযোগ রয়েছে। তারপরও যদি কোন সুরাহা না হয়, তবে মনে করতে হবে– এ মহিলা বাঁকা প্রকৃতির, উল্টো স্বভাবের। এ শেষ পর্যন্ত পরিবার ধ্বং ও নিঃশেষ করেই ছাড়বে। তখন তৃতীয় তালাক প্রদান করে বিষয়ের ইতি করা যেতে পারে।

আপনারা লক্ষ্য করেছেন, শরীয়ত কী পরিমাণ সুযোগ দিয়েছে; যদি ঝগড়ার আশংকা হয়, নসীহত কর, উপদেশ দাও। যদি উপদেশ গ্রহণ না করে ঘরে একা রেখে দাও। এ দ্বারাও না হয়, ওড়না দ্বারা প্রহার কর, এতেও সতর্ক না হয়, সালিস নির্ধারণ কর, তারপরও সুরাহা না হয়, সুন্নত তালাক দাও; বিবাহকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন কর না। এ দ্বারা অনুমান করা যায় যে, নবী আ.গণের নিকট বিবাহ কত প্রিয় ও মূল্যবান জিনিস, একে ভঙ্গ করা তাঁরা আদৌ পছন্দ করতেন না। আর শয়তানদের নিকট বিবাহ এত ঘৃণার বস্তু যে, তারা কামনা করে যে কোনভাবে বিবাহ ভঙ্গ হয়ে যাক, বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হোক। কোন শয়তান যখন স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কলহ বাধিয়ে আসে তখন বড় শয়তান তাকে জড়িয়ে ধরে এবং বলে তুমিই আমার সুপুত্র, বিরাট একটি কাজ তুমি করেছ। এ দ্বারা স্পষ্ট হয়ে গেল যে, বিবাহ নবী আ.গণের প্রিয় ও পছন্দনীয় বিষয়, আর শয়তানের প্রিয় হল বিবাহ বিচ্ছেদ।

যারা আল্লাহ প্রদত্ত জোড়কে টিকিয়ে রাখেন তারাই নেককার

নেককার হবেন তারা, যারা নবী আ.দের পথ অনুসরণ করে চলবেন এবং বিয়ে করার পর অন্তরে এ অঙ্গীকার করে নেবেন যে, ধৈর্য ও সহ্য সহকারে আমার স্ত্রীর সাথে জীবন যাপন করতে হবে। তার অধিকারসমূহ আদায় করতে হবে। যদি সে কিছুটা বাড়াবাড়িও করে তবুও আমাকে ধৈর্যধারণ করতে হবে, ক্ষমা করতে হবে। এজন্য যে, পরিবারকে ধ্বংস করা আমার উদ্দেশ্য নয়। পরিবারের কথা না হয় বাদ রাখলাম, দু'টি বংশের মধ্যে, দু'টি গোত্রের মধ্যে পারস্পরিক বিরোধ সৃষ্টি করব না। এগুলো হল স্বামী-স্ত্রীর মানসিকতার উপর নির্ভরশীল। তারা যদি নেক নিয়তে উত্তমভাবে জীবনযাপন করেন, তাহলে দু'টি পরিবারও মিলেমিশে থাকবে, দু'টি গোত্র সম্প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ থাকবে, দু'টি সমাজ

পরস্পরে মিলিত হয়ে থাকবে। আর তারা যদি বোকামী করে, তবে দু'টি গোত্র ও দু'টি সমাজের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিবে। তাদের দু'জনের উপরই সবকিছু নির্ভর করে। তারা যদি পরস্পরের হক বুঝতে পারে, বিবাহের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য, করণীয়-বর্জনীয় এবং আদব ও অধিকারসমূহ বুঝাতে পারে এবং রক্ষা করে চলে– যা শরীয়ত বর্ণনা করে দিয়েছে, তবে ঘর, পরিবার, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ও গোত্র-সমাজ সবই যথাস্থানে ঠিক থাকবে। এটা কত বিরাট একটি বিষয় যে, একজন মানুষ সম্পূর্ণ সমাজকে সামলে রাখার মাধ্যম হবে। আর ঐ মানুষটি কত খারাপ ও হতভাগা, যে সমাজের মধ্যে বিভেদ-বিচ্ছেদ সৃষ্টির মাধ্যম হয়ে যায়। এ কারণেই বিবাহের ব্যাপারটি অত্যন্ত নাজুক ও সহজ। সহজ এভাবে যে, দু'টি শব্দ বললেন, দু'জন জুড়ে গেলেন। আর নাজুক বা স্পর্শকাতর এ জন্য যে, এতে অনেক দায়িত্ব এসে যায়, মহিলারও দায়িত্ব বেড়ে গিয়েছে, পুরুষেরও দায়িত্ব বেড়ে গিয়েছে। এসগুলো রক্ষা করা ধৈর্যশীল ও সহ্যশীলের কাজ। অল্পতে দিশেহারা ও আত্মনিয়ন্ত্রহীন হয়ে পড়া যার অভ্যাস, সে তো বিরোধই বাধাতে থাকবে, গোত্র-সমাজে বিশৃংখলা ও অনৈক্য সৃষ্টি করতে থাকবে।

আল্লাহ তাআলা এজন্যই বিবাহকে তাঁর 'আয়াত' বলেছেন। অর্থাৎ এ হল আমার কুদরতের বিরাট এক নিদর্শন। আমিই অন্তরকে পরিবর্তনকারী। আল্লাহ তাআলা যখন অন্তরে অন্তরে জোড় ও সংযোগ স্থাপন করে দেন, তখন নেক স্বভাবের ব্যক্তি আল্লাহ প্রদত্ত বন্ধনকে অক্ষুণ্ন রাখেন, এর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন এবং আমৃত্যু তাকে টিকিয়ে রাখেন। আর বিবাহের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে পূরণ করেন। বিবাহের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য হল প্রশান্তি লাভ করা। স্বামী তার স্ত্রীর নিকট থেকে প্রশান্তি লাভ করবে, স্ত্রী স্বামীর সেবাযত্ন করে প্রশান্তি লাভ করবে। আর উভয়ের মধ্যে গভীর ভালবাসা, স্নেহ-মমতা এবং অনুগ্রহ ও রহমতের সম্পর্ক বিদ্যমান থাকবে; ক্রোধ ও কঠোরতা এবং বিভেদ ও বিরোধের সম্পর্ক যেন না থাকে। اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ. 'এ বিবাহে কুদরতের বড় বড় নিদর্শনাবলি রয়েছে।' আমি বলি এসব বিষয়াবলিকে যদি যথাযথ পালন করা হয়, তবে প্রতিটি বিষয়ই কুদরতের এক একটি স্বতন্ত্র নিদর্শন। যদি স্বামী-স্ত্রী প্রস্তুত হয়ে যান এবং আমল করেন তবে প্রতিটি জিনিসই নিদর্শনে পরিণত হবে। তবে তা হবে ঐ সমস্ত ব্যক্তিদের জন্য যারা চিন্তাভাবনা করেন এবং বিবেক বুদ্ধিকে কাজে লাগান।

মোবারকবাদ

উপরোক্ত আয়াতের আলোকে এ আমি কয়েকটি কথা এজন্য আরয করলাম যে, এখন একটি বিবাহের অনুষ্ঠান ছিল। বন্ধু ও প্রিয়জনেরা মোবারকবাদ পেশ করেছেন। আমার মোবারকবাদ হল এই– আমি বিবাহ সম্পর্কীয় অধিকারসমূহ এবং আদবসমূহ আরয করলাম। এ কথাগুলো দ্বারা আমিও মোবারকবাদ পেশ করছি। ছেলে পক্ষ ও মেয়ে পক্ষ– উভয় খান্দানের জন্য মোবারকবাদ পেশ করছি। পার্থক্য এতটুকু, আপনারা হলেন আত্মীয় ও আপনজন হিসেবে মোবারকবাদ জানিয়েছেন, আর আমি জাতির খাদেম হিসেবে মোবারকবাদ দিচ্ছি। আর জাতীয় খাদেমের কাজ হল খেদমতের তরিকা উপস্থাপন করা। এই হল সর্বোত্তম মোবারকবাদ। যদি বর ও কনে এ নসিহতগুলোর উপর আমল করেন তাহলে এটাই হবে সর্বোত্তম প্রকৃত মোবারকবাদ। আর ঐ বিবাহই খায়র ও বরকতের কারণ হবে।

এখন আপনারা সবাই দুআ করুন, আল্লাহ তাআলা যেন এই দুই স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে পারস্পরিক ভালবাসা নসিব করেন। যে দু'টি পরিবার পরস্পরের সাথে সংযুক্ত হল তাদের মধ্যে যেন ভালবাসা ও সম্প্রীতির সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়, একে অন্যের কল্যাণকামিতায় নিযুক্ত থাকে এবং একে অন্যের ভালবাসায় উপকৃত হতে পারে। তাদের অন্তরে যেন প্রশান্তি ও স্বস্তি বিরাজ করে এবং একে অন্যের জন্য খুশির কারণ হয়।

اللّٰهم ربنا تقبل منا إنك انت السميع العليم، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرّيّتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إمامًا. واخر دعوانا ان الحمدُ لِلّٰهِ رب العالمين.

দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত